কথা কল্পনা কাহিনী

(চতুর্থ স্তবক)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

ডাঃ বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলে

সূচীপত্র

চিত্ত ও চিত্র

অলৌকিক

প্রসন্ন মধুর

দুর্বোধ্য

মানিকবাবু দারুণ বিরক্ত হয়েছেন। আর বিরক্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে বৈ কি! ভদ্রলোকের পাড়ায় এ কী কাণ্ড! রোজ সন্ধ্যা হলেই লোকটা মদ খেয়ে এসে হল্লা শুরু করবে—এবং করবে বলতে গেলে ওঁরই কানের কাছে। ওঁর ভেতরের বারান্দার সামনাসামনি মনীশদের উঠোন, আর তার ঠিক ওপারেই শৈবালদের বাড়ির বারান্দা। সেইখানে দাঁড়িয়েই যত গোলমাল এবং চিৎকার লোকটার।

আগে হ'লে মানিকবাবুর বিরক্তিই যথেষ্ট ছিল। ওঁর ভুরু কোঁচকাতে দেখলেই পাড়ার লোক তটস্থ হয়ে উঠত। সেকালে এ পাড়ার মধ্যে উনিই একমাত্র বড় সরকারী কর্মচারী ছিলেন—তাও যেমন-তেমন বড় নয়—তখনকার দিনে সতের শ' টাকা মাইনের গরিষ্ঠ কেরানী, মানুষের শুধু সম্ভ্রম নয়—ত্রাসের সঞ্চার করত। কিন্তু সে দিন আর নেই। প্রথমত মানিকবাবু পেন্‌সন্‌ নিয়েছেন, লোকের চাকরি খাবার বা ক'রে দেবার হাত তাঁর চলে গেছে, দ্বিতীয়ত এখন তিনি ধরেছেন কন্‌ট্রাক্টরী ব্যবসা—তাতে মেজাজ সর্বদা চড়িয়ে রাখার অভ্যাসটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন ক'রে মন যোগানোর পাঠ নিতে গিয়েও যে খুব সফল হয়েছেন তা নয়, মাঝখান থেকে আগেকার রাশভারী গাম্ভীর্যটা হারিয়ে ফেলেছেন। তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা—আগেকার দিনের অর্থাৎ তাঁর চাকরির আমলে এ পাড়ার যাঁরা বাসিন্দা আজ তাঁরা সংখ্যালঘু। বিস্তর নতুন লোক এসেছে এ পাড়ায়। নানা দেশের নানান্‌ মানুষ। উদ্ধত ও দুর্বিনীত। প্রথম বয়স থেকে যে ধরনের বিনম্র বাধ্যতায় তিনি অভ্যস্ত, এদের ভেতর সেটার চিহ্ন খুঁজে পান না তিনি। ভয় হয় এদের কাছে মেজাজ দেখাতে। সম্মান যদি না থাকে? একবার গেলে ও বস্তুটি ফিরে পাওয়া শক্ত—এটুকু ব্যবহারিক জ্ঞান মানিকবাবুর আছে। এখনও তবু বড় বাড়ি, দামী গাড়ি ও যত্নকৃত দূরত্বের একটা মোহ লোকের কাছে আছে। ওরই মধ্যে সামান্য একটু সম্ভ্রম, সামান্য একটু সমীহের ভাব ওদের চোখে তবু ফোটে—চোখে চোখ পড়লে। সেটুকু সহজে খোয়াতে রাজী নন তিনি।

অথচ এ অবস্থাও তো অসহ্য।

প্রতিদিনই রাত দশটা এগারোটা থেকে ঐ হল্লা, কটূক্তি ও চিৎকার শুরু হয়। চলে রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত—যতক্ষণ না নেশা ও শ্রান্তিতে মাতালটার চোখ বুজে আসে। কতক্ষণ সহ্য করা যায়? এক-একদিন মনে হয় তাঁর হাণ্টারটা নিয়ে গিয়ে খুব দু'চার ঘা বসিয়ে দিয়ে আসেন কিংবা তাঁর গোণ্ড জেলার দারোয়ান সূর্যপালকে দিয়ে ধ'রে আনিয়ে ওরই নাল-বাঁধানো জুতোর ঘায়ে লোকটার মুখখানা থেঁৎলে বিকৃত ক'রে দেন।...দেওয়াও চলত হয়ত—যদি পাড়ার কারুর কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছুমাত্র, উৎসাহ না হোক, সমর্থন পেতেন।

শৈবালের বাবার একেবারেই মাথা খারাপ। তিনি আর ভাড়াটে পান নি—ঐ লোকটিকে ঘর ভাড়া দিয়ে বসে আছেন। তাই লোকটাকে এখন তাড়িয়ে দে! তারও তো কোন চেষ্টা দেখা যায় না—বেশ শান্তভাবেই সহ্য ক'রে যাচ্ছেন। ছেলেপুলের ঘর, এই অনাচার যে কী ক'রে সহ্য করেন, আশ্চর্য! ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে এই অসৎ উদাহরণ।

শৈবালের বাবা উপেনবাবু, এ পাড়ায় ঠিক নবাগত না হ'লেও খুব পুরাতনও নন। অর্থাৎ মানিকবাবুর গৌরবময় যুগের লোক নন। ডেকে ধমকে দেওয়ার মতো সম্পর্ক তাঁদের নয়। তাছাড়া উপেনবাবু মানুষটাও যেন কেমন কেমন। মার্টিন কোম্পানীর সামান্য কেরানী থেকে বড় অফিসার হয়েছেন—সেই মতো মেজাজটা তাঁরও কড়া।

সুতরাং কোথাও কোন উপায় খুঁজে পান না ভদ্রলোক, শুধু নিষ্ফল রোষে প্রত্যহ গর্জে বেড়ান। ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন আর অর্ধস্বগতোক্তি করেন নানা রকম।

সব চেয়ে তাঁর বিপদ হয়েছে—কারও কোন সহানুভূতি নেই।

তাঁর স্ত্রী, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী ও তরুণী স্ত্রী সুরমা—যার জন্য বেশী মাথাব্যথা মানিকবাবুর এই ব্যাপারে, যার রুচিবোধ ও আভিজাত্যের জন্যে তাঁর সংকোচের সীমা নেই—তিনিই সেদিন বলে ফেললেন, 'তার বাড়িতে সে চেঁচাচ্ছে তাতে তোমার এত জ্বালা কেন? সে-বাড়ির লোক কিছু বলে না,

তার পাশের বাড়ির লোক কিছু বলে না—যত অসুবিধে কি তোমারই? ইচ্ছে হয় ওদিককার সব জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দাও। তার জন্যে এত গজ্‌রাবার কি আছে?'

নাও কাণ্ড!

মানিকবাবু তো ভেবেই পান না যে তাঁর মাথা খারাপ হ'ল না কান? অর্থাৎ তিনি ঠিক শুনছেন ও ঠিক বুঝছেন তো?

তবু এই প্রথম বোধ হয় মাতালটার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতাও বোধ করেন।

সুরমা তাঁর সঙ্গে এতগুলো কথা বলবে এ যেন ধারণারও অতীত। আশা ও কল্পনা তো বহুকালই ছেড়ে দিয়েছেন মানিকবাবু।

দরিদ্রের ঘর থেকেই এনেছিলেন তিনি, অত্যন্ত চড়াদামে কিনতে হয়েছিল এ স্ত্রীরত্ন। খুবই দরিদ্রের ঘর ওদের। তবু মূল্য কম নেন নি সুরমার বাবা। বাইশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ির মর্টগেজ ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাজার টাকা দিয়ে সে-বাড়ি সারিয়ে দিতে হয়েছিল। রতনবাবু হেসে বলেছিলেন, 'আমার কি বলুন, আপনার মতো রাজা জামাই আসবে ভাঙা বাড়িতে—সে যে আপনার অপমান।'

আসল কথা বাড়ি উদ্ধার ক'রে সারিয়ে নিচের তলাটা মোটা টাকায় ভাড়া দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন রতনবাবু। ইহকালের ভাবনাটা আর রইল না। মেয়েকেও তিনি তাই কথা দিয়েছিলেন। সুরমা যেদিন শুনেছিল পঞ্চান্ন বছরের বিপত্নীক মানিকবাবু ছেলের জন্যে মেয়ে দেখতে এসে নিজেই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন এবং তার জন্য যে কোন দাম দিতে রাজী আছেন, আর সেই সঙ্গেই শুনেছিল যে এক মাসের মধ্যে বাইশ হাজার টাকা দিতে না পারলে এ বাড়ি নিলাম হয়ে যাবে এবং সে নিলামে যা দাম উঠবে তা বাইশ হাজারের বেশি হবে না কিছুতেই—অর্থাৎ কপর্দকশূন্য হয়ে পথে বসতে হবে, সেদিন এ দুটো সংবাদের মধ্যেকার যোগাযোগ-রক্ষাকারী অনুক্ত বক্তব্যটা বুঝতে একটুও দেরি হয় নি তাঁর। কিছুক্ষণ বিবর্ণ মুখে স্থির হয়ে বসেছিল সে, একদৃষ্টে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে—সে সময় মধ্যে মধ্যে রক্তের ঢেউ সে পাংশু কপোলের উপর দিয়ে খেলে গিয়েছিল কি না প্রবীণ রতনবাবু তা লক্ষ্য করেন নি—তার পর শান্ত কণ্ঠেই বলেছিল সে, 'মেয়ে যদি বেচতে হয় বাবা তো বেশ চড়া দামেই

বেচো। বাকী জীবনটা যেন আর দুঃখের পেছনে দৌড়তে না হয়। নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ ক-টা দিন কাটিয়ে দিতে পারো এমন ব্যবস্থাই ক'রে নিও।'

সুরমা জানত যে বাবা টাকা উড়িয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হন নি। তিনটি বোনের বিয়ে দিয়েছেন ঋণ ক'রে—তারই ফলে এই অবস্থা। সে তাঁকে ক্ষমা করেছিল।

এই সুরমার বিবাহের ইতিহাস। বাড়িতে পা দিয়ে তার সেই তেইশ বছরের সপত্নীপুত্রকে দেখতে পায় নি। ঘৃণায় নাকি বাড়ি ত্যাগ ক'রে সে মামার বাড়ি ছিল, সেইখান থেকেই বিলেত চলে গেছে। তা যাক্। দুঃখ? দুঃখ কারও কোন আচরণে পেয়েছে কি না সুরমা তা আজও মানিকবাবু বুঝতে পারেন নি।

দরিদ্রের ঘর থেকে অত পয়সা দিয়ে কিনে আনার জন্যে কোন কৃতজ্ঞতা আশা করেছিলেন কি না মানিকবাবু তা আমরা জানি না—হয়ত রূপ ও যৌবনের এবং হঠাৎ বড়মানুষের ঘরে পড়ার জন্যে কিছু অহঙ্কার আশা করে-ছিলেন কিন্তু এমন চরম ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতা তিনি কখনই কল্পনা করেন নি।

হয়ত ঔদাসীন্য বললে ভুল বলা হবে। এক রকমের অবজ্ঞা-মিশ্রিত উপেক্ষা বলাই ঠিক। জিনিসের মূল্য সম্বন্ধে তার সচেতনতা দেখলে মানিকবাবুই অবাক হয়ে যান। দাম না জানা থাকলেও সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস বেছে নিতে কখনও ভুল হয় না। দামী কাপড়-জামা-আসবাবই সে ব্যবহার করে কিন্তু তার কোনটা সম্বন্ধেই এতটুকু আসক্তি নেই। অর্থ সম্বন্ধে এমন নির্বিকার ভাব মানিকবাবু দেখেন নি বললে একটু অবিচার হবে—ব্যবসায় ও চাকরি উপলক্ষে বহু কোটিপতির সঙ্গে মিশেছেন, একমাত্র তাদেরই ঘরে কারুর মধ্যে এই উপেক্ষা ও নিস্পৃহতা লক্ষ্য করেছেন। তিনি ভেবেই পান না যে এ আভিজাত্য সুরমা কোথায় পেল।

এর জন্য তিনি গর্বিত বোধ করতে পারতেন যদি পরিপূর্ণ অধিকার তাঁর জন্মাত ঐ মেয়েটির ওপর। একদিন মানিকবাবু বহু দুঃখেই আবিষ্কার করলেন যে তিনি তাঁর এই সুন্দরী ও অভিজাত স্ত্রীটিকে রীতিমত সমীহ ও ভয় ক'রেই চলেন। অথচ কোন বিরুদ্ধভাব তার নেই—বিদ্রোহ তো নয়ই। কথা কইলে যে উত্তর দেয় না তা নয়, কিন্তু উত্তরই দেয় শুধু। নিজে থেকে কখনই কথা কয় না। পাশে বসে থাকলে উঠে যায় না—ওঁর সঙ্গ এড়াবার চেষ্টা নেই— কিন্তু

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাথরের মতোই বসে থাকে পাশে, তাতে প্রাণের স্পর্শ পান্ না। সঙ্গ আছে কিন্তু সঙ্গ-সুখ নেই। অথচ রাগ করবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পান না—ভদ্রভাবে রাগ ক'রেও দেখেছেন—কোন ফল হয় না। যে মান ভাঙাবে একমাত্র তার ওপরই অভিমান করা যায়—কী দাবীতে কিসের জোরে অভিমান করবেন? ক্রোধ প্রকাশের হেতুও হয় না বিশেষ, সুরমা যে তাঁর বাধ্য নয়, এমন কথা কিছুতেই মানিকবাবু বলতে পারেন না।

তার ওপর বছর দুই হ'ল ওর আর একটি অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়ে মানিকবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বাতজ্বরে কয়েকদিন বেশ একটু কাবু হয়ে পড়েছিলেন—হাতের এমন জোর ছিল না যে কলম ধরেন। তাই সুরমাকে বলেছিলেন ওঁর সুপারভাইজিং এঞ্জিনীয়ারকে একটা চিঠি লিখে দিতে। উনি বক্তব্যটা বাংলাতেই বলেছিলেন, আশা করেছিলেন যে কোনমতে চলনসই ভাষায় সুরমা বাংলাতে লিখে দিতে পারবে—কিন্তু চিঠি লেখার পর যখন উনি দেখতে চাইলেন তখন সুরমা ওঁর হাতে কাগজটা দিতে ওঁরা দুজনেই চম্‌কে উঠলেন। চমৎকার শুদ্ধ ইংরাজীতে অফিসিয়াল নির্দেশ! পাকা কেরানীও সে ভাষায় লিখে গর্ববোধ করত! মানিকবাবু চম্‌কে উঠলেন ওঁর ইংরাজীতে এই অসামান্য দখল দেখে, আর সুরমা চম্‌কে উঠল অজ্ঞাতসারে নিজের এই বিদ্যাটা প্রকাশ পেয়ে গেছে বলে। আফিসের চিঠি ব'লে স্বাভাবিকভাবে, সহজেই ইংরেজীতে বেরিয়ে গেছে কলম দিয়ে—এখন স্বামীর চোখে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় দেখে নিজেই সচেতন হয়ে উঠল।

মানিকবাবু বললেন, 'তবে যে তোমার বাবা বলেছিলেন তুমি কখনও ইস্কুলে পড়ো নি!'

'ঠিকই বলেছেন। বাবা মিথ্যে কথা বলেন না।'

'তবে এমন ইংরেজী শিখলে কোথায়?'

'বাড়িতেই পড়েছি।'

'কে পড়িয়েছেন, বাবা?'

'না।'

এর চেয়ে বেশি প্রশ্ন করতে মানিকবাবুর সাহসে কুলোয় না।

ফলে স্ত্রীর সম্বন্ধে সম্ভ্রমবোধ বেড়েই গেছে। আরও বেশী সমীহ করেন,

আরও বেশী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তার সম্বন্ধে কিছু করতে গেলে—কিছু স্বাচ্ছন্দ্য, কিছু বিলাসের উপকরণ যোগাতে গেলে মনে হয় কোনটাই বুঝি উপযুক্ত হচ্ছে না এমন স্ত্রীর। গর্ববোধ করেন যথেষ্টই—বাইরে কর্মচারীদের কাছে বলে বেড়ান যে তাঁর মৃত্যুর পর ব্যবসার কোন ক্ষতি হবে না। তাঁর স্ত্রী এমন সাতটা অফিস চালাতে পারবে।

কিন্তু এত সব অনুভূতি সত্ত্বেও আসলটি নেই। তৃপ্তি বোধ করতে পারেন না। হাতের মুঠার মধ্যে থেকেও যে সুদূর, তাকে দিয়ে বুক ভরলেও মন ভরে না—গর্বে বুক ফুলে উঠতে পারে কিন্তু তৃপ্তি কোথায়?

এ হেন স্ত্রীর আভিজাত্য নিয়েই যখন এত দুর্ভাবনা, যার রুচিবোধের ক্ষুণ্ণতার আশঙ্কাই ওঁর বিরক্তির প্রধান কারণ, তখন অকস্মাৎ সেই স্ত্রীর এ কী উক্তি?

ঈষৎ ক্ষুণ্ণকণ্ঠেই মানিকবাবু উত্তর দিলেন, 'আমি তো এসবে অভ্যস্ত, কুলী-কামারী নিয়ে আমার কারবার। তোমার জন্যেই আরও—'

'আমি!' একটুখানি হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। সে হাসিতে কী ছিল? বিদ্রূপ? হতাশা? অভিযোগ? কে জানে! মোনালিসার হাসির মতোই বিচিত্র, রহস্যময়।

অতশত বোঝেন না মানিকবাবু। কেমন যেন ম্লান হয়ে কুঁকড়ে যান শুধু এই হাসির সামনে! কী বক্তব্য, অভিযোগই কিছু আছে কিনা—প্রশ্ন করতেও সাহসে কুলোয় না।

কিন্তু তাই ব'লে অত সহজে ছাড়বার লোক মানিকবাবু নন্। তিনি গোপনে গোপনে পাড়ায় লোক লাগালেন, উপেনবাবুর কাছ থেকে খবরটা সংগ্রহ করবার জন্য। খবরটা শুনে আরও একবার নিষ্ফল রোষে দাঁত কিড়-মিড় করলেন। লোকটার নির্ঘাৎ মাথা খারাপ, নইলে এমন কথা কেউ বিশ্বাস করে! ঐ মাতালটা নাকি ডবল এম. এ. পাস। ইংরেজী আর ইকনমিক্স্ দুটোতেই ফার্স্ট হয়েছিল। ওর মতো ইংরেজী লিখতে নাকি ইংরেজরাও পারে না। কোন কলেজের প্রোফেসারীও পেয়েছিল কিন্তু অত্যধিক মদ্যপানের জন্যই সব চাকরি যায়। তারপর ইস্কুলের মাস্টারী—তা থেকে এখন শুধু

কয়েকটি টিউশ্যনী ভরসা। সকালের দিকে টিউশ্যনী করে, বিকালের দিকে মদ খায়। এই ওর কাজ, উপেনবাবু শৈবালদের সব কটা ভাইবোনকে পড়াবার বিনিময়ে ওকে থাকবার জন্য সিঁড়ির চিলেকোঠার ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। আর দুটি দুটি খেতে দেন। বিকেলে খাবার মতো অবস্থা কোন দিনই থাকে না, দিনের বেলাও অর্ধেক দিন খায় না—পেটের ব্যথায় পেট টিপে বসে বসে পড়ায়। অর্থাৎ একরকম বিনা খরচে এমন একটা পণ্ডিত মাস্টার পাওয়ার লোভেই নাকি অত ঝামেলা সহ্য করেন ভদ্রলোক।

'এমন না হ'লে বুদ্ধি!' মানিকবাবু ব্যঙ্গের হাসি হাসেন, 'ছেলেকে পড়াতে গিয়ে ওধারে যে পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল! ঐ ব্যাড এক্জাম্পল চোখের সামনে রাখলে ছেলেপুলে মানুষ হবে? তা ওঁর ছেলেপুলেকে উনি যা খুশি করুন—কিন্তু পাড়ার ছেলেদের অধঃপাতে দেবার কী অধিকার আছে ওঁর?'

যে লোকটি খবর সংগ্রহ ক'রে এনেছিল সে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে আবারও বললে, 'শুধু কি তাই! রোজগার নেই বলতে গেলে এক পয়সাও, অথচ মদ খাওয়া চাই রোজ—রীতিমতো ভিক্ষে করে মদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আবার সেদিন দেখি পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে দু' পয়সা এক পয়সা ক'রে চাইছে।'

'রাস্কেল! ব্ল্যাক গার্ড! এ সব লোকদের যারা প্রশ্রয় দেয় তাদেরও হর্স-হুইপ করতে হয়।' দাঁতে দাঁত চেপে বলেন মানিকবাবু।

বেশাদিন আর উদাসীন থাকা যায়ও না। লোকটা বড্ডই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। অকথ্য কথা বলে সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, যা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। বিশেষ ক'রে একদিন যখন দেখলেন যে সুরমা রাত্রে খাওয়ার পর ছাদে আগে নিয়মিত বেড়াত এখন সেটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে—তখন আরও আক্রোশ বেড়ে গেল। অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে ওর মার্জিত রুচিতে বাধে বলেই সুরমা বোধ করি ওঁকে সেদিন ঐ কথাগুলো বলেছিল, কিন্তু এধারেও নিশ্চয়ই অসহ্য হয় ওর। নইলে এত দিনের অভ্যাস ছাড়বেই বা কেন? না না, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে, মনে মনে বিষম ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মানিকবাবু—এমন করলে সুরমার স্বাস্থ্য টিকবে কেন? এই

ক'দিনেই যেন বেশ একটু কৃশ হয়ে গেছে। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেন মানিক-বাবু, ওর চোখের কোণেও যেন কালি পড়েছে, বেশ সুস্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ।...

সব লাজ-লজ্জা সম্ভ্রমবোধ বিসর্জন দিয়ে মানিকবাবু একদিন শৈবালদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। উপেনবাবু তো অবাক—চোখকেই যেন বিশ্বাস হয় না। সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে বলেন, 'কী ভাগ্য আমার! আসুন আসুন!'

'ভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য বরং বলতে পারেন। আপনার আমার—পাড়ার সবাইকারই। এ কী মাল জুটিয়েছেন, বাড়িতে যে টিকতে পারি না!'

গম্ভীর হয়ে ওঠে উপেনবাবুর মুখ। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'ব্যাপারটা যে আমিও খুব প্রসন্ন মনে সহ্য করছি তা ভাববেন না। আসল কথা কি জানেন, আগে অতটা আমি ভাবি নি। কিন্তু এখন ফেলিই বা কোথায়, চলে যাবার কথা তো কানেই তোলে না। তাড়িয়ে দিলে রাস্তায় পড়ে মরবে। তবু সেদিন বলেছিলুম, বেশ রূঢ় ভাবেই বলেছিলুম—বলে, মরণ রোগ ধরেছে, বেশিদিন বাঁচব না—আপনার আশ্রয়েই মরতে দিন। একটুখানি আত্মীয়তাও আছে খুব দূর সম্পর্কের—একেবারে রাস্তায় বার ক'রে দিতেও পারছি না।'

'ওর আর কে আছে?' মানিকবাবু প্রশ্ন করেন।

'কেউ নেই। সেই তো হয়েছে বিপদ। মা-বাবা তো ছিলই না কখনও—পরের ঘরে মানুষ, বলতে গেলে পাড়ার লোকের দয়ায়। কিন্তু লেখাপড়ায় চিরদিনই ব্রিলিয়াণ্ট—নিজে পড়ে টিউশ্যনী ক'রে পাড়ার গরীব ছেলেমেয়েদেরও অনেককে পড়িয়েছে ও। অনাথ ছেলে বলে উন্নতির চেষ্টা ওর খুবই ছিল—উন্নতি ক'রেও ছিল খুব। একটা এম. এ. পাস করে মাস্টারী পায়, মাস্টরী করতে করতেই আর একবার এম. এ. পাস করলে। ভাল চাকরি পেত, পড়ানোর দিকে ঝোঁক ছিল বলে প্রোফেসরী নিলে, অবশ্য সরকারী কলেজেই ঢুকেছিল, ক্রমে মোটা মাইনে হ'ত—কিন্তু কী করে যে কী হ'ল। দেখুন না এই এক ঘোড়ারোগে সব গেল!'

'এটা হ'ল কি ক'রে?' প্রশ্ন করেন মানিকবাবু।

'সেটা ঠিক জানি না। লোকপরম্পরায় শুনেছি কিসে একটা দারুণ শক্ পেয়েই নাকি এই দিকে ঝোঁকে। আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলুম ওর

'সোবার' অবস্থায়। চুপ ক'রে থেকে হেসে জবাব দিয়েছিল, জীবনে বড় ঝামেলা—তাই দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ভগবান দু'হাতে ব্যয় করার মতো অর্থ তো দেন নি, জীবনটাই তাই বিলিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছি এমনি ক'রে।'

'আশ্চর্য তো!'

মানিকবাবুও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'তাই তো, কিছুই করা যাবে না?'

উপেনবাবু বললেন, 'করতেও বোধ হয় হবে না। কাল তো লিভারের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে ছিল ছ' ঘণ্টা। তার উপর গিয়ে মদ খেয়েছে। মদ খেলে নাকি গলা থেকে পেট পর্যন্ত জ্বলতে থাকে—তবুও খায়। ক-দিন বা বাঁচবে?'

'আচ্ছা, চলি' বলে মানিকবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

'বিলক্ষণ,' শশব্যস্তে উপেনবাবু বলেন, 'গরীবের ঘরে এলেন, একটু চা-টা?'

'না না—কিছু না। ধন্যবাদ। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, আমার স্ত্রীর বড় ডেলিকেট নার্ভস্—রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন উনি এই ব্যাপারে।'

'তাই তো! বড়ই লজ্জার কথা।…দেখি একবার বুঝিয়ে বলে। ছোঁড়া একরকম যেন ডেলিবারেট্‌লি আত্মহত্যাই করতে চায়।'

আশ্চর্য এই যে সেই দিন থেকেই সমস্ত গোলমাল কোলাহল যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এটা এতই শান্তি, এত আশ্চর্য রকমের মুক্তি যে সকলেই ঘটনাটা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল। এমন কি সুরমাও তার সুকঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে একদিন স্বামীকে প্রশ্ন করল, 'তোমার মাতাল কি তোমার শাসনে সত্যিই পাড়া ছাড়লে নাকি?'

নিজে থেকে কথা বলা সুরমার পক্ষে অবিশ্বাস্য ব্যবহার। কৃতার্থ মানিক-বাবু এই রোমাঞ্চকর অনুভূতি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অনুভব ক'রে মুচকি হেসে বললেন, 'আমার নয়—তোমার শাসনে।'

'তার মানে?' কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ শোনায় সুরমার।

'মানে—আমি সেদিন বলেছিলুম উপেনবাবুকে—যে—মানে তোমার

শরীর খারাপ, এই সব চেঁচামেচিতে তোমার নার্ভ অকারণ উত্তেজিত হয়। শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়ে।'

'কেন এমন কথা বলতে গেলে তুমি? কী জন্যে বললে? কে বলেছে আমার শরীর খারাপ হয়? আমি বলেছি তোমাকে?'

'না না, তা বলো নি। কিন্তু তাতে তো ফল ভালই হয়েছে গো। কাল উপেনবাবুর মুখে খবর নিয়ে জানলুম যে এতদিন এত লোকের চেষ্টায় যা হয় নি—তোমার নাম ক'রে উনি সেই ঐন্দ্রজালিক ফলই পেয়েছেন। উপেনবাবু বলে ছলেন, তোমার হল্লা-হাঙ্গামায় মানিকবাবুর স্ত্রীর শরীর বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তুমি কি ওঁকে মেরে ফেলবে?…তাইতেই নাকি আশ্চর্য ফল হয়েছে। একেবারে সেই দিন থেকে মদ খাওয়া ছেড়েছে। আছে এখানেই—কিন্তু মদ আর খায় না।…তবে শরীর খুব খারাপ নাকি, বেশি দিন আর বাঁচবে না।'

সুরমা স্বামীর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ভাবেই কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'ভবিষ্যতে আমার নাম ক'রে কাউকে কিছু না বললেই খুশী হবো।'

এই বলে সে স্বামীর দিকে না চেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

মানিকবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থেকে বললেন, 'বোঝো কাণ্ড! যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর!'

সেদিনের পর থেকে আবারও সেই সুকঠিন স্তব্ধতার আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখেছিল সুরমা। ও প্রসঙ্গ আর তোলে নি, কোন কথাই কয় নি বলতে গেলে মানিকবাবুর সঙ্গে।

চার-পাঁচ দিন পরে হঠাৎ মানিকবাবুই কথাটা পাড়লেন।

'ওগো শুনেছ সেই মাতালটার কাণ্ড?'

পাষাণ-কঠিন মুখভাবে কোন পরিবর্তনই হয় না। শুধু বঙ্কিম ভ্রূ ঈষৎ তুলে প্রশ্ন করে সুরমা, 'কী কাণ্ড?'

'এত মদ খেত, এখন হঠাৎ সব ছেড়ে দেওয়ার ফলে নাকি একেবারে শরীর ভেঙে পড়েছে। এখন ডাক্তারে বলছে সামান্য একটু ওষুধের মতো খেতে—তাতেও সে রাজী নয়। বলে ছেড়েছি যখন তখন আর না। মরতে তো হবেই,

যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভাল।...বোঝ দেখি। হা-হা!...একেই বলে মাতালস্য ভঙ্গী নানা।'...

সুরমা কথা কইলে না। যে ইংরেজী উপন্যাসখানা (ওর ইংরেজী জ্ঞানের পরিচয় পাবার পর মানিকবাবু অজস্র বিলিতী বই কিনে দিয়েছেন) পড়ছিল, খানিক পরে আবার স্বভাবসুলভ চরম নির্লিপ্ততার সঙ্গে সেইটেই তুলে পড়তে লাগল। কথাগুলো ভাল ক'রে শুনল কিনা তাও বুঝতে পারলেন না মানিকবাবু।

চার-পাঁচ দিন পরে হঠাৎ একদিন পাড়ার ঐ কোণে মৃদু হরিধ্বনি উঠল। সামান্য একবার মাত্র, 'বল হরি হরি বোল!' কিন্তু তবু তা সুরমার কানে পৌঁছল। ছাদে পায়চারি করছিল অভ্যাসমতো, শব্দ কানে যেতেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল।

উপেনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলিটা ঘুরে গিয়ে যেখানে সদর রাস্তায় পড়েছে সেই বাঁকটা দেখা যায় ওদের ছাদ থেকে। সুরমা একটু ঝুঁকে পড়ে দেখল, মাত্র চার-পাঁচটি পাড়ার ছেলে একটা মড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল। দীন হীন আয়োজন—নিতান্তই কোন আত্মীয়হীন হতভাগ্যের মৃতদেহ।

শব্দটা মানিকবাবুর কানেও গিয়েছিল।

তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'বল-হরি দিলে না? কাদের বাড়িতে ম'ল? মাতালটা গেল নাকি?'

সুরমা ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিলে না, যেমন নিঃশব্দে পায়চারি করছিল তেমনিই করতে লাগল। সেদিন বরং একটু বেশিক্ষণই ছাদে রইল—গভীর রাত্রে সে যখন শুতে গেল মানিকবাবু তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পরের দিন অফিস থেকে এসে শুনলেন, স্ত্রীর শরীর খারাপ, একটু দুধ ছাড়া কিছুই খায় নি সারাদিন।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে আগেই শোবার ঘরে গেলেন, 'কী হয়েছে তোমার, ডাক্তার ডাকো নি কেন? আমাকে একবার ফোনে জানালে তো পারতে!'

সুরমা ক্লান্ত সুরে জবাব দিলে, 'অকারণে ফোন ক'রে লাভ কী? এমনি একটু গা-টা ভার-ভার—একটু শুকিয়ে থাকলেই সেরে যাবে।'

কিন্তু তাতেও উদ্বেগ কমে না মানিকবাবুর। তিনি বলেন, 'তুমি বুঝছ না,

দিনকাল ভারি খারাপ। বড্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে। ডাক্তার ডাকা ভাল—।'

'প্লীজ!' বাধা দিয়ে সুরমা বলে, 'আমাকে শুধু একটু কোয়ায়েট্‌লি থাকতে দাও!'

ইচ্ছাই যেখানে আদেশ, সেখানে মানিকবাবু আর কি করবেন। ম্লান মুখে বেরিয়ে চলে এলেন তিনি।

কিন্তু পরের দিনও যখন সুরমা বিছানা ছেড়ে উঠল না—শুধু একটু দুধ আর কমলালেবু খেয়ে রইল, তখন আর মানিকবাবু ওর ভয়েও চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। ডাক্তার নিয়ে বাড়ি ফিরলেন একেবারে। ডাক্তার গম্ভীর মুখে পরীক্ষা ক'রে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই—এমনি একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার ছোঁয়াচ আর কি। একটা মিকস্‌চার দিচ্ছি, আর একটা ঘুমের ওষুধ—'

তৎসত্ত্বেও সারা রাত বেশ একটু উদ্বেগেই কাটালেন মানিকবাবু। তাই ভোরের দিকে এমন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন কখন যে পাশের খাট থেকে সুরমা উঠে গেছে তা টের পান নি। ঘুম যখন ভাঙল তখন বিছানা খালি দেখে ধড়মড় ক'রে উঠে এসে সামনেই কালীর মাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নতুন মা কোথায় গেল কালীর মা?'

'ওমা, তিনি যে গঙ্গা নাইতে গেছে!'

'কোথায় গেছে?'

'গঙ্গা নাইতে গেছে। অন্নপুন্নো গেছে সঙ্গে আর দারোয়ান।'

বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে কালীর মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন মানিকবাবু। অনেকক্ষণ পরে শুধু বলেন, 'বোঝো কাণ্ড!'

সুরমা ফিরে এল আটটারও পর।

'ইকি কাণ্ড তোমার।...দু'দিন জ্বর গেল আর আজই গঙ্গা নাইতে গেলে!'

তাড়াতাড়ি নেমে এসে প্রশ্ন করেন মানিকবাবু।

'জ্বর কে বললে? ডাক্তার বলেছে তোমাকে?'

'না, তা অবশ্য বলে নি। কিন্তু গঙ্গাতেই বা কেন?'

'ইচ্ছে হ'ল। দুদিন চান করি নি, মাথা যেন জ্বলছিল!' সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল সুরমা শান্ত ধীর ভাবেই।

'মাথায় তেল দাও নি?' খানিক ওর দিকে তাকিয়ে থেকে মানিকবাবু

পুনশ্চ প্রশ্ন করেন।

'দিই নি বুঝি? তা হবে। মনে ছিল না।'

কোনদিকে না তাকিয়েই সুরমা জবাব দেয়।

অন্নপুন্নো ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, 'তেল না সাবান না কিছু না। একেবারে পাগলির মতো সবসুদ্ধ গিয়ে ডুব। তাই কি উঠ্‌তে চায় জল থেকে? কতক্ষণ ধরে যে একগলা জলে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল—তার ঠিক নেই। আমার তো ভয় হয়ে গিছ্‌ল। বলি ভির্মি গেল না তো? দুদিন খাওয়া নেই!...'

সে বকেই যেতে লাগল। মানিকবাবু 'ছাখো দিকি কাণ্ড, নিমোনিয়া না বাধায়!' বলতে বলতে উদ্বিগ্ন মুখে স্ত্রীর পিছনে পিছনে ছুটলেন।

সামাজিক

নীলার বিয়ে কিছুতেই কোথাও ঠিক হচ্ছে না, এই নিয়ে রজতবাবুর জীবদ্দশাতে অশান্তির শেষ ছিল না। নীলার মা রেণুকা সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত—দিনমানে প্রায় কখনই তাঁর নাগাল পেতেন না, বাজার-রেশন-দুধ-ডাক্তার-টিউশ্যনী-অপিসে নিরন্ধ্র ক'রে রেখেছিলেন তাঁর নিরবসরটিকে—এই নিয়ে অনুযোগ ক'রে যেতেন আর রজতবাবু নিজের অক্ষমতা ও নিরপরাধ প্রমাণের এবং নিষ্ক্রিয়তার অপবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করতেন।

এ বহুদিনের কথা, নীলার বিয়ে আর হ'ল না, এই হতাশা নিয়েই একদিন রজতবাবু ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে এ সান্ত্বনাও নিয়ে যেতে পেরেছিলেন যে, যাদের রেখে যাচ্ছেন তাদের একেবারে উপবাস ক'রে কাটাতে হবে না। কারণ, নীলা তার আগেই একটা চাকরিতে ঢুকেছে।

রেণুকার আপসোস ও আপসানি অবশ্য যায় নি। বরং বিলাপ ও পরিতাপ বেড়েছে। সেই সঙ্গে মৃত-স্বামীর উদ্দেশে অনুযোগ-অভিযোগও। 'পুরুষ-মানুষের দায় এসব, এ কি আমার করবার কথা? উঠে পড়ে লাগলে কি আর মেয়েটার বিয়ে হ'ত না! কালো নয়, কুলো নয়—সুন্দরী মেয়ে আমার, বি. এ. পাস। নিজে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে দিব্যি সরে পড়লেন—এখন মর্ মাগী তুই! আমি এই বয়সে লোকের দোরে দোরে ঘুরি, ওগো আমাকে একটা

পাত্তর দেখে দাও গো, ওগো আমাকে একটা পাত্তর দেখে দাও গো। সত্যি, বিধাতার বিচার বটে। আমাকে যদি আগে নিত তাহলে আর এসব দেখতেও হ'ত না, বলতেও হ'ত না। যার দায় সে বুঝত, পারত দিত, না পারত মেয়ের রোজগারে বসে খেত। আমার কি তাতে!' ইত্যাদি—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন নীলা নিজেই তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করল তখন তার মা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন একেবারে। সে স্তব্ধতা অনুযোগের বা দুশ্চিন্তার কারণ দূর হ'ল বলে নয়—সে-নীরবতা স্বস্তির ও শান্তির নয়। কারণ তাহলে সেই সঙ্গে মুখে একটা অন্ধকার ছায়াও নেমে আসত না অমন ভাবে।

এ-ছায়া ও বিষাদের কারণ অনেক। তার খানিকটা নীলা জানত বা অনুমান করতে পেরেছিল—সবটা পারে নি।

সাধারণত মেয়েরা এই ধরনের স্বয়ম্বরা হলে মেয়ের মা-বাবা বা অভিভাবকরা যে কারণে বিষণ্ণ বা ক্ষুব্ধ হন—এক্ষেত্রে সে-কারণ কিছু নেই। নীলা যাকে পছন্দ করেছে সেও ব্রাহ্মণ, বি. এস-সি পাস, সুশ্রী দেখতে, ভাল চাকরি করে। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে—সে-প্রমাণও রেণুকা পেয়েছেন। ভাল নামকরা ওষুধের কারখানার মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, সাতশ' টাকা মাইনে পায়, এছাড়া টি. এ. থেকেও কিছু বাঁচে। বিদেশেও নিয়ে গিয়ে ফেলবে না, দীর্ঘ অনুপস্থিতিরও ভয় নেই। বিমানের হুদ্দো এখানেই—কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান।

এমন পাত্র ধনীর ঘরের রূপসী দুলালী মেয়েরও কাম্য।

তবে?

নীলা ভেবেছিল যে বিয়ের পর তার আয়টা বন্ধ হয়ে যাবে বলেই মায়ের দুশ্চিন্তা এত। সেই মতো সে একটা সান্ত্বনাও দিতে গিয়েছিল, 'আমি যে টাকাটা সংসারে দিতুম মা—এখন অন্তত কিছুকাল তা দিয়ে যেতে পারব, সে-কথা ওর সঙ্গে আমার হয়েই গেছে—ও বলেছে তোমাকে বিয়ে করছি তোমার জন্যেই, তোমার রোজগার খাওয়ার জন্যে নয়। স্ত্রীর রোজগারে বসে খাবার প্রবৃত্তি হলে অনেকদিন আগেই বিয়ে করতে পারতুম—এতদিন অপেক্ষা করব কেন? আমার হাতখরচা বলে যা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা তুমি দাও, সেইটেই রাখব—তার বেশী নয়।'

তার জবাব দিয়েছেন রেণুকা ভ্রূকুটি করে, 'যদি তোমার রোজগার বন্ধ হয়ে যাবার ভয়েই হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যেত মা—সে-চিন্তাই যদি এত বড় হ'ত, তাহলে তোমার বিয়ের কথা জনে জনে বলবই বা কেন, তার জন্যে এত ব্যস্তই বা হবো কেন ?'

তবে ?

প্রশ্নটা নিরুত্তরিতই থেকে যায়।

এ এমন একটা কথা যা মেয়েকেও বলতে পারেন না রেণুকা।

যেদিন থেকে ওঁরা নীলার জন্য ছেলে খুঁজতে শুরু করেছিলেন সেদিন—অর্থাৎ সে-সময় রজতবাবুর হাতে কিছু টাকা ছিল। বেশী নয় অবশ্য, হাজার আষ্টেক টাকা—এই টাকাটা তিনি অতিকষ্টে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে, মানে এর মধ্যে লাইফ ইনস্যুরেন্সের একটা টাকাও ছিল, সেটা খরচ না ক'রে নীলার বিয়ের জন্যই চিহ্নিত ক'রে রেখেছিলেন।

নীলা তখন সবে বি.এ. পড়তে শুরু করেছে। ডাকের সুশ্রী না হলেও সুশ্রী মেয়ে, লেখাপড়ায় ভাল, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। ওঁরা ভেবেছিলেন ওঁদের মতো মধ্যবিত্ত ঘরের মাঝারি পাত্র পাওয়া খুব কঠিন হবে না। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক— রেণুকার মাসীর ভাষায় 'বে-র ফুল ফোটে নি' বলেই সম্ভবত সে-রকম 'আনে-নেয়-খায়-দায়' এবং অন্তত বি.এ. পাস পাত্রও একটা পাওয়া যায় নি। ওরা যাকে পছন্দ করছিলেন, সে বা তার অভিভাবকরা মেয়ে ও মেয়ের ঘর পছন্দ করে নি, যারা করেছে তাদের ঘরে এঁরা মেয়ে দিতে চাননি।

এইভাবেই সময় কেটেছে। বছরের পর বছর।

নীলা বি. এ. পাস করেছে। এম. এ-ও পড়েছে বছর দুই। তারপর আরও দু বছর বসে থেকে একটা চাকরিও খুঁজে নিয়েছে। চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটা বড় ওষুধের দোকানে চাকরি। সেইখানেই এই পাত্র বিমানের সঙ্গে ওর পরিচয়। তাও চট ক'রে কিছু হয় নি—কারণ এই সময়ই একদিন, প্রায় বিনা নোটিশে রজতবাবু মারা গেছেন। আপিস থেকে ফেরার পথে অভ্যাসমতো বাজারে ঢুকেছেন একবার, সেইখানেই নাকি শরীরটা খারাপ লেগেছে, তা সত্ত্বেও দরকারী জিনিসগুলো কিনেছেন, শেষে খুব খারাপ লাগতে একটা রিকশা করেছেন, কিন্তু রিকশা থেকে নেমে সেই যে চলনে বসে পড়েছেন—

আর ওঠেন নি।

অপর পক্ষেও খুব তাড়া হয় নি। বিমান ছ্যাবলা ধরনের বা আবেগপ্রবণ কাঁপা ছেলে নয়। জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা বেশ কিছুটা দায়িত্বজ্ঞান-ঘেঁষা। ফলে পরস্পরকে চিনতে বুঝতে নিঃসংশয় হতে দীর্ঘ দিন সময় লেগেছে। সময় নিয়েছে তুজনেই, অপরকে বলে-কয়েই।

কিন্তু এর মধ্যে বহির্জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

সরকার এর ভেতর বার বার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে-হার দেখিয়েছেন—বাস্তবের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক থাকে নি। সরকারের স্বীকার-করা হারও যথেষ্ট চড়া—কিন্তু তা আসল বাজার দরের ধারে-কাছেও যায় না।

আপিসের মাইনে অবশ্য বেড়েছে। তবে এমন বাড়ে নি যাতে এই হু-হু-ছুটে-যাওয়া ব্যয়-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখা যায়।

এ অসাম্য শুরু হয়েছে অনেকদিন থেকেই। পাপচক্র—যাকে ইংরেজীতে 'ভিসিয়াস সার্কল' বলে—তার প্যাঁচে পড়ে একদিকে যেমন পাঁচ-দশ টাকা করে বাড়তি বৃদ্ধি হয়েছে—মানে নিয়মমাফিক ইনক্রিমেণ্ট ছাড়া—অপরদিকে তেমনি তার অনুপাতে দ্বিগুণ তিনগুণ চড়ে গেছে বাজার-দর। ফলে টানাটানি পুঁজি ভাঙা ও শেষ পরিণতি ঋণ করা—কোনটাই বন্ধ হয় নি।

এর ভেতরেই ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হয়েছে। পেট বাড়ে নি সত্যি কথা—কেউই বেশী খায় না এ-বাড়িতে। তবে তাছাড়া সব খরচাই বেড়েছে। কাপড়-জামা, বই-খাতা, লোকলৌকিকতা—সমস্ত খাতেই বিপুল ব্যয়-বৃদ্ধি ঘটেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। তবু তো খুব বড় সংসার ওঁদের নয়—মাত্র তিনটিই ছেলেমেয়ে। 'দো য়্যা তিন বচ্চে, ব্যস।' সরকারী এ-উপদেশ লঙ্ঘন করতে হয় নি রজতবাবুদের—কিন্তু সেই তিনটিকে মানুষ করতেই প্রাণান্ত ঘটেছে। নেহরুজীর স্বপ্ন জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির যে এই পরিণতি হবে, মধ্যবিত্ত সমাজ যে জাতির সে উচ্চমার্গে যাবার রথের চাকায় এমনভাবে পিষ্ট হবে, নেহরুজী বোধ হয় তা কল্পনা করেন নি।

বর্তমান কালের ইস্কুলে পড়ানোই তো এক শোচনীয় অভিজ্ঞতা।

মাঝারি ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও যা বায়নাক্কা,—বিশেষ মেয়ে ইস্কুলের,

তাতে মনে হয় ব্যবস্থা কোন কোটিপতিপ্রধান দেশের মতো। রজতবাবুদের বাল্যকালে এসব ছিল কল্পনার বাইরে। এসব বাহুল্য আড়ম্বরকে তখন অনভিপ্রেত মনে করা হত। রজতবাবু আমরণ এই সবিস্ময় প্রশ্ন ক'রে গেছেন সবাইকে—যে, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হেডমিস্ট্রেসরা বা স্কুল কমিটির মেম্বাররাও কেমন ক'রে অনায়াসে এই অকারণ ব্যয় করাকে প্রশ্রয় দেন, নিজেরাই প্রস্তাব করেন। মেয়েদের এক রকমের এক রঙের শাড়ি কি ফ্রক পরে ইস্কুলে আসতে হবে, ছেলেদের এক ধরনের পোশাক পরতে হবে—এ-নবাবী কেন আমরা করব? এর সার্থকতা কি—এই প্রশ্নটা সুস্থ মস্তিষ্কে সহজভাবে কেউ ক'রে দেখে নি বোধ হয়। শুধুই একটা বিদেশ থেকে আমদানি-করা ফ্যাশানের হাওয়ায় হেলেছেন। যে-দেশের নেতা দেশের 'ইউনিটি' ইন ডাইভার্সিটী'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ, গৌরবান্বিত—সে-দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমন ইউনিফর্মের নেশায় পেয়ে বসে কেন?

এ বিলাসিতার আড়ম্বরের খরচ টানতে কষ্ট হয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদ করতে, ঝগড়া করতে পারেন নি।

ইস্কুলে জায়গা পাওয়াই যেখানে সৌভাগ্যের কথা সেখানে আবার অনুযোগ অভিযোগ করবে কে? ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। 'তোমাদের না পোষায় তোমরা অন্যত্র যাও'—এ-কথা তো পড়েই আছে।

তবু একরকম করে চলেছিল, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে—কাতরোক্তি অসন্তোষ প্রকাশের পথ বন্ধ করে ঐ সঞ্চয়টুকু করেছিলেন রজতবাবু, কিন্তু সে সঞ্চয় কোন্ সুদূর বিবাহের জন্যে ধরে রাখতে পারেন নি। আগামীকালের থেকে বর্তমানের দাবী অনেক বেশী প্রকট, অনেক বেশী বাস্তব।

খরচ বেড়ে গেছে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার প্রতি পদে। খাওয়ার খরচ, পরার খরচ, পড়ার খরচই শুধু নয়—বাড়িভাড়া গাড়িভাড়া ওষুধের দাম, তেল সাবান সর্বক্ষেত্রেই প্রতিদিন খরচ বেড়েছে। লৌকিকতার খরচই কি কম বেড়ে গেছে! রজতবাবুর বাল্যকালে দেখেছেন কোন বিয়েতে দুটো টাকা দিয়ে বৌয়ের মুখ দেখলেই যথেষ্ট হত—কিম্বা একটা পাঁচসিকে দেড় টাকা দামের সিঁদুরকৌটা, কি বই। শুধু নিকট আত্মীয়েরা আইবুড়োভাতের ধুতি বা শাড়ি দিতেন—যে পক্ষের যা। এখনকার মতো শাড়ি হাতে বৌ

দেখতে আসার এত রেওয়াজ ছিল না।

এখন উপহার দেওয়া হয় পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। শাড়ি তো তুচ্ছ —পঁচিশ ত্রিশ টাকার শাড়ি কেউ ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না। আত্মীয়দের সোনা না দিলে মন ওঠে না। অন্যরাও যে যতটা পারেন—যা সাধ্য, তার থেকে অনেক বেশী খরচ ক'রে মহার্ঘ উপহার দিয়ে নিজেদের সম্ভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

এ কাজ রজতবাবুকেও করতে হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পর রেণুকাকেও। সমাজে বাস করে যুগধারার বিপরীত স্রোতে যাওয়া যায় না। যে পারে সে মহাবীর, মহামানব। সবাই গান্ধী নয়। মনে মনে যা-ই বলুন, মুখে যতই বিলাপ করুন—ঐ স্রোতেই গা ভাসাতে হয়েছে। তার ফলে—রজতবাবুর জীবদ্দশাতেই ও টাকায় হাত পড়েছে, কিছুটা ভাঙতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর রেণুকাকে তো হয়েছেই, ক্রমশ সে টাকার আর কিছুই বাঁচিয়ে রাখা যায় নি।

আসলে সেই কারণেই এতটা অন্ধকার হয়ে উঠেছে রেণুকার মুখ।

কোথাও যে কিছুই নেই আর। একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গেছেন যে তিনি।

বিয়ে মানে সহস্রবিধ খরচ। বরপণের প্রশ্ন নেই সত্য কথা—এ ক্ষেত্রে সে প্রশ্নই উঠতে পারে না—কিন্তু তা ছাড়া আর সবই তো আছে। কোন্ খরচটা বাদ দেবেন তিনি, দিতে পারবেন ?

জামাই নিজেই একরকম বরকর্তা। ছেলের বাবা আছেন কিন্তু ছেলে নিজেই উদ্যোগী হয়ে সম্বন্ধ ঠিক করেছে বলেই সম্ভবত—তাঁর মতামত পছন্দ অপছন্দর জন্য অপেক্ষা করে নি—কোন কথায় বিশেষ থাকছেন না। 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি স্থির করেছেন। বলেই দিয়েছেন—'যা করতে বলবে করব, যখন যেখানে যেতে বলবে যাবো। আমাকে তো দরকার নৈবিদ্যির চূড়োয় মণ্ডা বসাবার মতো—লোককে কর্তা একটা দেখাবার জন্যে—তা সে পার্ট পার-ফেকটলি প্লে করব, কোন ভয় নেই। আমার হাতে যখন টাকা নেই, বেটার বে-তে এক পয়সা খরচ করতে পারব না—যা করবে ছেলেই করবে—তখন আমি আর ওর মধ্যে নাক গলাতে গিয়ে খাকৃতাইয়ে পড়ি কেন। নিজের জোর থাকত—অর্থে বা অধিকারে—আসল বরকর্তার কাজ করতুম নিজের

ওপর সব দায়দায়িত্ব নিয়ে। ছেলে পাত্রী ঠিক করেছে নিজে—আমার ওপর তো নির্ভর করে নি—আমি সেখানে ওপরপড়া হয়ে বাবাগিরি ফলাতে গেলে মেয়েপক্ষ যে ঠাস করে গালে চড় মারবে।'

সুতরাং তাঁরা যে কিছু চান নি—সেটা উদারতা নয়, বরং তার উল্টো। কোন কথায় থাকবেন না বলেই এ তুষ্ণীভাব তাঁর—এর দ্বারা এমন বোঝায় না যে যা হচ্ছে সব ব্যবস্থাটা তাঁর পছন্দ। এ পাত্রী সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট হয়ে আছেন বললে যদি বা কিছু বেশী বলা হয়—খুশী যে নন এ বিয়েতে এটা নিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে কিছু না দিলে তাঁদের হাতেই শাণিত অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে—ভবিষ্যতে কথা শোনাবার, টিটকিরি দেওয়ার।

বরের বাবা ছাড়াও বহু লোক আছে সেখানে। অন্য আত্মীয়-স্বজন—মামা, কাকা, জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোন—আপন, দূর-সম্পর্ক মিলিয়ে অনেক। তাদের সকলের কাছেই পাত্রের মাথা হেঁট হবে—এক বস্ত্রে মেয়েকে পাঠালে। অমন সোনার চাঁদ ছেলে তাঁদের, অমন সুপাত্র—অপর জায়গায় রীতিমাফিক সম্বন্ধ হলে মেয়েপক্ষ জিনিস ঢেলে দিত। আলমারী (ষ্টীল), ড্রেসিং টেবিল, খাটবিছানা, আলনা, সোফাসেট তো বটেই—এসব তো মামুলী—ফ্রীজ, রেডিও, ডাইনিং টেবিল, স্কুটার—কত কীই যে দেয় আজকাল—সব জিনিসের নাম বা ব্যবহারও জানেন না রেণুকা—তবে অনেক জায়গাতেই দেখছেন আজ-কাল, দেওয়ার কি বিচিত্র ঘটা। মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে মনে করে ক'রে—কোন সুদূর ভবিষ্যতে কোন দিন কাজে লাগতে পারে ভেবে—কত বিলাস ও আরামের উপকরণ দেয় আজকাল মেয়ের বাপেরা, মেয়ে-জামাই তথা পাত্র-পক্ষকে।

তাও, সে সব তো সেখানকার কথা।

এমন মেয়ে তাঁর—তাকেই বা সম্পূর্ণ নিরাভরণা কেমন ক'রে পাঠাবেন রেণুকা ?

রূপসী মেয়ে, গুণের মেয়ে—যে এতকাল তাঁদের সুযোগসুবিধা দেখে, তাঁদের ভরণপোষণ ক'রেই এমন নিঃস্ব হয়েছে, কখনও নিজের ভবিষ্যৎ ভাবে নি, কিছু জমিয়ে রাখে নি—তাকে তিনি কোন্ প্রাণে কোন্ বিবেচনায় ভিখিরীর মেয়ের মতো সম্প্রদান করবেন—শুধু রুলি কড় পরিয়ে ? অথচ,

কোনমতে একটা একটা করে—চন্দনসই কি দরিদ্র হিসেবে—গা-সাজানো গহনা দিতে গেলেও তো অন্তত পনেরো ভরি সোনা লাগবে, বর্তমানে যা বাজার-দর—তাতে ছ-সাত হাজার টাকার খেলা।

কিছুই যে নেই তাঁর। সত্যিই কিছু নেই।

মেয়ে ক'বছর ধরে রোজগার করেছে সত্যি কথা। রজতবাবুও কিছু রেখে গিছলেন—বিশেষ কিছু না হলেও এমন নিঃস্ব হবার মতো নয়, প্রায় পাচ হাজার টাকার মতো ছিল একটা পোস্ট অপিসের খাতায়। অফিস থেকে রেণুকাকে একটা সামান্য পেনসনও দেয়—তিনি রিটায়ার ক'রে যেতে পারেন নি বলে। বড় ছেলেটাও—নীলার চেয়ে ছোট—অনেক দুঃখে বিস্তর ঘুরে কেঁদে-ককিয়ে একটা চাকরিও পেয়েছে। সাধারণ সরকারী চাকরি। ব্যাঙ্কের মতো কি অন্য প্রাইভেট ফার্মের মতো মাইনের চমক নেই—তবে আজকাল সরকারী চাকরিও একেবারে নগণ্য নয়।

এসব কথাই বলবে লোকে। কিন্তু ঐ টাকা যে প্রয়োজনের হিসেবে কিছুই নয়—এ কথা কাকে বোঝাবেন তিনি? বাইরের লোক তো দূরের কথা, মেয়েকেও বলা যাবে না। সে এই ক'বছর প্রাণপাত করেছে বলতে গেলে, নিজের একটা শখ-শৌখিনতা করে নি, কোন শখ কি সাধের কথা মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করে নি। যা পেরেছে উদয়াস্ত খেটে, মাসকাবারে সম্পূর্ণটাই এনে মায়ের হাতে ধরে দিয়েছে। মা চল্লিশ পঞ্চাশ—হাত তুলে যা দিয়েছেন তাতেই বাস-ভাড়া, হাতখরচা, টিফিন সব চালিয়েছে। রেণুকা কোনদিন হিসেবও নেন নি যে এতেই ওর চলে কিনা।...ভাইয়েরা কেমন ক'রে মানুষ হবে, সংসারটা কিসে বজায় থাকবে—এই ছিল ওর একমাত্র চিন্তা, সাধনা, ধ্যানজ্ঞান।

তার বদলে আজ ওকে এ কথা বলা চলবে না যে, 'হাতে এখন টাকা নেই, সুতরাং হয় বিয়ে পিছিয়ে দাও, না হয় এক বস্ত্রে, চেলির কাপড় কি বড়জোর একখানা ধনেখালির ডুরে শাড়ি পরে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসো। আমরা তোমাকে কিছুই দিতে পারব না, একজোড়া বালাও না।'

সে বুঝবেও না এত টাকা কিসে গেল। যার উপার্জন, যে সে কষ্টের টাকা দিয়ে খালাস—তার কাছে সে টাকা 'এত টাকা'ই—তা তার অঙ্ক যেমনই হোক। সেই জন্যই, মা যে তার বিয়ের জন্যে চিহ্নিত করা ঐ সামান্য টাকাও

ভেঙে খেয়েছেন—একথা শুনলে সে বিস্মিত হবে, ক্ষুব্ধ হবে। হয়ত ক্রুদ্ধও হবে। এটাকে তার প্রতি অবিচার বলে মনে করবে। অথচ ঈশ্বর জানেন, রেণুকা কত চেষ্টা করেছেন—প্রাণপণে লড়াই করেছেন বলতে গেলে—ঐ টাকা কটা বাঁচিয়ে রাখতে। ছেলে তো এই সম্প্রতি চাকরিতে ঢুকেছে। তার আগে ওঁর পেনসনের একশো পয়ষট্টি টাকা আর মেয়ের তিন সাড়ে তিন—এই ভরসা ছিল। তাতে কি আর এই চারটে প্রাণীর খাওয়া-পরা লেখাপড়া চলে ? সে সঙ্গে লোকলৌকিকতা—নিম্নতম ভদ্রতা বজায় রেখে ?

মেয়ে শুনলে বলবে, 'আমাদের জানাও নি কেন, আমরা আরও কষ্ট করতুম। একবেলা উপোস ক'রে থাকতুম সেও ভাল—এমন ভাবে পথের ভিখিরী হতে গেলে কেন ?'

তা যে হয় না—উপবাস করলেই যে সব সমস্যা মেটে না, তা আজ ওকে বোঝানো যাবে না। একবার বলেছিল নীলা, 'এইসব নেমন্তন্নে যাওয়া বন্ধ করো মা। আমাদের এখন এত কুটুম্বিতে বজায় রাখার অবস্থা নয়। বাবা গেছেন, আয় কমেছে—এখন এত সব কোথায় পাবো ?···এখন আমাদের দুঃখের সময়, শোকের সময়—আনন্দ করতে যাবোই বা কেন উৎসব-বাড়িতে ?'

এইটেই পারেন নি রেণুকা।

অনেকগুলো সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, কমিয়ে দিয়েছেন সৌজন্যের আদান-প্রদান তাদের সঙ্গে—সাধারণ বন্ধুবান্ধব কি পরিচিত যারা তাদের বাড়ি যান না, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের কাজেকর্মে না গেলে চলে না। আর গেলে লৌকিকতাও করতে হয়। রেণুকা জানেন—আত্মীয়দের কাছে মাথা হেঁট না হয় কোনদিন, তারা না অবজ্ঞা উপেক্ষা করতে সাহস করে—এ চিন্তা ছিল রজতবাবুর কাছে চিরজাগ্রত সাধনার মতো। সত্যিই মাসের শেষ সাতদিন ডাল-ডালের-বড়া চালিয়েও ভাগ্নীর বিয়েতে দেড় ভরির মটর মালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে বছর মারা যান সেই বছরেও।

আরও সেই জন্যেই এইগুলো পরিহার করতে পারেন না রেণুকা। আত্মীয়রা গরিব ভাববে, নিঃস্ব দীন ভাববে—এ চিন্তাও যে ছিল তাঁর কাছে অসহ্য। জেনে শুনে স্বামীর স্মৃতিকে অপমান করতে, তাঁর ধারণার প্রতি

অমর্যাদা প্রকাশ করতে পারেন না।

আর, লোক-লৌকিকতাই সম্পূর্ণ দায়ী নয় এ অবস্থার জন্যে। জীবন-যাত্রার সর্ব খাতেই ব্যয় বেড়েছে—তার মধ্যে শুধু খাওয়ার খরচটাতেই কিছু কমানো যায়, শরীরকে বঞ্চিত করে কিছু বাঁচানো যায়। আর কোন্‌টা কমাবেন? কোন্‌টা বাদ দেবেন? কিছুতেই আয়ব্যয়ের দুই প্রান্ত টেনে মেলাতে পারেন নি বলেই—তিলে তিলে, একটু একটু ক'রে প্রতি মাসে পঞ্চাশ ষাট ক'রে ভাঙতে হয়েছে। কোন মাসে বেশীও—ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফী জমা দেবার মাসগুলোতে তো কথাই নেই। তাও—এই পুঁজি ভাঙার সব দায়িত্ব তাঁর ওপর চাপালেও চলবে না, স্বামী বেঁচে থাকতেই তা শুরু হয়েছে—তিনিই শুরু করে গেছেন।

শুধু কি সেই জমা টাকা থেকেই ভাঙা হয়েছে। এক-একখানা ক'রে—তাঁরও সামান্য যা ছিল, ধুলিগুঁড়ি—গহনা বেচে এই সংসারে 'তলাগুছি' দিতে হয় নি? আজ সেগুলো থাকলে আর ভাবনা কি ছিল? অন্তত গহনার সমস্যা তো থাকত না। পনেরো ভরি সোনা অনায়াসে তিনি বার করতে পারতেন। আজ যে কিছুই কোথাও নেই।

এই তাই, ছেলের চাকরি হবার আগে দু-তিন মাস শুধু হাতে ধার করতে হয়েছে কারও কারও কাছে। অতি সামান্যই বাড়িভাড়া, আজকালকার অনুপাতে নামমাত্র—বহুকাল আগের ভাড়া বলেই এখনও মাসিক ষাট টাকাতে বাস করতে পারছেন, বাড়িওলা কোনমতেই তুলতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন বাড়ি ভেঙে পড়ুক—তাও তিন মাস বাকী পড়েছিল। বলাইয়ের চাকরিটা এই সংকটঘন মুহূর্তে হয়ে গেল তাই কোন-মতে মাথা উঁচু ক'রে এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছেন। এর ভেতর মেয়ের বিয়ের টাকা কেমন ক'রে বাঁচিয়ে রাখবেন?

এসব কথা মেয়েকে বলা যাবে না। সে, সে কেন ছেলেরাও, মুখে সব বড় বড় কথা বলে। আদর্শ উপদেশ কেতাবে পড়া বিদ্যের ওপর নির্ভর ক'রে তারা বাস্তব জীবন সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। যে হাতে-কলমে না সংসার চালায় এই বাজারে—তাকে কিছুতেই এই 'টাকা-আনা-পাই'-এর অঙ্কটা বোঝানো যাবে না।...বিশেষ এতদিন যে ওঁদের জন্যে স্বার্থত্যাগ করে এসেছে—এখন বাপ-

মায়েরই এই অবশ্য কর্তব্যের দায় থেকে তাঁদের রক্ষা করতে গিয়ে যদি শোনে যে, তার একটু সুখের জন্যে প্রায়-বিগতযৌবন-জীবনের এইটুকু নিরাপদ আশ্রয়, শেষ জীবনের আশা ও বাসা—পা রাখার মতো এই তলটুকুর জন্যে—তাও সবই তো সে-ই করেছে, এখন সামান্য শেষ অনুষ্ঠানটুকু করার মতোও সামর্থ্য নেই এঁদের, সব ঘুচিয়ে বসে আছেন মা, তাহলে তার মন ও রসনা দুইই বিষাক্ত হতে বাধ্য। যে কোন মেয়েরই হত। সংসারকে এতটুকু বেশ চিনেছেন রেণুকা।

সুতরাং কাউকেই কিছু বলা গেল না।

বিবাহ বন্ধ করাও গেল না—পিছিয়ে দেওয়াও গেল না।

ওরা নিজেরাই দিন স্থির করেছে, রেণুকা মৌন হয়ে থেকে সম্মতি জানিয়েছেন।

অবশ্য নীলা একবার বলেছিল, 'ছাখো, যদি তেমন বোঝ, এসব ঝঞ্ঝাট আড়ম্বরে দরকার নেই, সোজা রেজিস্ট্রি অফিসে চলে যাই, তারপর ওর ঘরে গিয়ে উঠি কোয়ায়েটলি। অবশ্য ওর বাবা খুবই ক্ষুব্ধ হবেন তাতে—কিন্তু সে আর কি করা যাবে।'

রেণুকা তাতেও রাজী হতে পারেন নি।

এমন পাত্রের সঙ্গে, সজাতে স্ব-ঘরে বিয়ে হচ্ছে—সেটাতে পাঁচজনকে ডেকে একটা সামাজিক অনুষ্ঠান করতে পারবে না। সে হয় না। এমনিই রজতবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আগেকার প্রতিষ্ঠা অনেকটাই গেছে—এভাবে মেয়ের বিয়ে হলে আর কিছুই থাকবে না। আত্মীয়রা মনে করবে যে মুখে যতই যা বলুক—নিশ্চয় কোন অজাত-কুজাতে বিয়ে করেছে। কেউ বা মুখ টিপে হাসবে, কেউ বা নাক ফুলিয়ে। নানারকম বাঁকা কথা উঠবে, আলোচনা চলবে ওঁদের কেন্দ্র ক'রে। সবাই বলবে, অমুক চক্রবর্তী মরার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যামিলিটাই লোফারদের ফ্যামিলি হয়ে গেল।

না, সে তিনি সইতে পারবেন না। তাই যদি পারতেন তাহলে এতকাল এত দুঃখ সহ্য করলেন কেন? নিজেরা সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মীয়তার প্রাপ্য শোধ করলেন কেন?...বিয়ে তিনি দেবেন মেয়ের—বিয়ের মতো ক'রেই। সমারোহ না হোক, কোন ফাঁক তিনি থাকতে দেবেন না কোথাও। 'আমাদের ঘরের কাজে ঘটা নেই ল্যাটা আছে'—ওঁর শাশুড়ী প্রায়ই কথাটা বলতেন, সেটার

অর্থ আজ বুঝলেন। বুঝলেন যে সেটাও দরকার। আশপাশের বাড়িতে, পাড়ায়, আত্মীয়দের বাড়ি—নিম্নমধ্যবিত্তই সকলে—যেমন বিয়ে দেখেছেন, দেখছেন গত ক বছর ধরে, এ বছরও তিন-চারটে দেখলেন—সেই মতোই আয়োজন করবেন। ওঁর বোনঝি-জামাই সামান্য চারশো-টাকা মাইনের ইস্কুল মাস্টার—সেও তো পনেরো ভরি সোনা, খাটবিছানা, ড্রেসিংটেবিল, আলমারি দিয়েছে। তবে ? তার চেয়ে কম দেবেন কি ক'রে ? সে তো সাধারণ কেরানী জামাই তবু !

তাই বলে তিনি যা কাণ্ড করলেন—বিয়ের দিন স্থির হবার পর—তার জন্যে বোধ করি তিনি নিজেও প্রস্তুত ছিলেন না।

নিতান্তই ঝোঁকের মাথায়, পাগলের মতো মরীয়ার মতো—বলা উচিত রেসের জুয়াড়ীর মতো ক'রে বসলেন, অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবে।

শুধু একটি তথ্যের ওপরই ভরসা করেছিলেন—প্রাণপণে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন—তিনি কোন অধর্ম করেন নি কোনদিন, তাঁর স্বামীও না, 'হরে-হম্মে কারও এক পয়সা নেন নি কখনও, তাঁর ছেলেমেয়ে কেউ অসৎ নয়—মেয়েও তাঁর প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে কোন খারাপ পথে পা দেয় নি—তাঁদের বিপদ হবে কেন ? কেন ভালভাবে সুশৃঙ্খলে বিয়ে হবে না তাঁর মেয়ের ? এত দুঃখের পর কেন ভগবান মুখ তুলে চাইবেন না ?

এই অত্যন্ত আবছা অস্পষ্ট একটা ধারণার ওপর ভরসা ক'রে রেণুকা পাড়ার দোকানে গিয়ে খাট আলমারি ড্রেসিংটেবিল বায়না দিয়ে এলেন এবং স্যাকরাকে ডেকে চুড়ি হার পাশা ঝুমকো ও রিস্টলেটের অর্ডার দিলেন। ফার্নিচার-ওলাকে অবশ্য একশোটা টাকা আগাম দিয়েই চলে গিয়েছিল কিন্তু স্যাকরা সোনার দামটা পুরো চাইলেন, অন্যথায় সোনা। তাঁর কাছ থেকে ছ'দিনের সময় নিলেন রেণুকা। বিয়ের আর মাত্র দশদিন বাকী সেদিন থেকে—তারপর টাকা পেলেও স্যাকরা আর গড়াতে পারবে না বলে দিয়েছিলেন।

এর পর রেণুকা বেরোলেন ঐ ভাগ্যের ওপর ও ধর্মের ওপর বরাত দিয়ে টাকা ধার করতে। ভেবেছিলেন—এইখানটায় একটু চালাকিও খেলেছিলেন মনে মনে—ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, বেশী টাকা তিনি কারও কাছ থেকেই

চাইবেন না, তাহলে কেউই দেবেন না। দুশো একশো করে ধার চাইবেন আত্মীয়দের কাছ থেকে। তাদের সকলকেই বলবেন, সামান্য কিছু কম পড়েছে, তাতে ভরসা পাবে তারা ধার দিতে। এতগুলো আত্মীয় তাঁর এই কলকাতায় —সাত আট মাইলের মধ্যে অন্তত বাইশ তেইশ ঘর—সবাই যদি দুশো টাকা ক'রে ধার দেয় তাহলেই তো চার হাজার টাকা উঠে যাবে। ফার্নিচারওলা কি আর হাজার খানেক টাকা বাকী রাখবে না ? তা না হয় উনি তার পায়ে ধরবেন শেষ পর্যন্ত। ভদ্রলোক, কায়স্থর ছেলে—তার দয়াধর্ম আছে। স্যাকরার মতো নির্মম হবে না।

অবশ্য যা ফেঁদেছেন উনি, চার হাজারেও হবে না। খাওয়া ম্যারাপ কিছুই তো ধরেন নি এখনও। কিন্তু সে চিন্তা পরে। তার জন্যে পরিচিত বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীরা আছে। মেয়ে বলেছে আপিস থেকে হাজারখানেক টাকা ধার করার চেষ্টা করছে, ওদের নাকি এভাবে দেওয়ার রেওয়াজ নেই, ওর জন্যে স্পেশাল কেস করতে সুপারিশ করেছেন ম্যানেজার, পেয়ে যেতে পারে। সে যা হয় তখন হবে। বেশী কাকেও বলবেন না, শ'দুই বড়জোর, বরযাত্রী নিয়ে। আত্মীয়দের সবাইকে বাড়িশুদ্ধ বলবেন না সেজন্যে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। অবস্থা বুঝতে অনুরোধ করবেন। তাও, খাওয়াটা না হয় সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশের দোহাই দিয়ে 'ডিশ' ব্যবস্থা করবেন। তাতে যদি নিন্দে হয় হোক, তার জন্যে ভাবেন না। এখন মেয়ে-জামাইকে যা দিতে হবে সেটার ব্যবস্থাই আগে দরকার।

কিন্তু তাও হল না—এমনই ভাগ্য।

কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখা গেল অতবড় চালাকি এবং মানবচরিত্রের জ্ঞানও ব্যর্থ হয়ে গেল। অত হিসেব কোন কাজেই লাগল না। দুশো কেন একশো টাকাও দিলেন না কোন আত্মীয়।

তাঁদের তরফেও কিছু বলার আছে বৈকি!

কারও সদ্য মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কাকেও দাঁড়িয়ে থেকে ভাগ্নীর বিয়ে দিতে হয়েছে, সব খরচ করে। যার বাড়িতে এক বছরের মধ্যেও কোন বিয়ে হয়েছে—তা কি ছেলের কি মেয়ের—তাদের কিছু বলারও নেই। দেনা তাদের প্রত্যেকেরই আছে, আর সে দেনা শোধ হতে আগামী চার কি পাঁচ বছর

লাগবে নিশ্চয়। এছাড়া কেউ বাড়ি করেছেন—ত্রিশ হাজার টাকার এস্টিমেট ছিল, বাষট্টি হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, এখনও বাইরে প্লাস্টারিং হয় নি, দেনায় মাথার চুল বিকিয়ে আছে, নিজেরা অর্ধাশনে থেকে শুধু সেই দেনার সুদ গুনছেন। বাড়িভাড়ার থেকে ঢের বেশী যাচ্ছে। কারও বা আবার সুখের দশায় অর্থাভাব, ছেলে-বৌকে আমেরিকা পাঠিয়েছেন। ছেলে স্কলারশিপ নিয়েই গেছে, কিন্তু তারা গাড়িভাড়া দেয় নি—বারো হাজার টাকা গুণে দিতে হয়েছে ওঁদেরই—ফলে পাওনাদাররা গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কারও বাড়িতে হয়ত পর পর দু-তিনটে কঠিন অসুখ গেছে—তাদের কাছে কথা পাড়াই গেল না। একজনের জামাইয়ের মাংসপেশী শুকিয়ে আসছে, ক্রমশ অসাড় হয়ে পড়ছে—তাকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করানো হচ্ছে—তারই প্রত্যহ পাঁচশো টাকার দরকার বলতে গেলে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার চেয়ে অনাত্মীয়দের কাছে সুবিধে বেশী হল।

স্বল্প-পরিচিত পাড়ার তিন-চারটে লোক, ছেলের এক বন্ধু—এঁদের কাছ থেকে বরং কিছু পাওয়া গেল। সব জড়িয়ে হাজারখানেক টাকা।

এ টাকার সবটাই স্যাকরাকে ধরে দিলেন রেণুকা, কিন্তু সে ভদ্রলোক তাতেও ঘাড় নাড়লেন। এতে কি হবে, আড়াই ভরি সোনার দাম। কোনমতে দেড় ভরিতে একটা ফঙ্গবেনে হার আর ব্রোঞ্জের ওপর সোনা-বাঁধানো ছ' গাছা চুড়ি হতে পারে। আরও তিন হাজার টাকা না পেলে রেণুকার ফরমাশ-মতো গহনায় হাত দিতে পারবেন না সর্বানন্দ কর্মকার। তাও মজুরী এর মধ্যে তিনি ধরছেনই না।

এর পর দুটো দিন কেমন যেন আচ্ছন্ন অভিভূতের মতো ঘুরে বেড়ালেন রেণুকা। মনে হতে লাগল কী একটা ঘোরে রয়েছেন। সবই করছেন, নেমন্তন্ন চিঠি ছেপে এসেছে, সেগুলো নিয়ে ছেলেমেয়েরা যে যার নেমন্তন্ন সারছে—ওঁকেও যেতে হচ্ছে কোথাও কোথাও। লোকজন আসছে—ডেকরেটার কেটারার—সকলের সঙ্গেই কথা কইছেন, কিন্তু সে যেন আর কেউ, অন্য কোন প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, উনি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে শুনছেন শুধু। ইতিমধ্যে নীলা অফিস থেকে ধার পেয়েছে, সে নশো টাকা হাতে এসেছে, হাজার টাকাই পেয়েছিল—একশো টাকা নীলা হাতে রেখেছে তার টুকিটাকি

প্রসাধনদ্রব্য হাতখরচের জন্যে, তা থেকে ডেকরেটার ও কেটারারকে অর্ধেক টাকা চুকিয়ে দিতে হবে—এই চুক্তি আছে। তাও তারা দই মিষ্টি দেবে না, সে আলাদা বায়না। ডেকরেটারও অন্তত আর আড়াইশো টাকা না পেলে কাজ শেষ করবে না।

এমনি হাজারো খরচ সামনে ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ফার্নিচারওলা খবর পাঠিয়েছেন, মাল প্রায় তৈরী, আর কিছু টাকা চাই। সর্বানন্দ ব্রোঞ্জের চুড়িই ধরেছেন, হারও সওয়া ভরির বেশী হবে না। দু'গাছা ক্ষয়ে-পাত-হয়ে-যাওয়া চুড়ি ছিল নীলার হাতে, তা থেকে পাশা-ঝুমকোর সবটা সোনা পাওয়া যাবে না বলে হারের ওজন আরও কমাতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর মজুরী তিনি ফেলে রাখতে পারেন, কিন্তু এই বাজারে ঘর থেকে সোনা দিয়ে অর্ডার সাপ্লাই তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে না।

এদিকে আর মোটে তিনটি দিন বাকী।

যা করতে হবে—এই একদিনেই।

কী করবেন রেণুকা—তাও ভেবে দেখেছেন বৈকি। গত দুদিন তো ক্রমাগত সেই কথাটাই ভাবছেন।

আর চব্বিশ ঘণ্টা দেখবেন তিনি। অবশ্য এর মধ্যেই বা কী এমন অঘটন ঘটতে পারে, অদৃষ্টের চাকা ঘুরে যেতে পারে তাও তিনি জানেন না। তবে, কোন উপায় যদি না হয় তিনি আত্মহত্যাই করবেন।

এই একমাত্র পথ আছে এ অনুষ্ঠান বন্ধ করার।

সে গোলমাল হাঙ্গামায় এসব জিনিস—খাওয়া-দাওয়ার প্রশ্ন কেউ তুলবে না। শোক এবং কেলেঙ্কারির প্রথম ঝড়টা বন্ধ হলে—কৌতূহল-কৌতুকমুখর রসনাদের নর্তন-কুন্দন ক্লান্ত হয়ে এলে—মেয়ে-জামাই নিশ্চয় চুপিচুপি রেজেস্ট্রী বিয়েটা সেরে নেবে। তখন আর এসব দেওয়া-থোওয়া—খাওয়া-দাওয়ার প্রশ্নই উঠবে না।···

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই চরম উপায়টা ভেবে পেয়ে অনেকটা শান্ত এবং সক্রিয় হয়ে উঠেছেন রেণুকা। অন্য উপায়ের কথাটাও নতুন ক'রে ভাবতে শুরু করেছেন।

ভাবতে ভাবতেই মনে পড়েছে—তাঁর বাল্যের সহপাঠিনী মীনাক্ষী

সরকারের কথাটা।

ছোটবেলায় খুবই ভাব ছিল দুজনে। একসঙ্গে ইস্কুলে আবৃত্তি করতেন—কর্ণকুন্তী সংবাদ, কচ ও দেবযানী আবৃত্তিতে জুড়ি ছিলেন ওঁরা—গান গাইতেন ডুয়েটে। মীনাক্ষী বড়লোকের মেয়ে বড়লোকের বৌ হয়ে গিয়েছিল—অত ধনী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নি ওঁদের। তারপর মধ্যে বহুকাল আর খবরও পান নি। শুনেছিলেন মীনাক্ষীর স্বামী কোন ইনস্যুরেন্স আপিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে পাটনা গেছেন।

চিঠিপত্রের লেনদেন কোনকালেই ছিল না। হঠাৎ বছরখানেক আগে এক-দিন এক বিয়েবাড়িতে দেখা হয়ে গেল। শুনলেন মিঃ সরকার এখানেই এখন এল. আই. সি'র এক হোমরাচোমরা অফিসার হয়ে ফিরে এসেছেন। ভবানী-পুরের বিরাট পৈতৃক বাড়ি কোন ব্যাঙ্ককে ভাড়া দিয়ে দুই ভাই আলাদা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন, এই সম্প্রতি মিঃ সরকার নতুন বাড়ি করেছেন আবার।

মীনাক্ষীর নির্বন্ধাতিশয্যেই রেণুকা একদিন গিয়েছিলেন ওদের বাড়িতে। মীনাক্ষীও এসেছিল একদিন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বেশী মাখামাখি আর হয় নি, হওয়া সম্ভব নয়। রেণুকা তাঁদের নিম্নতম মধ্যবিত্ততা সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন—তিনি এ বিষয়ে উৎসাহ দিতে বা উৎসাহিত হতে নারাজ, মীনাক্ষীর বিহার-বিচরণের ক্ষেত্রও অতি বিস্তৃত, তার অবসর কম।

ঘনিষ্ঠতা হয় নি বলেই নিমন্ত্রিতদের তালিকা করার সময় ওর নাম মনে পড়ে নি। হঠাৎই পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল—এ বোধ হয় ঈশ্বরেরই নির্দেশ। অনেক টাকা মীনাক্ষীর, একটি শুধু মেয়ে সংসারে—খরচের পথ নেই বললেই চলে, কোন দায়দায়িত্ব নেই। সে ইচ্ছে করলেই হাজার দুই-তিন টাকা এখন দিতে পারে। গহনা অবশ্য আর আগের পরিকল্পনামতো করা যাবে না—দরকারও নেই—ও যা হচ্ছে তাই হোক, বড়জোর ওর সঙ্গে দুটো বারমেসে হালকা বালা করিয়ে দিতে পারেন—তাহলেই সামনের হাতের নিরাভরণতা অনেকটা ঢেকে যাবে।...এখন ফার্নিচারওলা ও কেটারারকে টাকাটা দিতে পারলে—সেই সঙ্গে খুচরো বাজার—কোনমতে সামলে নিতে পারেন তবু। বাকী টাকার জন্যে পরের দিনই কেটারার ডেকরেটার দই-

মিষ্টিওলা গায়ের মাংস খুবলে খাবে—তা খাক, সে শুধু তাদের কাছে অপমান, তাতে বিয়েটা তো আর বন্ধ হচ্ছে না। বৃহত্তর আত্মীয়সমাজ কি নতুন কুটম্বদের কাছেও দাঁড়িয়ে অপমানিত হতে হবে না তো।

সেই উদ্দেশ্যেই বেলা বারোটা নাগাদ একখানা রিকশা ডেকে যাত্রা করলেন রেণুকা। কাছেই বাড়ি, বাস ট্রাম কি ট্যাকসির হাঙ্গামা করতে হবে না।

রেণুকা যখন উপস্থিত হলেন—তখন মীনাক্ষী ওদের ফ্ল্যাটে সম্পূর্ণ একা। চাকর সাহেবের লাঞ্চ নিয়ে আপিসে গেছে, ঝি গেছে দু-একটা খুচরো জিনিস কিনতে বাজারে। মীনাক্ষীই পাঠিয়েছে। মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে। ইকনমিক্স্-এ এম.এ. পড়ে সে।

মীনাক্ষাই 'পীপহোল' দিয়ে দেখে দরজা খুলে দিল এবং খুব কলরব ক'রে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর একটু বিব্রত মুখে বলল, 'তুই এতদিন পরে এলি—কত সাধ্যিসাধনায়—আমি কিন্তু ভাই তেল মেখেছি—চান করতে যাচ্ছিলুম—একটু বসবি তুই ? এই দশটা মিনিট ? বড়জোর পনেরো—তার বেশী কিছুতে হবে না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব। তুই যা। আমি বেশ বসে থাকব।'

যে কাজে এসেছেন রেণুকা—তা সময়সাপেক্ষ। তাড়া ক'রে কোনমতে কথা পাড়লে চলবে না। তেল মেখে আর মানুষ কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে?

ওর সম্মতি পেয়ে খানকতক সাময়িকপত্র সামনে দিয়ে ভালভাবে বসিয়ে মীনাক্ষী নিশ্চিন্ত হয়ে বাথরুমে ঢুকল। মুখে দশই বলুক আর পনেরেই বলুক—আধ ঘণ্টার ধাক্কা, তা রেণুকা বেশ জানেন। 'কিন্তু উপায় কি ? চিরদিনই ওর স্নানে বেশী সময় লাগে। চপচপে করে তেল মেখে বেসম দিয়ে তা তুলে আবার সাবান মাখতে হয় ওকে—। তারপর আবার তার ওপর হালকা হাতে একটু সুগন্ধি তেল বুলনো আছে। এতে নাকি চামড়া ভাল থাকে। ঐ তো বসাবহুল মেদপর্বত দেহ—রঙও ফর্সা নয়—যতই মাজাঘষা করুক, ও চামড়া কি আর ভেলভেটের মতো মনোরম দেখাবে ? হাসি পেল রেণুকার কথাটা ভেবেই।

কিন্তু এক্ষেত্রে হাসলে চলবে না। তিনি তাড়াতাড়ি হাসিটা সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতে লাগলেন।

বাইরের এই বসবার ঘরটা ছোট, দু-এক মিনিটেই দেখা হয়ে যায়। দেওয়ালের ছবির সংখ্যা খুব বেশী নয়। যামিনী রায়ের নকল দুটো পট, একটা ল্যাণ্ডস্কেপ, দুটো গ্রুপ ফোটো, মিঃ সরকারের ফেয়ারওয়েল পার্টির সম্ভবত। সামনের কিউরিও কেসে টুকিটাকি জিনিস আছে—কিন্তু সে-ই বা দেখতে ক' মুহূর্ত লাগে? তাও এর আগের বার এসে ওর মধ্যে যা দ্রষ্টব্য দেখে গেছেন। তাছাড়া এখন চাবিবন্ধ, নেড়েচেড়ে যে দেখবেন, সে উপায় নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—এদিক ওদিক চাইতে ওদের শোবার ঘর নজরে পড়ল। নজরে পড়ল মানে—এ ঘর তো ওঁর জানাই, আগের বারে ঐ ঘরে বসেই গল্প ক'রে গেছেন। ডান দিকের এই বড় ঘরটা সম্পূর্ণ ওদের শোবার ঘর, হাল-ফ্যাসানে দু'ভাগে ভাগ করা বিছানা—প্রশস্ত দুটো আধুনিক খাটে। তাতেই বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে, বাকিটা ওআর্ডরোব আলমারি ইত্যাদিতে ভরা। এর সঙ্গে ভেতর দিয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট ঘর—মীনাক্ষীর ড্রেসিং রুম।

বাঁদিকে এই মাপের জায়গাটায় সমান মাপের দুটো ঘর, মেয়ে মীরা থাকে এদিকে, একটা তার শোবার আর একটা পড়ার ঘর। এছাড়া এই বসবার ঘরের ঠিক পিছনে খাবার ঘর। আধুনিক কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বসবার ঘর, খাবার ঘর এক জায়গায় রাখেনি—এতেই ধন্যবাদ দিয়ে গেছেন রেণুকা এর আগের বারে এসে। এটাকে ওঁর অসভ্যতা বলে মনে হয়। এর ওদিকটাতে বাথরুম রান্নাঘর, চাকরবাকরদের ঘর এবং একটা গেস্ট রুম বা বাড়তি শোবার ঘর, দৈবাৎ যদি কেউ এসে পড়ে কোনদিন। মীনাক্ষীরা দোতলায় এই পুরো ফ্ল্যাটটা নিয়েই থাকে, নিচেটা ভাড়া দিয়েছে।

সবই জানা, ওঘর তো ভাল করেই দেখা সেবার—তবু আজ বিশেষ ক'রে নজরে পড়ার কারণ হ'ল মধ্যের পর্দাটা আজ সরানো, এইখানে দাঁড়িয়েই ওঘরের খাটদুটোর একাংশ, একটা বেডসাইড টেবিল দেখা যাচ্ছে।

কী মনে হ'ল—বোধ হয় আর কোন আসবাব বেড়েছে কিনা, কিংবা নতুন কি ভাবে সাজিয়েছে, দেখার কৌতূহল—পায়ে পায়ে এগিয়ে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

আর ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল—এবং সঙ্গে সঙ্গে অকারণেই বুকটা ধ্বক ক'রে উঠে মনে হ'ল হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া এখনই বন্ধ হয়ে যাবে—স্টীলের

বড় আলমারিটার পাল্লা আধভেজানো, চাবির গোছা তাতেই ঝুলছে।···

বুকের স্পন্দনই শুধু থেমে যাওয়ার অবস্থা হয় নি, দেহটাও—বিশেষ পা ছুটো যেন পাথর হয়ে গেছে।···মাথার মধ্যে যেন প্রচণ্ড একটা শব্দ হচ্ছে—ছুটো মালের ওয়াগন ধাক্কা লাগার মতো ঝনাৎ-ঝনঝন আওয়াজ।

অথচ কেন যে এই বৈকল্য রেণুকা বুঝতে পারেন না।

অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। মীনাক্ষী চিরদিনই এইরকম—আলু-থালু অগোছালো। বিনা আয়াসে, বিনা আকূতিতেই অনেক পেয়েছে—অখিল পুরে পেয়েছে যাকে বলে—তাই তা রক্ষার জন্য সতর্ক হয়ে থাকার প্রয়োজন বোঝে না। তা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই, ঝি-চাকরও বোধ হয় বিশ্বাসী, এত হুঁশ রাখবেই বা কেন?···

অন্যায় হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে। এখানে দাঁড়ানো আদৌ উচিত নয়। এখনই ওখানে ফিরে গিয়ে স্থির হয়ে বসা উচিত।

এর পর যদি কিছু হারায়—ওঁকেই দায়ী করবে হয়ত। বার বার মনকে বোঝাতে লাগলেন।

কিন্তু তবু নড়তে পারলেন না। শুধু যে দেহটাই ওখানে আটকে গেছে তাই নয়—চোখ ছুটো আর মনটা ঐ চাবির গোছা ও আধখোলা পাল্লাটায় আটকে গেছে যেন। একটা কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশা অশুভ প্রভাব ওঁকে অপ্রতিহত আকর্ষণে টানছে ওদিকে।

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ তা জানেন না রেণুকা—মনে হ'ল এক যুগ—ঐ ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন নিঃশ্বাস সুদ্ধরোধ ক'রে। তারপর—কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই—মুগ্ধবৎ পা-পা ক'রে ঐদিকে এগোতে লাগলেন।

আলমারির দরজাটা ভাল ক'রে বন্ধ হয় নি, তার কারণ ভেতরের লকারটার চাবিগুলোই লকারের মুখে লাগানো আছে। সেটা বন্ধ ক'রে চাবি সরিয়ে না নিলে বাইরের পাল্লা ভাল ক'রে বন্ধ হবে না। বোধ হয় লকারে কিছু রাখতে রাখতে কোন কাজে বাইরে চলে গেছে, তারপর আর মনে নেই।

এই রকমই মীনাক্ষী বরাবর।

আলমারি খুলে এটা ওটা দেখতে লাগলেন রেণুকা। না, এমনিই চোখ বুলানো। প্রাণপণে রেণুকা নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এই আলমারির

মধ্যে এই যে রেশমে ধুতিতে শাড়িতে জামায় রূপোয় বাসনে ফুলদানিতে একাকার হয়ে আছে, এইগুলোই দেখছেন শুধু।

কিন্তু সেই অকল্যাণকর প্রভাবটাই একসময় তাঁর হাতটাকে ঐ একক চাবিটার দিকে টেনে নিয়ে গেল।

খুলিয়েও ফেলল লকারের ডালাটা—

তারপরেই মনে হল যেন কাঁকড়া বিছেয় ছোবল মারল ওঁর হাতে।

বাক্স কি কোন কেস-এ নয়—বিশেষ নির্দেশ দিয়ে তৈরী করানো বড় লকারটার ভেতর স্তূপাকার ক'রে ঢালা রয়েছে কতকগুলো গহনা—একরাশ; রাজা-মহারাজার ঐশ্বর্য।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মীনাক্ষীর যে স্বভাব ওর কাপড়-জামা রাখায় প্রকাশ পেয়েছে—সেই স্বভাবেরই পরিচয় এখানেও। সোনা ও জড়োয়াতে জড়াজড়ি—হারে চুড়িতে:বালায় কানের টব ও দুলেএ। সেটা বড় কথা নয়, বিস্ময় এই প্রাচুর্যে। প্রায় গরিব ঘরেরর মেয়ে রেণুকা, সেই রকম ঘরেই বিয়ে হয়েছিল—দশ-পনেরো ভরি সোনাই ওদের কল্পনায় সর্বোচ্চ সীমা। ওঁদের যখন বিয়ে হয়, তখন এত দাম ছিল না সত্যি কথা—তেমনি টাকাও ছিল দুর্লভ।…কোন একজনের যে এত সোনা থাকতে পারে—এত হীরে জহরৎ—বিশেষ এই সংকটের দিনে, তা ওঁর সুদূর স্বপ্নেরও আগোচর।

সন্ত্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত মন, বিহ্বল দৃষ্টি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছে—সমস্ত দেহটা ভেতরে ভেতরে কাঁপছে—কিছুই ভাল করে দেখার কি বোঝার অবস্থা নয়—তবু সেই অস্পষ্টতার মধ্যেই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার-সচেতনতা কাজ ক'রে গেল—ওপর ওপর চোখ বুলিয়েই মনে হ'ল : তিন-চার জোড়া বালা, চার-পাঁচ রকমের চুড়ি—প্রত্যেকটিই দশ-বারো গাছা ক'রে—আট-দশটা হার বা নেকলেশ, কানের গহনা যে কত তার সীমা-সংখ্যাই নেই। মানতাসা, বাজুবন্ধ বাউটি, কঙ্কন—এ বেশী নয়, তবে প্রত্যেকটিই একাধিক হবে নিশ্চয়।

এসব সোনার। এছাড়া জড়োয়া—সেও কোনটা বড় বড় পান্নার থামি বসানো নেকলেস, কোনটা হীরে ও পান্নায় মেশানো (হীরে বলেই মনে হ'ল রেণুকার, সে ঠিক চেনে না। শুনেছে আজকাল জারকন বলে এক পাথর বেরিয়েছে, অনেকটা হীরের মতো দেখতে), বড় বড় মুক্তোর মালা, কণ্ঠী,

কলার, পায়রার ডিমের মতো বড় বড় মুক্তো চারিদি:ক কুচোচুনি দিয়ে বাঁধানো —তারই নেকলেশ, সাধারণ জড়োয়া নেকলেশও কটা রয়েছে, এছাড়া রিস্টলেট, আর্মলেট, মুক্তোর চুড়ি, হীরে-পান্নায় মেশানো চুড়ি, নবরত্নের সেট —আরও কত কি, আরও কত কি। আরও কত।

এত বেশি প্রয়োজনের তুলনায়, হিসেব রাখার সামর্থ্যের তুলনাতেও এত অধিক যে—এ থেকে দু-চারখানা সরে গেলেও, অন্তত বহুদিন পর্যন্ত কেউ টের পাবে না।···

মীনাক্ষী বোধ করি ভাল ক'রে মিলিয়ে দেখেও না কোন দিন, বহুকালের মধ্যে হয়ত দেখার কথা মনেও পড়বে না তার।···

অনেক বেশী। প্রয়োজনের বহুগুণ অতিরিক্ত। সম্পদের রীতিমতো অপব্যয়—এই ভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা। এ পাপ। সামাজিক অপরাধ।

বার বার প্রায়-অবশ রসনা রেণুকার নিঃশব্দে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করে।

নিজের প্রলুব্ধ, অপরাধ-কল্পনা-সংক্রমিত মনকে প্রবোধ দেয়। এই অস্বাভাবিক প্রবণতার হয়ে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেন।

মাত্র দু-আড়াই হাজার টাকা হ'লেও কোনমতে এখন রেণুকার মেয়ের বিয়েটা হয়ে যায়। তার পরের কথা পরে।

অন্যথায় ওঁকে আত্মহত্যা করতে হবে। এবং সে কালই। আর কোন পথ নেই। তাতে একটা প্রাণই শুধু নষ্ট হবে না, একটা সংসারও। জীবনে আর ছেলেমেয়েরা কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

টাকা ঋণ চাইলে মীনাক্ষী কি দেবে? নানারকম বায়নাক্কা করবে হয়ত, স্বামীর দোহাই দেবে। নিদেন বলবে, 'উনি আসুন, জিজ্ঞেসা করি ওঁকে—তার আগে তো ভাই কিছু বলতে পারছি না!'

কথাগুলো ভাবার সময়—খুব দ্রুত চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে দিয়ে খেলে গেলেও—হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই, সে তার কাজ ক'রে যাচ্ছে। বেছে বেছে সবচেয়ে ভারী যে বালা দুটো তুলে নিয়েছে, সেই সঙ্গে ভারী একটা মফচেন। সব মিলিয়ে দশ ভরির কম হবে না। বেশীও হতে পারে।···

এবার ঠিক তেমনিভাবেই লকারের ডালাটা চেপে দিয়ে আলমারির দরজাটা ঠিক তেমনি অল্প খোলা রেখে দিয়ে এসে আগেকার আসনটিতে

বসলেন আবার।

বুকের মধ্যে যে কী করছে! এখনই হয়ত বুকের এই স্পন্দনটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে।

হে ঈশ্বর, তাই করো, তাই করো। এ লজ্জা এ দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি দাও। আর তিনি পারেন না, আর পারবেন না। রক্ষা করো তুমি।

একটু পরেই খট ক'রে বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে মীনাক্ষী।

'এই তোর দশ-পনেরো মিনিট।' স্নিগ্ধ অনুযোগ করেন রেণুকা। সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে যান নিজের আশ্চর্য অভিনয়-দক্ষতা দেখে। কত অনায়াসে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। কেমন সহজভাবে কথা কইছেন। এত শক্তি তাঁর মধ্যে সত্যিই ছিল?

'কেন, বেশী লেগেছে নাকি?'

অকপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করে মীনাক্ষী।

'আধঘণ্টারও বেশী। অন্তত পঁয়ত্রিশ মিনিট।' ক্ষমাসুন্দর হাসিতে মুখ রঞ্জিত ক'রে তুলে হলের বড় ঘড়িটা দেখান রেণুকা।

'তা হবে। কে জানে, অত হিসেব থাকে না। আমার তো মনে হ'ল এই ঢুকলুম।...ওমা, তা এতক্ষণ কাটল, আদরের মা এখনও এল না। আশ্চর্য! দাঁড়া, আমিই চা চাপিয়ে আসছি—'

'না ভাই, আর একটুও বসতে পারব না এখন। মেয়ের বিয়ে, নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি।...এই চিঠি রইল—মিস্টারকে সঙ্গে নিয়ে যাবি—অবশ্য অবশ্য।'

'তাই নাকি? মেয়ের বিয়ে? কোথায় রে? ছেলে কি করে?'

'এই সাধারণ ছেলে। যেমন আমরা তেমনিই। হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ।...যাস কিন্তু নিশ্চয়ই—য়্যাঁ?'

আশ্চর্য! কেমন সহজে সহজ হবার অভিনয় ক'রে যাচ্ছেন রেণুকা! কত অনায়াসে!

ওঁর এই অসামান্য শক্তি ছিল—তা কে জানত!

'ও মা, তা সত্যিই—একটুও বসবি না? এই দুপুরবেলা অমনি মুখে চলে যাবি—?'

'না ভাই। একা, বুঝতেই তো পারছিস। এখনকার দিনে ট্রামে বাসে রিকশায় ঘুরে নেমন্তন্ন করা—একা মেয়েছেলে। উঠতেই পারি না ভীড় ঠেলে। —এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে রে।—চা আর একদিন তখন এসে খেয়ে যাব। আজ আসি—'

তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন রেণুকা।

বড্ড তাড়া তাঁর। তিনি একা। একাই সব করতে হবে।

কোনমতে বাড়িটা থেকে একটু দূরে চলে এসে একটা ট্যাক্সী ডাকেন। যতদূর মনে পড়ছে ব্যাগে এখনও সাত-আটটা টাকা আছে—ট্যাক্সীভাড়া দিতে পারবেন।

ট্যাক্সীতে উঠে বসে বলেন, 'বৌবাজার।' কবে যেন কার মুখে শুনেছিলেন বৌবাজারে কোন কোন দোকান আছে যারা সোনা কেনে, মানে কিছু বেশী কম-দামে পেলে—কোন অনাবশ্যক অরুচিকর প্রশ্ন করে না।

কথাগুলো কেমন সাজানো থাকে মনে, প্রয়োজনের সময় ঠিক নেমে আসে ওপরের তাক থেকে।

এরপর নির্বিঘ্নে বিয়ে চুকে যাবে—সেই তো স্বাভাবিক।

যা বাকী রইল, পরে দিতে হবে—তাও ঢের। কিন্তু সেজন্য রেণুকা ভাবেন না। বিয়েটা বিয়ের মতোই হল—মানে যেমন বিয়ে হচ্ছে আজকাল, চারধারে যা দেখছেন। খাট বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, আলমারির দানের বাসন—সবই দিয়েছেন। ছেলে ঘড়ি দিতে বারণ করেছিল, তা বাদে ছেলেকেও যা দেয় কিছু দিতে ত্রুটি করেন নি—বোতাম আংটি গরদের জোড়। গয়নাটাই খুব কম হয়ে গেল। ব্রোঞ্জের চুড়ি আর হালকা হার। তবু শেষ মুহূর্তে একজোড়া বালা কিনে তাই মান রক্ষা হল—একেবারে নিরাভরণ অবস্থাটা ঢাকা পড়ল।

নীলা বিস্মিত হয়েছিল বৈকি? খুবই বিস্মিত হয়েছিল।

প্রশ্নও করেছিল, 'এসব কি ক'রে হল মা? কোথায় এত ধার করলে। শেষে অপমান হবে না তো। এত শুধবে কি ক'রে? তোমার জন্ম কেটে যাবে তো এত দেনা শোধ হতে। এতদিন অপেক্ষাই বা করবে কে? ভাইটার যে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না।'

রেণুকা ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আজ আর এত কৈফিয়ৎ দিতে পারছি না। তুই চুপ কর্ এখন। বিয়েটা মিটে যাক আগে—তারপর এসব ভাবতে বসব।'

তারপর অবশ্য বিয়ের আনন্দে, হাসিতে খুশিতে উৎসবের নেশায় ভুলেই গিয়েছিল নীলা। বিয়েটা যে এমন পূর্ণাঙ্গ আয়োজনে হবে, হতে পারবে—তা সে একবারও ভাবে নি। তাই, চিন্তা যা-ই আর যতই থাক—খুশী হয়েছিল সেও। উৎসবের রঙ ধরেছিল তারও মনে।···

কিন্তু বিবাহ শেষে বাসরঘরে আসার পথে একটা কথা কানে যেতে হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল নীলা।

কথাটা বলছিলেন ওর বড় মাসিমা, রেণুকার মামাতো বোন সুষমা। তিনি মীনাক্ষীদের চেনেন। মীনাক্ষীর স্বামী আর বড় মেসোমশাই দুজনেই এক আফিসে ছিলেন এককালে। সুষমা বলছিলেন 'তুই মীনাক্ষীদের নেমন্তন্ন করিস নি ?'

'কেন করব না। নিজে গিয়ে বলে এসেছি।' স্বাভাবিকভাবেই বলেন, কিন্তু নীলার মনে হয় সহসা যেন মা বড় বেশী বিবর্ণ, ক্লান্ত হয়ে ওঠেন—চোখের নিমেষে।

বড় মাসিমা বলছিলেন 'আমি তো তাই জানি। তবে আজ আসবার আগে ফোন করেছিলুম—একটা বড় বাজে কৈফিয়ৎ দিলে না-আসার। তাতেই সন্দেহ হয়—যে হয়ত তুই বলিস নি, বলতে পারিস নি—সেটা ঐভাবে ঢেকে নিলে।'

রেণুকা সুষমার অনুমান ব্যর্থ করে দিদি নিরুত্তর রইলেন। কোন প্রশ্ন করলেন না, কৌতূহল প্রকাশও না।

অগত্যা সুষমা নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, 'বলে, সেদিন কে একজন বন্ধু এসে ছিল নাকি ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে—সে চলে যেতেই দেখেছে আলমারি নাকি আধখোলা পড়ে, তাতে গোটা কতক গয়না শর্ট। তখন নাকি আর কেউ ছিল না সেখানে, বাড়িতেই কেউ ছিল না। বন্ধুকে বসিয়ে মীনু নাকি বাথরুমে ঢুকেছিল চান করতে।···তাই ওর মন মেজাজ খুব খারাপ—ঠিক করেছে আর কোন বন্ধুর বাড়ি যাবে না। কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না।'

এই বলে কেমন এক ধরনের স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সুষমা বোনের

মুখের দিকে। তারপর একবার ছাদের ওপরের ম্যারাপ ও বিবাহসভায় আসবাবপত্রের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

'রেণুকা, এবার কি করবে, পারবে অভিনয় চালিয়ে যেতে? সহজ হবার অভিনয়?'

নিজেকে অসহায়ভাবে প্রশ্ন করেন মনে মনে রেণুকা—এর ভেতরই।

পারেনও শেষ পর্যন্ত।

মুখের বিবর্ণতা না কাটুক, কণ্ঠস্বর সহজ হয়ে ওঠে। বলেন, 'অ। তাই নাকি? তা ভাল—যে যেমন বোঝে!···আমার বলা কর্তব্য বলেছি—আসে না আসে সে বুঝবে।···বন্ধুদের বাড়ি তো কত আসছে আর কত সম্পর্ক রাখছে। না এলে মহাভারত কারও অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

তারপরই যেন একটা কথা মনে পড়ে যায়। বলেন, 'গিছলুম তো আমিও নেমন্তন্ন করতে। আমাকেই চোর ভাবছে না তো আবার। এই ছ্যাখো! বড়-লোকের বাড়ি যাওয়াই অন্যায়, আমাদের মতো গরিব লোকের!'

উৎসব-বাড়ির কোলাহল স্তিমিত হয়ে এলে নীলা বাসর ছেড়ে উঠে এসে মার কাছে দাঁড়ায়।

রেণুকা তখন নিভে-আসা উনুনগুলোর সামনে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে ছিলেন—নীলার বেনারসী শাড়ির খসখসানিতে চমকে চোখ খুললেন।

নীলা ওঁকে কোন প্রশ্ন করার অবসর দিল না, কান্নায় ভেঙে-পড়া চাপা গলায় বলে উঠল, 'কেন, কেন এ কাজ তুমি করতে গেলে মা? কী দরকার ছিল এ মিথ্যে আড়ম্বরে!···এ আমার কী বিয়ে দিলে তুমি! এই পাপের বোঝা এই অপরাধের বোঝা ঘাড়ে তুলে দিয়ে আমাকে তুমি কোন্ নতুন জীবনের পথে পাঠালে! কেন, কেন! এর চেয়ে ভিখিরীর মতো শ্বশুরবাড়ি যেতুম—সেও তো ঢের ভাল ছিল মা!'

রেণুকা নিমেষে জ্বলে ওঠেন যেন। কঠিন কণ্ঠে বলেন, 'কী করেছি আমি? কী বলতে চাস শুনি? কী ভেবেছিস তুই আমার সম্বন্ধে--কী করেছি বলে তোর ধারণা?'

স্থির শাণিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন মেয়ের চোখের দিকে।

সে চোখে অপরিসীম দাহ, অপরিমাণ কাঠিন্য। আর স্পর্ধা। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত যেন সে দৃষ্টি, বিশ্ব-সংসারের এই অসাম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে।

চোখের পলকও বুঝি পড়ে না—এমনই স্থির উদ্ধত চাহনি।

সে চোখের সামনে মাথা নামিয়েই নিতে হয় শেষ পর্যন্ত।

মায়ের অবস্থাটা কি বুঝতে পারে নীলা? ওঁর মনটা কি দেখতে পায়? কে জানে!

তবে তার আশঙ্কা বা অনুমান যে কী—সেটা আর কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না। শব্দ কটা শেষ অবধি উচ্চারণ হয় না—ঠোঁটের কাছে এসেও আটকে যায়।

মাথা নামিয়ে আবার বাসরঘরের দিকেই ফিরে যায় একসময়।

পিছনে যে আগ্নেয়গিরি গলে জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছে কখন, তাও দেখতে পায় না আর।

নিয়ম রক্ষা

কতকটা 'দুত্তোর' বলেই বেরিয়ে পড়েছিলেন শিবনাথবাবু। আত্মীয়স্বজনরা বারণ করেছিলেন সবাই, বন্ধুবান্ধবরা তো বিশেষ ক'রে। বলেছিল, 'এই বয়স তোমার—যাটটা বছরের ধকল বড় কম নয় তো, যতই স্বাস্থ্যের বড়াই করো। তাছাড়া এই সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠলে, জ্বর যা-ই হোক না কেন, বড় পাজী রোগ, শরীরটা দুর্বল ক'রে দেয় বড্ড। আর এ পাগলামি কেন, মাছ না পাওয়া যায়, মাংস আছে, ডিম আছে। এমন কি চেষ্টা করলে ছানাও পাওয়া যেতে পারে—'

আড়ালে বলেছিল, এদলে আত্মীয়রাই বেশী, 'বড্ড নোলা লোকটার, ঐ নোলার জন্যেই একদিন মরবে ও। এই বয়সে এত লালস! ছিঃ!'

কারুর কোন কথাতেই কর্ণপাত করেন নি শিবনাথবাবু। স্ত্রী-পুত্র এবং বন্ধুদের উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'এখনও এমন

পঙ্গু হই নি যে, একেবারে ঠুঁটো হয়ে বাড়িতে বসে থাকব। আর সত্যি কথা বলতে কি, যদি জীবনে বাঁচার কোন উপকরণ না থাকে—তো জীবনের মায়া কি? আসলে এ-জীবনটাকে লোকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় কী জন্যে, ভোগের জন্যেই তো? আহারটা হচ্ছে সর্বপ্রধান ভোগ, তাই যদি না রইল তো বেঁচে লাভ কি, শরীরটাকে পুতু-পুতু করে বাঁচিয়ে রাখব কার জন্যে?'

আরও বলেছিলেন, 'জীবনটাই তো অসহ্য হয়ে উঠেছে। ঘি নেই, ভাল ঘি যে কাকে বলে, তা-ই তো ভুলে গেছি কতকাল হ'ল; তেলের গন্ধটা ছিল, সে-ও গেল। খাঁটি তিল তেল বলে টিন ভরে মনের আনন্দে বাড়িতে আনছেন যুবরাজ, তা-ও সেদিন কাগজে পড়লুম চর্বি আর জল মেশানো! খাই কি? ছুটো বড়া ভেজে খাবো সে জো নেই। তিল তেলে রান্না হয় ঠিকই, অভ্যস্ত গন্ধটা তো মেলে না! স্বাদে-গন্ধে মিলিয়ে তবে খাওয়া। পোড়া বনস্পতির জন্যে গজা-খাজা-বালুসাই-মতিচুর—এসব তো অখাদ্য হয়ে উঠেছে। তেলে-ভাজা বেগুনি-ফুলুরিরও বারোটা বাজল। লাল-আটার পরোয়া করি নে তত, পাঁউরুটি আছে যতদিন, ততদিন এদিকের ভাবনা নেই—কিন্তু ছুটো মিষ্টি খাবারও যে জো রইল না, সেই তো আরও অসহ্য। ভিক্ষে দেওয়ার মতো এতটুকু চিনি দেয় মেপে মেপে, চা খেতেই কুলোয় না। স্যাকারিন ভরসা ক'রে আছি। আর ছানা বলছিলি, কোথায় ভাল ছানা পাবি—খুঁজে নিয়ে আয় দিকি! ঘরে-কাটানো ছানা তো খেয়েছিস আগে, বাজারেও দত্তপুকুরের ছানা মিলত—ভালো ছানা, তার সঙ্গে স্বাদ মিলিয়ে নিয়ে আয় দিকি! ঘরে তো এই বোতল-মাপা দুধ, এতে ছানা হবে, না চা খাব—না, নাতি-নাতনীগুলোকে খাওয়াব?'

এরপর যুক্তি দেওয়া মুশকিল। তাছাড়া শিবনাথবাবু চিরদিনই জেদী মানুষ—কারও যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না বিশেষ। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, নিজেও ভাল চাকরি ক'রে এসেছেন বরাবর, এখনও পঁচশ টাকা পেনসন পান। গাড়ি না থাকলেও, বিরাট বসতবাড়ি আছে, সম্প্রতি একটা ভাড়াটে-বাড়িও কিনেছেন নিউ আলিপুরে। তা থেকেও শ'-আষ্টেক টাকা ভাড়া আসে। ছেলেরা রোজগার করে কিন্তু তাদের কাছ থেকে অদ্যাপি এক পয়সা নেন নি তিনি, নিজেই গোটা সংসারটা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই কারও মন যুগিয়ে

চলতে শেখেন নি কখনও।

আর তাতেই জেদটা গেছে বেড়ে।

খেতে-দেতে ভালবাসেন ছোটবেলা থেকেই। মাছ-মাংস বলে নয়, নিরামিষও এটা-ওটা খেতে অভ্যস্ত। ঠাকুরমা-দিদিমার হেঁসেলে ভাল ভাল নিরামিষ রান্না খেয়ে আসছেন দীর্ঘকাল। মাও, এদিকের রান্না যেমনই হোক, মিষ্টি করতে পারতেন খুব ভাল, হালুইকররা হার মেনে যেত। দরবেশ, মিহিদানা থেকে শুরু ক'রে রসগোল্লা-পান্তুয়া, গজা-বালুসাহী-প্রয়াগী—সবরকমই করতেন ঘরে। .

এতকাল এইভাবে ভালমন্দ খেয়ে এসে এখন যেন মনে হয় একেবারে দুর্ভিক্ষের দেশে এসে পড়েছেন। ঘি নেই, চিনি নেই, ছানা নেই—সম্প্রতি ময়দাও উধাও হয়েছে। মিষ্টি খাবার তো উপায় নেই। তেল গেছে—সুতরাং বড়িবড়া, ধোঁকা, বেগুনি খাবেন সে-পথও বন্ধ। একঘেয়ে মাংস খেয়ে কতকাল কাটানো যায়? তাছাড়া ইদানীং একটু বাতের মতো দেখা দিয়েছে—মাংস-ডিম বেশী খেতে বারণ করেছেন ডাক্তাররা। সেক্ষেত্রে এক টুকরো মাছ না পেলে বাঁচেন কী করে?

তাছাড়া চিরকাল ইচ্ছেমতো পয়সা ফেলে জিনিস কিনে আসছেন, তাঁদের যখন জ্ঞান হয়েছে, তখন সবাই জানত কলকাতা শহরে পয়সা ফেললে অর্ধেক রাত্রে বাঘের দুধ মেলে—তাঁর পক্ষে হাতে পয়সা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিনতে পাবেন না, এ-অবস্থা দুঃসহ তাঁর কাছে। এটা ঠিক বুঝতেও পারেন না যেন। যুদ্ধের সময় পঞ্চাশের মন্বন্তর হয়েছিল, কিন্তু তিনি অতটা টের পান নি, কারণ তিনি সে-সময়টা লাহোরে ছিলেন। খবরের কাগজে পড়েছেন, লোকের মুখেও শুনেছেন তার বিবরণ কিছু কিছু—কিন্তু তাতে অতটা বোঝা যায় নি।

সুতরাং এবার যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন শিবনাথবাবু।

'Llfe is impossible in these days !'

'Life is becoming hell !' ইত্যাদি বলে হুঙ্কার ছাড়েন মধ্যে মধ্যে আর হা-হুতাশ করেন।

এরই মধ্যে একদিন খবর পেলেন, তাঁর বেয়াই নৃপেনবাবু তাঁর শালা ভূষণবাবুর ভেড়ি থেকে মধ্যে মধ্যে মাছ আনিয়ে বেশ খেয়ে যাচ্ছেন নিয়মিত।

বৌমা বাপের বাড়ি গেছলেন মধ্যে। তাঁর মুখেই বিস্তৃত খবর পেলেন। বড় বড় দুটো ফ্রীজ আছে নৃপেনবাবুর বাড়ি। একটা ছিলই অনেকদিন, 'হায়ার পারচেজে' কেনা—আর একটা নাকি ভাড়া করেছেন। একদিন গিয়ে ঝুড়ি-দুই মাছ নিয়ে এসে তাতে রেখে দেন, পাঁচ-ছ' দিন ধরে খান। আরও শুনলেন যে, ভূষণবাবু বলে দিয়েছেন মাছের দাম এখন কমবে না, মাছও পাবেন না। তাঁরা অর্থাৎ মাছের মালিকরা আরও দাম বাড়াবেন দেখবেন শা—সরকার কী করে!

সে যাই হোক, নৃপেনবাবুর বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারলেন না শিবনাথ-বাবু, খুব মাথা খেলিয়েছে তো লোকটা। এদিকে তো দেখলে মনে হয় আপনভোলা লোক, পড়াশুনো আর নিজের একটু-আধটু লেখা নিয়ে থাকেন, দুনিয়ার কোন খবরই রাখেন না। অথচ কাজের বেলায় তো টন্‌টনে জ্ঞান দেখা যাচ্ছে!

একটা প্রবল আত্মধিক্কারও অনুভব করেন শিবনাথ।

ইস্—কথাটা তাঁর মাথায় যায় নি এতকাল! কী কষ্টটাই না পাচ্ছেন কাদিন খাওয়ার। ফ্রীজ তো তাঁর বাড়িতেও আছে, একটা নয়, দুই ছেলের শোবার ঘরে দুটো ছোট, ভাঁড়ার ঘরে একটা প্রকাণ্ড বড়—মোট তিনটে, তাতেই তো অনায়াসে আধ মণ পর্যন্ত মাছ রেখে দেওয়া যায়। আর তা ছাড়াও, তাঁর বন্ধু কমলাক্ষ বাগচির অত বড় ঠাণ্ডাঘর, হাজার মণ মাছ থাকত এক সময়ে, তাঁকে বলে দু ঝুড়ি মাছ রাখতেই বা কি লাগে। না হয় ভাড়াই দেবেন। কত আর ভাড়া হবে, মেছোরা যদি সে-ভাড়া দিয়েও লাভ করতে পারে, তিনি পারবেন না! আশ্চর্য, তাঁর এত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন ক'রে মার খাচ্ছেন আর ঐ নৃপেনবাবু লোকটা, যাকে চিরকাল বোকা বলে, সংসারা-নভিজ্ঞ বলে ঠাট্টা-তামাশা ক'রে এসেছেন, কৃপার চোখে দেখেছেন, সে দিব্যি তাঁদের সবাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে দুবেলা মাছ-ভাত খাচ্ছে!

কিন্তু বেশীক্ষণ অলসভাবে বসে বসে বিলাপ ও আত্মনিন্দা করার লোক নন শিবনাথবাবু। খবরটা শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়ে উঠলেন

তিনি। তখনই টেলিফোন ক'রে নৃপেনবাবুর কাছ থেকে ভেড়িতে যাবার পথ-ঘাট বুঝে নিলেন। যাওয়া কষ্টকর তাতে সন্দেহ নেই। শীতকাল হ'লে জীপে যাওয়া যায় অনেকটা পর্যন্ত, নইলে বাসও আছে কিন্তু এখন সে-উপায় নেই। ষ্টীমলঞ্চ ছাড়ে একটা ভোর ছটায়। তার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে ক'রে যেতে হ'লে সেই যার নাম রাত সাড়ে চারটেয় বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। ষ্টীমার যেখানে নামিয়ে দেবে, সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় হেঁটে যেতে হবে পাকা দু মাইল পথ—তারপর একটুখানি আবার নৌকোয় যাওয়া। হাঁটতে না চাইলে পুরো সবটাই নৌকোয় যেতে পারেন, তবে সে আরও অনেকটা ঘুরতে হবে। অবশ্য একটু বেশী হাঁটতে যদি রাজী থাকেন তো জীপও যেতে পারে—কিন্তু সে মাইল-চারেক।

আরও বললেন নৃপেনবাবু, মাছ এখন রোজ ধরানো হয় না। খদ্দের ঠিক হ'লে কিছু কিছু মাছ তোলে। কতক পাইকের আছে—যারা ওখান থেকে মাছ নিয়ে সুদূর আসানসোল কি দুর্গাপুরে বেচে আসে, তাদের মাছটাই নিয়মিত ধরানো হয় শুধু। এক্ষেত্রে—যদি শিববাবু যান, তাহলে হয়ত এক দিন ওখানে বসেই থাকতে হবে। মাছ উঠতে উঠতে সন্ধ্যা। ঠিক কবে যাবেন তা জানালে অবশ্য আগে থাকতে চিঠি পাঠাতে পারেন—ভূষণবাবুকে বলে সেখানকার ম্যানেজারের কাছে, কিন্তু সে-চিঠি সাত দিনের আগে পৌছবে কিনা সন্দেহ!

না, অতদিন অপেক্ষা করতে পারবেন না শিববাবু। চিঠি একটা তাঁর সঙ্গে দিলেই যথেষ্ট বাধিত বোধ করবেন। থাকতে হয় একটা দিন থেকেই যাবেন, সেখানে কর্মচারীরা থাকে ভেড়ি-মালিকের, বাসা ক'রে ভালভাবেই থাকে বামুন চাকর নিয়ে, তাদের সঙ্গে একটা দিন কাটিয়ে দেবেন। ভালই তো, তারা নিশ্চয় বেশী করে মাছ খাওয়াবে, অমন প্রবীণ একটা ভদ্রলোক গেলে।

সেইদিন থেকেই উঠে পড়ে লাগলেন শিববাবু। জীপ একটা চাই, নইলে যাওয়ার সময় যেমন-তেমন, আসবার সময় অসুবিধা হবে। মাছ নিয়ে বাসে উঠলে পিছন পিছন পুলিস তাড়া করবে। পুলিস না করুক, সাধারণ ভদ্র-লোকরাই হন্যে হয়ে উঠবেন। না, জীপ একটা চাই।

জীপ যোগাড়ও হ'ল। বড় ছেলের অফিসের জীপ। বড় ছেলে একটা বড় ফার্মের চীফ অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট, অফিসে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। রবিবার হলে

তো কথাই ছিল না। অফিসের দিন অফিসের গাড়ি বার করা মুশকিল, তবু সে পাঞ্জাবী-সাহেবকে বলে ব্যবস্থা ক'রে দিল একখানা জীপ।

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ক'রে বসলেন শিববাবু—আরও একটা প্রকাণ্ড ফ্রিজিডেয়ার ভাড়া ক'রে নিয়ে এলেন এক জায়গা থেকে। সেটা আনা, বসানো কনেকশান্ দেওয়া ইত্যাদিতে একটা দিন কেটে গেল। কমলাক্ষ বাগচির কোল্ড স্টোরেজে রাখা চলত, কিন্তু যা দিনকাল—বরং একটা জড়োয়া গহনা রেখে বিশ্বাস আছে, মাছ রেখে নেই। অর্ধেক মাছ ওর কর্মচারীরাই চুরি ক'রে নেবে হয়ত। আর সে খাতিরের জায়গা, বলাও যাবে না কিছু। না, তার চেয়ে এ-ই ভাল। মাত্র ত্রিশ টাকা ভাড়ায় এত বড় জিনিসটা পাচ্ছেন যেকালে, সেকালে কী দরকার লোকের কাছে এতটা বাধ্য-বাধকতায় যাবার!

দুটো দিন প্রস্তুতিতেই কেটে গেল। দু'-দুটো মৎস্যহীন দিন। অসহিষ্ণু শিববাবু, আর আসন্ন ছুটির দিনের জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না। রবিবার গেলে ছেলেরা কেউ কিম্বা বড় নাতি সঙ্গে যেতে পারত। শিববাবু সে-প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিলেন। কেন, কী হয়েছে কি? কা এমন ধাবধাড়া গোবিন্দপুর যাচ্ছেন তিনি? যাতায়াতে বড়জোর চোদ্দ কি ষোল মাইল রাস্তা, নিজস্ব জীপ যাচ্ছে—এর জন্যে এত উতলা হবার কী আছে?

রাত চারটেয় উঠে মুখ-হাত ধুয়ে পুজোপাঠ ক'রে তৈরী হয়ে নিলেন শিবনাথবাবু। পরের জীপ, অফিসের ড্রাইভার-ওরা একটু নবাবী মেজাজের লোক, নিশ্চয়ই অত ভোরে আসবে না, নইলে শিববাবু সাড়ে চারটেতেই যেতে পারতেন। যাই হোক, যতটা দেরি হবে ভেবেছিলেন, ততটা হল না, সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই গাড়ি এসে গেল। ইতিমধ্যেই হীটার জ্বেলে নিজেই চা ক'রে নিয়েছিলেন, এক কাপ খেয়ে আর এক কাপ ফ্লাস্কে ভরে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন, গাড়ি আসতেই রওনা দিলেন। বাড়ির সকলে তখনও ঘুমোচ্ছে, কোনমতে চাকরটাকে ঠেলে তুলে দরজাটা দেওয়ালেন।

'খাবার সময় কেউ কম যাবে না কিন্তু!...ও সব বেটাবেটিকেই চিনে নিয়েছি। হুঁ!' অর্ধস্বগতোক্তি করলেন শিববাবু।

ভোরে রওনা দিয়েও কিন্তু রোদ ওঠবার আগে গাড়ির যাত্রা শেষ করতে পারলেন না। ড্রাইভার এ পথে কখনও আসে নি, শিববাবুও তাই। দু-এক-

জনকে জিজ্ঞাসা করতে উল্‌টো বিপত্তি হ'ল, ভুল পথ বাতলে দিল। ফলে অনেক ঘোরাঘুরির পর যখন পাকা সড়কের পথ শেষ করলেন—তখন আটটা বেজে গেছে, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। আর তখনই মনে পড়ল যে ছাতাটা আনা হয় নি। ভোরে বেরিয়েছেন, অন্ধকার থাকতে প্রায়, তখন আকাশের এ চেহারাটা ভাবতেই পারা যায় নি।

যাক গে মরুক গে—কী আর করা যাবে! শিববাবু ফ্ল্যাস্কের অবশিষ্ট চাটুকু খেয়ে সেটা গাড়িতেই রেখে, ড্রাইভারের খোরাকী বাবদ তুটো টাকা দিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন। যদি সন্ধ্যার সময়ও না পৌছতে পারেন—যেন কাল সকালে এই সময় একবার সে গাড়ি নিয়ে আসে—অতি-অবশ্য, সে কথাটাও বারবার ব'লে দিলেন।

অতঃপর, নূতন উৎসাহে বেশ জোরে জোরেই পা চালালেন শিববাবু। কিন্তু বেশীক্ষণ সে গতি রাখা গেল না। কারণ রাস্তা খারাপ। ক্ষেতের আলে-আলে যাওয়া, অত্যন্ত পিছল মাটি সেখানকার। কোথাও বা পাঁকের মতো, পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোছ পর্যন্ত ডুবে যায়। বুদ্ধি ক'রে ওয়াটারপ্রুফ জুতোই পরে এসে ছিলেন কিন্তু তাও যেন কাজে লাগল না। শেষ পর্যন্ত সে জুতো খুলে হাতে করতে হ'ল।

এধারে পথও যেন আর শেষ হয় না। শুনেছিলেন তিন মাইল পথ—হিসাব মতো এক ঘণ্টার বেশী লাগা উচিত নয়। আস্তে যেতে হচ্ছে—না হয় সেজন্য দেড় ঘণ্টাই লাগুক—কিন্তু তু-ঘণ্টা ক্রমাগত হেঁটেও গন্তব্যস্থানের কোন হদিস পেলেন না। এধারে ভগবানও যেন আদা-জল খেয়ে তাঁর পিছনে লেগেছেন। কদিন ধরেই মেঘলা যাচ্ছিল, আজ তাঁর অদৃষ্টেই যেন আকাশ নির্মেঘ একেবারে। শেষা শ্রাবণের সূর্য কেশ-বিরল মাথার চাঁদি পুড়িয়ে দিচ্ছে। ঘামে জামা-কাপড় সপসপে হয়ে উঠেছে—অথচ একটু যে কোথাও ছায়ায় বসে বিশ্রাম করবেন সে উপায় নেই। তুদিকে ক্ষেত, নয়তো জলা—কাছাকাছি কোথাও কোন গাছপালা নেই। ক্ষিদেও পেয়েছে তেমনি, খালি পেটে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়েছিলেন, আবারও এক কাপ চা-ই খেয়েছেন শুধু। ভেবে-ছিলেন জীপ থেকে নেমে কোন দোকান থেকে কিছু কিনে খাবেন—কিন্তু দোকানগুলোর যা চেহারা দেখলেন তাতে আর প্রবৃত্তি হ'ল না খেতে।…

এখানে তো কিছু পাবেনই না—ধারেকাছে মনুষ্যবসতিরই চিহ্ন চোখে পড়ে না
—তা খাবার !

তবু গেলেন শেষ পর্যন্ত। ফেরার তো কোন কথাই ওঠে না। ফেরা মানে এই রোদে এতটা হাঁটা। অবশেষে সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘাটে গিয়ে পৌঁছলেন। ঘাট তো ভারি—ক্ষেত এবং তার আলের শেষ, এই পর্যন্ত। দিগন্তবিস্তৃত জলা আরম্ভ হয়েছে এখান থেকে। এবার নৌকোয় চড়তে হবে। কিন্তু নৌকো কোথায় ? তালগাছের গুঁড়ির পেটকাটা একটা ডোঙ্গা মাত্র বাঁধা আছে আর আছে একটি শীর্ণ কালোপানা লোক, অনুমানে বুঝলেন সে-ই মাঝি।

অন্য সময় হলে কিছুতেই চড়তেন না ডোঙ্গায়। সাঁতার জানেন না তিনি, আর এ-যা ডোঙ্গা, একটু এদিক-ওদিক হ'লেই হয়ত ওল্‌টাবে। তবু চোখ-কান বুজে তাতেই চড়ে বসলেন। আসলে তাঁর একটু বসা চাই কোথাও, হাঁটা আর সম্ভব নয়। বসার আরামটাই তাঁর কাছে স্বর্গসুখ বোধ হ'ল তখনকার মতো। এমন কি সূর্যদেব যে আরও দুঃসহ, আরও কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছেন তাও টের পেলেন না।

মাঝিটা অবশ্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করল।

'দ্যাখো দিকি বাপু, আপনারা কি আর এই ডোঙ্গায় চাপতে পারো। রামায় যদি ঘুণাক্ষরে বলে যে, বাবুভাই আসতেছে রেকজন তাহ'লে কি আর রামি নৌকোখানা রোপারে থুয়ে আসি ! তাতে তবু একটু সুখ ক'রে বসতে পারতে রাপনি !'

কিন্তু সেদিকে কান বা চোখ বুজে ছিলেন শিববাবু, কতক ভয়ে কতক শ্রান্তিতে।

আর সেই ভাবেই বোধকরি ঐ দুঃসহ গরম এবং তাপের মধ্যেই একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল।

ভেড়িতে গিয়ে যখন নামলেন তখন বেলা একটা বেজে গেছে। ওঁকে দেখেই মুখখানা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রভূষণবাবুর ম্যানেজারের। চিঠিখানা পড়ে মুখখানা বিকৃত করলেন। বাসায় সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, ঠাকুর-চাকর পড়ে ঘুমোচ্ছে, তাদের ডেকে ভাত চাপাতে বললে তারা প্রকাশ্যেই

পিতৃ-মাতৃ উচ্ছন্ন করবে মনিবদের। মাছও কিছু ধরা নেই। জেলেদেরও এটা বিশ্রামের সময়, জাল ফেলে মাছ ধরানো—এই ঠেকো রোদে কী সম্ভব?

তবু একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হয়।

ম্যানেজারবাবু অবশ্য করলেনও অনেক।

আর তারই ফলে বেলা চারটে নাগাদ দুটি গরম ভাতে-ভাত পেটে পড়ল শিবনাথের। শুধুই ডাল ভাতে আর আলু ভাতে, যে তেলে মাখা সেটায় তিসির তেলের গন্ধ। অবশ্য সে আর এদের দোষ কি—এই তেলই নাকি পাঁচ টাকার দরে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। তবে ঘিটুকু মন্দ নয়, অন্তত ঘিয়ের মতোই গন্ধ। শেষে একটু দুধও পেলেন। খাওয়া ভালই হ'ল—খেলেনও অনেক, সারাদিনের পরে—তবে মাছের নাম-গন্ধ রইল না, বলা বাহুল্য।

ম্যানেজার সুখরঞ্জনবাবু আরও অনেক কিছু করলেন।

দু ঝুড়ি মাছও সংগ্রহ ক'রে দিলেন রাত দশটার মধ্যে। ভেটকি আর বাগদা—দুই-ই শিবনাথবাবুর প্রিয় মাছ। দামও বেশী পড়ল না, মাত্র একশটি টাকা নিলেন সুখরঞ্জনবাবু। অথচ মেহনৎ করলেন ঢের, ঝুড়িতে সাজিয়ে ওপরে যথেষ্ট পরিমাণ ঝাঁঝি শেওলা ইত্যাদি দিয়ে রাত বারোটা নাগাদ নিজেদের নৌকোয় তুলে রওনা ক'রে দিলেন। বললেন, 'নইলে মাছ ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে পচে উঠবে। এ দিব্যি নৌকোয় শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাবেন, ভোরে পৌঁছে যাবেন ওখানে। সাতটার মধ্যে বাড়িতে গিয়ে চা খেতে পারবেন।'

নিজের একটা সতরঞ্চীও দিয়ে দিলেন—ওরই মধ্যে যদি একটু কায়দা করে পেতে শুতে পারেন। দুটি লোকও দিলেন সঙ্গে। পাহারাকে পাহারা—আবার ওরাই ওখানে নেমে মাছ বয়ে জীপে পৌছে দেবে। বলেছিলেন, 'মোট ষোলটি টাকা দেবেন মাঝির হাতে, নৌকোভাড়া লোকের খরচা সব। এ আপনাকে খুব কাছাকাছি জায়গায় নামিয়ে দেবে।—সেখান থেকে এক মাইলের বেশী হাঁটতে হবে না।'

সেই রকম নির্দেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন মাঝি আর তার সঙ্গের লোকদের।

শোবার মতো বিস্তৃত জায়গা না মিললেও হাঁটুটাটু মুড়ে গড়ানো চলত। কিন্তু শিবনাথবাবু সারারাত দুটি চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। তার কারণ প্রথমত, উৎকট আঁশটে গন্ধ মাছগুলোর। মাছের গন্ধ যে এত খারাপ

তা তাঁর ধারণা ছিল না এতকাল। সঙ্গের মাছেই প্রবল, কিন্তু নৌকোতেও একটা অনেক দিনের শুকনো গন্ধ, সেটা বরং আরও বিরক্তিকর, আরও অসহ্য। তা ছাড়া, দিনের বেলায় অতটা বুঝতে পারেন নি, জলেও বেশ একটা দুর্গন্ধ— তার কিছুটা মাছের এবং কিছুটা শ্যাওলার। সবচেয়ে এই নৌকোটায়, শুকনো আঁশচুপড়ির গন্ধ—সমস্ত কাঠে। শুলে যেন আরও গন্ধটা চেপে ধরে কে নাকের ওপর।

অগত্যা বার দুই-তিন শোবার চেষ্টা ক'রে সোজাসুজি উঠে বসেই থাকলেন। সুখের চেয়ে শোয়াস্তি ভাল। ঘুম তো হবেই না, যা মশা! উঃ, জলের উপর নৌকোয় এমন মশা ছেঁকে ধরে মানুষকে তা ওঁর জানা ছিল না।

তবু ঘুম না আসুক, বসে বসেও ঢোলা চলতা একটু। আগে বাসে যেতে-আসতে বেশ ঘুমুতে পারতেন উনি। সে অভ্যাস একেবারে যায় নি এখনও। কিন্তু আজ তারও একটা অন্তরায় দেখা দিয়েছে। নিজের দেহের মধ্যেই একটা অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। এদের বাসায় রাত্রে হরিণের মাংস হয়েছিল। কে যেন শিকারে গিয়েছিল—খানিকটা পাঠিয়ে দিয়েছে। এ নাকি দুর্লভ খাদ্য একে-বারে। মাংসটা তো পচা; তা, ওরা সবাই বুঝিয়ে দিলে, হরিণের মাংস নাকি পচিয়েই খেতে হয়। একবেলা ধরে সেদ্ধ হ'ল খড়ের সঙ্গে—তার উৎকট গন্ধে তখন থেকেই নাড়িতে পাক দিচ্ছে তাঁর। সেই মাংসই খেতে হ'ল। দুটি মাছের ঝোল ভাত হ'লে পরিতৃপ্তি সহকারে খেতেন; সেদিক দিয়েই কেউ গেল না। যাবেই বা কে? এদের তো আর তাঁর মতো অবস্থা নয়—মাছ খেয়ে খেয়ে অরুচি। ঐ পচা মাংস নিয়ে যেন মহোৎসব পড়ে গেল একেবারে। কী উৎসাহ সকলের। তারই খাতিরে আবার ঘি-ভাত হ'ল। এমনিই অবেলায় গুচ্ছের ভাত খেয়ে শরীর ঢিশঢিশ করছিল, শিবনাথবাবুর খাওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না, তার ওপর ঐগুলো খাওয়া। কী করবেন, সবাই নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ল। মনিবের ভগ্নীপতির বেয়াই—খাতিরের পাত্র তো বটেই। তাছাড়া এমন সুযোগ যখন পাওয়াই গেছে, পাকেচক্রে ভোজের আয়োজন হয়ে গেছে একটা, তখন তারাই বা পেড়াপীড়ি না করবে কেন?

কমই খেয়েছেন অবশ্য, তবু তাতেই অস্বস্তি হচ্ছে একটা। দুপুরের ভাতই হজম হয় নি তখনও, তার ওপর এই পাকা মাল পড়েছে। ঘি-ভাত ও মাংস—

মাংসটাও প্রচুর পিঁয়াজ রসুন ও ঐ অখাদ্য তেলে রীতিমতো গুরুপাক হয়েছে। তেষ্টা যা পাচ্ছে—এক এক সময় মনে হচ্ছে এই জলার পচা জল তুলেই মুখে দেন। নিহাৎ এ জল নুনপোড়া শুনেছেন বলেই অতিকষ্টে সে ইচ্ছা সম্বরণ করলেন। এমনিতেই তো গা-বমিবমি করছে—তার ওপর নোনা জল খেলে এখনই বমি হয়ে যাবে হয়ত। সুখরঞ্জনবাবু সব ব্যবস্থা করলেন, যদি বুদ্ধি ক'রে এক ঘটি জল দিয়ে দিতেন।

নৌকো ভোরেই ডাঙ্গায় নামিয়ে দিল অবশ্য। কিন্তু তখনই শিবনাথবাবু রীতিমতো অসুস্থ বোধ করছেন। মাথা ঘুরছে, গা-বমিবমি করছে—বুকেও একটা যেন কী ব্যথা অনুভব করছেন শেষ রাত থেকে। গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করতে পারলে সুস্থবোধ করতেন হয়ত—কিন্তু বুকের ব্যথাটার জন্যেই সাহস হচ্ছে না।

মাটিতে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। অবস্থা দেখে মাঝিটাই ছুটে এসে ধরল। বলল, 'আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন বরং বাবু, শরীলটা ভাল নেই রাপনার। বাপ রে, এ কি সাধারণ ধকল! আমাদেরই সহ্যি হয় না এত —রাপনার মতো বাবুভাইদের এত ঝক্কি পোয়াতে আসা ঠিক হয় নি।'

তখন কাঁধটা জড়িয়ে ধরবার মতোও অবস্থা ছিল না শিবনাথবাবুর। মনে হচ্ছিল, এই ঠাণ্ডা কাদার ওপর শুয়ে পড়তে পারলেই বেঁচে যান তিনি। মাঝিটাই গতিক দেখে এক হাতে ওঁকে জড়িয়ে ধরে আর এক হাতে ওঁর একটা হাত নিজের গলা দিয়ে ঘুরিয়ে নিল। এক রকম টানতে টানতেই নিয়ে চলল ওঁকে। বকতে বকতেও চলল সমানে :

'দেখুন দিকি। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় মানুষকে! এমন করে কি যেতে পারা যায়। হোক গে কম আস্তা—রাধ কোশের কম তো নয়। আর এ-শালার আস্তাও তেমনি, জন-মনিষ্যি নেই একটা। অ বাবু, কী হ'ল, এক-টুকুন পাটা টাগুন, এমন করলে কি আর আমি বইতে পারি! সে ঝোর কি আর আছে শরীলে। রাপনার এতখানি লাশ টেনে নে ঝেতে পারি কখনও!'

সেই ভাবেই অবশ্য টেনে নিয়ে আসতে হ'ল। শেষ পর্যন্ত যখন শিবনাথ-বাবু জীপে এসে উঠলেন, তখন বুকে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছে। ঝাপসা ঝাপসা ঠেকছে সব, চোখেও কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, মাথাতেও যেন কিছু

ঢুকছে না। বাঁ দিকটাতেই যেন ব্যথাটা উঠেছে না? ইস, এ কী যন্ত্রণা রে! তবে কি তাঁর থ্রম্বসিস হ'ল? একেই কি করোনারী থ্রম্বসিস বলে? না, না, এ বোধ হয় এক ধরনের 'উইণ্ড কলিক'—এ আগেও তাঁর এক-আধবার হয়েছে। হাতের কাছে যদি ফ্রুটসল্ট থাকত একটু। এক চুমুক খেলেই আরাম হ'ত খানিকটা। নাঃ, এমন ভাবে বেরোনো ঠিক হয় নি তাঁর। এখন ভালয় ভালয় বাড়ি পেঁছিতে পারলে হয়। আর না, এই নাক-কান-মলা—

ধরাধরি ক'রে জীপে বসিয়ে দিলে ওরা—কিন্তু বসে থাকতে পারলেন না, গড়িয়ে পড়ে গেলেন নিচে।

আশপাশের দোকান থেকে লোক ছুটে এল। ড্রাইভার পাংশু মুখে বার-বার বলতে লাগল, 'টেলিফোন? কাছাকাছি কোথাও টেলিফোন নেই! ছুটো ফোন ক'রে দিন না—বাবুর বাড়িতেই ফোন আছে। আর একটা হাসপাতালে অমনি—যদি য়্যাম্বুলেন্স পাঠাতে পারে। নেই এখানে কোথাও? তাই তো—'

মাছগুলো অবশ্য ওরা যত্ন ক'রে তুলেই রেখেছিল চারটে ফ্রিজিডেয়ার ভর্তি ক'রে। অত কষ্টের মাছ ওঁর।

তুলে রেখেছিল তাই রক্ষা। নইলে নিয়মভঙ্গের দিন মহাবিভ্রাট হ'ত, সেদিন নাকি কলকাতার কোথাও মাছ ছিল না, কোনো বাজারে না।

নৃপেনবাবু বললেন, 'ভালই হ'ল এক রকম। আশার জিনিস সাধের জিনিসই খাওয়াতে হয় ব্রাহ্মণসজ্জন আত্মীয়কুটুম্বদের। বড় আশার জিনিস ওঁর —তোমরা পাঁচজন খেলে, এই ভাল হ'ল।'

মাছগুলো খুব ভাল ছিল না। এত দিন গেল—তবু নিয়মরক্ষা তো হ'ল।

উপযাচিকা

চিনতে একটু দেরি হ'ল।

চিনতে পারছে না, অথচ মনে হচ্ছে কোথায় যেন কি একটা যোগাযোগ আছে। একেবারে এই প্রথম দেখছে না সে ভদ্রমহিলাকে—বা মেয়েটিকে। কি বলবে মনেও ভেবে পাচ্ছে না—ত্রিশ একত্রিশ বছরের মেয়েকে কী বলা

উচিত ? কিন্তু স্মৃতির সেই সূত্রটাই যে ধরতে পারছে না।

অবশ্য অবসরও যে খুব একটা পেয়েছে তাও না। চৌরঙ্গীর এই পাঁচতলা বাড়ির সিঁড়ি ভেঙ্গে (লিফ্‌ট্ গত সাত মাস অচল, পুরনো ভাড়াটে তাড়াবার এই সুযোগ পেয়ে সেটা ছেড়ে দিতে রাজী নন বাড়িওলা হরিশ দাঁ) খুব প্রয়োজন ছাড়া এ আপিসে বড় কেউ আসে না। যাদের টাকা পাওনা আছে কিম্বা যারা কিছু পাওনার আশা রাখে, তারাই কেবল এই কষ্ট সহ্য ক'রে ওপরে ওঠে।

তাও মেয়েছেলে আসে কদাচিৎ। ওদের যা ব্যবসা, তাতে মেয়েছেলে টেনে আনার প্রয়োজন নেই। গৃহসজ্জা হিসেবেও না, ব্যবসায়ের জন্যেও না। সে ক্ষেত্রে বামাকণ্ঠে 'একটু আসতে পারি ?' শুনেই তো চমকে ওঠার কথা। উঠেও ছিল। আরও চমকে উঠেছিল এই কারণে—গলাটা একেবারে অজানা মনে হয় নি, এর ভেতরেই কোথায় যেন একবার শুনেছে। আর সেই থেকেই খেইটা খুঁজে বেড়াচ্ছে পরিচয়ের। কিন্তু ওর বিস্ময় ও বিস্মৃতি-বিহ্বলতা যত বিস্তৃতই হোক না কেন—সময় তো কেটেছে মোট মিনিট-দুই-তিন।

ভবেশ অবশ্য বাহ্যত অফিসার-জনোচিত গাম্ভীর্যে স্থির হয়ে বসে থাকলেও মনে মনে স্মৃতির রুদ্ধদ্বারে মাথা ঠুকছে। প্রাণপণে খুঁজছে পুরনো সেই খেইটা। অজানা কি অপরিচিত নয়, তবু ঠিক জানার বা পরিচয়ের ইতিহাস-টাও মনে পড়ছে না। শুধু কেমন যেন আবছা আবছা মনে হচ্ছে সেই যোগা-যোগটার সঙ্গে একটা কি লজ্জার ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

মেয়েটি ঘরে ঢুকতে চিন্তাবিব্রত ভবেশ নীরবেই সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। মেয়েটির হাতে একখানা বাঁধানো খাতা, একটি ব্যাগ ও একটা ছোট ফোল্‌ডিং ছাতা। চেয়ারে বসে অল্প কয়েক মুহূর্ত লাগল হাতের সেই তিনটে জিনিস কোলের ওপর গুছিয়ে রাখতে—অন্তত সেই সময়টুকু ব্যস্ত থাকার সুযোগ পেল—তার পর সে অজুহাতও যখন রইল না, তখন মাথা হেঁট ক'রে স্থির হয়েই বসল এবং বসেই রইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো পরিচয়ের সূত্রটা পেয়ে গেল ভবেশ।

ডান কানের পাশে ঐ জড়ুলটা। সেদিনও ঠিক এই ভাবে মাথা নিচু ক'রে বসেছিল প্রথম দিকে, ঐ জড়ুলটাই সামনে পড়েছিল। ছোট্ট জড়ুল, এমনি

লক্ষ্য হবার কথা নয়, কিন্তু মুখের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের সঙ্গে ওটা যেন বেমানান, আর, এই ডান দিক দিয়ে মুখটা চোখে পড়লে বয়সের চেয়ে বেশী বয়স্কা মনে হয়।

আহীরিটোলার সেই মেয়ে। কী যেন নাম—হ্যাঁ, শুক্লা।

সন্ধ্যা বেলায় জরাজীর্ণ, ব্যবহার-মলিন প্রায়-অন্ধকার ঘরে বাট বাতির আলোতে দেখা—সেই জন্যেই এই বিস্মৃতি-বিহ্বলতা, ভাল ক'রে দেখা হয় নি বলেই। নইলে, সে তো বেশী দিনের কথা নয়, বোধ হয় মাসখানেক আগের ঘটনা। তবু ঐ জড়ুলটাই লক্ষ্য পড়েছিল বলে আজ চিনতে পারল।

নিজের জন্যেই দেখতে গিছল ভবেশ।

যৌবন-বয়সের অনেকখানি কাটিয়ে দিয়ে এসে, প্রায় সে বয়স অতিক্রম ক'রে আজ তাকে অল্পবয়সীদের এই খেলায় নামতে হয়েছে—পাত্রী সন্ধানের এই অরুচিকর পর্বে। নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়ার ফলেই এই বয়সে বিয়ের প্রয়োজন হয়েছে, আর ঠিক সেই কারণেই নিজেকে পাত্রী দেখে বেড়াতে হচ্ছে। এখন নিজের অভিভাবক নিজেই—মাথার ওপর দাঁড়িয়ে গরজ ক'রে বিয়ে দেবে এমন কেউ নেই।

এ ক্ষেত্রে যে পথে অগ্রসর হতে হয় সেই পথেই গিছল ভবেশ, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তার ফলেই একটি আধুনিক প্যাণ্ট পরা ছোকরা ঘটক জুটেছে—সে-ই এনেছিল সম্বন্ধ। বেশ গুছিয়েই পেড়েছিল কথাটা। মেয়ে এম.এ. পাস, গান বাজনা জানে, দেখতেও সুশ্রী। একটা স্কুলে মাস্টারী করে। বয়স প্রায় বত্রিশ হবে, তা ভবেশবাবুও তো এই বয়সের মেয়েই খুঁজছেন। এ যেন মনে হচ্ছে ওঁর জন্যেই বিধাতা এই মেয়েটিকে আইবুড়ো রেখেছিলেন এত দিন; ইত্যাদি—

যা বলেছিল তা বিশেষ মিথ্যা নয়—এটুকু সত্যের খাতিরে মানতেই হবে—যা বলে নি সেইখানেই গোলমাল বাধল। 'গলির গলি তস্য গলি' কথাটা শোনাই ছিল—সে যে এই পদার্থ, তা জানা ছিল না কোন দিন। ষোল ফুট রাস্তা থেকে ছ ফুটে পড়তে হ'ল, তা থেকে চার ফুট একটা ব্লাইণ্ড-লেন। দু'-দিকে বড় বড় বাড়ি, দিনমানেও এসব গলিতে কোন দিন রোদ নামে না।

বাড়িও এ গলির সঙ্গে মানান-সই। প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ি—কিন্তু তার

একটা ঘরেরও মেঝেতে সিমেণ্ট নেই বোধ হয়, দেওয়ালগুলোর এখানে-ওখানে একটু-আধটু পলেস্তারা আছে—তাও দেড়শো-দুশো বছরের অযত্ন-ব্যবহারে—তেলে ময়লায় কালিতে ছারপোকা মারার দাগে পুরু চট পড়ে ভয়াবহ বর্ণ ধারণ করেছে। ছাদের কড়ি বরগা ভগ্নদশার শেষ সীমায় পৌঁচেছে। বেশির-ভাগই ঝুলে পড়েছে, টালিও খসে পড়েছে দু-চারখানা, কোথাও বা পড়ো-পড়ো হয়ে আছে, উদ্যত-বজ্র মহাভয়ের মতো—দরজা জানলা কোনটাই পূর্ণাঙ্গ নয়, পাল্লাগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে অথবা পেরেক পুঁতে আটকাতে হয়েছে কোথাও কোথাও।

এরই মধ্যে বহু শরিক। সব পৃথক। কর্পোরেশন থেকে বাড়ি ভাঙার নোটিশ দিয়েছে অনেক দিন। এঁরা বিস্তর তদ্বিরে ব্যাপারটা ঠেকিয়ে রেখেছেন। ট্যাক্সও দেন না কেউ। বাড়ি যখন থাকবেই না শেষ অবধি—জীবিত বা মৃত একদিন এখান থেকে যেতেই হবে—তখন আর অযথা ট্যাক্স দিয়ে লাভ কি? তা ছাড়া তিনটে মর্টগেজ আছে, কে শেষ অবধি দখল করবে তাই বা কে জানে?···ইলেকট্রিক বেশির ভাগ অংশে নেই, কেরাসিনের ডিবে বা হ্যারিকেনে কাজ চলছে।

অবশ্য বাইরের দুটো উঠোন পেরিয়ে ওরা যেখানে গিয়ে পড়ল সেই অংশের দোতলার ঘরগুলোর তত দৈন্য দশা নয়। ইলেকট্রিক আছে, দেওয়ালও পুরো পলেস্তারা-খসা নয়, যদিচ তাতে চুনকাম হয় নি অন্তত পঞ্চাশ ষাট বছর। খাট বিছানা—মায় চেয়ার আলমারিও আছে ঘরে।

কিন্তু দু-চারটে কথার পর জানা গেল, এইটুকু যে এখনও বসবাসযোগ্য আছে সে এই শুক্লার বাবার জন্যেই। তিনি বড় চটকলে কাজ করতেন, তাই এইটুকু ঠাট বজায় রাখতে পেরেছিলেন, অসময়ে মারা না গেলে বোধ করি অন্য একটু আশ্রয়ও কোথাও ক'রে নিতে পারতেন। সেটা হয় নি। হয়েছে যেটা—ছটি ছেলেমেয়ে রেখে অকস্মাৎ তাঁকে পরলোকগমন করতে হয়েছে। শুক্লার মা বুদ্ধিমতী—তিনি কোনমতে এখানেই পড়ে থেকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছেন। শিখেছেও তারা। বড় ছেলে এম. কম. পাস ক'রে ভাল চাকরি পেয়েছে, তবে তার আগেই একটি বিবাহ ক'রে বসে-ছিল—দিল্লীতে বৌ ছেলে নিয়ে বসবাস করে। মাঝে মধ্যে এক-আধশো টাকা

পাঠানো ছাড়া কিছু করতে পারে না। মেজ বি. এ. পাস করার পর বিভিন্ন ব্যবসায়ে ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করেছে—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ছাড়া কোন ফল হয় নি। ছোটটি স্কুল-ফাইন্যালের পর আর এগোতে পারে নি, সে ড্রাইভারী শিখে রেওয়াতে একটা চাকরি নিয়ে চলে গেছে, সেও নিজের খরচ চালিয়ে বিশ পঁচিশের বেশি দিতে পারে না। এধারে শুক্লার মার হাতও একেবারে খালি। বড় মেয়ে একটা ইস্কুলে চাকরি পেয়েছে সম্প্রতি; তাতে কোনমতে উপবাসটা বেঁচেছে—কিন্তু মেয়ের বিয়ের টাকা জমে নি। অর্থাভাবে শেষ দুটি মেয়েকে পড়ানোও যায় নি, একটা করে পাস দিয়ে বসে আছে।

মেয়ের এক কাকা এসেছিলেন, কথার ভাবে বোঝা গেল—ঘোর অনিচ্ছায় ও অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে। দুই কাকাকে শুক্লার বাবাই চটকলে কাজ ক'রে দিয়েছিলেন, তারা সেখানে কোয়ার্টার নিয়ে থাকে। এদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই, রাখতেও চায় না। ভদ্রলোকের মুখে মদের গন্ধ, কথাবার্তা অত্যন্ত রুক্ষ ও উদ্ধত। ইচ্ছে ক'রে, এদের সম্বন্ধে অতি সাধারণ তথ্যও—যা না জানবার কোনই কারণ নেই—অজ্ঞতার ভান ক'রে বার বার বৌদির কাছে জেনে নিয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন, অর্থাৎ ভবেশদের জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে তিনি এদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেন না, কোন খবর জানেন না। আজ যে এসেছেন নিতান্ত দায়ে পড়েই। ওরই মধ্যে, প্রথম সুযোগেই এও জানিয়ে দিলেন যে এ বিবাহে —যদি বিবাহ হয়—এক পয়সাও সাহায্য করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে না—সে অসম্ভব আশা যেন কেউ না করে।

সুতরাং বাইরে এসে ঘটককে সাফ জবাব দিতে হয়েছিল।

মেয়ে এমন কিছু অপছন্দের নয় হয়ত, এ বয়সে কিছু আহামরি সুন্দরী তরুণী জুটবে না—কিন্তু শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ ও লোকগুলি অপছন্দের। এই বাড়িতে সে আর কিছুতেই আসতে পারবে না। কোন দিনই নয়। ঐ এক ঘন্টা সময়েই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল। ঘটক বাধা দিয়ে বলল, 'বিয়ে তো অন্যত্র ভাড়া বাড়িতেই দেবেন ওঁরা—'

'কিন্তু তার পর? শ্বশুরবাড়ি হলে সেখানে যাব না, সে হতে পারে না। যেতে হবেই।···পরের দিনই যেতে হবে হয়ত—'

—'আগে থেকে বলে নেবেন না হয়—'

—'ওসব বাজে কথা বলেন কেন। তা যে সম্ভব নয় তা আপনিও জানেন। তা ছাড়া, আমি কিছু চাই না সত্যি কথা—কিন্তু এক্ষেত্রে যে অবস্থা দেখলুম, ঘর থেকে ওদের খরচও দিতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা—এই বড় মেয়ে, একে যে বিয়ে করবে, বড় জামাই—অভিভাবক হবে। ঐ দুটি আইবুড়ো শালী, শাশুড়ি, আর আধপাগলা একটা শালা, বেকার অকর্মণ্য—তার ঘাড়েই চাপবে।…ও আপনি যতই যা বলুন, আমি ব্যবসা ক'রে খাই, বয়সও মেঘে মেঘে অনেক দূর এগিয়ে গেছে—অনেক লোক দেখলুম, যা বলছি আপনাকে একেবারে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার সত্য, বাস্তব, প্রত্যক্ষ। ও আপনি না বলে দিন।'

ঘটককে নিজের পরিষ্কার মতামত জানিয়ে এ প্রসঙ্গে ঐখানেই যবনিকা ফেলে দিয়েছিল ভবেশ, মন থেকে এ প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ মুছে ফেলেছিল একেবারে। সেই জন্যেই আরও চিনতে দেরি হয়েছে। কিন্তু এখন চিনতে পারার পর ওর ভয় ভয় করতে লাগল। এ আবার কেন এসেছে, কী মতলবে? কোন রকম ব্ল্যাকমেল করতে আসে নি তো? সেই ব্যাটা ঘটক কোন বড় ক'রে জেনে শুনে ফাঁদে ফেলবে বলেই নিয়ে যান নি তো সেদিন মেয়ে দেখাতে—যাকে বলে 'স্টেজ-সেট' ক'রে—এখন কিছু মিছে কথা লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করা সহজ হবে ব'লে?

দেখতে দেখতে ভবেশের কপালে ঘাম দেখা দিল, হাতের তালু দুটো পর্যন্ত ঘামতে লাগল।

তবু, ভয় পেলেও সেটা দেখানো চলবে না। অতি কষ্টে গলায় স্বর ফুটিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে করতে প্রশ্ন করল, 'কী বলুন।'

এবার শুক্লাও অতিকষ্টে গলা পরিষ্কার করল, 'আপনি আমাকে অপছন্দ করেছেন?'

ভবেশ এতক্ষণ, এই অল্প সময়ের মধ্যেই, ভাবছিল সেদিনের ঐ পরিচয়টা একেবারেই অস্বীকার করবে। কিন্তু এর পর সে অভিনয় করতে লজ্জাবোধ করল। বলল, 'এ প্রশ্ন আপনার পক্ষে করা যত কঠিন, তার চেয়েও কঠিন আমার উত্তর দেওয়া—তাই নয় কি?'

—'আমাকে—আমাকে অপছন্দ করলেন কেন ?...আপনি তো শুনেছি খুব সুন্দর চান নি!'

ভবেশের পিছন দিকে জানলা, তাতে পর্দা লাগানো থাকলেও দিনের আলো আসে—সে আলো এসে পড়েছে শুক্লার মুখে, সেই সঙ্গে টেবিল-ল্যাম্পের আলোর একটা রেখা কোলে-জড়ো-করা হাত দুটোর ওপর। লক্ষ্য করল ওরও কপালে বেশ বড় বড় ফোঁটায় ঘাম জমে উঠেছে, হাতের ওপরটাও চিকচিক করছে। কাঁপছেও হাত দুটো।

এবার সত্যিই ভবেশ নিজেকে বিপন্ন বোধ করল।

নির্জন ঘরে এ কি নাটক করতে এল মেয়েটা! উষ্ণ ও বিরক্ত হয়ে উঠল মনে মনে। এ তো ভীষণ বেহায়া, ব্যাপিকা! জবরদস্ত মেয়ে যাকে বলে। একে সে বিয়ে করবে ব'লে দেখতে গিছল! কী ভয়ানক ফাঁড়াই গেছে সে-দিন!

সে একটু রূঢ়ভাবেই জবাব দিল, 'কেন অপছন্দ করলুম সে তো আমি মিঃ সেনকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি। সে বলে নি আপনাদের?'

—'বলেছে কতকগুলো কারণ—কিন্তু সেগুলো ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় নি। বাজে কথা ব'লেই মনে হয়েছে। আমি আসল কারণটা জানব ব'লে এসেছি!'

—'আমি তাকে আসল কারণই বলেছি, সে অবশ্য যদি অন্য বাজে কথা বলে থাকে তো জানি না।'

—'সে বলেছে—ঐ বাড়ি ঘর, ঐ পরিবেশ, আমার আত্মীয়রা—এইগুলোই নাকি আপনার অমতের কারণ, ঠিক আমি নই!'

—'ঠিকই বলেছে সে।'

—'কিন্তু এ যে য়্যাবসার্ড!' এবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে শুক্লা, 'আপনি কি ঐগুলোকে বিয়ে করতেন? ও বাড়ি ঘরে আপনি ক'দিন আর যেতেন? ও বাড়ি তো ছাড়তেই হবে, আমাদেরও। আর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা না না রাখা—সেও তো আপনার হাতে!'

—'বিয়ের আগে পর্যন্ত, তারপর সবটা আর আমার হাতে থাকত না। তা ছাড়া দায়িত্ব! যে আপনাকে বিয়ে করবে—দুটি শালী. একটি বেকার শালা

ও একটি শ্বাশুড়ির ভার তার ঘাড়ে চাপবে, এটা মানেন তো ?'

—'আমার মার অত্যন্ত আত্মসম্মানজ্ঞান, তাতেই কাকারা আরও ওঁকে দেখতে পারেন না। তিনি মরে গেলেও জামাইয়ের ঘাড়ে চাপবেন না···আর, না হয় আমি আমার মাইনেটা ওঁদের ধরে দিতাম, এখন চাকরি ছাড়তুম না।'

—'দেখুন বুড়ো বয়সে বিয়ে করছি সংসার-সুখের জন্যেই। স্ত্রী চাকরি করবে, বিশেষ মাস্টারীর চাকরি—এক গাদা হোমটাস্‌ক্ আর পরীক্ষার খাতা নিয়ে আসবে, সংসার থাকবে ঝি কি চাকরের জিম্মায়—ঠিক সে জন্যে আমি বিয়ে করছি না। ইয়ে—মানে শুধু দৈহিক লালসা মেটানোর জন্যে বিয়ে করার আর বয়সও নেই আমার।' পছন্দ না করাটার সিদ্ধান্তটা যে চূড়ান্ত—কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের দৃঢ়তায় সেটা বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিল ভবেশ।

বুঝল মেয়েটাও। মধ্যে একবার মাথা তুলেছিল কিন্তু এখন আবার আগের মতোই মাথা হেঁট ক'রে বসে আছে। বসে রইল অনেকক্ষণ ধরেই।···

কপালের ঘামের ফোঁটাগুলো বড় হয়ে উঠেছে, একটা টপ্ ক'রে ঝরে পড়ল হাতের ওপর। আগে ভেবেছিল চোখের জল, অর্থাৎ এও নাটকেরই অংশ একটা—পরে দেখল ঘামই। আরও একটা ফোঁটা এসে চিবুকের প্রান্তে ঝুলছে, এখনই হয়ত ঝরে পড়বে।

এই প্রথম লক্ষ্য করল—মেয়েটার চিবুকের গঠনটা বড় সুডৌল।

তার পর হঠাৎই শুক্লা মুখ তুলল আবার। বলল, 'আমি বেশীক্ষণ আর আপনাকে বিরক্ত করব না।···এই আপনার ফাইনাল কথা তা বুঝেছি। শুধু একটা প্রশ্ন করব, অনেস্ট উত্তর দেবেন, কোন চক্ষুলজ্জা না ক'রে ?'

—'বলুন। চক্ষুলজ্জা করলে এত কথা বলতে পারতুম না মুখের ওপর, মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে বলতুম।'

—'আপনি এই যে কারণ দেখালেন—এই কি সব ? না, অন্য কোন কারণও আছে ?···কেউ ভাংচি দেয় নি কিছু ? শুধু দয়া ক'রে এইটে বলুন—অনেস্ট ট্রুথ।'

—'ভাংচি। ও হেভেনস্। না না, ভাংচি কেউ দেয় নি। দেবার কোন কারণ আছে নাকি ?' চেষ্টা সত্ত্বেও অশোভন কৌতূহলটা চাপতে পারে না।

—'ভাংচির আর কি কারণ থাকতে পারে—জেলাসি ছাড়া ? সর্বত্রই ঐ

একই কারণ। শুধু তার প্রকাশে আর য়্যাপারেন্ট কারণে রকমফের ঘটে। যারা ভাংচি দেবে তাদের সে রকম কারণ খুঁজে বার করতেও দেরি হয় না।··· ঐ বাড়িতে অসংখ্য শরিক আমাদের—তাদের কেউ, কোন ছেলেমেয়ে কোন-দিন একটা পাসও দেয় নি। কারও চাকরি-বাকরিও নেই—চুরি জুচ্চুরি ভিক্ষে, এই জীবিকা—। ওর মধ্যে আমরা একটু ভদ্রভাবে থাকি, সে একটা গায়ের জ্বালার মস্ত কারণ। আমাদের কাকাদেরই গাত্রদাহ আছে—আমার মা তাঁদের মতামতের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন না—এই অপরাধ!'

একটু থেমে কেমন এক রকমের করুণ হাসি হেসে বলল, 'তেত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল—মা যা-ই বলুন না কেন, জানি বিয়ে হবে না, কোন আশাই নেই। এক পয়সা খরচ করার সামর্থ্য নেই—অত দায়িত্ব—তবু মা শোনেন না, তাঁর ধারণা মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন বিয়ে করা অবশ্য কর্তব্য, আর হয়েও যাবে একদিন, যেমন ক'রে হোক—অথচ সে জন্যে কেউ একটু চেষ্টা করবে এমন লোকও নেই একটা—শেষে মরীয়া হয়ে রেশনের টাকা বাঁচিয়ে ঐ বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলেন মা,—কিন্তু জানেন, যে পাঁচ-ছটা পার্টি দেখতে এসে-ছিল, প্রত্যেককে ভাংচি দিয়েছে! তারা স্বীকার ক'রে গেছে—আপনাদের মেয়ের নামে এই এইসব শুনেছি,···যদি দেখে অপছন্দ করত তো কিছু বলার থাকত না—এই অপমানটাই আমার বেশী লাগে! আমাদের দেশের লোক মেয়েদের দুর্নাম বিশ্বাস করার জন্যে যেন তৈরী হয়ে থাকে।'

তারপর হাতের তিনটে জিনিস গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'আচ্ছা, আসি, নমস্কার।'

কিন্তু তারপর, দরজার কাছাকাছি গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল আবার। খুব আস্তে আস্তে, যেন স্বগতোক্তির মতোই বলল, 'আমার কিন্তু আপনাকে দেখে ভাল লেগেছিল, কেমন একটু আশাও হয়েছিল—আশা নেই জেনে-বুঝেও, হোপ এগেন্‌স্ট্‌ হোপ—মনে হয়েছিল আপনার কাছে একটা আশ্রয় পাবো হয়ত, হয়ত এবার সুখের মুখ দেখব একটু। কী পাগলই হয়ে ওঠে মানুষ এক এক সময়।'

আর দাঁড়াল না সে, দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

উঠে দাঁড়িয়েছিল ভবেশও। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এসে পর্দাটা

সরিয়ে দিল খানিকটা। আরও আলো ঢুকুক, সেই সঙ্গে বাইরের নির্মল হাওয়া...

আগেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল, শেষের এই নির্লজ্জ লোলুপতায় যেন গা-ঘিনঘিন করছে।

মেয়েটা শুধু বদই নয়, বোকাও। ও কি আশা করে এই কথাগুলো শুনলেই সে গলে জল হয়ে যাবে!

উঃ, সত্যি কী সাংঘাতিক মতলববাজ মেয়ে রে বাবা!

বরাত ভাল ওর, গুরুবল—তাই কোনমতে বেঁচে গিয়েছে। ঐ ব্যাটা সেন তো দিয়েছিল আর একটু হ'লে ফাঁসিয়ে! ভাগ্যিস সে তার ফোঁসলানিতে ভোলে নি!

যাই হোক—দ্য ওআর্স্ট ইজ ওভার—মনে মনে বলল ভবেশ, ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে সেই ভাল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। একটা শিক্ষাও হয়ে গেল খুব। মেয়ে দেখতে যাবার আগে তার বংশ, পরিবেশ, অবস্থা এ সব দেখে শুনে নিয়ে যাওয়া দরকার। 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' ওসব পুঁথি-কেতাবেই ভাল। আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলে না, দুষ্কুলে স্ত্রীরত্ন জন্মায় না—তা চাণক্যই বলুন আর স্বয়ং মনুই বলুন...

আপিস থেকে বেরিয়ে ভবেশ একটু হাঁটে রোজই। রাজ্যের ঘেমো-গন্ধওলা লোকের ভীড়ের মধ্যে উঠে (মহিলারা আরও দুঃসহ, হাতকাটা জামার দরুন প্রবলতর ঘামের গন্ধ তো আছেই—মাথার তেলচিটে ফিতের সঙ্গে গন্ধ তেল ও ঘামের পচা গন্ধ মিশে যে এক নিদারুণ ইন্দ্রিয়াতীত সূচীভেদ্য ব্যাপার) চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে—কিংবা হ্যাণ্ডেল ধরে প্রাণ হাতে ক'রে বাদুড়-ঝোলা হয়ে যাওয়া, তার থেকে একটু হেঁটে ধর্মতলা পর্যন্ত গিয়ে মিনি-বাস কিম্বা শেয়ারের ট্যাক্সি ধরা ঢের ভাল।

আজ কিন্তু তখনই ওদিকে যেতে মন চাইল না। রাস্তা পেরিয়ে বর্তমান কালের ভুক্তাবশিষ্ট গড়ের মাঠে গিয়ে পড়ল।

যতই মনে করুক ওর কথা আর চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, ও পর্ব তো চুকেবুকে গেছে—সহসা একসময় আবিষ্কার করল ভবেশ—সে এই এতক্ষণ ধরে ওর কথাই চিন্তা করছে। মেয়েটার কথা...

মেয়েটা কি সত্যিই ব্যাপিকা, গায়ে-পড়া—স্বৈরিণী ধরনের যাকে বলে? শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে এই ছেলেমানুষী পদ্ধতিতে ভোলাতে এসেছিল ওকে?

সেটাই সম্ভব। ভদ্রঘরের মেয়েদের, বলে বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। যথার্থ সদ্বংশের মেয়ে হ'লে মরে গেলেও এমন ভাবে অপরিচিত একটা পুরুষের কাছে উপযাচক হয়ে আসতে পারত না।·· ছিঃ!···একদিন একবার দেখতে গেছে একটা লোক, সে কী রকম লোক, স্বভাব চরিত্র কেমন—খাওয়াতে পরাতে পারবে কিনা—কিছুই জানা নেই, তার কাছে এসে বলা, 'আপনাকে ভাল লেগেছিল, ভেবেছিলাম আপনার কাছে বেশ থাকব!' বলতে পারল কী করে। আশ্চর্য।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় ঘাসের ওপরই বসে পড়ল। একটা সিগারেটের জন্যে পকেট হাতড়াল—নেই। মনে পড়ল আপিসের ড্রয়ার থেকে প্যাকেটটা আনাই হয় নি।···মরুক গে, এতক্ষণ যদি না খেয়ে কেটে থাকে, আরও দু ঘণ্টা বেশ কাটবে।···

অবশ্য, মেয়েটা যা বলল, তা একেবারে মিথ্যা না-ও হতে পারে।

বাঙ্গালী মেয়ের তেত্রিশ বছর বয়েস, তার মানে তো বুড়ি। আর আট-দশ বছর পরে সন্তান ধারণের শক্তিই চলে যাবে। এতদিনেও বিয়ে না হলে মরীয়া হয়ে ওঠবারই তো কথা। সব মেয়েই এমনি পাগল হয়ে উঠত, এ বোকা বলে সে ভাবটা প্রকাশ ক'রে ফেলেছে। মানে যাদের বিয়ে বা সংসারের ইচ্ছে আছে তারা হ'ত—যারা 'শীতল' ধরনের মেয়ে, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু সে আর কটা?

এ ক্ষেত্রে তো আরও। অবস্থা যা, বিয়ের কোন সুদূরতম সম্ভাবনাও নেই! ওদের এ বিজ্ঞাপন-দেওয়া বা মেয়ে-দেখানো এইটেই তো মূর্খতা। পাঁচটা লোক সংসারে—দৈনিক জীবন ধারণের খরচাই কি কম? এখনও তবু মাথার ওপর ছাদটা আছে, সেটা চলে গেলে এর ওপর ঘর ভাড়া টানতে হবে। একটা ভাল ঘর মানেই একশো টাকা, কমপক্ষে। এই সবই তো নির্ভর করছে ঐ মেয়েটার এক নড়বড়ে চাকরির ওপর। ওর বিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিলে খাবে কি? কোন্ বরই বা ঐ দুটি মুখ্যু শালী, বেকার শালা, অথর্ব শাশুড়ির দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে বিয়ে করতে যাবে ওকে? গান বাজনা জানে না, মোটা মাইনের

কাজও নয়—ভরসার মধ্যে একটা সন্থ পাওয়া মাস্টারী। বিয়েতে এক পয়সা খরচ করতে পারবে না। পাত্র পক্ষ যদি কিছু না-ও চায়—মেয়ের চুড়ি হার, বরাভরণ, দানের বাসন, ঘর খরচা সব জড়িয়ে কিছু না হোক ছ-সাত হাজার লাগবে। কে দেবে শুনি? ঐ ভয়েই তো কাকাটা আগে থাকতে শুনিয়ে দিলে—এক পয়সা খরচ করতে পারবে না। তবে! এ বিয়ের কথা তোলাই তো পাগলামি।

যদি সত্যিই মেয়েটা ভাল, মানে, ভদ্র হয়—কতখানি অতৃপ্ত সাধ আর রুদ্ধ কামনায় এমন জ্ঞানহারা হয়ে ছুটে এসেছে না জানি! কত দিনের স্বপ্ন হয়ত বেচারীর—একটি ভদ্র স্বামী, নিজস্ব সংসার। কোন্ মেয়ে চায় যে সে চিরকাল নিজের দুর্বল কাঁধে বাবার নির্বুদ্ধিতার ফলাফল বয়ে যাবে—বোনের বিয়ে দেবে, মাকে দেখবে, ভাইয়ের সংসার টানবে। নিজের সাধ আহ্লাদ মেটার কোন আশা কোথাও নেই দেখেই এমন পাগল হয়ে উঠেছে হয়ত, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়েছে। কোন্টা শোভন, কোন্টা সঙ্গত—সে হিসেব নেই।···

আচ্ছা, মেয়েটা কেমন? সত্যিই কি অভিনয় ক'রে গেল আগাগোড়া? না প্রাণের যন্ত্রণাতেই এসেছিল? মুখ-চোখের ভাব ইচ্ছেমতো পালটাতে পারে, যারা ও বিদ্যায় পাকা। অনেককে শিখতেও হয় না, শক্তিটা নিয়ে জন্মায়—জন্মগত ব্যাপার। চোখের জলও মানসিক প্রক্রিয়ায় আনা সহজ—কিন্তু ঘাম? দেখতে দেখতে যে ঘেমে নেয়ে উঠল মেয়েটা—? হাতের ওপরটা পর্যন্ত ঘামে চিকচিক করছিল, শেষের দিকে লক্ষ্য করেছে, সেখানে সেটা বেশ কটা বিন্দুর আকার নিয়েছে। হাত দুটো থর থর ক'রে কাঁপছিলও। এত কি অভিনয় হতে পারে!

অবশেষে একসময় দুত্তোর বলে উঠে পড়ে ভবেশ। তখনই বাড়ি যায় না, দু টাকা দশের টিকিট সাড়ে তিন টাকায় কিনে, শো শুরুর অনেক পরে একটা সিনেমায় ঢোকে। ক্লান্তিকর কী একটা ছবি, খানিকটা দেখে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে। বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে জোর ক'রেই একখানা বই নিয়ে বসে।

কিন্তু খানিক পরে আবিষ্কার করে বইয়ের একটি কথাও তার মাথাতে

ঢুকছে না—যেমন খানিক আগে ছায়াছবির পাত্র-পাত্রীরা কী বলছে কী করছে দেখেও মাথাতে ঢোকে নি ওর। কে জানে কেন, যে ঝামেলা চুকে গেল, যার কথা আর ভাববার দরকার নেই—যার শেষের কথাগুলোতে 'পুংশ্চলী' বৃত্তির (শব্দটা সম্প্রতি অভিধানে পেয়েছে ও, হঠাৎ) নিদর্শন পেয়ে ঘেন্নায় ওর গা বমি ক'রে এসেছিল—সেই ভাবনা, তার ভাবনাই ভাবছে সে সর্বক্ষণ, সেই চিন্তাটাই মাথায় চেপে বসে আছে।

তার ভাবভঙ্গী, তার কথাগুলো।

কেবলই যাচাই করতে চায় মন, এ অভিনয় না প্রাণের জ্বালা।

মেয়েটা চরম বেহায়া না চরম দুঃসাহসিক ?

না মরীয়া ?

কোন মীমাংসাই হয় না সমস্যাটার। মনের মধ্যে কোন উত্তর পায় না এ প্রশ্নের—প্রমাণসিদ্ধ নিশ্চিত কোন উত্তর।

অনেক দেখেছে সে এই চল্লিশ বছর বয়সে, মানুষের বাইরের আবরণ দেখে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না সব সময়ে। ওর ছেলেবেলায় কোন এক লেখক ওর অটোগ্রাফ বইতে সত্যেন দত্তর কটা লাইন লিখে দিয়েছিলেন, "তুমি যাহা ভাব কলঙ্ক, তাহা অস্ত্রের লেখা হবে।" লাইনটার মানে জেনেছে ও অনেক পরে। কলঙ্ক মানে কলঙ্ক-লেখা। আগে চোর, ব্যভিচারী ইত্যাদিদের কপালে লোহা পুড়িয়ে বিশেষ দাগ দিয়ে দেওয়া হ'ত—তাতেই জনসাধারণ বুঝত লোকটা ঘৃণ্য অপরাধী। অথচ যুদ্ধের সময়—সম্মুখ যুদ্ধে—অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোদ্ধার অস্ত্রের আঘাতেও ঐ রকম দাগ 'পড়ত, ক্ষতচিহ্ন—সে চিহ্ন শৌর্যের, সাহসের—সেই জন্যেই গৌরবেরও।

তেমনিই যদি মর্মান্তিক সত্য হয় ঐ মেয়েটার আচরণ ?

কতখানি মানসিক যন্ত্রণাতেই না এতটা মরীয়া হয়ে উঠেছে !

বেচারী !

*

গভীর রাত পর্যন্ত ও পরের সারাটা দিনই প্রায় মনে মনে কথাটা নিয়ে তোলাপাড়া করল ভবেশ। বস্তুত সেদিন আপিসের কোন কাজই হ'ল না। এক দালাল এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে ওরা বছরে অনেক টাকার 'বিজনেস'

পায়—তাঁকে অকারণেই খিঁচিয়ে উঠল; ওর একমাত্র যে ওপরওলা পাশের ঘরে বসেন তিনি বার দুই ডেকে পাঠাতে বলে ছিল ওর অত্যন্ত মাথা ধরেছে, এমনভাবে বার বার তার উঠে আসা সম্ভব নয়। তিনি বিস্মিত হলেন। কিন্তু বহু রাত্রি পর্যন্ত জাগরণের কালিমা মাথাধরার লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে সহানুভূতির সুরেই বললেন, 'তা হ'লে আপনি আজ একটু বিশ্রাম নিলেন না কেন?… সত্যিই তো—মুখের যা চেহারা হয়েছে! বরং বাড়িই চলে যান, কাজ যা আছে আমি ম্যানেজ ক'রে নিতে পারব।'

এই প্রশ্রয়ে বেঁচে গেল ভবেশ। আরও ঘণ্টাখানেক কাগজপত্র নিয়ে অনর্থক নাড়াচাড়া ক'রে, যাঁরা কাজে এসেছেন তাঁদের পাশের ঘরে পাঠিয়ে—আড়াইটে নাগাদ সত্যিই উঠে পড়ল সে।

কিন্তু ততক্ষণ ওর সেই অবসাদ কেটে গেছে খানিকটা।

অনিশ্চয়তাই বেশী ক্লান্তিকর, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তো বটেই। নিজের কাছেই মেয়েটার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করতে করতে এতটা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, এবার এক সময় লক্ষ্য করল পাল্লাটা স্বপক্ষেই বেশী ঝুলে পড়েছে। হয়ত যে মন দাঁড়ি ধরে ছিল, এটা তারই কারসাজি, এক সময় এদিকে 'পাষাণ' চাপিয়ে দিয়েছে খানিকটা—তবু এই অনবরত যুক্তি-প্রতিযুক্তি প্রয়োগের দায় ও অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচে গেছে সে, 'পাষাণ' চাপানো হয়েছে কি না—সে তথ্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত হ'তে চায় না।

আপিস থেকে বেরিয়ে,পার্ক স্ট্রীটের একটা নামী রেস্তোরাঁয় অনেকক্ষণ ধরে পুরো এক পট অর্থাৎ দু কাপ কফি খেল সে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আরও একটা দমকা খরচ ক'রে ফেলল। একখানা ট্যাক্সি ডেকে পাইকপাড়া রওনা দিল।

যেদিন শুক্লাকে দেখতে যায় সেদিন—সে কোন ইস্কুলে মাস্টারী করে সেটা জেনেছিল; ওঁরাই বলেছিলেন, আর সে ইস্কুলটা যে পাইকপাড়ায় সেটাও জানিয়েছিলেন সেই সঙ্গেই। এখন দু-চারজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে সে ইস্কুলের সামনে এসে পৌঁছতে খুব অসুবিধে হ'ল না।

সময় হিসেব ক'রেই এসেছে ভবেশ। ও ফটকের কাছে পৌঁছবার আগেই

ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেল আর মেয়েরা হুড়হুড় ক'রে বেরোতে শুরু করল।

ভবেশের তাড়া ছিল না কিছু। ইস্কুলের ছুটি হলেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেরোতে পারেন না, তাঁদের একটু সময় লাগে। কতটা সময় লাগবে সেটাই ছিল চিন্তা। কিন্তু দেখা গেল বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল না—ছাত্রীদের ভীড় সম্পূর্ণ কমবার আগেই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফটকের দিকে যে এগিয়ে এল সে শুক্লা—আর, যেন ভবেশের সৌভাগ্যক্রমেই, একা।

—'মিস চৌধুরী!'

আস্তেই ডেকেছিল ভবেশ, তবু শুক্লা বিষম চমকে উঠল। হয়ত কোন গভীর চিন্তার মধ্যে ছিল বলেই। সে চমকে ওঠাটার প্রবলতর পুনরাবৃত্তি ঘটল ওকে দেখার ও চিনতে পারার পর। নিমেষেই মুখের অনেকগুলো বর্ণান্তর ঘটে গেল—শেষ পর্যন্ত সব রঙ মিলিয়ে গিয়ে বিবর্ণতাটাই স্থায়ী হ'ল।

—'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল। কোথাও একটু নিরিবিলি বসা যায় না?'

মুখের বিবর্ণতা সত্ত্বেও শুক্লা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। পা-ও থামায় নি। চলতে চলতেই বলল, 'না, কৈ আর। এখানে কোন পরিচিত বাড়ি নেই, থাকলেও যে মেলাই কৈফিয়ত···হোটেল রেস্তোরাঁও তো পাড়ায় তেমন নেই যে বসব। তা ছাড়া চারিদিকেই ছাত্রী, কে কি মনে করবে—। কোথাও দাঁড়িয়েও কথা বলা যাবে না।···আর কী দরকারই বা। আপনার যা বলার তা তো কালই শেষ হয়ে গেছে। আমারও।'

—'একটু—একটু অন্য কোথাও যাবে? কিছু খারাপ ভেবো না—ট্যাক্সি ক'রেই যাবো—চৌরঙ্গীর দিকে কোন রেস্তোরাঁয়, কি গড়ের মাঠে? আমি আবার পৌঁছেও দেব যেখানে বলবে। বেশি দেরি হবে না, গ্যারান্টি দিচ্ছি। এক পেয়ালা চা দিতে আর খেতে যেটুকু সময় লাগবে—'

মুখের ভাবটা যে কঠিন হয়ে উঠল সেটা লক্ষ্য করতে কোন অসুবিধে হ'ল না ভবেশের। সেই ছুটি দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ থেকে কঠিনতর উত্তরেরই আশঙ্কা করছিল ভবেশ। কিন্তু, আবারও দেখল, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলেই নিল শুক্লা, নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'চলুন। তবে ট্যাক্সিতে নয়, বাসেই যাবো। নতুন চাকরিটা আমি মিথ্যে দুর্নামে খোয়াতে চাই না। আপনি এগিয়ে যান, আমি যাচ্ছি।'

রেস্তোরাঁয় বসে চা আর স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিয়ে বিনা ভূমিকাতেই ভবেশ কথাটা পাড়ল, 'আমি যদি মত পরিবর্তন করি, তুমি—তুমি আমাকে সে সুযোগ দেবে?'

'তুমি' আগেই বলেছে। আপনিই বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। এখন হঠাৎ সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে বিষম লজ্জা পেয়ে বলে উঠল—'তুমি বলে ফেললুম, কিছু মনে করলে না তো?'

—'আমি অত লক্ষ্য করি নি,' প্রশ্নটা উড়িয়ে দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল, 'কিন্তু মত পরিবর্তনের কারণ? দয়া? অনাথা সহায়সম্বলহীনার প্রতি?'

ব্যঙ্গের সুরটা ধরতে না পারার কোন কারণ নেই, তবু ভবেশ সংক্ষেপেই উত্তর দিল, 'না। অনুশোচনা। নিজের অবিবেচনার জন্যে।'

—'ও একই কথা।' বলে একটুখানি চুপ ক'রে রইল শুক্লা। মনে হ'ল ওরও মনোরাজ্যে একটা তুফান উঠেছে, আশা-নিরাশা, কর্তব্য-অকর্তব্য, লোভ ও অভিমানে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে।

তারপর, বোধ হয় সে আবেগ-আলোড়নের প্রাথমিক প্রাবল্য কমে এলে আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু আমিও মন স্থির ক'রে ফেলেছি। মত পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না, কেন না, এর অবাস্তব দিকটা আগেই আমার চোখে পড়েছিল, তবু লোভটাও বড় বেশী প্রবল বলেই মার চেষ্টায় বাধা দিই নি, ভাগ্য হঠাৎই একটা সুব্যবস্থা ক'রে দেবেন এমনি একটা অস্পষ্ট সান্ত্বনার মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছি। কাল সেই মোহটা ভেঙেছে। সারারাত ভেবে দেখেছি আপনার কথাই ঠিক, দুটো আইবুড়ো লেখাপড়া-না-জানা সাধারণ চেহারার বোন, একটা অকর্মণ্য বেকার ভাই আর বুড়ো মা—এতগুলো বোঝাসুদ্ধ কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না। কিছুটা অন্তত রূপ, কিম্বা কোন বিশেষ কোয়ালিফিকেশন—যেমন গান বাজনা—থাকলেও বা কথা ছিল। করলেও—যে করবে, হয়ত না ভেবেচিন্তে, কিম্বা করুণা ক'রে—যেমন আপনি করতে চাইছেন আজ—তারপর জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠবে, ঘাড় থেকে নামাবার জন্যে ছটফট করবে, আমাদের অভিসম্পাত দেবে। সে ক্ষেত্রে জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠবে আমারও। যদি বলেন যে দায়দায়িত্ব তোমার ভাইরা নিল না, বড়, পুরুষমানুষ হয়েও—সে দায়িত্ব ঘাড় পেতে নেওয়ায় তোমার অত গরজ

কিসের ? তার উত্তরে সেই য়্যাণ্ডারসেনের গল্পই বলতে হয়, তারা খেয়া নৌকোর দাঁড়টা ফেলে চলে গেছে, আমি আগে যেতে পারি নি। এখন কার হাতে দিয়ে যাবো বলুন ? না, আমি মন ঠিক ক'রে ফেলেছি, মাকেও বলে দিয়েছি, আজ সকালেই। তিনি অবিশ্যি কাঁদতে বসেছেন, কিন্তু ও কান্নায় কান দিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি ভবিষ্যতের ছবিটা দেখছেন না—দেখতে চাইছেন না—আমি দেখেও সেদিকে চোখ বুজে থাকি কি ক'রে ?'···

একটু থেমে, বাইরের দরজাটার দিকে চেয়ে আবারও বলল, 'এনিওয়ে, আপনি যে অনুগ্রহ করতে চেয়েছিলেন এটা মনে থাকবে আমার, এজন্যে সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ। অন্তত একটা বিয়ের অফার তো তবু এল জীবনে ! আমাদের কাছে এটা কম কথা নয়। এটুকুও না এলেই বা কি করতুম—তবু মনে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ থাকত।···আমি মা বোনের জন্যে স্যাক্রিফাইস করলুম, এ-সান্ত্বনাটাও থাকত না।···আচ্ছা আসি, নমস্কার।' সে উঠে দাঁড়ায় একেবারে।

—'আরে—আর একটু বসবেন না ? চা বলেছি যে—?' ভবেশ বিষম ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—'থাক গে চা। আপনি ওদের দামটা দিয়ে দেবেন। তা হ'লেই হবে। আমি যাই।'

সে সত্যি সত্যিই দ্রুত বেরিয়ে যায়। চা যে টেবিলে এসে হাজির হয়েছে, তাও লক্ষ্য করে না।

নরেন ঠাকুর

বড়বাজারে আপনার যাতায়াত আছে ? তা হ'লে নরেন ঠাকুরকে নিশ্চয়ই দেখেছেন।

ছোট ছোট খ্যাংরা-ছাঁটা চুল, তার মধ্যে ফাঁসবাঁধা টিকিটি যেন উদ্যত কামানের মতোই খাড়া হয়ে থাকে। গোঁফ-দাড়ি কামানো কিন্তু সে অভাব পূরণ ক'রে নিয়েছে ওঁর দুই ভুরু এবং কান। কানের পাশে এত চুল থাকতে ঠাকুর আমাদের গোঁফ কামাতে গেলেন কেন—অনেকেই ভেবে পায় না।

অবশ্য, গোঁফ-দাড়িও কামানো হয় সপ্তাহে দুবার কি একবার। বাবুদের বাড়ি ওঁদের মাইনে করা নাপিত যখন কামাতে আসে তখন যদি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে তবেই—ফলে সপ্তাহে অন্তত তিনটে দিন ক'রে কাঁচাপাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে মুখখানা সজারুর মতোই কণ্টকিত থাকে।

নরেন ঠাকুর যে এঁদের ফার্মে কি করেন ঠিক, অর্থাৎ উনি এ ফার্মের কে, তা বোধ হয় আজ আর কারুরই ভাল মতো জানা নেই। বি. এন. মল্লিক য়্যাণ্ড মাইতি—ফার্মটি বহুকালের। এঁদের রামকৃষ্ণপুরে চালের গুদাম আছে, বড়বাজারে কাপড়ের আড়ৎ এবং দয়েহাটায় বিরাট লোহালক্কড়ের দোকান। তিন ভাই এঁরা—মানে মল্লিকরাই তিন ভাই, মাইতি বলে এখন আর কেউ নেই, কোন এককালে ছিল, সে অংশও এখন এঁদের—তিনজনে তিনটি কারবার দেখেন। বড়বাবু বসেন রামকৃষ্ণপুরে, মেজভাই বড়বাজারে, সেজভাই দয়েহাটায়। ছোটভাই সম্প্রতি মারা গেছেন—তাঁর বিধবা স্ত্রী শিশু-পুত্র নিয়ে কতকটা এঁদের দয়া ও সুবিবেচনারই মুখ চেয়ে আছেন।

যত দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, ব্রহ্মার মতো নরেন ঠাকুরও ছিলেন চতুরানন। এখন ওঁর তিনটি মুখ তিন মনিবের দিকে ফেরানো থাকে। মিছে কথা ব'লে এবং অনবরত ধরা পড়ে পড়ে একটা অদ্ভুত আধো-অপ্রতিভ আধো-চতুর হাসি ওঁর মুখে লেগেই থাকে। বরং বলা চলে মুখখানা ঐ ভঙ্গিতেই বেঁকে গেছে। কণ্ঠস্বরেও কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি তোষামোদের সুরে বাজে সর্বদা—সে রকম কথা যদি আপনারা কারুর মুখে শুনে থাকেন তো ঠিক বুঝবেন—শুনলেই বুদ্ধিমান লোকে বুঝতে পারে যে মিছে কথা বলছে, অথচ যার তোষামোদ করা হয় সে মিছে জেনেও খুশী হয়। মুখে ঐ হাসি এবং ঘন কুঞ্চিত ভ্রূর মধ্যে দিয়ে কোটরাগত চক্ষুর তীক্ষ্ণ চাহনি—সে অপূর্ব সমন্বয় দেখলে মানুষটিকে ভোলা কঠিন।

নরেন ঠাকুর এ ফার্মে ঢোকেন উনিশ বছর বয়সে, কর্তার আমলে। বিল আদায়কারী গোমস্তা, এই ছিল ওঁর সেদিন পদবী। তখন কারবার ছিল একটিই—চালের আড়ৎ। টালিগঞ্জের কলটাও কেনা হয় নি তখনও পর্যন্ত। সুতরাং একটি গোমস্তাই যথেষ্ট। নরেন ঠাকুরের আসল নাম হ'ল নরেন চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণ ব'লে ঠাকুর উপাধিতেই তিনি পরিচিত। ছোটরা ডাকত

ঠাকুর মশাই, ঝি-চাকররা ঠাকুর-দা—আর বড়রা শুধু ঠাকুর। সেকালে অব্রাহ্মণ বাড়িতে ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের এই ভাবেই সম্মান দেখানো হ'ত।

সে আজ ছত্রিশ বছর আগের কথা।

তখন বয়স ছিল উনিশ, এখন পঞ্চান্ন। এখন তর্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি উঠেছে—অনামিকায় পলা ও তামার। পূজার্চনাও করেন কিছু কিছু শোনা যায়—দীক্ষাও নাকি হয়েছে। কিন্তু সে সব কখন করেন তা কেউ জানে না। কারণ ভোরবেলা উঠেই পথে গঙ্গাস্নান সেরে এঁদের পোস্তার বাড়িতে এসে ওঠেন—তিন কর্তার কাছে হাজরে দিয়ে, বাড়ির হিসাবপত্রের কাজ সেরে ভাত খেতেই এগারোটা বেজে যায়, তারপর 'অফিসে' বেরোন। কখনও রামকৃষ্ণপুর, কখনও বড়বাজার, কখনও দয়েহাটা। তপিল ধরে হিসেব চুকিয়ে ছুটি মেলে কোনদিন রাত সাড়ে নটা, কোনদিন দশটা। বাড়ির লোকে কেউ মুখ দেখতে পায় না—রবিবার ছাড়া। রবিবারেও কর্তাদের বাড়ি হাজরে দিতে হয়—সব কাজ সেরে ছুটি মেলে হয়ত কোনদিন বিকেলে, কোনদিন সন্ধ্যায়। তবু এই সন্ধ্যাগুলোই তাঁর পরিবারের জন্য তোলা থাকে। বাজার হাট করেন—ঘরের অন্য কাজ, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো, বিবাহ অন্নপ্রাশন যা কিছু, এই সময়ই সে সবের চিন্তা করারও সময়। অর্থাৎ মনটা সপ্তাহে এই বিশেষ একটি দিনের কয়েক ঘণ্টা মাত্র ফেরে নিজের সংসার ও ব্যক্তির দিকে।

কী কাজ করেন এঁদের?

কি না করেন! কর্তাদের কিছু কিছু তেজারতি আছে, আছে কিছু কিছু গোপন লেনদেন, নিজস্ব ব্যবসায়। তার একটা হিসাব আছে। সে হিসাব নরেন ঠাকুর ছাড়া কাউকে বিশ্বাস ক'রে দেওয়া যায় না। তিনি তিন কর্তার কাছেই সময়মতো বাকি দুজনের নামে প্রচুর নিন্দা করেন এবং অনেক 'গোপন সংবাদ' দেন—কিন্তু টাকাকড়ির কথাটা বলেন না। কারণ জানেন এটা ওঁদের আঁতের জিনিস। আঁতে ঘা দিতে নেই। সেই গুণেই এখানে এই দীর্ঘকাল টিকে আছেন নরেন ঠাকুর।

এ ছাড়া আছে ইন্‌কাম ট্যাক্স্ ফাঁকি দেবার জন্যে নানা রকম হিসেবের মার-প্যাঁচ্। তার জন্যে অবশ্য ফার্মের আরও জন-দুই প্রাচীন কর্মচারী আছেন, যাঁরা বাড়ির একটি বিশেষ দোতলার ঘরে সকাল নটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত খাতার

ওপর ঘাড় গুঁজে বসে থাকেন—কিন্তু নরেন ঠাকুর ছাড়া তাঁরাও অচল। নরেনই তাঁদের নির্দেশ দেন, কাজ বুঝিয়ে দেন এবং বুঝে নেন। সরকারী দলিলপত্র নিজের তত্ত্বাবধানে রাখেন। বিশ্বাস এঁরা কাউকেই করেন না—নরেন ঠাকুর ছাড়া। নরেন ঠাকুরকে করেন এই জন্য যে, তাঁরা বোকা নন। কর্তারা জানেন যে এ বাড়িটি নরেন ঠাকুরের কামধেনু, এখান থেকে বিবিধ এবং নিয়মিত উপার্জন তাঁর। সে উপার্জনের পথ নরেন ঠাকুর স্বেচ্ছায় নষ্ট করবেন না। একজনকে দোহন করবার সুযোগ দিয়ে চতুর ব্যবসায়ীরা অপরের দোহন করবার পথ বন্ধ করেন।

এ ছাড়া আছে বাজার-সরকারী। বিভিন্ন পূজা, ক্রিয়াকলাপের বাজার—এসব তো আছেই। তাছাড়া তিন সংসারের মাসকাবারী, কাপড় জামা জুতো খোকাবাবুদের, বৌমাদের গোপন ফরমাশ এবং গৃহিণীদের অলঙ্কার—নরেনবাবু ছাড়া অচল। মেয়েদেরও কিছু কিছু টাকা খাটে—সুদে ও ব্যবসায়ে ; সে সবেরও বাহন নরেনবাবু। খোকাবাবুদের ফরমাশী জিনিস কিনতে হবে, সে টাকা কী অছিলায় কর্তাদের না জানিয়ে হিসেবের গোঁজামিলে বার করতে হবে তা নরেন ঠাকুর ছাড়া কেউ জানে না। এমন কি দু-একজন ইতিমধ্যে কিছু কিছু উড়তে শুরু করেছেন—সে খরচ ও সুযোগ-সুবিধা, তাও যুগিয়ে যাচ্ছেন নরেন ঠাকুর। তা ছাড়া বিয়ে থেকে শ্রাদ্ধ—এসব ব্যাপাবের মূলাধার উনি। রেশনকে ফাঁকি দিয়ে কেমন ক'রে আটা চিনি সংগ্রহ করতে হবে, কোথা থেকে বেসন আসবে, কোথা থেকে ঘি ও ক্ষীর, কোন্ হালুইকর কোন্টা ভাল করে, খাওয়ানোর পর পাতা গ্লাস কোন্ কোন্ ডাস্ট্‌বিনে ভাগ ক'রে ফেলে আসতে হবে,—যাতে এনফোর্সমেন্টের লোকরা না ধরতে পারে—এসব নরেন ঠাকুরের নখদর্পণে। সে সময় কদিন রাত্রের নিদ্রাও ত্যাগ করেন উনি। প্রথমে ভিয়ান, পরে ভাঁড়ার আগ্‌লে বসে থাকেন যক্ষের মতো। সব কাজ সেরে অবশিষ্ট মিষ্টি গুছিয়ে নিয়ে পথে ময়রার দোকানে কিছু কিছু বিক্রী ক'রে তিনদিন কি চারদিন পরে বাড়ি ফেরেন।

বলা বাহুল্য—এ সব ব্যাপারেই ওঁর কিছু কিছু 'থাকে'। কীভাবে কতটা আসে—ঠিক কোন্ পথে—তা বলতে পারব না। তবে ইতিমধ্যে উনি গোপনে কলকাতাতে একটি বাড়ি কিনেছেন পুত্রবধূর নামে, দেশে স্ত্রীর নামে প্রায়

তিন শ' বিঘে জমি। এছাড়া সেখানেও দালান কোঠা উঠেছে। গহনা আর কোম্পানীর কাগজও স্ত্রীকে কিছু কিছু ক'রে দিয়েছেন। শুধু স্ত্রী যখন মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করেন যে, 'ভূতের মতো তো খেটেই যাচ্ছ চিরকাল। এত যে করছ, ভোগ করবে কবে ? বয়স কি কমছে ?' মৃদু হেসে বলেন, 'করব, করব— দাঁড়াও। আর একটু গুছিয়ে নিই, তারপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এসে বসব।'

কিন্তু ছাড়া আর হয় না। সহস্রমুখী আয়ের এ পথ তিনি ভরসা ক'রে ছাড়তে পারেন না।

অথচ বেশভূষা চিরকাল সমান। গরমের দিনে একটি ছেঁড়া আধময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি, তার ওপর আরও ময়লা একটা উড়ুনি। আর শীতের দিনে ময়লা (কোনকালে সাদাই ছিল) জিনের কোট, ভেতরে একটি সোয়েটার এবং বাইরে খান-তিনেক গায়ের কাপড় আর পায়ে চটি জুতো—এই বেশ দেখে আসছি আমরা চিরকাল। প্রতি বৎসরই তিন কর্তার কাছ থেকে তিনখানা ক'রে গায়ের কাপড় আদায় করেন উনি, দু-একদিন পরে গোপনে বিক্রী ক'রে দেন। তারপর শুরু হয় পুরনো গায়ের কাপড় একখানা গায়ে দিয়ে বেড়ানো কিন্তু ঘটনাটা বার বার ধরা পড়ে যাওয়ায় এখন আর সদ্য সদ্য বেচতে পারেন না এবং তিনখানাই একসঙ্গে গায়ে দিয়ে বেড়াতে হয়। নইলে পাওনাটা বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এ ছাড়া মনিব-গৃহিণীদের ও বধূমাতাদের কাছ থেকে তো আছেই। এক বছর সাতখানা গায়ের কাপড়, তিনটে গরম জামা ও এগারটি ছাতি আদায় হয়েছিল এই বাড়ি থেকেই। তাছাড়া বার-ব্রতে ব্রাহ্মণ বিদায় তো লেগেই আছে। সেখানেও উনি প্রথম ও প্রধান ব্রাহ্মণ। জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির পরের দিন অন্তত তিন জায়গায় পারণ করতে হবে—তাতে অসুখই হোক আর যাই হোক।

অফিসেও ওঁর হাজার রকমের কাজ থাকে। কোথায় কাকে তাগাদায় পাঠাতে হবে, কোন্ কোন্ খদ্দেরকে বিশেষ তাগাদা দেওয়া দরকার, কাদের ওপর নজর রাখা উচিত—সেল্‌স্ ট্যাক্সের দিন কবে ; ইন্‌কাম ট্যাক্সের খাতা তৈরী হ'ল কি না—মাল কোন্ কোন্ গুদামে ভাগ ক'রে রাখলে ধরা পড়বার ভয় নেই, এসব নরেন ঠাকুরই ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করেন। ফলে কোন এক জায়গাতেই তাঁর বসা হয় না। বিশেষ ক'রে যে সব মাল 'ব্ল্যাক,' করা হয়

তার হিসাব এবং টাকাকড়ি জমা-খরচ—নরেন ঠাকুর ছাড়া আর কেউ জানেন না, করেনও না। সে জন্য চরকীর মতো তাঁকে ঘুরতে হয়—এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিচিত্র হিসাবে তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূর দু'পাশের চামড়া আরও কুঁচকে যেতে থাকে দিন দিন।

যাই হোক, এতদিন তিন মুখে তোষামোদ ও ছয় হাতে উপার্জন ক'রে এক-রকম বেশ চলছিল কিন্তু আর বুঝি চলে না। কর্তাদের খুশী করার অমোঘ মন্ত্রটি নরেন ঠাকুর আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিলেন—সেটা হ'ল একজন ভাইয়ের কাছে বাকী দুজন ভাই যে কিছুই করছেন না, অথচ লাভের ভাগটা সমান নিচ্ছেন এইটে প্রতিপন্ন করা। এতে যেমন আত্মতৃপ্তি এবং আত্মসান্ত্বনা লাভ করতেন এঁরা—এমন কিছুতে নয়।

ধরুন সকালে বেলা সাতটার সময় নরেন ঠাকুর হয়ত বড়বাবুর ঘরে তাঁর ঈষৎ টানা টানা এবং নাকি সুরে বলে এসেছেন, 'আমি তো তাই বলছিলুম মেজবাবুকে যে, কর্তাবাবু যখন মারা গেলেন তখন আপনাদের আর কত বয়েস—আপনার তেরো, সেজবাবুর দশ আর ছোটবাবুর নয়—বড়বাবুই তো ধরুন কারবারটাকে এমনভাবে দাঁড় করালেন। দেহের একপিট রুইকে আর একপিট ভুঁইকে দিয়ে দিনরাত খেটেছেন—কোনদিন নিজের আরামের দিকে তো চান নি—এখন উনি যদি একটু আপনাদের বকাবকি করেনই—'

এই পর্যন্ত বলে চুপ ক'রে যান নরেন ঠাকুর।

বড়বাবু ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই বলেন হয়ত, 'তার পর? কী বললেন মেজ-বড়বাবু? কথাটা পছন্দ হ'ল না বুঝি?'

নরেনবাবু আরও অপ্রতিভ হাসি হেসে বলেন, 'সে কথা আর শুনে কাজ নেই, হাজার হোক আমি তো ওঁদেরও কর্মচারী!'

আরও পেড়াপীড়িতে বলেন, 'ওঁরা বলেন যে সে সময় উনি যদি একটু বেশী খেটে থাকেন তো সে তাঁর কর্তব্যই করেছেন, তাই বলে কি এখনও উনি কর্তা হয়ে থাকবেন? আর আমি তো পনেরো বছর বয়স থেকেই লেগেছি, সেজ ভাই তো আরও কম বয়সে। লেখাপড়া ছেড়ে তো এই নিয়েই পড়েছিলুম, বাবু একা আর কি করতে পারতেন?'

'হুঁ!' রেগে আগুন হয়ে উঠে বড়বাবু তখন ফর্দ দিতে থাকেন যে কী কী উপায়ে তিনি ইচ্ছে করলে অন্য ভাইদের ফাঁকি দিয়ে পথে বসাতে পারতেন অথচ তা করেন নি—ভাইদের জন্য স্বার্থত্যাগই করেছেন।

এরপরই, নরেন ঠাকুর মেজবাবুর ঘরে পৌঁছে, সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে, মেজবাবুর কোন একটা মন্তব্যে সায় দিয়ে হয়ত বললেন, 'তাইত, আমিও তাই বলি—খাটুনি তো আপনারা কেউ কম খাটেন নি—ছেলেবেলা থেকেই সমানে খেটে আসছেন। তবু তো আপনাদের ভাল বলতে হবে আপনারা বড়বাবুকে বাপের মতোই মান্য ক'রে চলেন! ওঁরও তো সেটা বিবেচনা করা উচিত।... আমি এ সব বলতে গেলে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন—'

'তাই নাকি? তাই নাকি? কি বললেন কি? আজ কোন কথা হ'ল নাকি?'

'না, না—সে কথা এখন থাক্ মেজবাবু, ওসব কথায় আর না—'

এই ভাবেই চলছিল। জলের ছলছলানিতে পাথরের সিঁড়িরও ক্ষয় হয়—এঁদের মনে যে ক্ষয় ধরবে তার আর আশ্চর্য কি? এই দূরদৃষ্টিটাই নরেন ঠাকুরের ছিল না। ক্রমশ এমন বেধে উঠল যে আর পৃথক না হয়ে উপায় রইল না। বিশেষত এমনি বিষপ্রয়োগ অন্দর মহলেও সমানে চলছিল পাল্লা দিয়ে—সেখানের হলাহল আরও উগ্র।

তাছাড়া শুধু কর্তৃত্বই নয়—স্বার্থের প্রশ্নও উঠল বৈ কি! যতদিন কালো-বাজারের সুবিধা ছিল না তখন সংশয় ছিল দু-চার হাজারের হিসেব নিয়ে। এখন কালোবাজারের লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের হিসাব নিয়ে তিন ভাইয়ের মনেই অবিশ্বাস এবং সংশয় মাথা তুলে দাঁড়াল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন না।... শেষে পর পর কয়েকটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনার পর স্থির হ'ল তিন ভাই তাঁদের বিষয় এবং ব্যবসায় পৃথক্ ক'রে নেবেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীও যা কিছু প্রাপ্য (অবশ্য যতটা সম্ভব ফাঁকি দেবার পর যা প্রাপ্য ব'লে স্থির হয়) তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তবে সেটা নগদে—কারবারের ঝঞ্ঝাট আর থাকবে না।

এইবার নরেন ঠাকুর চোখে অন্ধকার দেখলেন। এতটার জন্য ঠিক তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ এবার যাকে হোক একজনকে বেছে নিতে হবে।

অন্তত মনিবরা তাই চান। তাঁরা সকলেই চান নরেন ঠাকুরকে, আর তা চান ব'লেই শত্রুর সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে রাজী নন। এবার নরেন ঠাকুরকে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে হবে—তিনজনের মধ্যে কার ওপর তাঁর টান বেশী।

আকাশ-পাতাল ভাবেন ঠাকুর। ভেবে কূলকিনারা পান না। ক্ষীণ চেষ্টা করেন ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবার কিন্তু সেটা আর সহজ হয় না। বহুদিনের মৃদু বিষ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, এখন সামান্য ঝাড়ফুঁকে সে বিষ নামানো সম্ভব নয়। প্রবল বন্যায় বালির বাঁধ দেবার মতোই তাঁর সে চেষ্টা নিজের কাছেই হাস্যাস্পদ বলে ঠেকে।

না, আর সম্ভব নয়। শুধু ভাইয়ে ভাইয়ে নয়—তাঁদের স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা-জামাতার মধ্যেও এই বিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে ; মুহূর্তে মুহূর্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে উঠছে—দাবানল জ্বলল ব'লে।

অতএব তিনটি কপিলা গাইয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে।

কাকে নেবেন ? বড়বাবুকে ?

বড়বাবুর হাত দরাজ কিন্তু মেজাজ কড়া। তা তিনি নিজেও স্বীকার করেন, বলেন, 'এক অক্ষরও বিদ্যে নেই পেটে—ভদ্র ভাষা বেরোবে কোথা দিয়ে ? ছেলেবেলা থেকে সমানে খেটেছি কুলীদের সঙ্গে। দু-মনি চালের বস্তা মাথায় করতে হয়েছে কতবার, করগেটের বাণ্ডিল মাথায় ক'রে গুদোমে তুলেছি। তৈরী আসনে তো পাছা দিতে আসি নি বাবুদের মতো—মিষ্টি কথা মিছরির ছুরি—ওসব আমার কাছে পাবে না। সাফ্‌ বলে দিচ্ছি বাবা।'

তাছাড়া বড়বাবুর ছেলেগুলি ভাল না। বড্ড বেশি দেমাকে। বড় ছেলে আবার সম্প্রতি নতুন কোন ব্যবসায়ে নামা যায় কিনা তাই দেখতে বিলেত আমেরিকা গিয়েছিল (দেখা তো ছাই—বাপের পয়সায় নবাবী করে এল ! ঠাকুর বলেন মনে মনে)—তার দেমাকে রতনবাবুর তো পা পড়েই না মাটিতে, অন্য ছেলেগুলোরও মিলিটারী মেজাজ। উহুঁ ! চলবে না। নরেন ঠাকুর আপন মনেই ঘাড় নাড়েন।

রাত্রিবেলা পথ চলতে চলতে ছাড়া এসব কথা ভাববার তাঁর ফুরসুত কই ?

সেজবাবু রাম কিপ্পন। হাত দিয়ে ছুঁচ গলে না। বড়বাবু যে সব (কল্পিত) দায়ে একশ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন সে সব দায়ে সেজবাবুর হাত দিয়ে

কুড়ি টাকার বেশি বেরোয় নি। বড়বাবু যদি চল্লিশ টাকার গায়ের কাপড় দেন তো সেজবাবু দেবেন চোদ্দ টাকার। অবিশ্যি কথাগুলো মিষ্টি বটে সেজবাবুর—ছেলেগুলোও ভাল, ভদ্র, অমায়িক—কিন্তু আখের দেখতে হবে তো।

বাকী থাকে মেজবাবু। মেজবাবুও একটু কৃপণ এবং বড় বেশী নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। যত প্রতিশ্রুতি দেন তার সিকিও বেরোয় না শেষ পর্যন্ত হাত দিয়ে। তাছাড়া মেজবাবুর ছেলেগুলিও বড্ড হুঁশিয়ার, এখনই সব শিখে নিতে চায় ব্যবসা। খোদার ওপর খোদ্‌কারী করার ইচ্ছা। একটু বোধহয় অহঙ্কারীও বেশী এরা—

কিন্তু তাহলে কি হয়—মেজমা মাটির মানুষ। যত গাঁজাখুরী আষাঢ়ে গল্পই নরেন ঠাকুর করুন না কেন, মেজমা ঠিক বিশ্বাস করেন এবং গোপনে ওঁকে টাকা বার ক'রে দেন। কতবার এমন হয়েছে বন্ধকী-এলেদেওয়া খুচখাচ সোনার জিনিসও বার ক'রে দিয়েছেন—ঠাকুরমশাই এই জিনিসটা বেচে নিও যা হয়। সেবার বড় মেয়ের বিয়ের সময় নরেন ঠাকুর যখন কেঁদে পড়লেন (কোন দরকার ছিল না—বলা বাহুল্য) মেজবাবু দিলেন একশ টাকা, বড়বাবু বরাভরণ সব গড়িয়ে দিলেন, সেজবাবু অতিকষ্টে চল্লিশটি টাকা বার করলেন—অথচ মেজমা গোপনে তিন ভরি সোনা বার করে দিলেন, তাতেই মেয়ের গলার হার হয়ে গেল। অন্য অন্য মেয়েরাও কিছু কিছু দিয়েছিল কিন্তু মেজমার মতো কেউ না। তারপর নমস্কারীর সব কখানা কাপড় নিজের আলমারী থেকেই বার ক'রে দিলেন। কতকাল থেকে এই সব নতুন শাড়ি জমে ছিল তা কেউ জানে না—আটখানা কাপড়ই মেজমা একা দিলেন।

সব ছেড়ে যদি কোন একটা গাছে নৌকো বাঁধতেই হয় তো সবচেয়ে বড় গাছ বেছে নিতে হবে।

মেজমাই নিঃসন্দেহে সেই বড় গাছ। ভগবান ওঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, আর চিরকাল এমনি নির্বোধ রাখুন—এমন কামধেনু আর হবে না।

নরেন ঠাকুর নির্জন হৃষিকেশ পার্কে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়েন। মন তিনি স্থির করেছেন। কিন্তু, তবুও—

এই কিন্তুটাই থেকে যায় মনের মধ্যে। অর্থাৎ একজনকে বেছে নিলেও বাকী দুজনকে কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

যতক্ষণ না পুলিসে উঠিয়ে দিলে ততক্ষণ পার্কে বসে রইলেন নরেন ঠাকুর, তারপর বাড়িতে এসে আহার সেরে হুঁকোটি হাতে ক'রে সদরের চলনে এসে বসলেন—এবং বসেই রইলেন। কলকাতা শহরের ভাড়াটে-বাড়ি, নিচের তলাটা তিনি সম্পূর্ণ নিয়ে থাকেন বটে কিন্তু সেটা তো দুখানা ঘরেই শেষ। ভেতরের দিকে উঠানের পাশে সরু সরু ফালি বারান্দা আছে বটে, তবে দোতলা ও তেতালার ভাড়াটেদের সমস্ত আবর্জনা নিচে এই উঠানটাতেই এসে পড়ে; বারান্দায় বসা অসম্ভব—দুর্গন্ধে মাথা ধরে ওঠে।

অতএব নরেন ঠাকুরের বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়ার প্রয়োজন হ'লে এই সঙ্কীর্ণ চলনের সঙ্কীর্ণতর (দশ ইঞ্চি) ইট বাঁধানো বেঞ্চিতে এসে আশ্রয় নিতে হয়। আজও এইখানেই এসে বসলেন নরেন ঠাকুর। কল্‌কে নিভে গেল শীগগিরই কিন্তু নরেন ঠাকুর উঠলেন না, হুঁকোটা নামিয়ে রাখার কথাও মনে রইল না। সেই ভাবেই বসে কাটিয়ে দিলেন সমস্ত রাত। একেবারে চমক ভাঙল যখন গিরি ঝি এসে ওঁকে দেখে চম্‌কে উঠে বললে, 'ওমা, ঠাকুর মশাই, আমি বলি কে। ভয় পেয়ে গিছ্‌নু।'

নরেন ঠাকুর উঠে কোন কথা না বলেই গামছা নিয়ে গঙ্গার দিকে হাঁটা দিলেন।

গৌতম ততক্ষণে বুদ্ধ হয়ে গেছেন। সারারাত্রি সেই চলন-রূপ বোধিদ্রুমের নিচে বসে তপস্যা তাঁর ব্যর্থ হয় নি।

বড়বাবু সবে পূজো সেরে দুধের কাপ মুখে তুলেছেন, নরেন ঠাকুর এসে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন।

'এসো ঠাকুর, কী ঠিক করলে?'

'মেজবাবুর লোহার দোকানই ভরসা করলুম।'

ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গিয়েছিল যে বড়বাবু কাপড়, মেজবাবু লোহা এবং সেজবাবু রামকৃষ্ণপুরের ডাল-মশলার আড়ৎ নেবেন। রেশনের ফলে চালের কারবার মন্দা পড়ায়, ওখানেই ওঁরা ডাল-মশলার গুদাম করেছিলেন। বড়বাবু ইতিমধ্যেই কাপড়ের কল এবং সেজবাবু চালের কল কিনে ফেলেছেন—একথাও শোনা যাচ্ছে, শুধু বাকী এঁদের কলকাতার আটাত্তরখানা ভাড়াটে

বাড়ি ভাগ করা—সেজন্য য়্যাটর্নীরা এরই নধ্যে পয়সা খেতে শুরু করেছেন।

নরেন ঠাকুরের কথাটা শুনেই বড়বাবুর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। কিন্তু নরেন ঠাকুর আজ নির্ভয়—তিনি প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

'ঐ তো বড়বাবু—এখনও নরেন ঠাকুরকে চিনলেন না। আপনিই আগে চোর বলে বসে রইলেন, তবে চুরি করতে যাচ্ছি কার জন্যে ?'

'কী রকম, কী রকম ? খুলে বলো বাপু—'

'আপনার যা কাজ তা আমি ক'রে দিয়ে যাবো রাত দশটা হোক এগারটা হোক—যখন হোক এসে। সে কাকে-বকেও টের পাবে না…তার জন্য আমার কিছু চাই না। আপনার নিমক বিস্তর খেয়েছি বড়বাবু—আপনার পয়সাতেই দেহটা টিকে আছে। আপনার অনিষ্ট কেউ না করে সেটা তো দেখতে হবে।'

'সে আবার কি ? সেই জন্যে মেজবাবুর চাকরী নিলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক সেই জন্যেই। ওধারে যে কি হচ্ছে তা তো খবর রাখেন না। আমি যদি না থাকি তো কে চোখ রাখবে মেজবাবুর ওপর ? আমিই তো আপনার চোখ বাবু, সব পরিষ্কার দেখতে পাবেন।'

'কি হচ্ছে, কি হচ্ছে, শুনি ?'

'আজ আর কিছু জিজ্ঞেসা করবেন না। যখন হাতে-কলমে মিলিয়ে দেব তখন এর উত্তর পাবেন। এখন আপনার কাজ বজায় ক'রে গেলেই তো হ'ল। আপনার প্রাইভেট হিসেব আর কাউকে দিয়ে হবে না, সে আমি জানি। আপনি নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোন।'

"সেথা হ'তে ফিরি চলে গেল ধিরি"—বধূ অমিতার ঘরে নয়—সেজবাবুর ঘরে।

সেজবাবু ভ্রূকুটি ক'রেই বসেছিলেন, 'কী খবর ঠাকুর ? সময় হ'ল আসবার ? বড়বাবু ছুটি দিলে ?'

নরেন ঠাকুর স্বভাবোচিত হাসি হেসে বললেন, 'ইরি মধ্যে কি ? দাঁড়ান আপনাকে আগে পথে বসাই! তবে তো! আমি তো মেজবাবুর চাকরি নিয়েছি।'

'তাই নাকি! বেশ, বেশ! ভালই তো।' সেজবাবুর মুখও থমথমে হয়ে

হয়ে উঠল।

'ঐ তো! দেখুন সেজবাবু, পয়সা আপনার কাছ থেকে বেশি খাই নি, এটা ঠিক—তার চেয়ে ঢের বেশি পয়সা বড়বাবুর মেজবাবুর খেয়েছি। কিন্তু মিষ্টি ব্যবহার তো আর কারুর কাছে পাই নি। মানুষ সব ভোলে। ভোলে না মিষ্ট আহার আর মিষ্ট বাক্য। কথাই থেকে যায় সেজবাবু, আর কিছু থাকে না। আপনি নিরীহ লোক—ওধারে বড়বাবু মেজবাবুর তো মুখে ঝগড়া কিন্তু আপনার সনব্বাশ করার সময় তো দুজনে এককাঠ্ঠা, তা জানেন কি?'

'সে আবার কি?'

'তবে আর বলছি কি? সেইজন্যেই তো মেজবাবুর চাকরি নিলুম। সব খবর নিতে পারব, ওদিকে চোখটা খোলা থাকবে। অথচ আপনার যা কাজ, প্রাইভেট খাতা সে আবার আমি ছাড়া কে করবে। যারই চাকরি করি না কেন—সে কাজ ঠিক তুলে দিয়ে যাব।'

'ধ্যুস! ওরা জানতে পারলে গুড় মাখিয়ে গা চাটবে তোমার!'

'সে কি কেউ টের পাবে ভেবেছেন? জনমানব কেউ জানতে পারবে না। সে আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন।'

মেজবাবুর ঘরে সর্বশেষ পৌঁছলেন ঠাকুর। টিকি থেকে প্রসাদী ফুল নিয়ে মেজমার হাতে দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'মাগো, তোমারই ভরসা!'

'কি ঠিক করলে ঠাকুর?' চশমার মধ্যে দিয়ে বাঁকা চেয়ে প্রশ্ন করেন মেজবাবু।

'মেজমাকে ছেড়ে কোথা যাবো বলুন। সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মা আমার! মা আমার অন্নপূর্ণা।'

'আমি বললুম!' মেজমা বলেন, 'নরেন আমায় আন্তিক (আন্তরিক?) ভালোবাসে!'

ভাগ্যহত

একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েছিল বলেই এ সম্ভাবনাটা মনে আসে নি তার। আর জ্ঞানশূন্য না হলে এ কাজ তো কেউ করে না। সেও করত না।

ছি ছি ছি !

ইস, তার যে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করছে। আর মরাই উচিত তার। এত মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, সন্ন্যাস রোগ হয় না তার ? এটুকু দয়াও কি ভাগ্যের কাছে পেতে পারে না ? এর পর সে আনন্দর কাছে মুখ দেখাবে কি ক'রে ? সে সম্মান—ইদানীং যে প্রীতি সে পাচ্ছিল, তার সমস্ত উৎস সে-ই তো বন্ধ ক'রে দিল। যেটুকু প্রশ্রয় ছিল তার এ বাড়িতে, ভবিষ্যতের আশ্রয়ও—তা এক নিমেষে ঘুচে গেল। অতঃপর শ্রদ্ধার বদলে পাবে ঘৃণা, অপরিসীম অপরিমাণ ঘৃণা। তার সঙ্গ সাহচর্য এখন থেকে নবসংক্রামিত কুষ্ঠ রোগীর বিষাক্ত সান্নিধ্যের মতোই ত্যাগ করবে ওরা। আর ঐ মেয়েটা—ঐ সেবন্তী—সে-ই বা কি মনে করল। অতঃপর যদি সে পারুলকে দেখে থুথু ফেলে—ওকে দেখিয়ে—খুব কি একটা দোষ দিতে পারবে পারুল ?

কিন্তু কেন, কেন, এই অবিচার মুখ বুজে সহ্য করতে হবে তাকে ? কেন যা কিছু মন্দ, যা কিছু নিষ্ফলতা, তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। কেন বিনা অপরাধে অপরাধের শাস্তি বইবে সে ?

কেন, কেন ?

সব নাকি বিধাতার বিধান, যা কিছু ঘটছে তার জীবনে—তার অদৃষ্ট, ভাগ্যলিপি, জন্মলগ্নের গ্রহ সন্নিবেশের ফল। সে বিধাতাটি কে, ওর ওপর তার এই অবিচারের কী অধিকার আছে ? কেন বসে বসে শুধুই সে কুগ্রহগুলি সাজিয়ে ছিল ওর জন্মক্ষণে ?

পৃথিবীতে সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে—শুধু সে-ই জ্বলবে দিন-রাত, সারাজীবন ? হ্যাঁ, দুঃখ আছে ; আরও অনেক দুঃখী আছে হয়ত সে ছাড়াও—কিন্তু এমন নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতা তার মতো কি কারও অদৃষ্টে ঘটছে ? মনে তো হয় না।

পৃথিবীতে একটি মাত্র জিনিস তাকে দিয়েছিলেন বিধাতা, কিছুটা রূপ। না নূরজাহান কি পদ্মিনী নয়, এমন কি দ্রৌপদীও নয়—লেখকরা যে সব রূপের বর্ণনা দেন তার মতোও নয়—তবু মোটামুটি সে ভাল দেখতে, দুর্বিনয় প্রকাশ না ক'রেও সে এটুকু বলতে পারে। প্রথম বয়সে বহু লোক সুন্দরী বলেছে তাকে, দাদার বন্ধুরা অনেক উচ্ছ্বাস করেছে।

ঐটুকুই মাত্র রজতরেখা তার সারা জীবনের ভরা-বর্ষা অমাবস্যার নিবিড় ঘন আঁধারে।

কিন্তু সে রূপের প্রতি পুরো সুবিচার করা সম্ভব হয় নি—তার মক্কেলহীন ভালমানুষ উকিল বাবার। কোনমতে সংসার চালাতেই প্রাণান্ত হত তাঁর—দেনা, নানা অছিলায় নানা স্থান থেকে মালে ও টাকায় ধার করাই ছিল তাঁর প্রধান জীবিকা। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত পাওনাদার ঠেকাবার শিক্ষা নিতে হয়েছে তাদের ভাইবোনদের—মিথ্যে কথা বলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ায়।

তবু তো সংসার ওদের বড় ছিল না—দুই ভাই এবং সে। মধ্য কলকাতার এক পুরনো এঁদো গলির মধ্যে দেড়শো কি দুশো বছরের পুরনো বাড়ির এক তলায় ভাড়া থাকত তারা। মাত্র ত্রিশ টাকা ভাড়ায়—তাও দিতে পারতেন না বাবা। মরবার আগে দশ বছরের ভাড়া বাকী ছিল। বাবা বড্ড ভালমানুষ ছিলেন বলেই বাড়িওয়ালা তাড়ান নি। তবে বার বার শাসাতেন—'বাড়ি ভেঙে নতুন ক'রে তৈরি করব যখন, তখন কিন্তু আতান্তরে পড়বেন। তখন তো যেতেই হবে। কর্পোরেশন তো কবেই ডেমোলিশ্যন অর্ডার দিয়েছে।'

তবু এত কষ্ট ক'রেও একটা কাজ করেছিলেন, লেখাপড়াটা শিখিয়েছিলেন ওদের। বেশী দূর নয়—পারুলের দাদা আর পারুল ম্যাট্রিক পাস করেছিল, ছোট ভাই শ্যামল স্কলারশিপ পেয়ে বি. এ. পড়েছিল—পাসও করেছে।

না, কর্তব্যে অবহেলা করেন নি পবিত্রবাবু। বড় ছেলে একটা চাকরিতে ঢোকামাত্র পারুলের বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। পাত্রও জুটেছিল ভাল—অন্ততঃ তাই শুনেছিলেন তিনি। এম. এ. পাস, ভাল সরকারী চাকরি করে, কলকাতায় নিজের বাড়ি। এর চেয়ে ভাল পাত্র আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে কী আশা ক'রে মেয়ের বাবা? বিশেষ যার বিত্তের অবস্থা নিম্নাতি-নিম্ন।

এই 'সম্বন্ধ' এনেছিলেন তাঁর পরিচিত আর একটি উকিল। প্রবীণ উকিল —এবং অন্ততঃ পবিত্রবাবুর চেয়ে তাঁর পসার বেশী। সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। মেয়ে দেখতে এসেছিলেন ছেলের মা ও মামা। মামা নাকি পুলিসে চাকরি করেন, সেকালের মতো কড়া কফ-ওলা শার্টের উপর কুঁচনো চাদর ঝুলিয়ে এসেছিলেন। বিরাট গোঁফ তাঁর—কথাবার্তা সমস্তই সম্ভ্রম-উদ্রেককারী।

দেখে সমীহর ভাব তো দেখা দিয়েই ছিল—একটু ভয় ভয়ও করেছিল পবিত্রবাবুর। অতঃপর আর ছেলে না দেখলেও চলত। কিন্তু তবু দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। মামা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ছেলে বড় লাজুক, পড়াশুনো নিয়েই থাকে এখনও বেশির ভাগ সময়। বিয়েতে ঘোর অনিচ্ছা। তাঁরা এক রকম জোর ক'রেই দিচ্ছেন—কাজেই রীতিমাফিক পাত্র দেখানো যাবে না। এঁরা যদি দূর থেকে কৌশল করে দেখে আসতে চান তো দেখতে পারেন।

তাতেই রাজী হয়েছিলেন পবিত্রবাবু। রাস্তা থেকে দেখেছিলেন—বুকে দু' হাত রেখে বারান্দায় পায়চারি করছে মাথা হেঁট ক'রে। হয়ত কিছু চিন্তা করছে। দূর থেকে দেখা হলেও ছেলে যে সুশ্রী সেটা বোঝা গিয়েছিল। খালি গায়ে বেড়াচ্ছে, গৌর বর্ণ টা দূর থেকেই চোখে পড়ে।

এরপর আর কি খবর নেবারই বা আছে—আপনারা হলেই বা এর বেশী কি নিতেন?

বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বরপক্ষে আশীর্বাদ করতে নেই—ঠিক হল বিবাহ-বাসরেই ওটা সারা হবে।

বিয়ে বেশ নির্বিঘ্নেই চুকে গেল—আর পাঁচটা বিয়ের মতোই। পবিত্রবাবু যথাসর্বস্ব পণ ক'রেই কতকটা বিয়ের খরচ করেছিলেন—সাধ্যের অতীত অর্থাৎ বিপুল দেনা ক'রে। আত্মীয়স্বজন, পরিচিত লোকদের কাছ থেকে বিশ পঞ্চাশ ক'রে ধার করেছেন। কবে কীভাবে শোধ হবে তা একবারও ভাবেন নি। হয়ত ধরেই নিয়েছিলেন যে, এ জীবনে এ ঋণের পরিশোধ সম্ভব নয়। সে জবাবদিহির অবসরও থাকবে না।

বিয়েটা জমলেও বাসর জমল না। শোনা গেল বরের সারাদিন অসহ্য মাথার যন্ত্রণা—ওকে একটু ঘুমোতে দিতে হবে। জোর ক'রেই বাসর থেকে সবাইকে বার ক'রে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলেন মামা। বরও পরের দিন সকাল পর্যন্ত নিঃসাড়ে ঘুমোল।

ভাগ্য বেশী দিন আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে নি।

পরের দিন গিয়ে দুধে-আলতায় দাঁড়াতেই তার বীভৎস চেহারার ওপরকার রেশমাবরণটা খসে পড়ল। দেখা গেল বর রীতিমতো পাগল—ওর মায়েরই ভাষায় 'উন্মাদ পাগল'।

প্রথমটা পারুল অত কিছু ভাবে নি। গরমে উপবাসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে —বিশেষ সারাদিন মাথার যন্ত্রণা ছিল—এই কথাই ভেবেছে, মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে। পরে বুঝল এবং শুনল, এ রোগ দীর্ঘকালের এবং চিকিৎসার জন্যও অনেক চেষ্টা করেছেন এঁরা। মানে ডাক্তার-বদ্যি টোটকা-টুটকিতে যতটা হয় —পাগলা গারদে দেওয়া যায় নি অর্থাভাবে—বিনা পয়সায় ঢোকাবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। শেষে এক আধুনিক ডাক্তার নাকি বলেছেন, অকালে যৌনতৃষা জেগেছিল, তা দমন করতে গিয়েই এই বিপত্তি। সে সময় বিয়ে হলে সেরে যেত।

এইটুকুই বলেছেন, এখন বিয়ে হলে সারবে কিনা তা বলেন নি। কিন্তু মা সেই আশ্বাসেই এত কাণ্ড করে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন—রাশি রাশি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। মামা বলে যাকে দাঁড় করিয়েছেন, সেও মামা নয়—এক পাকা জুয়াড়ি। একশো টাকা নিয়ে এই অভিভাবকত্ব বা অভিনয় করেছে।

আরও শুনল পারুল।

ছেলে একটাও পাস করে নি। ক্লাস টেন থেকেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল। হয়ত তখন থেকেই এই লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। বই সামনে নিয়ে গুম হয়ে বসে থাকত। সারারাতই বসে থাকত এক-একদিন। আবার কোন-দিন বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত—সাত-আট ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরত। এক ছেলে বলেই মা কিছু বলেন নি কোনদিন। তাঁর হাতে যৎসামান্য পুঁজি ছিল, তাইতেই ট্যাংরা অঞ্চলে সামান্য সওয়া কাঠা জমির ওপর এই তাসের ঘরের মতো বাড়ি করেছিলেন। নিচের দেড়খানা ঘড় ভাড়া, ওপরের দেড়খানা ঘরে ওঁরা থাকতেন।

এই পাত্র, এই তার অবস্থা।

বাবা নালিশ করতে পারতেন—কিন্তু এঁরা ছেলের লেখাপড়া ও আয় সম্বন্ধে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন, তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। তা ছাড়া—কীই বা করবেন, কতটা ক্ষতিপূরণ আদায় করবেন? উকিল ফী না লাগলেও মকদ্দমার বিবিধ বিচিত্র অকারণ খরচা আছে। সে টাকা কে দেবে? বিয়ের দেনা শোধ করতে শুধু নুন-ভাত খেতে হচ্ছে। তাও বড় ছেলের সামান্য আয় সে বাবার হাতে দেয় না বলে। তার বদলে চাল ডাল, বাজার, চা, চিনি কিনে

দেয়—তাই সেটুকুও জুটছে। যে উকিল সম্বন্ধ এনেছিলেন, তিনি উদাসীনভাবে বললেন, "তাই নাকি? সরি। আমি এত তো কিছুই জানতুম না। আমার এক মক্কেল বলেছিল তাই—" পরে শুনেছিলাম পবিত্রবাবু—তিনিও একশোটি টাকা গুণে নিয়েছিলেন ছেলের মার কাছ থেকে।

সুতরাং কিছুই করা যায় নি। কোন প্রতিকারই না।

ডিভোর্সটা ঘটানো যেত অনায়াসে—কিন্তু তার জন্যেও মামলা করা দরকার। সেখানেও সেই এক প্রশ্ন—টাকা? তা ছাড়া পবিত্রবাবুর মনটাও একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। জীবনটা তাঁর ব্যর্থ সব দিক দিয়েই। ভেবেছিলেন তাঁর দুর্ভাগ্য তাঁর সঙ্গেই শেষ হবে। ইহজীবনে এমন কোন অন্যায় করেন নি যাতে ছেলেমেয়ে পর্যন্ত তার ফল ভোগ করবে। বস্তুতঃ তাঁর নিষ্ফল বিনষ্ট জীবনে এই একটিই মাত্র আশ্বাস বা আশার আলো ছিল। পারুলের এই সর্বনাশে তিনি একেবারে শুয়ে পড়লেন। কোন প্রতিকারের চেষ্টা দূরে থাক—কিছু চিন্তা করারও সাধ্য রইল না।

পারুলও বাবাকে আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে চায় নি। যতদিন পেরেছে সহ্য করেছে—প্রাণপণেই সহ্য করেছে। পাগলের সঙ্গ ওএদের একান্ত দারিদ্র্য সয়েছে অনেক। প্রথম প্রথম শাশুড়ী জোর ক'রে তাকে ছেলের ঘরে পাঠিয়েছে—ছেলে সারবে এই আশায়। এমন কি, নানাজনের পরামর্শে চেষ্টা করেছে নানা কৌশলে তার যৌন প্রবৃত্তিকে উদ্রিক্ত করতে—কিন্তু কোন ফলই হয় নি তাতে। পাগল সে দিক দিয়েই যায় নি, বরং মারধোর করেছে। দোর বন্ধ ক'রে পাখা লাঠি যা পেয়েছে তাই দিয়ে মেরেছে। মা বাইরে থেকে ছটফট করেছে কিন্তু দোর খুলে বৌকে উদ্ধার করতে পারে নি। পারুলই ফাঁক পেলে খিল খুলে বেরিয়ে এসেছে। তাও জোর ক'রে হাত মুচড়ে টেনে এনেছে এক-একদিন। পাগলের ধারণা এ মেয়েটা তাকে খুন করতে এসেছে—তাই এ উগ্রমূর্তি।

তবুও মা হাল ছাড়ে নি। পাড়ার লোকরাই সব দেখে ও শুনে পবিত্রবাবুর ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে খবর দিয়েছে। মারের শব্দ শুনেছে তারা, কালশিটে ও কাটা দাগ চোখে দেখেছে।

তবু কিছু দিন ইতস্ততঃ করেছেন পবিত্রবাবু। কিন্তু যেদিন গলা টিপে খুন

করতে গেল পাগল, সেদিন সামনের বাড়ির লোক দেখে ও গোঙানি শুনে জানলায় পাথর ছুঁড়ে অন্যমনস্ক করে সেই সুযোগে ছুটে এসে দরজা ভেঙে ওকে উদ্ধার করেছিল। তারাই পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল বাপের বাড়ি।

তারপর কেটেছে দীর্ঘকাল।

পবিত্রবাবু ঐভাবে মেয়ে ফিরে আসার আঘাতটা সহ্য করতে পারেন নি বেশীদিন। তবু তখনও পারুল পথে বসে নি একেবারে। সংসারটা কোনমতে এক-পায়া-ভাঙা টেবিলের মতো নড়বড়ে হয়েও দাঁড়িয়ে ছিল। মা তখনও বেঁচে, দাদাও বোনকে একেবারে পথে বার ক'রে দিতে চায় নি। ছোট ভাই টিউশনী ক'রে কিছু কিছু আনছে—তাতেই এক মুঠো ভাত পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু সে আশ্রয় রইল না বেশীদিন। বাড়িটার একটা অংশ ধ্বসে পড়ল এক বর্ষারাতের ভোরে। এবার পুরসভা বাড়ি ভাঙবার হুকুম দিলেন। অর্থাৎ বাসা বদল ছাড়া উপায় নেই। ওর নতুন বৌদি এই সুযোগই খুঁজছিল বোধ-হয়—একখানা ঘর ভাড়া ক'রে তারা পৃথক সংসার পাতল। আর এক বাড়ির একখানা ঘরে ছোট ভাই মা ও দিদিকে নিয়ে এসে উঠল। এবারও ভগবান পথে-বসাটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। ছোট ভাই পাস করেছিল এর ভেতরই—একটা চাকরিও পেয়ে গেল। মাঝারি চাকরি, তবে তাতে দিন চলে যায়।

এমনি দীর্ঘকাল ধরে চলেছে ভাইয়ের সংসারে দাসীবৃত্তি। ছোট ভাইও বিয়ে করবে—এ তো স্বাভাবিক। আর যত দাসীগিরিই করুক—কোন বধূই একটা পোষ্য ননদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। মা যতদিন ছিলেন কোনমতে সহ্য করেছে। কেন না মাকে কোথায় ফেলে? বোনকে তাড়ালে তাঁকে দেখেই বা কে? মা গত হতে ছোট বৌ প্রায় সংহার-মূর্তি ধারণ করল। ভাই অনেক বোঝাল—বিনা মাইনের এমন একাধারে ঝি ও রাঁধুনী পাওয়া ভাগ্যের কথা। না থাকলে লোক রাখতে হবে, আর তা রেখেও এ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে না। কিন্তু বৌ কোন কথাই শুনতে রাজী নয়। অতিষ্ঠ করে তুলল ভাই বোন দুজনকেই। আসলে "বিম্ববতী মহিষীর সতীনের মেয়ে, ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে" সেই ভাব। ছোট বৌ এসেছিল কালো-

কোলো গোলগাল দেখতে, ভাল নয়। তার বাবা চাকরিতে অনেকখানি ঠেলে দিয়েছেন জামাইকে। সেই কৃতজ্ঞতারই বিয়ে। এদিকে সবাই বলে অতটা বয়স হয়েছে পারুলের, বত্রিশ-তেত্রিশ হয়ে গেল—তবু কি চেহারা! এইটেই সইতে পারে না ছোট বৌ।

একদিকে অসহায় ভাগ্যহত বোন, আর একদিকে এই অশান্তি। ছোট ভাই প্রায় দিশাহারা হয়ে ঘুরছে পাগলের মতো। ঠিক সেই চরম মুহূর্তে এই যোগাযোগ হয়ে গেল—এই বিয়ের ব্যবস্থা।

জগদীশবাবু এলেন ওর জীবনের রঙ্গমঞ্চে।

জগদীশবাবু অবস্থাপন্ন উকিল, পসার মাঝারি—মাসে মাত্র হাজার দুই-আড়াই টাকা আয়। কিন্তু তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণ অনেক। এই ট্যাংরা রাসমণিবাজার বেলেঘাটা অঞ্চলে খান সাত-আট বাড়ি। বিস্তর কোম্পানির কাগজ রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা। সেগুলো নষ্ট করার দরকার হয় নি।

জগদীশ পবিত্রবাবুর চেয়ে বয়সে ছোট হলেও পারুলের থেকে অনেক বড়। পারুলের তখন তেত্রিশ, তাঁর একান্ন। এমনি স্বাস্থ্য ভাল, শক্তসমর্থ—পঞ্চাশও দেখায় না।

জগদীশবাবুকে চিনত পারুল; এরা সবাই চিনত। উকিল হিসেবেই যাতায়াত ছিল। ইদানীং কিছু কিছু সাহায্যও নিতেন পবিত্রবাবু ওঁর কাছ থেকে, ধার বলেই নিতেন, কিন্তু দুজনেই জানতেন যে এ ধার শোধ হবে না কোনদিন। সবচেয়ে বড় কথা, পারুলের বিয়েতেও উনি এসেছেন, ভাল একখানা শাড়ি দিয়ে গেছেন। পবিত্রবাবু যেদিন মারা যান সেদিন তাঁকে দাহ করার অবস্থা ছিল না। উনি সব খরচ দিয়েছেন, শ্রাদ্ধ বাবদও মোটা সাহায্য করেছেন।

হঠাৎই একদিন জ্যোতুর মনে পড়ে গেল জগদীশবাবুর কথাটা। বছর-খানেক আগে বিপত্নীক হয়েছেন ভদ্রলোক, চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছেন। বড়টি ছেলে, তার বয়স বারো, ছোটটির তিন। পিসী, মাসী যে দু-একজন না জুটেছিল তা নয়, কিন্তু তারা পুকুর নয়—লেক চুরি করতে চায়। দেখে-শুনে সবাইকে তাড়িয়ে জগদীশবাবু ঝি-চাকরের ওপরেই ভরসা

করেছেন। তারা চুরি করলেও একেবারে অত করবে না, আর কাজটা অন্ততঃ ক'রে যাবে সেই সঙ্গে।

আরও শুনেছে জ্যোতু, জগদীশবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তাঁর সমবয়সী কোন বিধবা মহিলাকে তিনি বিয়ে করতে চান। নার্স হ'লেই ভাল হয়। বিয়ে করছেন ছেলেমেয়েদের জন্যেই। বক্স নম্বর দেওয়া বিজ্ঞাপন। তবু সে যে কার তা বুঝতে বাকী থাকে না।

জ্যোতু সোজা গিয়ে ওঁকে চেপে ধরল—'পারুলকে আপনি বিয়ে করুন। এমন ভাল মেয়ে পাবেন না। ভূতের মতো খাটতে পারে। আমার স্ত্রীর রূঢ় ব্যবহার সত্ত্বেও তার ছেলেমেয়ে দুটোকে যেভাবে যত্ন করে তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।'

পারুল!

স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ, সুন্দর কপাল, ঢেউ-খেলানো পিঠজোড়া চুলের রাশ, ঈষৎ টানা দুটি চোখের মায়া-মমতাভরা দৃষ্টি, দীর্ঘায়ত দেহ—পারুল বলতেই এই ছবি ভেসে ওঠে মনে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, বোধকরি এক আশাতীত প্রত্যাশায় ও কামনায়।

কিন্তু পরক্ষণেই কেমন যেন একটা ছায়া পড়ে কিছু-পূর্বের সে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'না না—পারুল এখনও—। আমার মতো বুড়োর সঙ্গে—না না, তুমি বরং অন্য ভাল পাত্র দেখ, আমি কিছু খরচ দিতে রাজী আছি।'

জ্যোতু ওঁর দুটো হাত চেপে ধরে বলে, 'দেখুন, ওর পাত্র জানাশুনো লোক ছাড়া পাওয়া যাবে না কোথাও। সে বিয়ের এখনও ডিভোর্সএর কিছু করা যায় নি। সে শুনেছি বদ্ধ পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত। আজ বছর তিন-চার কোন পাত্তা নেই। বেঁচে আছে কি মরেছে, কি অন্য কোথাও গেছে, কিছুই জানি না। আপনি বিধবা বলে ধরে নিয়ে বিয়ে করুন। এ ছাড়া আর একটিই মাত্র পথ খোলা আছে—লোকের বাড়ি ঝি বা কমবাইণ্ড হ্যাণ্ডের কাজ করা। সত্যি বলছি, কিছু খরচ যে আমি দিতে পারি না তা নয়, কিন্তু কোথায় কার কাছে রাখব? এখনকার দিনে একটা লোকের খরচাও তো কম নয়।

অতটা আমি চালাতেও পারব না। অথচ অবস্থা যা, আর দিনকতক আমার বাড়ি থাকলে ওকে সুইসাইড করতে হবে।'

এরপর জগদীশবাবুকে রাজী করানো অনেক সহজ হয়ে এল। মেয়েটিকে দেখছেন আশৈশব, মায়াও আছে একটা। তার দুর্গতির যদি অবসান হয় উনি সুখীই হবেন। পারুল প্রথমটায় একটু ক্ষীণ আপত্তি করেছিল। চিরদিন যাকে কাকাবাবু বলে এসেছে, সেই ভাবেই মান্য করেছে, তাকে বিয়ে? কিন্তু পরক্ষণেই জগদীশবাবুর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারাটা মনে পড়ে চুপ ক'রে গিয়েছিল। অমন স্বামীই কি আর কোথাও জুটবে? এ তো তবু মানুষটাকে জানে। সজ্জন লোক—সচ্ছল সংসার—এর চেয়ে ভাল আশ্রয় আর কোথায় পাবে? এ ছাড়া আর পথই বা কি!

এক আত্মহত্যা, না হয় তো বারনারীর জীবন বেছে নেওয়া। সেও তো একরকম আত্মহত্যাই। অন্য বিয়ের চেষ্টা কেই বা দেখবে? কেউ বোধহয় করবেও না এ অবস্থায়। তা ছাড়া, আগের চেহারার কাঠামোটা বজায় থাকলেও সে রূপ বা কান্তি কিছুই নেই। অবিরাম পরিশ্রম—বাসন মাজা থেকে রান্না—হাত-পা কর্কশ শ্রীহীন হয়ে গেছে, শিরা ফুলে উঠেছে। তাকে পছন্দ ক'রে কেউ এত ঝুঁকি নেবে তা সম্ভব নয়। আর নতুন কে আসবে, কী মূর্তি ধারণ করবে—তাই বা কে জানে? তার চেয়ে এ আশ্রয় শতগুণে ভাল।

মন স্থির করার পর ঐ জগদীশবাবুকে কেন্দ্র ক'রেই জীবনের স্বপ্ন-কল্পনা আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা নতুন রূপ নেবে এ স্বাভাবিক! সে স্বপ্ন ক্রমশঃ আবিষ্ট মোহগ্রস্ত ক'রে তুলবে—তাও। কিশোর কাল থেকেই মেয়েরা স্বপ্ন দেখে—স্বামী, পুত্র-কন্যা, সংসার। অন্ততঃ এ-দেশে দেখে, আজও দেখে। পারুলও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে দিনকয়েক না যেতে যেতে অধীর হয়ে উঠল সে। মনে হল মধ্যের এই ক'টা দিন পাঁজি থেকে উঠিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

বিয়ের পর অবশ্যই আদর-যত্নের ত্রুটি হল না। যে-সব দামী শাড়ি গয়না—মূল্যবান প্রসাধনের স্বপ্ন দেখতেও সাহস হয় নি কোনদিন—এখানে সে সব অযাচিত-ভাবেই রাশি রাশি এসে পড়ল, যেন বর্ষিত হতে লাগল ওর ওপর।

আসার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসল সে। কারণ ঝি-চাকরের সংসার—আত্মীয় কেউ ছিল না। ঝি-চাকরেরা তাকে হাত করতেই ব্যস্ত। বিরোধিতা করলে স্বার্থহানিরই ভয় বরং। ছেলেমেয়েগুলিও ভাল। প্রথম প্রথম দু-চার দিন দূরে দূরে থাকলেও তাদের বশ ক'রে নিতে দেরি হল না। নিঃসন্তান যুবতী মেয়ে—যে ভাইয়ের সংসারে ছেলেমেয়ে প্রতিপালন ক'রে এসেছে এতকাল—ছেলেমেয়েদের সেবা তার জীবনে প্রয়োজন। সেবাযত্নে তাদের আপনার করে নিলে।

প্রসন্ন হয়ে উঠলেন জগদীশবাবুও। নিশ্চিন্ত হলেন। এইখানেই তাঁর ভয় ছিল, ছেলেমেয়েদের কী চোখে দেখবে পারুল! এবার আর কোন চিন্তা রইল না। ফলে পারুলের সমাদর আরও বাড়ল। কী করলে সে সুখী হয়, তৃপ্ত হয়, সেইটেই জগদীশবাবুর ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল যেন।

এই পরিপূর্ণ, কল্পনাতীত স্বপ্নাতীত সুখের মধ্যেই—মন যখন ভবিষ্যতের স্বপ্নে উড়ে বেড়াচ্ছে, দূর দিগন্ত পর্যন্ত তার গতি, দিগন্তও ছাড়িয়ে যাচ্ছে বুঝি এতকালের যে আশঙ্কা, তার জীবনে কোন সুখ কোন শান্তি কোন কামনাপূরণ বিধাতা লেখেন নি—তাও ভুলতে বসেছে, সেই সময়ই বজ্রটি এসে পড়ল। বিনা আয়োজনে, বিনা আড়ম্বরে। নির্মেঘ আকাশ থেকে এসে পড়ল তা।

একদিন বিস্তর ভণিতা ক'রে বহু ক্ষমা প্রার্থনার পর জগদীশবাবু জানালেন যে সন্তান-প্রজনন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সে সম্ভাবনা তিনি স্বেচ্ছায় নিজে হ'তে নষ্ট করেছেন। তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় নাকি এই আশঙ্কাতেই সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন। মৃত্যু-যন্ত্রণার অধিক যন্ত্রণা—যে তাঁর মৃত্যুর পর জগদীশবাবু নিশ্চয় আবার বিয়ে করবেন এবং নূতন স্ত্রীর ছেলেমেয়েদের দিকে ঝুঁকে তাঁর ছেলেমেয়েদের জীবন ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রে দেবেন—তাদের দিকটা অবহেলা করবেন। তারা মানুষ হবে না, কষ্ট পাবে।

জগদীশবাবু সেদিন ভেবেছিলেন এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। আর বিয়ে তিনি আদৌ করবেন না। হেসেছিলেন সেদিন স্ত্রীর ব্যাপার দেখে। তারপর যেদিন বুঝলেন ছেলেমেয়েদের জন্যেই আবার বিয়ে করা দরকার, অপরিহার্য—নইলে সংসারটাই নষ্ট হয়ে যাবে, মেস-হোটেলের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে ছেলেমেয়েরা, সভ্যতা শালীনতা পারিবারিক আচার-

আচরণ কিছু শিখবে না—সেদিন স্ত্রীর কথাটাই প্রথম মনে পড়েছিল। তাই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে গিয়ে অস্ত্রোপচার করিয়ে এসেছেন, পাছে শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে না পারেন অথবা নববধূর মিনতিতে বিচলিত হয়ে পড়েন। আর সেই জন্যেই তিনি সমবয়সী মহিলা খুঁজেছিলেন, যার আর এ সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং অভাববোধও বুঝবে না!

আকৈশোর কেন, আজন্মই দুঃখ পেয়েছে পারুল। আকৈশোর মার খেয়েছে ভাগ্যের হাতে। এমন বোধহয় কেউ খায় না, খায় নি। সহ্য ক'রে ক'রে তাই বুক তার পাথর হয়ে গেছে, সেখানে কিছু বাজে না।

পাথরের মতোই বসে শুনল তাই—তার মৃত্যুদণ্ডের এই রায়। শুনেও পাথর হয়ে বসে রইল বহুক্ষণ। ঘরে মৃদু নীল আলো—তবু তাতেই দেখা যাচ্ছে লোকটা এই পাখার নীচেও গলগল ক'রে ঘামছে, লজ্জায় অনুশোচনায় কোন-মতে মাথা তুলতে পারছে না। কোন সান্ত্বনা দেবার কি গায়ে হাত দেবার সাহস নেই আর। মাথার সামনে চুল পাতলা হয়ে এসেছে। তবু তাতে পাক ধরে নি। কপালে দুটি একটি রেখা গভীর হয়ে ফুটে উঠলেও অন্য কোথাও কুঞ্চন দেখা দেয় নি, শিথিল হয় নি গায়ের চামড়া। এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন, সোজা বসে থাকেন। অর্থাৎ যৌবন না থাক, পুরুষত্ব পূর্ণমাত্রায় থাকার কথা। সুশ্রীও বটে। জীবন সম্ভোগের পূর্ণ আয়োজন সামনে। কেন একটা মিথ্যা, একটা তুচ্ছ আবেগের বশে এমন সর্বনাশ করতে গেল লোকটা। নিজেরও, তারও।···

অনেকক্ষণ, প্রায় দু' ঘণ্টা এমনি পাথরের মতো বসে থেকে তেমনি পাথরের মূর্তির মতোই নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। একটা নিঃশ্বাসও ফেলতে পারল না। সে যন্ত্রও যেন পাথর হয়ে গেছে।

শুধু একবার দেখল, অপরাধী তখনও তেমনি নতমস্তকে বসে—সেই একভাবে।

না, করার কিছুই নেই। কোন প্রতিকারই না। সেদিনও কিছু করা

যায় নি, আজও করা যাবে না। ভাগ্যের হাতে অকারণ ও অকরুণ আঘাত পাবার জন্যই তার জন্ম, অন্য রকম আশা করাই তার ধৃষ্টতা, স্পর্ধা।

আসলে আশ্রয়ের প্রশ্নটাই তো সবচেয়ে বড় এখন। ভাত, কাপড় আর মাথার ওপর নিরাপদ আচ্ছাদন একটা। যে অবস্থায় সে পৌঁছেছিল, এ বাড়িতে একটা রাঁধুনী বা ঝিয়ের চাকরি পেলেই তো তার কৃতার্থ হয়ে যাবার কথা। সে জায়গায় সে যে গৃহিণী হতে পেরেছে, রবার-ফেনার নরম বিছানার বিস্তীর্ণ খাটে শুতে পাচ্ছে, বাসন মাজতে হচ্ছে না, রান্না করতে হচ্ছে না, পাঁচটা দাসী-চাকর তার আজ্ঞাবহ, ফ্রীজ আছে, রেডিও আছে, পাখা চলছে দিনরাত—অর্থাৎ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ও সসম্মানে থাকতে পেয়েছে—এই তো যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী আশা করাই ভুল। সেই ভুলের জন্যেই বিধাতার হাতে অতবড় একটা চড় খেতে হল।

আজ এখান ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে কী পাবে সে? সন্তান, তরুণ স্বামী, দৈহিক সম্ভোগ—এর কোনটাই আর পাওয়া সম্ভব নয়। মাঝখান থেকে দাসীবৃত্তি করতে হবে দুটো ভাতের জন্য। সে দাসীবৃত্তিও সম্মানের সঙ্গে করা যাবে না হয়ত—জাত-ধর্ম বজায় রেখে। তার এত রূপ এখনও আর অবশিষ্ট নেই যে সুদর্শন উপার্জনক্ষম কোন সৎপাত্র ওর সব ইতিহাস ভুলে নিজে খরচ ক'রে তাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে। আবার এমনও কুরূপা কি বিগত-যৌবনা হয়ে পড়ে নি যে, নিরাপদে দাসীবৃত্তিও করতে পারবে। লাঞ্ছনার হয়ত কিছু বাকী থাকবে না। শেষ পর্যন্ত একদিন কুখ্যাত পাড়ায় খোলার ঘরের দরজায় মুখে খড়ি মেখে দাঁড়াতে হবে।

তার চেয়ে এই আরাম, এই স্বাচ্ছন্দ্য, এই সম্মানই থাক। এইটুকুই তার লাভ। লাভ কেন, উপরি পাওনা বলে ধরে নেবে।

জীবনে পোড় খেতে খেতেই এই বিশেষ হিসেবগুলো শেখে মানুষ। নিজের সত্যিকার প্রয়োজনের মূল্য, লাভ-লোকসান বিচার করতে শেখে। সেই হিসেব খতিয়ে দেখেই শান্ত হ'ল পারুল। জগদীশকে লোকদেখানো ভাবে সান্ত্বনা দিল না বটে, নিজের সহজ আচরণেই তাঁকে আশ্বস্ত করল।

আসল সান্ত্বনা পেল সে এই ছেলেমেয়েগুলোর কাছ থেকে। এরা

স্বভাবতই ভদ্র, একটু স্নেহের কাঙালও। ওদের মা দীর্ঘদিন ধরেই নানা রোগে ভুগেছিলেন। কোলের মেয়েটি প্রায়-মুমূর্ষু মায়ের দুধও পায় নি কোনদিন। সেই জন্যেই এত স্নেহ-বুভুক্ষু। তাই অল্প আয়াসেই ওর অনুগত হয়ে পড়ল। ভালও বাসল। পারুলের ভয় ছিল বড় ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে। তারা অনেকদিন মাকে পেয়েছে। কিন্তু তারা যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল। আসলে এত আদর-যত্ন, এমন অস্খলিত সেবা তারা নিজের মার কাছেও পায় নি।

এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে ওর জীবনযাত্রা সুখে ও নিরুদ্বেগে কেটে গেছে তরতরিয়ে। ওকে দস্তুরমতো ঈর্ষা করেছে উভয় পক্ষের পরিচিত ও আত্মীয়েরা, দাদা বৌদি নতুন ক'রে সম্পর্ক ঝালাতে চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে একটি সন্তান গছিয়ে দিতে। ওর নিজের কেন সন্তান হল না, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি।

এই ভাবেই কেটেছে দীর্ঘ আট-ন' বছর। বহু শারীরিক দুঃখে যা হয়নি, সুখে ও আলস্যে তাই হয়েছে। না, মোটা হয় নি, যেন বুড়ী হয়ে গেছে পারুল। মুখখানা রুক্ষ ও কঠিন, মুখভাব রূঢ় কর্কশ হয়ে গেছে। এখন আর জগদীশ-বাবুর পাশে বেমানান দেখায় না। বরং জগদীশবাবুকেই মনে হয় বয়সে ছোট। জগদীশবাবুব এই অক্ষয়িত যৌবনের জন্যেই পারুল বুড়ী হয়ে যাচ্ছে কি না কে জানে।

তা নিয়ে পারুল মাথা ঘামায় না।

সে আরও বেশী ক'রে সংসারকে জড়িয়ে ধরেছে বরং। বি. এ. পড়তে পড়তেই বড় মেয়ে দেবীর বিয়ে দিয়েছে। দিয়েছেও বিরাট ধনী ব্যবসাদারের ঘরে। ছেলে বাছবার সময় অবশ্য তার অর্থ বা শিক্ষার চেয়ে তার চেহারার দিকেই বেশী নজর দিয়েছে পারুল—মানে অনেক ভাল ছেলেও চেহারায় খামতির জন্যে নাকচ করেছে। জগদীশবাবু অনুযোগ করলে বলেছে, 'তা হোক, সম্পত্তি আমিই তাদের দিতে পারব। আমার অল্পবয়সী মেয়ে, আমি ফুটফুটে জামাই ছাড়া নেব না।' এ জামাই যে শিক্ষিত ও বিত্তশালী হয়েছে, সে নিতান্তই যোগাযোগ।

দেবীর বিয়ের পরই আনন্দর বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল পারুল।

জগদীশবাবু এই এক জায়গায় খুব কঠিন হয়ে ছিলেন বলেই পেরে ওঠে নি। রাজী হয় নি আনন্দও। কিন্তু এম.এ. পাস করে ল পড়তে শুরু করতেই পারুল চেপে ধরল জগদীশবাবুকে, 'এবার আমি কোন কথা শুনব না, ছেলের বিয়ে দেবই।' ছেলেকেও রাজী করাল সে। আনন্দর সঙ্গে ইতিমধ্যে ভারী মধুর একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পারুলের—শ্রদ্ধা ভালবাসা সখ্য সব মিলিয়ে। নতুন মা'র সঙ্গে তার কলেজের গল্প না করলে চলে না। কোন্ মেয়ে তাকে কি চিঠি দিয়েছে, কোন্ মেয়ে করিডরে তার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করার চেষ্টা করে—যে সব কথা সে কোন বন্ধুকেও বলে না, বলে নতুন মাকে। সুতরাং নতুন মার চোখে জল দেখে সে আর 'না' করতে পারল না। পারুল বলল, 'এই তো দেখছ আমার শরীর ভেঙে আসছে। সংসারটা কাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব বলো। ওঁরও তো প্রায় ষাটের কাছাকাছি হল, নাতি-নাতনী দেখতে তো সাধ যায়।...আর আমিই বা এই শূন্য পুরীতে কতকাল এমনভাবে কাটাব বল তো। তোমরা ইস্কুল-কলেজে বেরিয়ে যাও, উনি কাছারি ছাড়া কিছু জানেন না, বাড়ি ফিরলেও এক পাল মক্কেল মুহুরী আসে সঙ্গে। আমি যে একা থাকতে থাকতে পাগল হয়ে যাব।'

আর একটিও কথা বলে নি আনন্দ। কন্যাপক্ষ দেখতে এলে সুবোধ ছেলের মতোই সামনে এসে বসেছে। তবে সে নিজে মেয়ে দেখতে রাজী হয় নি। নতুন মাকে বলেছে, 'তুমি পছন্দ করলেই হবে। তুমি আমাকে একটা হাবা কালা ধরে দেবে?' বাইরে কোথাও কোন প্রণয়ের বন্ধন আছে কি না সে প্রশ্নও করেছিল পারুল। আনন্দ সবেগে ঘাড় নেড়েছে। বলেছে, 'প্রণয় আছে, বন্ধন নেই। যার সঙ্গে বাইরে প্রেম করা যায়, তাকে ঘরে আনব কি? ছিঃ!'

সেবন্তীকে জগদীশবাবুর পছন্দ হয় নি তত। শ্যামবর্ণ ঘেঁষা রঙ, মুখশ্রীও অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকার মতো নয়। দেহযষ্ঠী দীর্ঘায়ত, গঠনও সুডৌল—প্রশংসা করার মতো এইটুকু। জগদীশবাবু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন। বললেন, 'আমার অমন সুন্দর ছেলের পাশে এই বৌ? লোকে বলবে কি?' পারুল সে আপত্তি উড়িয়ে দিল। বলল, 'রূপ তো দু'দিনের। তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। ভদ্র বংশ, মেয়েটাও বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে—এই-ই ভাল।'

পারুলের কাছে অপরাধী জগদীশবাবু জোর করে আপত্তি করতে পারলেন

না। ছেলে যখন আমমোক্তারনামা দিয়েছে নতুন মাকে তখন তিনি আপত্তি করার কে? সেবন্তীর সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল আনন্দর।

এর পর সুখে ঘরকন্না করারই কথা। বৌ প্রায় মনের মতোই হয়েছে। (পুরো মনের মতো বৌ আর কবে কোন্ শাশুড়ির হয়?) জগদীশবাবুরও বধূর রূপ সম্বন্ধে যত বিরূপতাই থাক—ব্যবহারে খুশী, খুশী আনন্দও। কিন্তু অদৃষ্টে সুখ না থাকলে কে সুখী করতে পারে? বৌ আসার পর থেকেই এই ব্যাধিটা দেখা দিয়েছে পারুলের। এই ঈপ্সাটা।

কুৎসিত, অস্বাভাবিক, লজ্জাকর। তা পারুলও জানে। ভদ্র বংশের মেয়ে, এসে পড়েছেও ভদ্রলোকের কাছে। কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত তা বুঝতে অসুবিধা নেই। বয়সও হ'ল চল্লিশের কাছাকাছি।

কবে এই বাসনা অঙ্কুরিত হয়েছিল মনে, সে হিসেব নেই। প্রথম প্রথম অস্পষ্ট, একটা আব্‌ছা আকার নিত মাত্র, সে সম্বন্ধে অবহিত সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে উঠে চোখ বুজে যেন দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করত। মনে মনে বার বার উচ্চারণ করত—আমি এ ভাবি নি, ভাবি নি; এ মিথ্যা, ভেবেছি বলে ধারণাও করি নি। এমনি-এমনি এ একটা কি পাগলামি—

তারপর ক্রমশঃ সে ইচ্ছাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আর তাকে অবাস্তব বলে অস্বীকার করা যায় নি। আরও পরে দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। নেশার মতো পেয়ে বসেছে। প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ইচ্ছার মতো দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়েছে, ভাবনায় পর্যবসিত হয়েছে পর পর। সকল কাজের সকল কথার মধ্যে, আহারে, বিহারে, বিলাসে, ঐ চিন্তাটা আচ্ছন্ন অভিভূত ক'রে রেখেছে, মনটাকে বেঁধেছে নাগপাশের মতো সহস্র বন্ধনে—অজগরের পাকের মতো অব্যক্ত অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় চাপ দিয়েছে।

আর পারে নি নিজের সৎবুদ্ধি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে, বংশগত ঐতিহ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—সোজাসুজি আত্মসমর্পণ করেছে এই ঈপ্সা বা লালসার কাছে।

সে আনন্দদের দাম্পত্য জীবন প্রত্যক্ষ করবে। দেখে বা শুনে যতটা হয়

রসাস্বাদন করবে—প্রথম বিকাশোন্মুখ তারুণ্যের প্রণয়লীলার।

তেইশ চব্বিশ বছর বয়স আনন্দর, সেবন্তীর আঠারো। এই বয়সে সেও শ্বশুরঘর করতে গিছল—এই বয়সের পিপাসা ও শক্তি সে জানে। আনন্দ দেহে যুবক, মুখকান্তিতে ও মনে কিশোর। সুন্দর সুগঠিত দেহ, স্বভাব আবেগময়। যাকে কেশবিন্যাসে সুন্দর দেখায়, অবিন্যস্ততে অধিকতর আকর্ষক মনে হয়। যাকে স্বেদবিন্দুতে লোভনীয় লাগে, প্রসাধনে সুমোহন, তার দৃষ্টিতে সপ্রেমকামনা, হাসিতে পতঙ্গ-দাহক অগ্নির আকর্ষণ। দেহছন্দে নবযৌবন-সমুদ্রের উত্তালতা, হাসিতে সংগীত। সেবন্তীও, সুন্দরী নয় এটা ঠিকই, বোধকরি সুন্দরী হ'লে সমধিক মনোরমা হবে ছেলের, এই ভেবে ইচ্ছা ক'রেই শ্যামাঙ্গী মেয়ে এনেছিল সে—নবতারুণ্যের মাধুর্যে ঝলমল, মোহিনী। তার দেহছন্দে যেন রতির আত্মপ্রকাশ, তার কটাক্ষে মদনের পঞ্চশায়ক। কালো মেয়ে এমন অপরূপা হয় তা এর আগে দেখে নি পারুল, কখনও শোনে নি।

এই দুটি প্রায়-কিশোর-কিশোরীর মিলনলীলা চোখে দেখবে সে একবার। শুনবে এদের প্রণয়-কূজন। এ চাইই তার।

না, এ ছাড়া সে আর বাঁচবে না। আর তার জীবনে কোন সাধ নেই, স্বপ্ন নেই। অস্তিত্বও বুঝি নেই। জীবনের কোন অর্থই থাকবে না এ ইচ্ছা চরিতার্থ না হ'লে। যখন বুঝল তার এ অধঃপতন অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী—তখন বৃথা নিজেকে দমন করার চেষ্টা ছেড়ে দিল। এখন এই কাজটা কী ক'রে করবে একমনে শুধু এই পরিকল্পনাই করতে লাগল।

খাটের নিচে লুকিয়ে থাকা কি জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বড় স্থূল। ধরা পড়ার সম্ভাবনা পদে পদে। বাড়িতে এতগুলো ঝি-চাকর ছেলেমেয়ে—কে কখন উঠবে দেখবে তার ঠিক কি!

অনেক ভেবে একটা উপায় বের করল। আনন্দদের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের একটা দরজা আছে বারান্দার দিকে। কতকগুলো অব্যবহার্য ভাঙা কাঠ-কাঠরা পড়ে থাকে বলে সেদিকটা বড় কেউ আসে না। জমাদার ধুতে আসবার জন্যে এই দরজাটা। সে এসে ডাকলে কেউ ভেতর থেকে খুলে দেয়।

ছেলেদের ঘরের সঙ্গে বাথরুম নেই, কিন্তু এই বারান্দার দিকে একটা

দরজা আছে। ওরা দোর বন্ধ ক'রে শোয়। তেমনি পারুলের নিজের ঘর থেকে এ ঘরে আসবার দরজাটা খোলাই থাকে, যাতে কারও অসুখ-বিসুখ হলে বা কেউ ডাকলে অনায়াসে শোনা যায়।

এই পথই ধরল পারুল।

রাত্রে এক ফাঁকে গিয়ে ওরা যখন খেতে বসেছে—বাথরুমের বারান্দার দিকের দরজাটার ছিটকিনি খুলে রেখে এল। নিবাত ভাদ্রের রাত্রি, হাওয়ায় সে দরজা খুলে যাবে সে সম্ভাবনাও নেই। তা ছাড়া দরজাটা ভারী, সহজে খুলবে না। খোলবার সময় কব্‌জার আওয়াজ যাতে না হয় সে জন্যে সে বিকেলেই মেসিনের তেল দিয়ে রেখেছিল এক ফাঁকে। ওটা বন্ধই থাকে। তাই ছেলে-বৌ কেউ চেয়ে দেখবে সে সম্ভাবনাও নেই। দেখলেও অল্প আলোয় চোখে পড়বে না পার্থক্যটা।

জগদীশবাবুর ইদানীং ভাল ঘুম হয় না বলে ওষুধ খান। গাঢ় নিদ্রা। সেদিকে কোন ভয় নেই। ছেলেদের ঘুম তো গভীর হবেই। এ ঘর থেকে বেরিয়ে ও ঘরের দোর খুলে বারান্দায় পড়া—এর মধ্যে কোন অসুবিধাও নেই, আশঙ্কাও না। তারপর নিঃশব্দে ঐ বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়া এক মিনিটের ব্যাপার। বাথরুমের দরজা ভেজানোই থাকে। ওটা বন্ধ করার কথা কারও মনে পড়ে না। এদের ঘরে শূন্য বাতির আলো জ্বলে, চোখ সয়ে গেলে সেইটুকুই যথেষ্ট।...

সবই ঠিক ঠিক হিসেব করেছিল পারুল—নিজের সহ্যশক্তির হিসেবটা ধরে নি। প্রয়োজন বোঝে নি। সেই সামান্য অবহেলাতেই এত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল।

যেটা মধুর ভেবেছিল, আসলে সেটা যন্ত্রণাদায়ক। সে যে এত যন্ত্রণা, এত মর্মভেদী, বুক ফেটে যাওয়ার মতো—তা কল্পনাও করে নি। শেষে যখন মাথাতেও অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হ'ল তখন আর থাকতে পারল না। অন্ধের মতো, গুলি-খাওয়া জন্তুর মতো হাতড়ে হাতড়ে পা টেনে টেনে ফিরল। বোধহয় কোন কারণে সেদিন পাম্পে জল ওঠে নি, বাথরুমের কলে জল ছিল না। কেউ একটা বড় বালতি ক'রে জল রেখে গিয়েছিল। আসার সময় সেটা লক্ষ্য ক'রে বাঁচিয়ে এসেছিল। যাবার সময় দেখতে পায় নি, খেয়ালও ছিল না। অন্ধকারে

এসে পড়ল তার ওপর। সেও পড়ল, বালতিটাও। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রিতে সে শব্দ ভয়াবহ বোধ হ'ল। বাড়িসুদ্ধ উঠে পড়বে, তার আর আশ্চর্য কি!

পারুলের পায়ে চোট লেগেছে, কোমরেও সম্ভবতঃ। তবু তার মধ্যেই কোনমতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এর ভেতরেই আনন্দ এক লাফে উঠে দরজা খুলে ভেতরে এসে আলো জ্বেলেছে। চাকর মণি ওপরেই শোয়। সে 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এসেছে। ছেলেমেয়ে, জগদীশবাবু—সবাই আসছেন। দু'দিকের পথেই লোক।

বলা চলত বৈকি। মাথার ঠিক থাকলে বলা চলত যে কী একটা আওয়াজ পেয়ে চোর ভেবেই এসেছিল। আরও কৈফিয়ৎই ভেবে নিতে পারত। কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে কিছু মনে পড়ল না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অপরাধীর মতো মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে এসে নিজের বিছানায় আছড়ে পড়ল। তখন তার কাঁদবারও শক্তি নেই আর, বাইরের বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করারও না।

ভ্রষ্টলগ্ন

আহারের পর রান্নাঘরের কাজ সারিয়া বিমলা যখন উপরে উঠিয়া আসিল, তখন তিনটা বাজিবার আর বিশেষ বিলম্ব নাই। খুকীর দুধের বাটিটা তাকের উপর ঢাকা দিয়া রাখিতে রাখিতে ঘড়িটার দিকে চাহিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। এখনই আবার অপরাহ্ণের আয়োজন শুরু করিতে হইবে, আবার সেই উনানে আঁচ দেওয়া, আবার সেই রান্না—সেই সব! এখন হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত।

প্রত্যহই তাহার এই রকম বেলা হয়। সকালে স্বামীর অফিস এবং বড় ছেলেটার ইস্কুলের মতো তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়, তাহার পর আর একপ্রস্থ রান্না, ছেলেমেয়েদের নাওয়ানো, খাওয়ানো, বৈকালের জল-খাবার প্রস্তুত এবং আরও অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজ সারিতে সারিতে একটা বাজিয়া যায়। ঠিকা ঝি আছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য রান্নাঘর সারিয়া বাসনগুলি কলঘরে নামাইয়া বাটনার মসলাগুলি পর্যন্ত শিলের পাশে

সাজাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে সে আসিয়া মার্-মার্ শব্দ করিবে, হয়ত বা একটা কাজ বাকী রাখিয়াই চলিয়া যাইবে। সুতরাং আহার এবং তার পরের পর্বটা সারিতে সারিতে ঘড়ির কাঁটা রোজই আড়াইটার ঘর পার হইয়া যায়।

বিমলা একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কোমরের ব্যথাটা কিছু কমাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে পূবের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পাশের বাড়ির একতলার বৌটি তখন প্রসাধন করিতে বসিয়াছে; প্রত্যহ এমনি সময়েই সে প্রসাধন করিতে বসে। স্নো, ক্রীম, পাউডার, আলতার শিশি, সিঁদুরের কৌটা, রুজ, লিপ্‌স্টিক প্রভৃতি প্রসাধনের নানা সরঞ্জাম চারিদিকে ছড়ানো, তাহারই মধ্যে বসিয়া একটি ছোট আয়নার সামনে বৌটি দ্রুত হস্তে মাথা বাঁধিতেছে। তাহার প্রসাধনের সময় প্রায়ই বিমলা পাঁচ-দশ মিনিট করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিত, কিন্তু সেদিন তাহার ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সে একটু বিস্মিত হইল।

বৌটির নাম লিলি, তাহার স্বামীর নাম হিরণ; কোনদিন চাক্ষুষ আলাপ না হইলেও, তাহাদের সম্বন্ধে বহু তথ্যই বিমলার জানা ছিল। সে জানালার ফাঁক দিয়া আর একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। লিলি মাথা বাঁধা শেষ করিয়া, অন্যান্য ব্যাপারও যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া একখানা সিল্কের শাড়ি পরিল। তাহার পর বিছানায় বসিয়া অসহিষ্ণুভাবে পা দোলাইতে লাগিল। একটু পরেই ঘরে ঢুকিল হিরণ। লিলি লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, 'ইস—একেবারে তিনটে বাজিয়ে এলে, কখন পৌছব বলো দেখি?'

হিরণ দেওয়ালের আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলটা ঠিক করিতে করিতে বলিল, 'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো দেখি—। শালারা কি ছুটি দিতে চায়? দুটি ঘণ্টা আগে বেরোব তার জন্মে কত কাণ্ড!'

লিলি হাসিয়া কহিল, 'বললে না কেন, বৌকে নিয়ে তিনটের শো'তে বায়স্কোপ দেখতে যাব।'

হিরণ জবাব দিল, 'সাহেবরা হ'লে হয়ত ছুটিই দিত, কিন্তু বড়বাবু জানতে পারলে একেবারে বরখাস্ত করত!'

তাহার পর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লিলির দিকে চাহিয়া কহিল, 'আরে, এ করেছ কী? বায়স্কোপ গেলে সবাই তো দেখছি তোমার দিকেই চেয়ে থাকবে!

বায়স্কোপ দেখা আর বেচারাদের অদৃষ্টে ঘটবে না।'

আনন্দে ও লজ্জায় লিলির মুখ লাল হইয়া উঠিল। একবার নিজের সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া লইয়া ঈষৎ লজ্জিত মুখে কহিল, 'সত্যি বলছ, ভাল দেখাচ্ছে?'

হিরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, 'মাইরি বলছি! যেন প্রতিমার মতো দেখাচ্ছে।'

আনন্দ ও সংশয়ের মধ্যে দোল খাইতে খাইতে 'যাও, মিছে কথা' বলিয়া লিলি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইবার পরও বহুক্ষণ বিমলা জানালার গরাদেটা ধরিয়া ঠিক তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইল। এই আয়না-বসানো আলমারীটা তাহার বিবাহের, ছেলেদের অসংখ্য অত্যাচারে তাহা মলিন হইয়া উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়াও গিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহাতে দেখা যায়।

মাথার চুল পাতলা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর চার-পাঁচ দিন তাহাতে চিরুনি পড়ে নাই; মুখের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আগুনের আঁচে ও দারিদ্র্যে যেন পুড়িয়া গিয়াছে; পরনের কাপড়খানিতে হাত দিলেই বোধ হয় ময়লা উঠিয়া আসে, এমনি তাহার অবস্থা, তাহার উপর অসংখ্য হলুদ ও কালির দাগ। নিজের চেহারার দিকে চাহিয়া বিমলা অকস্মাৎ নিজেই শিহরিয়া উঠিল; এই তাহার অবস্থা? অথচ একদিন সে সত্যই লিলির চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী ছিল। মনে আছে তাহার শাশুড়ী দুধে-আলতায় বরণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 'যেমনটি চেয়েছিলাম আমার সুরেশ তেমনিটিই ঘরে এনেছে, আশীর্ব্বাদ করো দিদি; যেন সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকে।' আর স্বামী ফুলশয্যার রাত্রে কানের কাছে গদগদ কণ্ঠে চুপিচুপি বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি আঁকতে পারতুম তো তোমার একখানা ছবি এঁকে কোন রাজামহারাজাকে তিন-চার হাজার টাকায় বেচে দিতুম!'

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। আজ কোথায় বা তাহার সে শাশুড়ী, আর কোথায় বা তাহার রূপমুগ্ধ স্বামী! অসংখ্য অভাব-অনটনের মধ্যে এই চার-পাঁচটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করিতে করিতে, তাহাদের সহিত দিনরাত চেঁচামেচি

বকাবকি করিতে করিতে কখন যে দিনরাত কাটিয়া যায় তাহার হিসাবও থাকে না। সুরেশ অফিস হইতে বাড়ি ফেরে সন্ধ্যার অনেকখানি পরে, তাহার পর একটু ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা দেখিয়া খাইয়া শুইয়া পড়ে। সকালেও দোকান, বাজার এবং ডাক্তারখানায় তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না; এমন বহুদিন যায় যেদিন বিমলা ও সুরেশের মধ্যে কোন কথাবার্তাই হয় না।...পুরুষের চোখে ভাল লাগার মূল্য যে কি, বিমলা তাহা বহুদিন ভুলিয়া গিয়াছে!

বিমলা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিদ্রিত পুত্র-কন্যার কাছে আসিয়া বসিল। ঘড়ির কাঁটা দ্রুত সরিয়া যাইতেছে, এখনই নিচে যাওয়া প্রয়োজন; কিন্তু বিমলা কিছুতেই তখন কাজে মন দিতে পারিল না। এইমাত্র দেখা প্রণয়নাট্যের স্মৃতি আজ তাহাকে উন্মনা করিয়া দিয়াছে।

একেবারে চমক ভাঙিল ঝিয়ের ডাকে। বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলমারীটা খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর কতকগুলি পাট করা কাপড়ের ভাঁজের মধ্য হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া নিচে নামিয়া আসিল। এ টাকা দুইটি বহুদিন হইতে কৃপণের ধনের মতো সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কোনদিন আকস্মিক বিপদের আশঙ্কায়। কিন্তু দরজা খুলিয়া সে টাকা দুইটি ঝিয়ের হাতে দিয়া কহিল, 'সন্তুর মা, একটা উপকার করতে পারিস?...ছুটে গিয়ে ঐ মোড়ের দোকান থেকে এক শিশি হেজলিন আর এক প্যাকেট পাউডার এনে দিতে পারবি?...হেজলিন, মনে থাকবে তো?'

কাজ করিয়া বিদায় লইবার সময়ে সন্তুর মাকে বিমলা আর এক দফা ডাকিল, কহিল, 'সন্তুর মা, সন্ধ্যের পর তো তোর কোন কাজ থাকে না, আজ যদি এসে একবার ছেলেমেয়েগুলোকে একটু ঘুম পাড়াস তো বড় ভাল হয়। আমার শরীরটা আজ বড্ডই খারাপ। আমি বরং তোকে দু-আনা পয়সা দেব জল খেতে—'

সন্তুর মা সম্মত হইল।

বিমলা তখন বিকালের রান্না চাপাইয়া দিল। কোনমতে একটা ঝোল-ভাত ও খুকীর সাগু, এ ছাড়া সেদিন আর সে কোন ঝঞ্ঝাট করিবে না। বড় ছেলেটাকে বলিল, আজ আর তোর বই নিয়ে বসতে হবে না, তাড়াতাড়ি খেয়ে

শুয়ে পড়্—তোর শরীরটা ভাল ঠেকছে না।'...

বলা বাহুল্য, সে বাঁচিয়াই গেল।

তাহার পর ছেলেমেয়েগুলির ভোজনপর্ব যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সারিয়া লইয়া সন্তুর মার হাতে তাহাদের ছাড়িয়া দিল। নিজেদের ভাত-তরকারী ঢাকা দিয়া রাখিয়া, রান্নাঘরের অপর কাজগুলি কোনমতে সারিয়া ছোট আয়নাখানি লইয়া বহুদিন পরে মাথা বাঁধিতে বসিল। কয়েক মাস আগে তাহার স্বামী মাথাধরার জন্য এক শিশি সুবাসিত তৈল আনিয়া দিয়াছিলেন, সেই শিশিটা সে তুলিয়া রাখিয়াছিল দেরাজের মধ্যে, আজ এতকাল পরে সেটা বাহির করিয়া রুক্ষ চুলকে আয়ত্ত করিয়া লইল। ইহার পরে অত রাত্রে কলতলায় গেল গা ধুইতে।

প্রসাধন শেষ করিয়া শান্তিপুরের একখানা দামী শাড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া বিমলা যখন দাওয়ায় আসিয়া বসিল তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। এইবার সুরেশের আসিবার সময় হইয়াছে। বিমলা কল্পনায় দেখিতে লাগিল সুরেশ তাহার দিকে চাহিয়া প্রথমটা কিরূপ চমকিয়া উঠিবে। তাহার পর নিশ্চয় আজিকার সজ্জা দেখিয়া দুই-একটা রসিকতাও করিবে, বিমলা তখন তাহাকে নিজের মতলবটা খুলিয়া বলিবে। ছেলেমেয়েরা সন্তুর-মার কাছে আছে এবং ঘুমাইয়াই পড়িয়াছে যখন, তখন আরও ঘণ্টাতিনেক তাহার কাছে অনায়াসে থাকিতে পারিবে; তাহারা আজ সাড়ে নটার শোতে বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে। যে কোনও ছবি হউক—আজ আর বিমলা কোন কথা শুনিবে না, সুরেশকে লইয়া যাইবেই!...বহুদিন পরে সেই প্রথম যৌবনের মতো পাশাপাশি বসিয়া বায়স্কোপ দেখিবে।

কিন্তু রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, সুরেশের দেখা নাই। সাড়ে নয়টা! বায়স্কোপ দেখার আর আশা রহিল না, কিন্তু তবুও সে সন্তুর মাকে বাড়ি যাইতে দিল না, অন্তত একটা খোলা ফিটনে করিয়া তাহারা খানিকটা হাওয়া খাইয়া আসিতেও তো পারিবে! তাহার দারিদ্র্য, তাহার সংসার, তাহার ছেলেমেয়ে, এই সব ভুলিয়া এই সমস্ত হইতে দূরে অন্তত কিছুকালের জন্যও স্বামীকে সে পাইতে চায়।

কিন্তু রাত্রি দশটা যখন বাজিয়া গেল তখন অগত্যা সন্তুর মাকে ছাড়িয়া

দিতে হইল। বিমলা তবু নিচের তলার দাওয়ায় তেমনিই বসিয়া রহিল। অবশেষে এগারোটার সময় সুরেশ ফিরিল।

সে সদরের কাছ হইতেই বকিতে বকিতে ঢুকিল, 'শালারা একেবারে জানে মেরে দিয়েছে! উঃ—মাথা যে ধরেছে, ঘুমোলেও ছাড়বে কি না সন্দেহ!'

বিমলা শুধু কহিল, 'এত দেরি যে আজ?'

সুরেশ জামাটা খুলিতে খুলিতে জবাব দিল, 'সাহেবের কি এক স্টেটমেণ্ট না গুষ্টীর পিণ্ডি মাথা তৈরী হচ্ছিল, তিনিও বসে রইলেন, আমাদেরও বসিয়ে রাখলেন।...উঃ—পেট যেন জ্বলে যাচ্ছে, তেমনি মাথাও ধরেছে।...তাড়াতাড়ি ভাতটা বাড়ো দেখি, কোনমতে দুটো মুখে গুঁজে শুয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচি।'

বিমলা ভাত বাড়িয়া দিয়া একটা পাখা হাতে ভাতের কাছে আসিয়া বসিল। সুরেশ তখন ঘাড় গুঁজিয়া খাইয়া চলিয়াছে। আর অনর্গল বকিতেছে, 'কি ঘেন্না যে হয় এক-এক সময়ে, তা আর কি বলবো! ইচ্ছে হয়, যা আছে অদৃষ্টে হোক্—চাকরী ছেড়ে চলে আসি। শালারা কি আর মানুষ মনে করে আমাদের?'...ইত্যাদি।

আঁচাইবার পর পান লইবার সময় সুরেশের নজর পড়িল পাটভাঙা শাড়িটার উপর, প্রশ্ন করিল, 'তোমার আটপৌরে কাপড় কি আর নেই?'

বিমলা জবাব দিল, 'আছে। কেন?'

সুরেশ কহিল, 'হঠাৎ দিশী কাপড় পরেছ, তাই জিজ্ঞেস করছি—'

তাহার পর আর কোন কথা না কহিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল। বিমলা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আর একবার আয়নাটি হাতে করিয়া আলোর নিচে আসিয়া দাঁড়াইল। দুপুরে সে লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু সত্যই তাহার আর যৌবন নাই! চক্ষু কোটরগত হইয়া গিয়াছে, চোয়ালের হাড় দুইটি ঠেলিয়া উঠিয়াছে, বিরল কেশে পাতা কাটিতে গিয়া মাথার মাঝখানে খানিকটা টাকের মতোও বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হেজলিন ও পাউডার তাহার মুখের মেচেতার দাগ ঢাকিতে পারে নাই।...নাঃ, যৌবন চলিয়াই গিয়াছে!

পাশের বাড়ি হইতে তখন লিলি আর হিরণের কলহাস্যের শব্দ ভাসিয়া

আসিতেছে, রোজই তাহারা বহু রাত্রি পর্যন্ত এমনি জাগিয়া গল্প করে। বোধহয় এক সময়ে সে নিজেও করিত, সে আর সুরেশ। কিন্তু সে বহুদিন, বহু যুগ আগেকার কথা।...

আয়নাটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বিমলা তাকের উপর হইতে হেজলিন ও পাউডারের প্যাকেটটা লইয়া জানালা গলাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তাহার পর রান্নাঘরের বাতিটা নিভাইয়া দিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া গেল।

অনুশোচনা

মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে বিদুরের মৃত্যুকাহিনী বিবৃত করা হয়েছে। সে মৃত্যু বড় অদ্ভুত। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী—এঁরা বনগমন করার কিছু দিন পরে পাণ্ডবরা তাঁদের দেখতে বনে যান। সেখানে বিদুরের খোঁজ করতে গিয়ে শোনেন যে, তিনি বায়ুভূক হয়ে কোথায় যেন তপস্যা করছেন, বনের নির্জন-ভাগে কদাচ কখনও তাঁকে দেখা যায়। সেই সময়ই দৈবক্রমে বিদুর সেদিকে আসছিলেন,—যুধিষ্ঠিরকে দেখা মাত্র আবার বিপরীত দিকে ফিরে গহন অরণ্যে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করলেন। বিদুরকে দেখে চেনা যায় না। অনাহারে তাঁর শীর্ণদেহ, তাঁর মাথায় জটা, মুখে এক টুকরো কাঠ—'বীটা' বলে একে—আহার ও বাক্য বর্জনের চিহ্ন, তাঁর দেহ মললিপ্ত ও বনধূলিধূসরিত।

যুধিষ্ঠির তাঁকে পালাতে দিলেন না—তাঁর পিছু পিছু 'ভো ভো ক্ষত্তা বিদুর, আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির, আপনাকে দেখতে এসেছি' বলতে বলতে ছুটলেন। তখন কতকটা নিরুপায় হয়েই—বিদুর একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অনিমেষ লোচনে যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে রইলেন, সেই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটল।

এই পর্যন্ত মহাভারতে আছে। কেন যুধিষ্ঠিরকে দেখে তিনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন, কেনই বা তাঁর এই কঠোর তপস্যা বা তপস্যার নামে আত্মনিগ্রহ—আর একদৃষ্টে যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে চেয়ে তিনি কী-ই বা বোঝাতে চেয়েছিলেন, নিয়ম ক'রে 'বীটা' মুখ দিয়ে বাক্যবর্জন করার জন্য মুখে বলতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত, আর কেনই বা ঐ অবস্থায় তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল—সে কথা

মহাভারতে লেখা নেই।

তাঁর এই বিচিত্র আচরণের কারণটা তাই কেউ জানল না। জানতে পারেও নি কোন দিন।

হয়ত ব্যাসদেবও জানতেন না, তাই লেখেন নি। অথবা নিজ ঔরসজাত পুত্রের লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করতে চান নি, শেষ মুহূর্তে করুণা হয়েছিল তাঁর। অসংখ্য মানুষের—মহাভারত কাব্যের অসংখ্য চরিত্রের—সমস্ত কদর্য নগ্নতা প্রকাশ করলেও, বিনত, ধর্মপ্রাণ, সদাচারী এই সন্তানটির মনের গোপন এই কালিমা প্রাণ ধরে প্রকাশ করতে পারেন নি।

হয়ত কিছু সহানুভূতিও ছিল তাঁর এই দাসীগর্ভসম্ভূত সন্তানটির মানসিকতা সম্বন্ধে, হয়ত তার ঈর্ষাকে তিনি দুর্বলতা মাত্র মনে করতেন, কলুষ বলে ভাবতেন না। কে জানে!

কিন্তু বিদুর ক্ষমা করেন নি নিজেকে। যিনি সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার বলে বিদিত, সেই পরম ধার্মিক সত্যনিষ্ঠ বিদুর তাঁর মনের গোপন দুর্বলতাকে পাপ বলেই মনে করেছিলেন—সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন শেষ জীবনে—আশ্রমবাসের সময়ে।

অদৃষ্টের এই পরিহাসে হাসি পেয়েছে বৈকি, ক্ষত্তা বিদুরের। অতি করুণ, অতি অসহায় হয়ত—তবু হাসিই সেটা।

স্বয়ং ধর্মের অধর্মাচরণ।

এ কী অসম্ভব ব্যাপার!

সেই জন্যেই হেসেছিলেন বিদুর।

তাঁর জন্মের মূলেই যে এই অসঙ্গতি। অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল বলেই তো তাঁর জন্ম।

স্বয়ং ধর্ম অন্যায় করেছিলেন, লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়েছিলেন মাণ্ডব্যকে। শিশুর অবোধ কৌতূহলকে পাপ বলে গণ্য ক'রে আমরণ তার ফল ভোগ করতে বাধ্য করেছিলেন তাপসশ্রেষ্ঠ মাণ্ডব্যকে—সেই অবিচার তথা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতেই ধর্মকে মনুষ্য জন্ম নিতে হয়েছে, তাও কোন উচ্চকুলে নয়, বিবাহ বন্ধনের ফলস্বরূপে নয়—নিতান্তই দাসীর গর্ভে, জারজ পুত্র হিসেবে।

বরং জারজের থেকেও হীন যদি কিছু থাকে—তাই।

এক নারী ভয়ঙ্কর-দর্শন পুরুষের আলিঙ্গন থেকে রক্ষা পেতে ক্রীতদাসীকে পাঠিয়েছে সে পুরুষের শয্যায়—সেই একান্ত অপ্রণয়জ সম্ভোগের ফলেই জন্ম হয়েছে ওঁর, সাক্ষাৎ ধর্মের অবতারের।

আর তার ফলে সারাজীবন এই আপাত-অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে কাটাতে হল ওঁকে—বিদুরকে।

ব্যাসদেবের সন্তানদের মধ্যে—বিচিত্রবীর্যের তথাকথিত ক্ষেত্রজ পুত্রদের মধ্যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিবেচনায়, বিচক্ষণতায় কেউই বিদুরের সমকক্ষ নয়। না পাণ্ডু না ধৃতরাষ্ট্র। এমন কি তাদের সন্তানরাও—যারা সিংহাসন নিয়ে বিবাদ করল, এতগুলি বীরের মৃত্যুর কারণ হ'ল, কারণ হ'ল এতগুলি নারীর বৈধব্যের, এতগুলি মহৎ-বংশ লোপের সেই যুধিষ্ঠির বা দুর্যোধনও নয়।

অথচ যুধিষ্ঠির নাকি সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র, ধর্মরাজ।

এও এক পরিহাস বৈকি! বিধাতার পরিহাস।

ধর্মের কামজ পুত্র !!

ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের রীতি প্রচলিত আছে ঠিকই, ঋষিদত্ত মন্ত্রের আকর্ষণেই ধর্মকে আসতে হয়েছিল এও ঠিক—তবু ধর্মের উচিত ছিল নিজেকে সংযত করা, পরনারীর কামাতুর আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করা। তা যে তিনি-করেন নি, তার মূলে কি তাঁরও কোন গোপন বাসনা ছিল না?

বিদুরের ধারণা—ছিল।

তাই ধর্মের পুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মের ক্লৈব্যাংশই পেয়েছেন,—পুরুষের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম,—কোনটাই পান নি। তাদের মর্ম বুঝতে পারেন নি।

অথচ এরাই বসল সিংহাসনে, এরাই হ'ল রাজা। বিদুর চিরকাল 'ক্ষত্তা' অর্থাৎ দাসীপুত্র বলে অভিহিত হলেন; তাঁর থেকে সব দিক দিয়েই হীন ঐ ইতরদের অনুগ্রাহভাজন, আজ্ঞাবহ হয়ে রইলেন। পরজীবী পরাশ্রয়ী হয়ে জীবন কাটাতে হ'ল তাঁকে। চিরদিন সৎপরামর্শ দিয়ে গেলেন সকলকে—যা কেউ শুনল না। কিন্তু কোন অন্যায়ের প্রতিকার, কোন ভুলের সংশোধন করতে পারলেন না, ঘটনাপ্রবাহের কোন গতি পরিবর্তনের সাধ্য হ'ল না তাঁর।

শুধু তাই নয়—নির্বোধ ধার্তরাষ্ট্রগুলোকে সৎ পরামর্শ দিতে গিয়ে লাঞ্ছিতই হয়েছেন বরাবর। লাঞ্ছিত আর অপমানিত। মূঢ় রাজা ধৃতরাষ্ট্র, অন্তরে বাহিরে

অন্ধ, মোহান্ধ পিতা—তিনি বারবার ওঁর পরামর্শ চেয়েছেন কিন্তু কখনই সে পরামর্শ-মতো চলেন নি, আর পরে সেই প্রসঙ্গে ‘ওর কাছেই বিলাপ করেছেন। অথচ ছুটিও দেন নি। দিবারাত্র নিজের সামনে হাজির রেখেছেন—বিলাপ শোনবার জন্য এবং ইচ্ছামাত্র অহরহ আজ্ঞাপালনের জন্য। তন্ত্রের তুরীর মতো উনি পাণ্ডব ও কৌরব গৃহের মধ্যে বরাবর যাতায়াতই করেছেন, অন্ধরাজার চক্ষুলজ্জাহীন খেয়াল চরিতার্থ করতে। সেই জন্যেই বোধ করি ওঁকে তার বেশী সম্মান কেউ দেয় নি, ওঁর কথায় কর্ণপাত করে নি। আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতোই দেখেছে সকলে।

এই ওঁর ভাগ্যলিপি।

বিদুর তা জানতেন।

জানতেন ঋষির অভিশাপ শুদ্ধমাত্র তাঁর নীচ জন্মেই ক্ষয় হয়ে যায় নি। অথবা সেই জন্মেরই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এসব। অঙ্গাঙ্গী জড়িত। উনি ধর্মের অবতার—ধর্মের বিধান কোনটাই অজানা ছিল না ওঁর! ওঁর উচিত ছিল নীরব হয়ে বিনা প্রতিবাদে বিধান মেনে নেওয়া।

কিন্তু বিদুর তা পারেন নি।

উনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, ঈর্ষিত হয়েছিলেন। ফলে কুরুবংশ সম্বন্ধে বিদ্বিষ্টও।

কিছুতেই এই দুটো রিপুকে দমন করতে পারেন নি, ক্রোধ আর মাৎসর্যকে। বিধাতার ঘোর অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাঁর মন, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে-ছিল।

কেন, তাও জানেন ক্ষত্তা বিদুর।

দেহধারণের ফল এটা।

দেহধারণ করলে দেহের ধর্ম মানতেই হবে। কেউ সে নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কেউ অব্যাহতি পায় নি সে অমোঘ বিধান থেকে।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তাই মিথ্যা বলতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত, মিথ্যাচরণ করতে হয়েছে। এর শাস্তিও ভোগ করতে হবে। অন্যথায় সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঐ পুরুষের সশরীরে স্বর্গে যাবার কথা, কিন্তু তা তিনি পারবেন না, ক্ষণেকের জন্যে হলেও নরকে যেতে হবে তাঁকে।

যুগে যুগে ঈশ্বরের অবতাররা জন্মগ্রহণ করেছেন এই মর্ত্যের মৃত্তিকায়,

অবতীর্ণ হয়েছেন ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষরা—তাঁরা কেউই এ নিয়ম থেকে অব্যাহতি পাননি। শোক-দুঃখ-জরা, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ—এ সবের কাছেই বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে তাঁদের।

বিদুরকেও তাই—সব জেনে শুনেও—ঐ দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে।

বিধাতার অবিচার দেখে তিক্ততা বোধ হয়েছে, নির্বোধ অপদার্থদের সুখ-সৌভাগ্যে অসূয়ার জ্বালা অনুভব করেছেন—সমস্ত মনে শুধু নয়, সমস্ত দেহেও। দুঃসহ ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েছেন, এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়েছে সমগ্র হস্তিনাপুরী তার সকল ঐশ্বর্য সুদ্ধ নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে বিরাট শ্মশানভূমিতে পরিণত ক'রে দেন, ভস্মস্তূপমাত্র পরিচয় অবশিষ্ট রাখেন।...এই রাজ্যখণ্ডের কোন চিহ্ন কোথাও না থাকে—সেই সঙ্গে এই রাজবংশেরও। পরম অধর্মচারী এই বংশের রক্তকণাও যেখানে আছে—সেখানেই পাপ, সেখানেই অস্বাভাবিক যৌনসম্ভোগ। সেখানেই অনাচার আর অবিচার, লোভ ও দম্ভ।

অবশ্য পাণ্ডব আর কৌরব—কুরুবংশের দুই শাখা সম্বন্ধেই এই অসহ্য উষ্মা অনুভব করেছেন মহাত্মা বিদুর।

কেউ ভাল নয় ওরা, কেউই সিংহাসনে বসার, রাজ্য শাসন করার, এতগুলি প্রজার সুখদুঃখের ভার নেওয়ার উপযুক্ত নয়। পাপসম্ভব তো বটেই—বোধ করি জন্মের এই কলুষিত ইতিহাসের জন্যেই, বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হওয়ার ফলেই, ওরা এমন অমানুষ হয়ে উঠেছে। বিচিত্রবীর্যের নিজের জন্ম এক-মৎসজীবীর দুহিতার গর্ভে, যে নারীর এই বিবাহের আগেই সন্তান ধারণের ইতিহাস আছে। সেই এক ঋষির কামজ সন্তান সত্যবতীর কানীন পুত্রই হলেন আজকের বেদ-উপনিষদ ব্যাখ্যাকার মহর্ষি মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস!

হায় রে শাস্ত্র, হায় রে শাস্ত্রকার!

কিন্তু সেইখানেই বর্ণসঙ্করের শেষ নয়, শুরু মাত্র—

পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র—বিচিত্রবীর্যের দুই ক্ষেত্রজ সন্তান, আর এক জারজ সন্তানের ঔরসজাত বর্ণসঙ্কর ছাড়া কিছু নয়। পাণ্ডবরা আবার সেখানেও থেমে থাকে নি—বর্ণসঙ্করের বর্ণসঙ্কর পুত্র তারা। তবে তারা কোন্ অধিকারে

সিংহাসনে বসে—রাজ্য-পরিচালনের সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও বিদুরকে 'দাসীপুত্র' এই অপরাধে হেয় অবজ্ঞেয় অপ-পরিচিত করে দূরে সরিয়ে রেখে?

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু রাজকুমারীদের গর্ভজাত ঠিকই কিন্তু যার ক্ষেত্রে তাঁরা জন্মেছেন—সে কি জন্ম অধিকারে বিদুরের থেকে শ্রেষ্ঠতর জীব? ওঁর মা দাসী হলেও পবিত্রভাবে একান্ত শ্রদ্ধাতদ্‌গত চিত্তে ঋষির সেবা করেছেন। ধীবর কন্যা সত্যবতীর মতো এক ঋষিকে কামমোহিত পদানত ক'রে নিজের স্বেচ্ছাচারিতার অনুমোদন আদায় ক'রে নেন নি। তেমন কোন অভিসন্ধি থাকলে বিদুরজননীও ব্যাসদেবের কাছে ব্রাহ্মণ পরিচয় আদায় ক'রে নিতে পারতেন।...

বিদুর যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, হিতকারী—স্থিতপ্রজ্ঞ, তা ঐ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বা তাঁর নির্বোধ ভ্রাতুষ্পুত্রের দল—কাপুরুষ পাণ্ডবরা—স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, বাধ্য হয়েছেন তাঁদের অভিভাবক শিক্ষাদাতা ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও—তবু তাঁরা কেউই বিদুরকে একখণ্ড রাজ্য কি কোন উচ্চ রাজপুরুষের পদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। সকলে ধরেই নিয়েছিলেন যে বিদুর ঐ সামান্য অবস্থাতে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের জীবন যাপন ক'রেই সুখী; বিদুর তাঁর অবস্থা মেনে নিয়েছেন; মেনে না নেওয়ারও যেন কোন কারণ নেই—পরের অনুগ্রহাপেক্ষী পরজীবী হয়ে নিয়ত অপমানের অন্ন গ্রহণ করায় যেন কোনই দুঃখই থাকতে পারে না বিদুরের! বিদুর এমনিই থাকবেন, সর্বদা কাছে কাছে, ফাই ফরমাশ খাটবেন, অশোভন অন্যায় দুরভিসন্ধিমূলক বার্তা বয়ে নিয়ে যাবেন, অযাচিত সদুপদেশ দিতে গিয়ে—মূর্খ বৃথাগর্বিত ধার্তরাষ্ট্রদের দ্বারা ভর্ৎসিত লাঞ্ছিত হবেন। এর থেকে শ্রেয়তর আর কী জীবন আশা করতে পারেন বিদুর?...এই অবস্থাটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে ধরে নিয়েছেন সকলে।

অথচ, বিদুরের ওপর যদি আর একটু কর্তৃত্বভার দেওয়া হ'ত, যদি আর একটু শ্রদ্ধা ও সমীহ করত কুরুবংশের রাজকুমাররা—তাহলে এত বড় অঘটন ঘটত না, এমন ক'রে মহাসর্বনাশা আত্মকলহে, অকারণ অর্থহীন গৃহবিবাদে ভারতভূমি এমন মহাশ্মশানে পরিণত হ'ত না, কেবলমাত্র বৃদ্ধ, পঙ্গু, বিধবা ও অনাথ শিশুদের বাসভূমি হয়ে দাঁড়াত না। ভীষ্ম দ্রোণ না পারুন, কর্ণের

অভিপ্রায় না থাক, একা বিদুরই বাধা দিতে পারতেন ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি ক্ষুদ্র ঈর্ষা, মিথ্যা অভিমান, অন্তঃসারশূন্য আত্মহঙ্কারের ফল এই নিদারুণ গৃহবিবাদ, এই আত্মকলহ।

মূঢ়, মূঢ় ঐ মানুষগুলো, বীর বলে যাদের দম্ভ আর দর্পের শেষ ছিল না। কেন এই বিবাদ, কী তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, তা বোধ করি কেউ জানতও না—ঐ যারা এসেছিল পূর্বের পুণ্ড্রবর্ধন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর থেকে, পশ্চিমের সিন্ধু সৌরাষ্ট্র—উত্তরের কেকয় মদ্র থেকে, দক্ষিণের মাহিষ্মতী বিদর্ভ পর্যন্ত—ভারতের নানা প্রান্ত ও নানা দিক থেকে যারা এসেছিল যুদ্ধ করতে, প্রাণ দিতে।

কেউ জানত না। কেউ ভেবেও দেখে নি বোধ হয়।

তবু কি বিদুর পারতেন না এই যুদ্ধ বন্ধ করতে—উচ্চপদে অধিষ্ঠিত না হয়েও, রাজা বলে পরিচয় দিতে না পেরেও ?

পারতেন। কিন্তু করেন নি।

সেই নিষ্ক্রিয়তা, সেই একটি দিনের একটুখানি দুর্বলতাই পাপের পাষাণ ভার হয়ে তাঁর বুকে চেপে বসে ছিল। যত দিন গেছে, যত ঐ হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন—অকারণ অর্থহীন কতকগুলো লোকের শোচনীয় মৃত্যু,—যুদ্ধক্ষেত্রে অসহায় আহতদের মরণ-আর্তনাদ শুনেছেন, দেখেছেন কত রূপবান তরুণ বীরদের দেহ শৃগাল কুকুরে ছিঁড়ে খাচ্ছে—ততই নিজের অপরাধের গ্লানি দুঃসহ হয়ে উঠেছে তত ইচ্ছে হয়েছে নিজের হৃদ্‌পিণ্ড নিজের হাতে উপড়ে অনলে আহুতি দিয়ে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করেন।

হয়ত এত কিছু নয়। হয়ত উনি সত্যিই অতটা দায়ী নন—একমাত্র তো ননই—সে প্রবোধ যে দেবার চেষ্টা না করেছেন তাও নয়—তবু বিদুর তাঁর মনে এতটুকু স্বস্তি পান নি।

কারণ উনি জানতেন যে যদি কারও কথার ওপর ধৃতরাষ্ট্রের কিছুমাত্র আস্থা থাকে তো সে উনি···একমাত্র ওঁকেই সমীহ করতেন অন্ধরাজা, তাঁর বিবেকের সতর্ক বাণী শুনতে পেতেন বিদুরের কণ্ঠে। বোধ করি সেই জন্যেই এতটা সমীহ করতেন, বারবার ওঁর মত জানতে চাইতেন।

বিশেষ ক'রে সেইদিন—যেদিন সারারাত্র বিদুর ও সনৎকুমারের সঙ্গে

আলোচনা করার পর, শুনলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসছেন পাণ্ডবদের দূত রূপে, তখন তিনি বিশেষভাবে ন্যায় ও ধর্মের দিকে ঝুঁকে ছিলেন, পাণ্ডবদের শক্তি স্মরণ করে ভয়ও পেয়েছিলেন। তারপর যেদিন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এলেন, কৌরবদের অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন উপেক্ষা করলেন এবং দুষ্টমতি দুর্যোধনের দুরাগ্রহের উত্তরে নিজের স্বরূপ দেখিয়ে নিজের বিপুল বীর্যের কিছুটা আস্বাদ করিয়ে—অনায়াসে কৌরবসভা ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে চলে গেলেন—সেদিনও ধৃতরাষ্ট্র ভীত হয়েছিলেন—ধর্মের ভয়ে, বিবেকের ভয়ে, সর্বাধিক নিজ বংশের সর্বনাশের ভয়ে।

সেদিনই ছিল উত্তম অবসর। ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর যেমন জানতেন এমন কেউ না, তাঁর মনের কথা পুঁথির পৃষ্ঠার মতোই পাঠ করতে পারতেন। সেদিন সেই মুহূর্তে বিদুর ইচ্ছা করলে ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে সন্ধি করাতে পারতেন। পাণ্ডবদের প্রাপ্য দেওয়াতে পারতেন। সেদিন বিদুরের পরামর্শ শুনতেন ধৃতরাষ্ট্র, সেদিন তাঁকে দিয়ে এমন অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে পারতেন যা শত দুর্যোধনের সাধ্য থাকত না ভঙ্গ করবার। আর, একবার পাণ্ডবরা নিজেদের রাজ্যাংশ লাভ ক'রে চেপে বসলে আবার তাদের রাজচ্যুত করা ঐ পাপিষ্ঠদের পক্ষেও কঠিন হত।

এ সবই জানতেন বিদুর। তবু সে চেষ্টা করেন নি।

করেন নি যে তার মূলে ছিল ঐ বিদ্বেষ, নিজের প্রতি অবিচারের জন্য ক্ষোভ; তা থেকে উদ্ভূত একটা তিক্ততাবোধ।

বিদ্বেষ এদের দু পক্ষের ওপরই।

যাক, সব যাক—সর্বনাশ হয়ে যাক। দু দলেরই—আর এই দু দলে যারা যারা যোগ দিয়েছে—সকলকার। ধ্বংস হয়ে যাক এই রাজ্য, এই রাজ্যের সকল ঐশ্বর্য।

এই ছিল ওর সেদিনের মনোভাব।

তাই তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি পাণ্ডবপক্ষ হয়ে। ধৃতরাষ্ট্র যা প্রশ্ন করেছিলেন তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন, অসত্য কি অন্যায় কিছু বলেন নি এও ঠিক—সৎপরামর্শই দিয়েছেন ওঁর সাধ্যমতো জ্ঞানমতো—তবে নিজে থেকে একটি কথাও বলেন নি বা চেষ্টা করেন নি নিজের প্রভাব বিস্তার করার;

চেষ্টা করেন নি অন্ধরাজার জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলনের, মূঢ় মোহান্ধের চৈতন্যোদয়ের ; চেষ্টা করেন নি লোকক্ষয়কারী এই বীভৎস গৃহযুদ্ধ নিবারণের। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত থেকেছেন—দর্শকরূপে।

হয়ত মানুষের ন্যায়নীতির হিসেবে এটা পাপ নয়—কিন্তু বিদুর এটাকে পাপ বলেই মনে করেছিলেন। এ নিষ্ক্রিয়তা বা ঔদাসীন্য নয়—এর মূলে তাঁর যে বিদ্বেষ বা অসূয়া কাজ করেছে—সেইটেই পাপ। দেহের ধর্ম এটা, দেহধারণ করলেই দেহজ রিপুর অধীন হতে হবে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বোধ করি এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন—কিন্তু দেহের ধর্ম যদি পাপ করাই হয়—প্রায়শ্চিত্তও সেই দেহরই ধর্ম।

এই প্রায়শ্চিত্তই করতে চেয়েছিলেন বিদুর, ক'রেও ছিলেন জীবনের শেষ কটা দিন।

গৃহবিবাদ, আত্মকলহলের যে মর্মান্তিক পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে হ'ল তাঁকে —তুচ্ছ ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ, বৃথা আত্মহঙ্কারের ফলস্বরূপ অর্থহীন প্রয়োজনহীন এই আত্মীয়-কলহ আর তার সর্বসংহারক পরিণাম—হয়ত সেটাও খানিক প্রায়শ্চিত্ত। সহস্র সহস্র বিধবা পুরনারীর হাহাকার অনাথ শিশুর ক্রন্দন—এ শোনার জন্য, মহাশ্মশান দৃশ্য দেখবার জন্য বেঁচে থাকাই সে প্রায়শ্চিত্ত।

বিদুর জানেন এ যুদ্ধের এইখানেই সমাপ্তি ঘটল না। দেশের জাতির যে মহাসর্বনাশ হ'ল শত শতাব্দী ধরে তার মূল্য শোধ করতে হবে উত্তরপুরুষদের। বংশপরম্পরায় এই উত্তারাধিকার সংক্রমিত হবে—ঘৃণিত ভয়াবহ কোন ক্ষয়-রোগের মতো—এক থেকে অন্যে, পিতা থেকে পুত্রে, পৌত্রে। অসূয়া বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা ক্ষমতাপ্রিয়তা—এর মধ্যেই শিশু লালিত পালিত হবে। ফলে বারে বারে এই যুদ্ধ ঘটবে, নানারূপে হয়ত, তবু তা এড়ানো যাবে না কিছুতেই, রোধ করা যাবে না দেশ ও জাতির সর্বাত্মক মহাবিনষ্টিকে। উগ্র সুরার মতোই এই আত্মসর্বনাশের নেশা আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে তাদের।

না, নিজের এ অপরাধ বিদুর ক্ষমা করতে পারবেন না। আর কেউ কেউ অধিকতর দায়ী—এটা তাঁর দায়িত্বলাঘবের অজুহাত হতে পারে কিন্তু সত্যি-সত্যিই তাঁর দায়িত্ব তাতে লঘু হয় না, তাঁর অপরাধের স্খালন হয় না।

সেইজন্যেই এ প্রায়শ্চিত্ত তার। তুষানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করাই হয়ত

উচিত ছিল—কিন্তু তাতে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হত, বিস্তর বাদানুবাদ, কৈফিয়ৎ ও অনুরোধ, সমূহ বাধার সম্মুখীন হতে হত। তার চেয়ে এই ভাল। এই তিলে তিলে ক্ষয় ক'রে আনা মৃত্যু।

শুধু একটা দুঃখ এই রইল যে—কথাটি যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে যেতে পারলেন না তিনি—ধর্মপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে—তাঁরই অপর স্বরূপকে।

বিধাতার কৌতুক

একে তো সেই বেলা তিনটে থেকে স্টেশনে বসে আছি, রেল কোম্পানীর এমন বন্দোবস্ত যে তিনটের পর প্রথম গাড়ি এই রাত সাড়ে নটায়; পাঁচ মিনিটের কাজ ছিল এখানে—তার জন্মে পুরো সাড়ে ছ ঘণ্টা সময় নষ্ট—তার ওপর, যদি বা এ ট্রেন ঠিক সময় এল—আপ ট্রেনের দেখা নেই, সুতরাং প্রতীক্ষার অবসান ঘটল না। যেহেতু আপ ডাউন দুটো ট্রেনই এখানে মেলবার কথা, সেহেতু এখানেই মেলাতে হবে—তা অপরটা আধ ঘণ্টাই লেট্ হোক আর এক ঘণ্টাই হোক। শুনলাম আপ ট্রেন সত্যিই প্রায় আধ ঘণ্টা লেট্, অনায়াসে এর পরের স্টেশনে মেল করানো যেত—কিন্তু রেল কোম্পানীর 'কন্টোল' ঘরে যে মানুষগুলি বসে থাকেন তাঁদের হিসেব আর আমাদের হিসেব বোধ করি এক পাটিগণিত ধরে চলে না—কাজেই ও আলোচনা থাক।

বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। শীতের রাত, পাঁচটা না বাজতে বাজতে সন্ধ্যা নেমেছে, তখন থেকে অন্ধকারে বসে বসে মশা তাড়াচ্ছি। যখনকার কথা বলছি তখন স্বাধীনতা এসে গেছে কিন্তু তখনও স্টেশনে এত বিজলী আলোর ঘটা হয় নি। তেলের আলো—গাড়ি আসার মিনিট কতক আগে-আগে জ্বালান হয়। বাকী সময়টা জোনাকী ভরসা।

গাড়িতে উঠে বসে থাকতেও ভাল লাগল না—ভিড় যে খুব একটা বেশী ছিল তা নয়, কিন্তু বন্ধ কামরার মধ্যে মুড়িসুড়ি দেওয়া মানুষগুলির গায়ের কাপড়ের আর বিড়ির গন্ধে ভেতরের বাতাস এমন ভারী হয়ে আছে, ঢুকলেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, কাজেই যতটা পারা যায় বাইরে থাকার চেষ্টায় গাড়ির সামনেই পায়চারি শুরু করলুম।

যাত্রী যারা তারা ততক্ষণে প্রায় সবাই ভেতরে উঠে পড়েছে, ছুটি চা-ওলা ছোকরা ও একটি অদ্বিতীয় খাবারওলা এতক্ষণ ঘুরছিল, তারাও নিজেদের কোটরে গিয়ে ঢুকেছে—প্ল্যাটফর্ম জনবিরল, তার মধ্যেই—পায়চারি করতে করতে নজরে পড়ল—আমার মতো আরও একটি প্রাণী ভেতরে না উঠে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে। তবে তার পায়চারি করার ইচ্ছা নেই—একটি কামরার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত মালপত্র কিছু আছে সেখানে —নড়া সম্ভব নয়।

অলস কৌতূহল, তবু আর কোন কাজ না থাকাতেই কে মানুষটা দেখবার জন্যে পাশ দিয়ে বার দুই যাতায়াত করলুম। কিন্তু অন্ধকারে মুখ-চোখ কিছুই ঠাওর হল না, শুধু বুঝলুম যে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি মহিলা, এবং সম্ভবত বয়স্কা হবেন, কারণ পরিধানে সাদা কাপড়, পাড় আছে কিনা দেখা গেল না ঠিক, তবে থাকলেও খুব চওড়া কিছু নয়।

ইতিমধ্যে আমাদের যন্ত্রণার অবসান আসন্ন হয়ে এসেছে। দূর দিগন্তে—আলোর আভাস আপ ট্রেনের আবির্ভাব ঘোষণা করছে। চা-ওলা ছেলে ছুটি উনুনের পাশে কেটলি রেখে আগুন পোয়াচ্ছিল, তারা আবার ভাঁড়ের বালতি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল, খাবারওলার কাঁধে খাবারের বাক্স ও জলের বালতি গুছিয়ে তুলে নিল।

তাড়া নেই। যে গাড়ি আসছে সে গাড়ি না ছাড়লে আমাদের গাড়ি ছাড়বে না। অলসভাবে দাঁড়িয়ে দেখছি দূরের আলোর বিন্দুটি ক্রমশ কেমন করে বড় হ'তে হ'তে কাছে ছুটে আসছে। গাড়ি দেখা যাচ্ছে না, শুধুই চোখ-ধাঁধানো একটা আলো। আরও কাছে আসতে আর চেয়ে থাকা গেল না—চোখটা বাঁচাতেই ফিরে দাঁড়ালুম, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল—সেই উজ্জ্বল আলো মহিলাটির মুখে এসে পড়েছে—দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের রানীবৌদি।

একই সঙ্গে দুজনে দুজনকে চিনতে পারলুম।

রানীবৌদি বোধ হয় আগেই দেখেছেন—তবু আলো-আঁধারিতে একেবারে নিশ্চিত হতে পারেন নি। আমার মুখ দিয়ে 'রানীবৌদি!' বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও বলে উঠলেন 'সুব্রত!'

'আপনি এখানে! কোথায় এসেছিলেন?' প্রায় রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন করি, আর

কোন প্রশ্ন খুঁজে না পেয়েই—অথবা কোন্‌টা করা উচিত বুঝতে না পেরে। সহস্র প্রশ্ন করা চলত, অসংখ্য প্রশ্ন গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছে বলেই বোধ হয় কোনটা করতে পারলুম না।

তিনি কিন্তু খুব সহজ ভাবেই নিলেন কথাটা, নিতান্ত সহজ ভাবেই জবাব দিলেন, 'আমি এখানের মেয়ে-ইস্কুলে চাকরি করি। তুমি?'

'আশ্চর্য! আমিও এখানের ছেলেদের ইস্কুলেই একটু কাজে এসেছিলুম।

ইতিমধ্যেও গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টাও পড়ে গেছে —ছাড়ার। এবার এ গাড়ি ছাড়বে। বললুম, 'যাই এখন, গাড়ি বোধ হয় ছাড়বে এবার। আপনি থাকেন কোথায়, মানে কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমি থাকি—ছুটো স্টেশন পরে। গাড়ি নেই বলে প্রতিদিনই এত রাত হয় প্রায়। তাই এখানে একটা কোচিং ক্লাস সেরে যাই। সেখান থেকেই যাতায়াত করি। তা তুমি কোথায় যাবে, এখানেই ওঠো না। মেয়ে কামরা বটে—তবে কেউ নেই আজ। আমার একটু ভয় ভয়ই করছিল। তুমি উঠলে তো ভালই হয়। তুমি নিশ্চয় কলকাতা ফিরবে?'

'না, আজ কাটোয়া নামব। তা চলুন, এখানেই ওঠা যাক।'

উঠে সামনাসামনি বসলুম, গাড়িও ছাড়ল। কিন্তু তখনই কেউ কোন কথা বলতে পারলুম না। দীর্ঘকাল পরে দেখা। এতকাল কোন খবরই রাখি না কেউ কারও। শেষ যে দেখা—বারো বছর আগে—তার স্মৃতিটা আদৌ রুচিকর বা আলোচনাযোগ্য নয়।

রানীবৌদি আমার এক দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাইয়ের স্ত্রী। সম্পর্কটা খুবই দূরের। আর দেখাশুনোও এত অল্প দিনের যে—কোন স্মৃতিই কোন পক্ষের মনে থাকার কথা নয়, তবু যে মনে আছে তার কারণ ঐ বিশ্রী ঘটনাটা।

আমার দাদাটি পাড়াগাঁয়ের ছেলে, লেখাপড়ার বালাই বিশেষ ছিল না তার। তেমনি পুরুষ মানুষের যে চরিত্র ঠিক রাখতে হয়—এমন কোন কুসংস্কার ছিল না। বেশ কিছু জমিজমা ছিল ওঁদের—সচ্ছল সংসার—সুখেই দিন কাটত, বদ-খেয়ালি করার অবসরও ছিল প্রচুর। রানীবৌদি শহরের মেয়ে। বিশেষ পশ্চিমে মানুষ, বাবা ছিলেন মীরাটের সরকারী চাকুরে। হঠাৎ অসময়ে মারা যেতে কলকাতায় এসে মামাদের গলগ্রহ হয়ে পড়েছিলেন। সে মামার নিজের

তিনটে মেয়ে ছিল, তার ওপর এই ভাগ্নী এসে জোটাতে দিশাহারা হয়ে গেলেন। বলতে গেলে সামনে যাকে পাওয়া গেল—সেই পাত্রেই বিয়ে দিয়ে দিলেন। তবু নিজের মেয়েদের আগেই ভাগ্নীকে পাত্রস্থ করেছিলেন, সঘরের সম্পন্ন অবস্থায় সুশ্রী ছেলে, খুব খারাপ বিয়ে দিয়েছিলেন, তাও কেউ বলতে পারবে না।···

এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ ছিল না। বিয়ের পর কী একটা উপলক্ষে যোগেশদার মা বৌ নিয়ে আমাদের বাড়ি এসে দিনকতক ছিলেন। আমার মায়ের খুব পছন্দ হয়েছিল বৌকে, সম্ভবত বৌয়েরও। এর মাস কতক পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর রানীবৌদি একা এসে হাজির। না, অশ্রুমুখী নন—বরং জ্বালামুখী বলাই উচিত। আমার তখন বয়স অল্প কিন্তু তবু তাঁর দৃষ্টিতে যে বহ্নি দেখেছিলুম তা আজও মনে আছে। রানীবৌদি নাকি এসে একেবারে মার পা জড়িয়ে ধরে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন। সেই প্রথম শুনলুম যে যোগেশদা ঘোর অসচ্চরিত্র, এবং তার কী সব খারাপ অসুখ আছে। এই পিতার সন্তানকে বৌদি রাখতে চান না। এই সন্তান ঐ বীজ ও ঐ স্বভাবই ছড়িয়ে বেড়াবে। তিনি চান সন্তানকে নষ্ট করতে। মা শিউরে উঠে অনেক ক'রে ওঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন। কিন্তু রানীবৌদির শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন নিতে এল তখনও পাঠালেন না। বললেন, 'ওখানে গেলে পাগলী কি ক'রে বসবে তার ঠিক কি, তাছাড়া ওর শরীরও ভাল না। এখানেই থাক। কানা-কানী যা হোক একটা হয়ে গেলে নিয়ে যাস। তদ্দিনে মাথাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

কিন্তু দেখা গেল মেয়েটিকে আমার মা ঠিক চিনতে পারেন নি। মাস তিনেক সবসুদ্ধ ছিলেন বৌদি, এমনি তাঁর আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় নি। তাই ছেলে হবার পরও মাসখানেক কাটিয়ে যখন দেশে যান —যোগেশদার ছোট ভাই এসেছিল নিতে, তাকে সাবধান করে দেবার কথাও মনে পড়ে নি মায়ের। সেও ছেলেমানুষ, সতেরো আঠারো বছরের ছেলে, কোন উদ্ভট সম্ভাবনা তার মাথায় যাবে—এমনও আশা করা অন্যায়। রানীবৌদি সেই সুযোগ নিয়েই এক অঘটন ঘটিয়ে বসলেন, যেতে যেতে গাড়ির জানালা গলিয়ে সকলের সামনে চলন্ত ট্রেন থেকে বাচ্চাটাকে দিলেন ফেলে এবং তারপর বেশ

সহজ প্রশান্ত মুখেই নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

তারপর যথারীতি হৈচৈ, কেলেঙ্কারী—থানা পুলিস। বহুকালের কথা—কিন্তু কেলেঙ্কারির যে তরঙ্গ উঠেছিল, লজ্জা ও ধিক্কারের যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল ঘরেবাইরে—সে কথাটা আজও মনে আছে। মা ছড়া বেঁধে গালাগালি দিলেন মেয়েটাকে, কারণ তাঁকেও সাক্ষী দিতে হয়েছিল। পাড়ায় শুধু নয়—আত্মীয়-মহলেও ঢিঢিক্কার পড়ে গিয়েছিল, মুখ দেখানো কঠিন হয়ে পড়েছিল আমাদের। গালাগাল দিয়েছিলেন নিজেকেও—নির্বোধ ও মুর্খ বলে, সর্বনাশা মেয়েটাকে চিনতে পারেন নি বলে। তবে তখন আর আপসোস করে লাভ কি? কেলেঙ্কারীর কিছুই অবশিষ্ট রইল না—খবরের কাগজের কল্যাণে ভারত-বর্ষের কোন প্রান্তে আর ছড়াতে বাদ রইল না সংবাদটা।

রানীবৌদি কিন্তু নির্বিকার। কোনরকম অনুতপ্ত হতেও দেখা যায় নি নাকি। আদালতেও ঐ কথাই তিনি বললেন, এমন লোকের সন্তান রাখা মানে দেশের মধ্যে অসৎ লোকের বংশ বিস্তার করা, কুৎসিত ব্যাধির বীজ ছড়ানো। এ যুক্তিতে আইন এড়ানো যায় না, এড়াতে পারলেনও না। শেষ পর্যন্ত জেলেই যেতে হল বৌদিকে। তবে হাকিম ওঁর তেজস্বিতা, সত্য-ও স্পষ্ট-বাদিতায় মুগ্ধ হয়ে যতটা সম্ভব লঘু ক'রে দিলেন দণ্ড। যে মানসিক অবস্থায় মা হয়েও নিজের সন্তানকে নষ্ট করতে পেরেছেন—সেই অবস্থাটার প্রতিই জোর দিলেন বার বার।

এর পর স্বভাবতই আমরা আর কোন খবর রাখি নি রানীবৌদির। তবে খবর কিছু কিছু এসে পৌঁচেছে। জেল থেকে বেরিয়ে কোন্ নাকি মিশনারীদের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাঁরা নাকি তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে বি.এ. পর্যন্ত পাস করিয়ে ছিলেন। তারপর কোন্ ইস্কুলেও নাকি চাকরি ক'রে দিয়েছিলেন। না, ক্রীশ্চান হয়েছিলেন কি না তা জানা যায় নি। তবে তাতে যে রানীবৌদির কোন আপত্তি থাকবে তাও মনে হয় নি কারও। আর হলেই বা কি। আমাদের সমাজে, আমাদের আত্মীয় মহলে তো তাঁর মৃত্যুই হয়ে গেছে। ওঁর মামারাও কোন সম্পর্ক রাখে নি আর। যোগেশদার খবর আরও সংক্ষিপ্ত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আর একটা বিয়ে করেছিলেন। ইতিমধ্যে গুটিকতক সন্তানও হয়ে গেছে—সব কটাই চিররুগ্ন প্রায়—মারাও গেছেন ঐ ঘটনার বছর ছয়-সাতের মধ্যেই।

প্রায়-অন্ধকার রেলের কামরা। বন্ধ জানালার মধ্যে দিয়ে যতটা দেখা যায় —বাইরেটা অন্ধকার ও কুয়াশায় একাকার হয়ে গেছে। ভিতরে ততোধিক। ট্রেনটা যে গতিতে চলছে, মনের মধ্যে দিয়ে স্মৃতির ছবিটা তার চেয়ে অনেক বেশী দ্রুত গতিতে সরে সরে গেল। বুঝলুম, ওঁরও তাই। দুজনেই একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম অথচ কী বা করা যায়। কোন প্রসঙ্গ তোলা যায়—তাও যেন হঠাৎ মনে পড়ল না।

শেষে আবারও একটা মামুলী প্রশ্নই ক'রে বসলুম। আসলে যে কোন উপায়ে হোক—এই অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙা দরকার, বললুম, 'তার পর? তা এত দেশ থাকতে এইখানে চাকরি করতে এলেন? আর ওখানেই বা থাকেন কোথায়? এখানে হোস্টেল নেই? কিম্বা বাসাটাসা? রোজ এত রাতে যাওয়া—?'

হাসলেন রানীবৌদি। চোখে সে আগের আগুন জ্বলে কিনা জানি না—দেখলাম হাসিটা তাঁর আজও তেমনি মিষ্টি আছে। বললেন, 'আমাকে আর কোন্ বড় ইস্কুলে কে চাকরি দেবে বলো। সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, বি-টি ডিগ্রিও নেই। অনার্স ছিল অবিশ্যি—কিন্তু এম.এ. পাস করা আর হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া, সহায়-সম্বল তো কিছু নেই। এখানে এটা আগে মিশনারীদের ইস্কুল ছিল বলেই কাজটা পেয়েছিলুম।

'তা এখানেই থাকেন না কেন?'

'এখানে থাকলে চলে না। আমার ওখানের সংসার দেখে কে!'

'সংসার!' চমকে উঠলুম। সে বিস্ময় কণ্ঠে বা মুখভাবে চাপাও রইল না, 'আ—আপনি আবার বিয়ে করেছেন নাকি?'

আবারও সেই হাসি।

'দূর পাগল! আমাকে আবার কে বিয়ে করবে—জেলখাটা দাগী আসামী, তায় বিধবা। কেন, বিয়ে না করলে কি আর সংসার থাকতে নেই? একগাদা ছেলেমেয়ে আমার।'

এবার আর অনাবশ্যক বোধেই প্রশ্ন করলুম না, নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম শুধু।

তবে কি—তবে কি—

বোধ হয় অনুক্ত প্রশ্নটা আমার চোখ দেখেই অনুমান করে নিলেন রানী-বৌদি, বললেন, 'না না, অবৈধ সন্তান নয়। দস্তুরমতো স্বামী-দেবতা মশাইয়ের বিবাহিতা ধর্মপত্নীর সন্তান, তোমারই ভাইপো তারা। তোমার যোগেশদার ছেলে-মেয়ে!'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকি তাঁর মুখের দিকে। আজ বুঝি বিস্ময়েরও শেষ হবে না, হেঁয়ালিরও না। 'যোগেশদার ছেলে-মেয়ে? তাঁর ছেলে-মেয়ে আপনি মানুষ করছেন? সে কি ক'রে হবে!'

'হবে কি—হচ্ছে তো!' এবার একটু যেন অপ্রতিভের হাসিই ফুটে উঠল তাঁর মুখে, যেন কোন গর্হিত কাজ ক'রে ফেলেছেন—এমনি একটা লজ্জা, বললেন, 'তোমার যোগেশদা এই বিয়ে করার পরই পৃথক হয়ে ছিলেন, পৈতৃক সম্পত্তি যা পেয়েছিলেন তা মরার আগেই দু'হাতে উড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। মরবার পর সমস্ত পরিবারটা পথে বসেছিল প্রায়। এইখানে তোমার নতুন বৌদির—মানে আমার সতীনের বাপের বাড়ি। অগত্যা এখানে এসেই উঠে-ছিলেন তাঁরা—কিন্তু অবর্ণনীয় দুর্গতিতে দিন কাটছিল। ওদের অবস্থাও তো ভাল ছিল না, নইলে অমন পাত্রে মেয়ে দেবে কেন? আমি এখানে চাকরি করতে এসে এই ফ্যাঁসাদে জড়িয়ে পড়লুম আর কি! কানে শুনে—একের পর এক লোক এসে যখন বলতে থাকে—পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, পড়াশুনো তো কল্পনাতীত—তখন আর চুপ ক'রে থাকতে পারি কই! হাজার হোক শ্বশুরের বংশধর। যা-ই ক'রে থাকি, ডাইভোর্স তো হয় নি, ধর্মান্তরও হয় নি।···আমি এখন ওখানেই থাকি, রাঁধা ভাতটা পাই দুবেলা, আমার লাভ ঐটুকু আর কি!'

গল্প করতে করতে কখন মাঝের স্টেশন পার হয়ে গেছে লক্ষ্য করি নি। এবার রানীবৌদির স্টেশন কাছে আসছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তেমনি একটু লাজুক লাজুক ভাবে হেসে বললেন, 'মনে মনে খুব হাসছ, না? একেই বোধ হয় প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে, না কি ঈশ্বরের বিচার—কি বলবে? বিচার হলে খুবই সূক্ষ্ম বিচার বলতে হবে। নিক্তির তৌলে মাপা।' তারপর নামতে নামতে আর একটু হেসে বললেন, 'ছোটটা আবার এমন ন্যাওটো হয়েছে, যত রাতই হোক জেগে বসে থাকে। আচ্ছা চলি। যদি কখনও এসো তো এদিক

ঘুরে যেও। আচার্যিদের বাড়ি বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে।…আমার কেউ না হ'লেও—তোমার আত্মীয় তো!'

পিছু ডাকে

এমন একটা খুব বেশীদিনের কথা নয়, ওর নিজের বিয়ে হয়েছে এই সবে তিন বছর। নীলাদ্রির আরও কম, মাত্র বছর দেড়েক বিয়ে করেছে সে। তা হোক, ছাড়াছাড়ি তো এক সময়েই হয়েছে, বছর সাতেক হয়ে গেল প্রায়। মাস কতক এমনিই কেটেছে, তারপর মামলা। মামলায় অবশ্য বেশী দেরি হয় নি, উভয় পক্ষেরই সম্মতি ছিল বলে—আদালতের অনিবার্য যতটুকু দেরি। তার বেশী হয় নি। তার দু বছর পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ পাকা হয়েছে ওদের।

কিন্তু তখনই বিয়ে করে নি কেউ! করার ইচ্ছাও ছিল না ঠিক, সুপ্রিয়ার তো নয়ই—যতদূর জানে ও, নীলাদ্রিরও না।

তার পর এই যোগাযোগ। চাকরি আগে থেকেই করত সুপ্রিয়া, বস্তুত চাকরির জন্যেই ওদের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত। বর্তমান পদোন্নতিটা অবশ্য ছাড়াছাড়ির পরেই হয়েছে—এই বড় পোস্টটা পেয়েছে। পদাধিকার-বলেই বহু অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হয় তাকে, অনেকের সঙ্গে ঘুরতেও হয় কিছু কিছু। সেই ভাবেই সুপ্রিয়র সঙ্গে চেনা। বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার, মোটা মাইনের চাকরি করে, বয়সও বেশ হয়েছে—নীলাদ্রিরই বয়সী হবে—এতদিন বিয়েটা যেন হয় নি সুপ্রিয়ার জন্যেই। ভগবান এই যোগাযোগ করাবেন বলেই যেন ওকে তৈরী রেখেছিলেন।

প্রথম একটু চমকে উঠেছিল সুপ্রিয়া—নামের মিলটা দেখেই। তবে সে—যাকে ইংরাজীতে বলে 'জাস্ট ইন্টারেস্টেড' তার বেশী কিছু নয়। সাধারণ চেহারা সুপ্রিয়র, ইদানীং কিছু মোটা হবার দিকেই মোড় নিয়েছে বরং—কারণটাও অবশ্য গোপন করে নি—সামান্য কিছু য়্যালকোহল-অভ্যাসেই হয়েছে এটা। কথাবার্তাও ঝকঝকে কিছু নয়—নিতান্তই মামুলী। অর্থাৎ কোথাও কোনও জেল্লা ছিল না।

ছিল যেটা—সেটা অধ্যবসায়। সেই যে দেখা হ'ল, সুপ্রিয় আর ছাড়ল

না, লেগেই রইল। কিছুদিন পরে খারাপ লেগেছে সুপ্রিয়ার, রূঢ় হয়েছে, কটূকথা বলে তাড়িয়েছে, এক-আধবার অফিসে এলে সময় হবে না বলে তাড়িয়েছে—কিন্তু সুপ্রিয় তা গায়ে মাখে নি। সুপ্রিয়ার মা বলতেন, 'পায়ে-পড়ারে ছাড়া ভার'—এও কতকটা তাই হ'ল। একদিন সুপ্রিয়া সম্মতি দিতে বাধ্য হ'ল। সুপ্রিয়র অকাট্য যুক্তি—'ভগবান আমাদের মেলাবেন বলেই দুজনের এক নাম দিয়েছেন—সেই মনসার মতো—আর তিনিই তো মিলিয়ে ছিলেন। সাধারণত এসব কাজে য়্যাসিস্টান্টদেরই পাঠাই। তোমার পুরো নামটা শুনে মজা লাগল বলেই এলুম।

অবশ্য এবার আর ভুল নির্বাচন হয় নি সুপ্রিয়ার। এমন অনুগত বশম্বদ স্বামী দুর্লভ। সুপ্রিয় তাকে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেছে—তা সে গোপনও করে না, বরং এখনও যে সেই কৃতার্থতার ভাবটা কাটছে না, তাতেই সুপ্রিয়ার কিছু আপত্তি। আপিস থেকে ওকে একবার 'স্টেট্স্'-এ পাঠিয়েছিল, সেখান থেকেই মদ্যপানের অভ্যাস নিয়ে ফিরেছিল। সামান্যই অবশ্য, তবু অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ঠিকই। স্ত্রীর যে স্পষ্ট আপত্তি ছিল, তা নয়—শুধু তার চোখে-মুখে একটা ভয়ের ভাব লক্ষ্য ক'রে—মদ খেতে দেখলে কেমন যেন শিটিয়ে থাকত সুপ্রিয়া—এতদিনের অভ্যাস এক কথায় ছেড়ে দিয়েছে। সেই যে 'পায়ে-পড়া' ভাব এখন যায় নি ওর, পায়েই পড়ে আছে বলতে গেলে। স্ত্রীকে পেয়ে সে ধন্য। ওর এখনও ধারণা যে ও আদৌ এমন স্ত্রীর যোগ্য নয়—এমন বিদুষী ও এমন রূপসী—ঈশ্বরের অকল্পিত আশীর্বাদের মতোই এসেছে ওর জীবনে। স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রম বা ঈষৎ সমীহ ভাবটা এতদিনেও কাটে নি তাই।

এ পূজা, এ আরতি স্ত্রীলোক-মাত্রেরই ভাল লাগে। সুপ্রিয়ারও লেগেছে। তাছাড়া এতকাল যারা তাকে পাবার জন্যে চেষ্টা করেছিল তাদের কেউই আর্থিকমানে এর সমকক্ষ কি বড় নয়। সুপ্রিয়া মাসে প্রায় সাত শো' টাকার মতো পায়, তা থেকে মেয়ের জন্যে এক শো টাকা পাঠিয়েও অনেক থাকে। সেই লোভেই এসেছে বেশীর ভাগ। কিন্তু সুপ্রিয়র সে লোভ নেই, প্রয়োজনও নেই। সে পায় দু হাজার টাকারও কিছু বেশী—সব মিলিয়ে। তার দাদারাও সকলে কৃতী, বাইরেই থাকেন—ভাইয়ের টাকায় লোভ থাকলেও দাবী নেই। দিল্লীতে মস্ত বড় বাড়ি ওদের, সরকারকে ভাড়া দেওয়া আছে, তা থেকেও

কিছু আয় হয়। এখানের ফ্ল্যাটে একাই থাকত সে, প্রয়োজনের জন্তেই—বার তিনেক বড় রকমের চুরি হয়ে যেতে—এক বয়সে অনেক বড় বিধবা মাসতুতো দিদিকে এনে রেখেছিল। তিনি এদের বিয়ের পরই সংসারের ভার বৌকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। তাঁরও সংসার আছে, চিরকাল থাকার উপায় নেই। শুধু তিনিই একটি বিশ্বাসী বুড়ী ঝি দিয়ে গেছেন, সে অবশ্য রান্না ছাড়া কিছুই করতে পারে না—তাও খুব তাড়াতাড়ি কিছু পেরে ওঠে না—তবে বুক দিয়ে পাহারা দেয়। দিনে ঘুমোয় না, রাত্রেও অল্পক্ষণ, তাও ঘুম খুব সজাগ, কেবলই উঠে উঠে দেখে সব ঠিক আছে কিনা। তাই অন্য নতুন ঝি-চাকর বাখলেও তুজনেব বেরিয়ে যাবার কোন অসুবিধা হয় না—সরলাই তাদের ওপর নজর রাখে। সেই কারণেই বুড়ীকে রাখাটা বাড়তি বাজে খবচ মনে হয় না—বুড়ী গিন্নীর মতো বুক দিয়ে আগলে থাকে সংসারটা, অথচ আত্মীয়া কোন গিন্নীর মতো ভয় করতে হয় না।

না, সুখেই আছে সুপ্রিয়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক ওর তরফ থেকে ভালবেসে বিয়ে না কবলেও স্বামীকে ভালবাসতে শিখেছে পরে, এটাও ঠিক। এখন ওদের সুখের তো বটেই, শান্তির সংসারও।

আর সুপ্রিয়র অপরিসীম ভালবাসায়, পূজোয়—আগেকার বিশ্রী দিনগুলোর স্মৃতিও ভুলে গেছে সে—অপ্রীতিকর অশান্তির দিনগুলোর কথা। আজকাল কখনও-সখনও দৈবাৎ নীলাদ্রির কথা মনে পড়ে, তাও—ঐ মনেই পড়ে এই মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। পরক্ষণেই ভুলে যায়। আগে মেয়ে মধ্যে মধ্যে আসত—কিন্তু তাতে উভয় পক্ষেরই অশান্তি বাড়ে বলে বছর তুই পরে সুপ্রিয়াই বারণ করেছে। মেয়ে তার কাছেই রাখার কথা—কিন্তু নীলাদ্রির কাকী—মেয়ের ঠাকুমা যখন করুণভাবে মেয়েটিকে ভিক্ষে চাইলেন, তখন আর না বলতে পারে নি।

নিঃসন্তান ভদ্রমহিলা নীলাদ্রিকে ছেলের মতোই মানুষ করেছেন, তিনিই ওর মা। মহিলা লোকটিও খুব ভাল, নিপাট ভাল মানুষ, কখনও তিলমাত্র অসদ্ব্যবহার করেন নি সুপ্রিয়ার সঙ্গে। তাছাড়া রমা হওয়ার পর বছরখানেক খুবই ভুগেছিল লিভারের গোলমালে, বাঁচার আশাই ছিল না প্রায়—ঐ মহিলাই

রাতের পর রাত জেগে বুকে ক'রে বসে থেকেছেন, ওদের একবিন্দু ঝঞ্ঝাটও পোয়াতে দেন নি। নিজের নাতনীকেও অনেক ঠাকুমা এত ভালবাসতে পারে না, রমার ঠাকুমা তাকে যা ভালবাসেন।

সেই মেয়েকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা খুব অশোভন হ'ত, অবিচারও। মেয়েটাই অসুস্থ হয়ে পড়ত হয়ত—সে মা-বাবার থেকে ঠাকুমাকেই বেশী চেনে। তার খাওয়া-নাওয়া ঘুম—সবই তিনি দেখতেন, রাত্রেও তাঁর কাছেই শুত। সুপ্রিয়া তাই মেয়েকে দেখাব জন্য কি তার খবরের জন্যও বিশেষ ব্যস্ত হয় না—যোগ্যপাত্রে তার ভার আছে জেনে নিশ্চিন্ত সে।

আর, যখন চলে আসে—তখন নিজেরই দাঁড়াবার জায়গা নেই বলতে গেলে। বাবা কাছেই থাকেন, কলকাতা থেকে বারো-তেরো মাইলের মধ্যে—সেখান থেকে আপিস কবার কোন অসুবিধাও হ'ত না—কিন্তু তিনি অত্যন্ত গোঁড়া ধরনের মানুষ, মেয়েছেলে স্বামী ত্যাগ করে চলে আসবে, এ তিনি ভাবতেই পারেন না। বিধবা হ'লে বুক দিয়ে আগলে রাখতেন—কিন্তু এ মেয়ের মুখ দেখাও পাপ তাঁর কাছে। 'For better or for worse,' মেয়েরা স্বামীকে গ্রহণ করবে এই তাঁর মত। আর তাঁর অমতে তাঁর বাড়িতে ওকে স্থান দেবে—মা বা ভাই কারও এমন সাহস নেই। সুতরাং তাকেই এসে হোস্টেলে উঠতে হয়েছিল। পরে ওর আপিসের এক সহকর্মিণী হেনার সঙ্গে এই ফ্ল্যাটটা পেয় বেঁচে গিয়েছিল। ছোট্ট ফ্ল্যাট, দু কামরার—কিন্তু দুজনেরই বেশ আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা ছিল বলে কোন অসুবিধে হয় নি। তবু, সেখানে মেয়ে এনে রাখা সম্ভব ছিল না, কার কাছে রাখত সে? মেয়ে সুখেই আছে, পড়াশুনো ভাল করছে—মিশনারী ইস্কুলে সে-ই ব্যবস্থা ক'রে ঢুকিয়ে দিয়েছে, আর কিছু ভাবার নেই। সে নিশ্চিন্ত আছে। দু-একবার যা দেখা হয়েছে এর মধ্যে—তাতে বুঝেছে যে মানুষই হচ্ছে, অমানুষ নয়।

ফলে, তার কথাও এখন এক রকম ভুলে থাকে, তার অস্তিত্বও। কখনও-সখনও মনে পড়ে—এই মাত্র। এমন কি মাসের দোসরা তারিখে টাকাটা নীলাদ্রির কাকীমার নামে মনি অর্ডার করার সময়ও ওদের সকলের কথা মনে পড়ে কিনা সন্দেহ, অনেক সময় যান্ত্রিক ভাবেই কাজটা ক'রে যায়—অন্যমনস্ক ভাবে।

মনে আজও পড়ত না—যদি না সত্যেশবাবু এমন জোর ক'রে—'ডেলিবারেটলি' মনে করিয়ে দিতেন।

সত্যেশবাবু আগেও আপিসে এসেছেন বারকতক। মানে প্রথম বিবাহিত জীবনেও। ওদের দুজকেই চিনতেন, চিনেছেন—গরজ ক'রে, গায়ে-পড়ে যাকে বলে। ধড়িবাজ লোক, মতলববাজ, তাঁর যা কাজ তাতে সুপ্রিয়ার একটু প্রসন্নতা প্রয়োজন। কতকগুলো কাজ আছে যা ছকে-বাঁধা নিয়মে পড়ে—সেই সব নিয়মের শর্ত পালিত হলে অফিসাররা সই করতে বাধ্য। আবার কতকগুলো কাজ অনেকখানিই অফিসারের মর্জির ওপর নির্ভর করে—তাঁর ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার ওপর। সেক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছে করলেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঘোরাতে পারেন। সত্যেশবাবুর কাজ কতকটা সেই ধরনের।

তবে সুপ্রিয়ার তেমন কোন মতলব ছিল না, নেইও। সত্যেশবাবু একটু ভুলই বুঝেছিলেন। সুন্দরী মেয়েদের—তথাকথিত 'পাত্র-চাই'-বিজ্ঞাপনের সুন্দরী নয়, যথার্থ সুন্দরী যারা—তাদের বাইরে পুরুষদের মধ্যে কাজ করতে গেলে আত্মরক্ষার জন্যেই একটা গাম্ভীর্যের বর্ম ধারণ করতে হয়। সুপ্রিয়া ঠেকে শিখেছে এটা। আপিসে ঢোকার প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করার চেষ্টা করেছে যারা—তাদের সংখ্যা অগণিত, সে সংখ্যার নিরূপণ শতকের ঘরে কুলোবে না। কে করে নি, তাই তো মনে পড়ে না তার। আপিসে তো বটেই, বাইরে থেকে যারা কাজে ও অকাজে আসত, তারা প্রায় সকলেই। সেই জন্যেই যত দিন গেছে গাম্ভীর্যের বর্মে আর এক পুরু ক'রে আস্তরণ লাগাতে হয়েছে।

সেইটেকেই অপ্রসন্নতা বা বদ মেজাজ বলে ভুল করেছেন সত্যেশবাবু। তাঁকে বা কাউকেই—অকারণে ঘোরাবার কোন বাসনা ছিল না সুপ্রিয়ার। কিন্তু সত্যেশবাবু সেই ধরনের লোক, যারা কাজটা এমনি হবে কিনা প্রশ্ন করার আগেই ঘুষের কথাটা পাড়ে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে—সুপ্রিয়ার কাছে আর্থিক ঘুষের ইঙ্গিত পর্যন্ত দেওয়া যাবে না—হয়ত কথাটা আগেই কারও কাছে শুনে থাকবেন, তাই তিনি অন্যভাবে, আত্মীয় হয়ে ওঠার জন্যে, উঠে পড়ে লেগেছিলেন। অন্য নির্বোধ কোন কোন পুরুষের মতো স্বামীকে বাদ

দিয়ে স্ত্রীর অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেন নি—একেবারে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে ধরেছেন।

তা সত্ত্বেও লোকটাকে দেখতে পারত না সুপ্রিয়া। হয়ত বা সেই জন্যেই। উৎকট স্বার্থপর লোককে কেউই দেখতে পারে না। বিশেষ সত্যেশবাবুর মতো লোক। সর্বদাই মুখটা হাসিতে আয়ত হয়ে আছে, দেখলেই বোঝা যায় কৃত্রিম হাসি। সুপ্রিয়ার মনে আছে ওর এক অধ্যাপক বলতেন, 'পৃথিবীতে হাসি এত সুলভ নয়, যে সর্বদা হাসে বুঝবে, সে একবারও হাসে না।' সত্যেশবাবুকে দেখলেই সেই কথাটা মনে পড়ে সুপ্রিয়ার—গাম্ভীর্যটাকে তাই আরও দৃঢ় ক'রে তোলে।

আজ বিশেষ একটু কাজ ছিল সত্যেশবাবুর, তাঁরও আজ এ গাম্ভীর্য না ভাঙলে নয়। তাই তিনি কাজ শেষ ক'রে—অথবা ঠিকমতো বলতে গেলে—আজও শেষ হ'ল না দেখে, ওঠবার ভঙ্গী করতে করতে কথাটা পাড়লেন, 'কাল যে ওবাড়িতে গিয়েছিলুম মিসেস বাসু। ঐ দিকে গিয়ে পড়েছিলুম, তাই ভাবলুম একবার ঘুরে যাই। নীলুবাবুকে পাবো ভাবি নি—কিন্তু লাকীলি পেয়ে গেলুম।'

'অ। তাই নাকি!'

সে যে এখন আর মিসেস বাসু কি বসু নেই, মিসেস চ্যাটার্জী হয়েছে, সেটা সত্যেশবাবু খুবই ভাল জানেন, ইচ্ছে ক'রেই পুরনো নামে সম্বোধন করলেন, পুরনো সম্পর্কটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে।

সুপ্রিয়াও সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করল না। লোকটার সম্বন্ধে এমনই বিতৃষ্ণা যে, এইটুকু ভ্রম সংশোধনে যে ব্যক্তিগত আন্তরিকতা স্বীকার করতে হয়—সেটুকুও করতে চায় না সে।

অন্যদিন অন্য সময় হ'লে—সত্যেশবাবুর ক্ষেত্রে অন্ততঃ সে, যাকে বলে 'পাথুরে নিঃশব্দতা' তাই অবলম্বন করত। এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চুপ ক'রে থাকা তার অভ্যাসও—কিন্তু আজ হঠাৎ এতদিন পরে প্রাক্তন স্বামীর নামটা এমন আচম্বিতে তার মনে ও মাথায় আঘাত করল যে, কী বলছে তা ভাববার আগেই বেরিয়ে গেল ঐ অর্ধ-বিস্ময়োক্তিটা।

সত্যেশবাবু এ সুযোগ ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি এই সামান্য

অনিচ্ছাকৃত প্রশ্রয়েই উৎসাহিত হয়ে বিস্তার করলেন বার্তাটা, 'হ্যাঁ, দেখলুম, শুনলুমও কিছু কিছু। নতুন মিসেস বাসুর সঙ্গেও আলাপ হ'ল। অনেকক্ষণ ছিলুম, প্রায় দেড় ঘণ্টা। চা-টা খেলুম—।'

তারপব, সুপ্রিয়ার দিক থেকে কোন বিরোধিতা বা বিরক্তি-কঠিন মুখভাব দেখা দেবার আগেই, অকারণে গলাটা নামিয়ে বললেন, 'নীলুবাবুকে কিন্তু খুব সুখী দেখলুম না। কেমন যেন মনমরা মনমরা ভাব, আগের সে এক্স্‌জুবারেন্স একেবাবে নেই—যেন কেমন মিইয়ে গেছেন ভদ্রলোক। চেহাবারও সে জেল্লা আর নেই, অমন সাহেবদের মতো রঙ যেন তামাটে মেরে গেছে।···মানে আসলে কি জানেন, ওঁব তো ঐ চিরদিনের বোহেমিয়ান স্বভাব, নতুন স্ত্রীটি কিছু শক্ত হাতে রাশ টেনেছেন মনে হ'ল, বেশ শাসনেই রেখেছেন।···খুব ম্যাটার অফ ফ্যাক্‌ট্‌ ভদ্রমহিলা—কড়া মেজাজেরও।'

এতক্ষণে অনেকটা নিজেকে সামলে নিয়েছে সুপ্রিয়া। এ সম্বন্ধে কোন কথা তার বলাও যেমন উচিত নয়, শোনাও তেমনি। এতটাই শোনা উচিত হয় নি। বাধা দেওযা উচিত ছিল কথার সূচনাতেই। বারণ করা চলত, কিংবা না শুনে নিজেই উঠে যেতে পারত। আসলে বড় বেশী চমক লেগেছিল বলেই এই কয়েক মুহূর্ত অমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

অনেক—অনেকদিন ভুলে ছিল সে নীলাদ্রিকে, তার বাড়ি সংসার মেয়ে—সবাইকে। এই গত তিন-চার মাস বোধহয়—তাব শরীরে নতুন অতিথির আগমনের সম্ভাবনা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই—নতুন ক'রে জীবনের কথা ভাবছে সে। তার এই নতুন সংসার, নতুন স্বামী, তার—তাদের ভবিষ্যৎ জীবন—সব কিছুরই নব মূল্যায়ণ হয়েছে তার কাছে। এতকাল কিছুতেই যেন খাপ খাওয়াতে পারে নি এই পরিবেশে, ঠিক নিজের বলে ভাবতে পারে নি এই সংসারকে। কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে, মনে হয়েছে অল্প কিছুদিনের জন্য আর কারো বাড়ি অতিথি হয়ে এসেছে সে। জীবনের প্রথম বিবাহে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটাই যেন তার কাছে বাস্তব, তারপর এটাকে আবার বাস্তব বলে সত্য বলে ভাবা কঠিন হয়েছিল।

এই এতদিন পরে সেই কুণ্ঠা ও সঙ্কোচটুকু চলে গেছে। সুপ্রিয়কেও অনুগত প্রণয়প্রার্থী বা প্রণয়ভিক্ষু থেকে—মালিক না হোক—সমান কোন প্রাণী,

জীবনের অংশীদার বলে ভাবতে শুরু করেছে। এই নতুন অভিজ্ঞতা, এই নতুন আবিষ্কার—জীবন সম্বন্ধে নতুন আগ্রহ, নতুন মমত্ববোধ এনে দিয়েছে। তার ফলে ওর পুরাতন জীবনের স্মৃতি কোথায় মিলিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল, এমন কি মেয়ের কথাও আর মনে ছিল না। ইদানীং কয়েক মাস হ'ল একটি ব্যক্তিগত স্টেনো পেয়েছে সে, সেই ভদ্রলোকই তার হয়ে মনি অর্ডার ফর্ম টাইপ ক'রে পাঠিয়ে দেন—ঐ একটা দিন যে মনে পড়ত, তাও পড়ে না। সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে এই নামটা যেন এক প্রবল আঘাতে পুরাতন স্মৃতির সামনেকার একটা বড় কপাট খুলে দিয়েছিল। একসঙ্গে যেন বিরাট ঢেউয়ের মতো অনেকগুলো স্মৃতি এসে আছড়ে পড়ছিল মনের ওপর। তাতেই —সমুদ্রের ঢেউয়ে বিপর্যস্ত হবার মতোই যেন হাঁপিয়ে উঠছিল সুপ্রিয়া—বাধা দেবার বা সে চেষ্টা করারও অবসর পায় নি।

তবে তার এতদিনের শিক্ষা—সরকারী অফিসার পদবীতে কাজ করার বিশেষ অভিজ্ঞতা তাকে সামলে দিয়েছে অল্পকালের মধ্যেই। সে এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'দেখুন—ওসব কথা যাক। দয়া ক'রে যদি অন্য কথা কিছু বলার থাকে তো বলুন।...তার জীবন আর আমার জীবন আমরা বুঝেসুঝেই আলাদা ক'রে নিয়েছি। আমিও যেমন আমার পথে গিয়ে সুখী হয়েছি—তিনিও তেমনি তার পথে যাবেন, সুখী হলেন কি অসুখী হলেন—তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার তো কোন দরকার দেখি না।...তবে, তিনি যাকে এতকাল পরে আবার জীবনসঙ্গিনী বলে বেছে নিয়েছেন, তাকে নিয়ে সুখে শান্তিতেই থাকবেন—আমরা এইটেই আশা করব।'

'বটেই তো, বটেই তো। মাপ করবেন, ঠিক ওভাবে—মানে বিশেষ কিছু ভেবেচিন্তে কথাটা বলি নি—'বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সত্যেশবাবু। তবে তিনিও বিচক্ষণ লোক, ভ্রূকুটির মধ্য থেকেও রমণীমনের কৌতূহল চিনতে ভুল হয় নি তাঁর। তিনি যেন যেতে যেতেই—অর্থাৎ যাবার ছল ক'রে বেশ জুৎ করে আবার বসে, গলাটা পূর্ববৎ নামিয়ে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন মিসেস বাসু, মাপ করবেন—মিসেস চ্যাটার্জী—আমার ধৃষ্টতা হয়ে যাচ্ছে হয়ত —মানে বলছিলুম কি, আপনি কি মনে করেন জানি না, আমি নিজেকে আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড, মানে পারিবারিক বন্ধু বলেই মনে করি। আর

এতদিনের অভ্যাস আপনাকে ঐ বাড়ির মেম্বার মনে করার—সেটা যেন কিছু-তেই যেতে চায় না।···আসল কথা কি, সত্যি বলছি—এক্স্‌কিউজ মি, নীলু-বাবুকে দেখে একটু মন খারাপই হয়ে গেল। শুধু যে মনে সুখ নেই, তা নয় —দেহটাও ভেঙেছে, বেশ রোগা হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। এরই মধ্যে যেন বুড়িয়ে গিয়েছেন। সংসারেরও সে শ্রী নেই আর—বোধহয় আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়—'

'কেন—' অতি সহজেই সত্যেশ বাবুর ফাঁদে পড়ে সুপ্রিয়া, তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বলে ওঠে নিজের অজ্ঞাতসারেই, সংযত সতর্ক হওয়ার সকল প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও—'উনি, মানে আপনাদের নীলাদ্রিবাবু তো এখন বাঁধা মাইনের চাকরি করছেন—কী একটা বিলিতি পাবলিসিটি ফার্মে, মাইনেও, যতদূর শুনেছি, খুব খারাপ নয়। ছ-সাতশো তো বটেই—এতদিনে হয়ত আরও বেড়ে থাকবে।'

'তা হবে। তবে যতই হোক, একজনের রোজগার তো! নতুন ইনি তো শুনেছি তেমন পাস-টাসও নন, নিতান্তই গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। কাজেই ইনি যে সেদিক দিয়ে কিছু সাহায্য করতে পারছেন, তা মনে হয় না। যাই হোক, চা খেয়ে এলুম, কাপের কানা ভাঙা, আপনার আমলে এ জিনিস আনথিংকেব্‌ল্‌ ছিল, স্যাক্রিলেজ। তখন তো কতদিন গেছি, সে পরিচ্ছন্নতা আমাদের গল্প করার জিনিস ছিল।'

কৌতূহল মানবমনের প্রধান দুর্বলতার একটি কারণ, সত্যেশবাবু তা ভালই জানতেন, তাঁর নিপুণ হাতের শর যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছয়।

'দেখুন—' আবারও তীব্র তিক্ত হয়ে ওঠে সুপ্রিয়ার গলা, 'ছোট্ট সংসার, ওদের তো এখনও কোন বাচ্ছাও হয় নি, মেয়ের খরচও ওকে বইতে হয় না, একজনের যেমন রোজগার, তেমনি কোন দায়ধাক্কাও তো নেই। তা ছাড়া অতিথি আগন্তুক ভদ্রলোককে এক কাপ চা দেওয়া কানা-ভাঙা কাপে—এটাতে ঠিক অর্থাভাব বোঝায় না, এটা গৃহিণীপণার অভাব, বাড়ির যিনি কর্ত্রী তার শিক্ষাদীক্ষার অভাব। আমাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারেন নি বলেই গরীব গেরস্ত ঘরের মেয়ে এনেছেন এবার, যে ওঁর সমস্ত উপদ্রব অত্যাচার সইবে, কোন প্রতিবাদ করবে না—কিন্তু একটা মোদ্দা কথা ভুলে গেছেন, যে যে-ভাবের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, তাকে সেই রকমের ঘর থেকেই মেয়ে আনতে

হয়। নতুন ক'রে বিয়ে করার আগে এসব ভেবে দেখা উচিত ছিল ভদ্রলোকের।'

উত্তেজনার মুখে কথাগুলো বলে ফেলেছে সুপ্রিয়া, কিন্তু বলতে বলতেই শেষের দিকে, অশোভন দুর্বলতাটা এবং—নিজেরই ভাষায়—শিক্ষাদীক্ষার অভাবটাও ধরা পড়ে গেছে নিজের কাছে। সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাউ এভার, সে তাঁর ব্যাপার তিনি বুঝবেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এবার দয়া ক'রে আসুন—আমাকে এখনই একটা কনফারেন্সে যেতে হবে। অলরেডি দু মিনিট দেরি হয়ে গেছে।'

'অবশ্য, অবশ্য, নিশ্চয়ই। ভেরি সরি মিসেস বা—মিসেস চ্যাটার্জী। আমি যাচ্ছি, এখনই। নমস্কার।'

সেটা বেলা আড়াইটের কথা। কাজ অনেক ছিল, তার পরও—অনেক কাজের কথা মনে করিয়েও দিয়েছিল তার বড়বাবু—কিন্তু কোন কাজেই আর মন দিতে পারল না সুপ্রিয়া। এটা তার কাছেই একটা বিস্ময়, আর সে বিস্ময়ের ধাক্কাও বড় কম নয় তার মনের ওপর। এ ধরনের মনোভাব যে তার কখনও হতে পারে, হওয়া সম্ভব—এইটেই সে জানত না। এখনও যে সহজে স্বীকার করল তা নয়—নিতান্ত অস্বীকার করা গেল না তাই—এক সময় মেনে নিতে বাধ্য হ'ল।

স্টেনোকে ডেকে দু-একটা চিঠির জবাব দিতে গেল—সুবিধে হ'ল না। কেবলই গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। সে ভদ্রলোক ঈষৎ বিস্মিত হয়ে মুখের দিকে চাইতে অকারণেই একটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ পেশ করল, 'শরীরটা আজ ভাল নেই সুবীরবাবু, মাথাটা বড্ড ধরেছে—'

চকিতে একটা যেন চাপা হাসির আভাস খেলে গেল সুবীরের মুখে। ওর শরীরের খবর ইতিমধ্যেই আপিসে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, মাস তিন-চার অনুপস্থিত থাকতে হবে—সে খবরটায় অনেকের বেশী প্রয়োজন—রাষ্ট্র হবার কারণ আরও সেইটে। হাসিটা সেই খবরের কারণেই—সস্নেহ কৌতুকের।

কিন্তু ওপরওলা সম্বন্ধে এ ধরনের কৌতুকের ভাব থাকা উচিত নয় ভেবেই মুহূর্তে সামলে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সুবীর, 'তাহলে মিছিমিছি আর এসব—।

আজ থাক না বরং। আপনার তো কিছুই প্রায় এরিয়ার নেই কাজের, অন্য সব অফিসাররা সাত-আট মাস পিছিয়ে আছেন দেখুন গে। আজ এসব থাক।'

তবু কী একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়া, সুবীর উঠে দাঁড়াল একেবারে, 'না না—আমি আর কোন ডিক্‌টেশান নেব না আপনার। সে কৈফিয়ৎ দিতে হয় আমিই দেব।...আপনি একটু রেস্ট নিন।...একটা কোন মাথাধরার বড়ি আনিয়ে দেব নাকি? আপনার এ অবস্থায়—মানে কোন ক্ষতি হবে না তো? আমি ঠিক জানি না—'

এটাও নিম্নতম কর্মচারীর পক্ষে ধৃষ্টতা—এই 'অবস্থা'র ইঙ্গিতটা—কিন্তু তার আন্তরিকতা বুঝে কোন দোষ নিলেন না ওপরওলা, বরং অভয় দিয়ে বললেন, 'না না, ও আমার ব্যাগেই থাকে। আপনি যান, আমি একটু চোখ বুজে বসে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

তার পরও, মনকে শাসন ক'রে একটা ফাইল নিয়ে বসেছিল সুপ্রিয়া, কিন্তু সে সব কাগজপত্রের একটা বর্ণও মাথায় ঢোকে নি। তখন চুপ ক'রেই বসে থেকেছে।

নীলাদ্রি কালো হয়ে গেছে, রোগা হয়ে গেছে। মনমরা হয়ে থাকে।

সেই নীলাদ্রি, যার রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়ে বাবার খানিকটা অমতে বিয়ে করেছিল। বাবা বলেছিলেন, 'প্রথমত লেখাপড়া প্রায় কিছুই শেখে নি। তুমি ইক্‌নকিক্‌সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মেয়ে, কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষায় পাস করে চাকরি পেয়েছ—এ অহঙ্কার, তুমি যতই বলো, ত্যাগ করতে পারবে না। নীলাদ্রি ম্যাট্রিক পাস, আর্ট স্কুল থেকে পাস করেছে—কিন্তু সকলেই জানে যে আর্ট স্কুল থেকে পাস করতে লেখাপড়া লাগে না।...এসব জেনেও শ্রদ্ধা করতে পারবে তো? স্বামীর ওপর ভালবাসা—তুমি ভাবছ এসব ওল্ড ফ্যাশণ্ড, কিন্তু আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি—স্বামীর ওপর যদি শ্রদ্ধা এবং কিছুটা সম্ভ্রমের ওপর ভিৎ ক'রে না গড়ে ওঠে সে ভালবাসা দাঁড়ায় না। তুমি এখন যাকে ভালবাসা ভাবছ, সেটা মোহ—রূপজ মোহ। দৈহিক আকর্ষণ ছাড়া কিছু নয়।'

আরও বলেছিলেন বাবা, 'তা ছাড়া—অর্থের প্রশ্নও আছে। আর্টিস্টরা আজকালকার দিনে যত ভাল রোজগারই করুক—কতটা ঠিক আনতে পারবে, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। আগে রাজা মহারাজারা একজিবিশ্যানে

আসত, বুঝুক না বুঝুক, ভাল লাগুক না লাগুক—নিজেদের প্রেস্টিজের খাতিরে এক-আধখানা কিনত। এখন তো রাজাই রইল না কেউ—সব বাড়িওলা হয়ে গেল। তোমার টাকাতেই হয়ত সংসার চালাতে হবে। পারবে তার পরও শ্রদ্ধা রাখতে—? ভেবে ছাখো।'

ভেবে দেখে নি সুপ্রিয়া—বলাই বাহুল্য। ভগ্নিপতির বন্ধু হিসেবে পরিচয়, এ বাড়িতে যাতায়াত। দিদি সুলতারও খুব ইচ্ছে ছিল নীলাদ্রির সঙ্গে সুপুর বিয়ে হয়। বড় বংশের ছেলে, কলকাতায় নিজের বাড়ি, অন্য কেউ নেই—অমন রূপবান—খারাপ কি পাত্র? ফাইন আর্টসএ কিছু না হয় কমার্শিয়াল লাইনে যেতে কতক্ষণ?

সুলতা বুঝিয়েছিল, সুপ্রিয়াও বুঝেছিল। আসলে বুঝতেই চেয়েছিল সে। রূপ, উছলে-পড়া কান্তি—আর একটু 'বোহেমিয়ান' ভাব, সব মিলিয়েই চোখে নেশা লেগেছিল সুপ্রিয়ার। মনে হয়েছিল দামাল শিশুকে যেমন মা সামলে নিয়ে চলে, তেমন সেও ওকে প্রশ্রয় দিয়ে, সেবা দিয়ে সদাজাগ্রত থেকে সামলে নিয়ে চলবে। ইংরেজী ফরাসী উপন্যাসে এই ধরনের শিল্পীর কথাই পড়েছে সে, তাঁদের স্ত্রীরা নিজেদের 'নিজত্ব'কে সম্পূর্ণ রূপে বিলোপ ক'রে দিয়ে কেমন ক'রে স্বামীর শিল্পীসত্তাকে বিকশিত ক'রে তোলে। সেও না হয় তেমনি ভাবে নিজের সুখ-সুবিধা সব বিলিয়ে দেবে স্বামীর জন্যে।

এসব বড় বড় কথা সেদিন নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্যেই ভেবেছিল। আসল আকর্ষণটা ছিল নীলাদ্রির পরমসুন্দর চেহারারই—সে-কথা আজ আর গোপন ক'রে লাভ নেই।

সেই নীলাদ্রি কালো হয়ে গিয়েছে, কৃশ হয়ে গিয়েছে। মনমরা হয়ে থাকে।...যার ভাবনা চিন্তা বিবেচনা বলে কিছুই ছিল না জীবনে—ছিল শুধু ভাবোচ্ছলতা, আবেগ আর আনন্দ।

মরুক গে, সুপ্রিয়া আর কি করবে! যে যার জীবন বেছে নিয়েছে। এ বিয়েও দেখেশুনেই করেছে—নিজের পছন্দমতো। যে ওর কথা ভাবত, ওর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে উদ্বিগ্ন ব্যস্ত থাকত—তাকে তো ধরে রাখার চেষ্টা করে নি, কোন মূল্যই দেয় নি তার। জীবনটা যে শুধু হৈচৈ ক'রে কাটিয়ে দেবার জিনিস নয়—বুঝুক এইবার, 'হিসেব' 'বিবেচনা' কথাগুলো নাকি নিতান্তই 'বেণে-

সুলভ', তাই ও ব্যাপারগুলো বাদ দিয়েই সে জীবন কাটাতে চায়। সৌভাগ্য-ক্রমে সুপ্রিয়ার মতো স্ত্রী পেয়ে গিয়েছিল বলে বোধহয় ভেবেছিল যে সব স্ত্রীই এই রকম হয়। সেই জন্যেই এই স্ত্রী মন্দিরাকে—মন্দিরাই তো যেন মনে হচ্ছে নাম মেয়েটার—বিয়ে করার সময়, স্কুলফাইন্যাল পাস করার পর আর লেখা-পড়া করে নি—এই একমাত্র গুণেই পছন্দ করেছিল। আর কিছু ভেবে দেখবার দরকার আছে মনে করে নি।…

বেশ হয়েছে। কাঠ খেলে আঙরা বমি করতে হয়। আগুনে হাত দেবে অথচ হাত পুড়বে না—তা হয় না। সুপ্রিয়ার অত চিন্তার কি আছে। সে লোক, সে জীবন ছেড়ে দিয়ে এসেছে চিরদিনের মতো। তাদের কথা ভুলেই গেছে। আর কেন?

কতকটা নিজের ওপর বিরক্ত হয়েই উঠে পড়ল সুপ্রিয়া। পাঁচটা বাজে, আর বসে থাকার কোন কারণও নেই। সুপ্রিয়র সঙ্গে বিয়ে হবার পর সে নিত্য—যেন ritual বা ধর্মানুষ্ঠান হিসেবেই ওকে পৌঁছে দিয়ে যায় আপিসে আবার ছুটির পর নিয়ে যায়। যেদিন কাজের চাপে একান্তই আসতে পারে না বা আগে বেরিয়ে যেতে হয়—সেদিন ড্রাইভার পৌঁছে দেয় ওকে, সুপ্রিয় নিজে ট্যাক্সিতে যায়। 'সুপু' ট্যাক্সিতে বা বাসে আসবে—এ কথা সে ভাবতেই পারে না। এ নিয়ে সুপ্রিয়া অনেক অনুযোগ করেছে, বলেছে, 'অব্যেস খারাপ ক'রে দিচ্ছ। তা ছাড়া যে মাইনের চাকরি করি, তাতে গাড়ি রাখা যায় না সবাই জানে, নামেই গেজেটেড অফিসার, মাইনে তো কত—অতবড় গাড়ি থেকে নামলে লোকে যে সন্দেহ করবে, ভাববে ঘুষ খাই। আমার হাত দিয়ে বহু টাকার বিল পাস হয়, তা জানো?'

কিন্তু সে-সব কথায় কান দেয় নি সুপ্রিয়। বলেছে, 'যারা এত তোমাকে চিনে রেখেছে—তারা এ খবরও নিশ্চয় রাখবে যে, এ দাসানুদাস আড়াই হাজার টাকার ওপর রোজগার করে মাসে, এ গাড়িখানার খরচও তার কোম্পানী দেয়। নো ফীয়ার, ওসব বাজে কথা ভেবে অকারণে মন খারাপ ক'রো না।'

এখন কিন্তু এ ব্যবস্থায় ও কৃতজ্ঞতাই বোধ করে। শরীরের এই অবস্থায়

ধাক্কাধাক্কি করে ট্রামে বাসে চড়া—বিপজ্জনক তো বটেই, লোকের উপহাসেরও পাত্রী হওয়া।

আজ একটু বিশেষই কৃতজ্ঞ বোধ করল গাড়িতে চড়ে বসে, সুপ্রিয় আসে নি, ড্রাইভার পাঠিয়েছে। তা হোক, আরও ভাল। বড্ডই যেন একটা ঝাঁকানি লেগেছে মনের গোড়ায়। অথচ কেন যে লাগল, সেইটেই বুঝতে পারছে না বলে এত অস্বস্তি। এখন কিছুটা চুপ ক'রে থাকতে পারাটাই প্রয়োজন।··

আশ্চর্য! অনেকদিন তো হয়ে গেল। যতদিন তারা বিবাহিত জীবন যাপন করেছে, তার ডবলেরও বেশী। মোট তিন বছর ওরা ঘর করেছে, তাও শেষের বছরটাকে ঠিক ঘর-করাও বলা চলে না। সে সময়টা সুপ্রিয়া বেশীর ভাগই কাটিয়েছিল বাপের বাড়ি বা দিদির বাড়ি বা কোন বন্ধুর বাড়িতে। দেখাতে চেয়েছিল যে ওর অনুপস্থিতিতে, ওর বিরহে ওর মূল্য বোঝে কি না নীলাদ্রি, ওর জন্যে নিজের জীবনযাত্রাকে কিছুটা পাল্‌টাতে চায় কিনা।···

কোন ফলই হয় নি অবশ্য, শেষে চলেই আসতে হয়েছে। অবশ্য ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে আসে নি। কোন অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা ক'রেও না।···শান্ত ভাবেই বলেছে, 'ছাখো একটা ভুল হয়ে গেছে বলেই সারা জীবনটা সেই ভুলের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে, তার মানে নেই—' একটু নভেলিয়ানাই হয়ে গিয়েছিল, কোথায় যেন কোন বইয়ে ঠিক এই কথাগুলোই পড়েছে সে, 'আমাদের এখন পরস্পরের জীবন থেকে সরে যাওয়াই ভাল। আমাদের দুজনেরই এখনও বয়স আছে—নতুন ক'রে জীবন গড়ে তোলার। তাও যদি না চাও, স্বাধীনভাবেই থাকো, যা তুমি ভালবাসো। আমাকেও স্বাধীনভাবে থাকতে দাও। এ বিবাহিত জীবনের পরিহাস আর আমার সইছে না।···আশা করি, আমাকে তুমি ভুল বুঝবে না।'

ভুল বোঝেও নি। সদাপ্রদীপ্ত মুখ নীলাদ্রির ম্লানও হয় নি। হাসি মুখেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, হাতে হাত দিয়ে ঝাঁকানি দিয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর বলেছিল, 'কী বলবো বলো। যাও, একথাটা বলব না, তোমার যা খুশি তাই করো—যাতে তুমি সুখী হও। আমাকে তো জানোই —"আসা যাওয়া দুদিকেতে খোলা রবে দ্বার, মনে করাবো না আমি শপথ তোমার।" বিয়ের আগেও যে কথা বলেছিলুম, এখনও সেই কথাই বলছি।···

তাহ'লে এখন কি বলব, ও রিবোয়া—না গুডবাই ?'

'গুডবাই-ই ভাল।' উত্তর দিয়েছিল সুপ্রিয়া।

কিন্তু বেরিয়ে আসার সময়টাতে যা করেছিল নীলাদ্রি, ঠিক তার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিল না ও। দরজার কাছ পর্যন্ত এসে হঠাৎ সবলে ও সজোরে বুকে চেপে ধরে, সুপ্রিয়ার প্রবল বাধা সত্ত্বেও প্রচণ্ড এক চুমু খেয়েছিল। ঠিক সেই যেমন বরাবর, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় খেত—বিয়ের আগেও, পরেও। আবেগ-সর্বস্ব লোক নীলাদ্রি, আবেগের মাথায় কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তার কোনদিনই। সেদিনও—অত তিক্ততার পরও হাসিমুখে বলেছিল, 'কি করব, আমার কোন দোষ নেই, তুমি অত লাভলি হলে কেন ? এখন এই—হয়ত বা চিরবিদায়ের আগে শেষ স্পর্শটুকু আদায় না ক'রে ছেড়ে দিতে পারি ?···য়্যাব্‌সার্ড !···পুরনো দিনের গ্রীস হলে আইন ক'রে দিত—তুমি রাস্তায় বেরোলে যে খুশি চুমো খেতে পারবে—জানো ?'

সেদিন কথাগুলো ভাল লাগে নি। সে চুম্বনও বিষ ছড়িয়েছিল—কিন্তু পরবর্তীকালে, কোন্ এক বিচিত্র কারণে সেই সজোর বলিষ্ঠ আলিঙ্গন আর সেই দীর্ঘকাল-ব্যাপী কঠিন চুম্বনের স্মৃতি কেমন যেন রোমাঞ্চই জাগিয়েছে বার বার। এখনও জাগাচ্ছে—এই গাড়িতে বসে কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ···সে যখনই আদায় করত, অমনি দস্যুর মতোই, নির্মমভাবে। তবু আজ যেন —আজ যেন মনে হয় সেইটেই কাম্য। যুগ যুগ ধরে কেন যে সুন্দরী নারীরা স্বেচ্ছায় বর্বরদের কামনা করেছে, ইচ্ছে ক'রে ধরা দিয়েছে তাদের কামালিঙ্গনে—এই থেকেই যেন বুঝতে পারে কতকটা।

বাড়ি ফিরে দেখল, সুপ্রিয় ওর আগেই পৌঁছে গেছে। বোধহয় কাজ কিছু বাকী রেখেই চলে এসেছে। স্ত্রীকে আনতে যেতে পারে নি, তার ক্ষতি, পূরণের জন্যে আগে থেকে এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে আসতে একটু হাসল সুপ্রিয়া। কিন্তু যে ভালবাসে, তার কাছে সে হাসির ক্লিষ্টতা চাপা রইল না। সুপ্রিয় উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসে ওর হাত দুটি ধরল, 'কী হয়েছে সুপু ? মুখটা অমন শুকিয়ে গেছে কেন ? শরীর খারাপ লাগছে ? মাথা ধরেছে ?'

'প্লীজ, অমন অস্থির হয়ো না তো!' অকস্মাৎ যেন একটা প্রবল উষ্মা বোধ করে সুপ্রিয়া, 'শরীর যদি খারাপ হয়েছে বলেই মনে করো—তাহলে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াটাই আগে দরকার নয় কি? বসিয়ে বা শুতে দিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। অমন পথ আটকে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ চাইতে নেই।'

'সরি। সত্যিই আমার অন্যায় হয়ে গেছে,' যেন এতটুকু হয়ে যায় সুপ্রিয়, তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পথ ক'রে দেয়, তারপর কিছুটা অর্ধস্ফুট কণ্ঠে যেন ভয়ে ভয়ে বলে, 'না, মানে তোমার মুখটা বড্ড শুকিয়ে গেছে বলেই—। মুখে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে কে—'

সুপ্রিয়া এসব কথার কোন জবাবই দেয় না। ঘরে ঢুকে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে অবসন্ন ভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। অন্যদিনের মতো সোজা ওদের শোবার ঘরের পাশে ছোট্ট ড্রেসিং রুমটায় চলে যায় না।

'সরলাকে একটু জল দিতে বলো তো—ঠাণ্ডা।' পিছনের দিকে না চেয়েই স্বামীর নিকট-উপস্থিতিটা যেন বুঝতে পারে। সামনে আসার বা পাশে এসে গায়ে হাত দেবার সাহস নেই তার—কিন্তু দূরেও কোথাও যায় না, এটাও নিশ্চিত। পিছনে দাঁড়িয়ে ওর প্রসন্ন মেজাজের অপেক্ষা করছে। তাই অনায়াসে তাকেই ফরমাশ করে।

অনুগৃহীত সুপ্রিয় তখনই ছুটে ভেতরে যায়। তারপর ফিরে এসে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'একবার কি ডাক্তারকে একটু ফোন ক'রে দেখব আছে কিনা?…থাকলে আসতে বলব?'

'কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুপ্রিয়া।

'না। মানে—শরীরটা তোমার খুব ক্লান্ত হয়েছে বুঝতে পারছি—তাই বলছিলুম, একবার না হয় দেখেই যেত—?'

'হোয়াই শুড্ ইউ বদার সো মাচ? কী হয়েছে কি আমার? ক্লান্তই যদি হয়ে থাকি—বিশ্রাম নিতে দাও চুপ ক'রে, সেইটেই তো আগে দরকার।'

'না না—তা ঠিক। তবে এই অবস্থায়—'

'আঃ!…অবস্থা, অবস্থা। এই এক কথা শুনতে শুনতে গেলুম আমি। আপিসে বাড়িতে—সর্বত্র। এমন জানলে—সত্যি বলছি—আমি এই

অবস্থার ফাঁদে পা-ই দিতুম না।'

আর কিছু বলতে সাহস করে না তার মালিক। স্ত্রী সম্বন্ধে তার ভয় —ইংরাজীতে যাকে বলে awe—কিছু মাত্র কমে নি। মাস্টারের কাছে বকুনি খাওয়া ছাত্রের মতোই মুখ কাঁচুমাচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। পিছনেই থাকে —কিন্তু আর একটিও কথা বলতে সাহস করে না।

তুলনাটা আপনিই মনে আসে সুপ্রিয়ার—না আনবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও। মনে পড়ে নীলাদ্রির কথাই। ওর আপিস থেকে ফেরার সময় কোনদিনই প্রায় বাড়ি থাকত না, থাকলেও ঘুমে অচেতন হয়ে থাকত। যেদিন দৈবাৎ দুপুরে ঘুমোত সেদিন সন্ধ্যার আগে উঠত না এবং ফলে সারারাত জেগে থাকত ও জাগিয়ে রাখত। কিন্তু দৈবাৎ কোনদিন বাড়িতে থাকলে ও জেগে থাকলে—এক কাণ্ডই ক'রে বসত। কাকীমার সামনেই হয়ত জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে শুরু করত। বলত, 'কী করব, তুমি ক্লান্ত হয়ে যখন ফেরো, মুখটা একটু শুকিয়ে যায়, চোখের কোণে কালির আভাস লাগে—কী সুন্দর যে দেখায়! মনে হয় দীর্ঘকাল কোথাও লাম্পট্য ক'রে উঠে এলে! সত্যি বলছি, এই অবস্থার একটা ছবি আমি আঁকবই—'

না, ভালবাসবার বা সেটা প্রকাশ করার কোন অভাব ছিল না তার—এটা সুপ্রিয়াও মানতে বাধ্য। একটা ভুল ধারণা—শিল্পীর পক্ষে ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনটাই প্রয়োজন—বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল বলেই যত অশান্তি। কিন্তু তাই বলে মদ—সঙ্গে পড়ে একটু-আধটু খেত না তা নয়—মাতাল কখনও হয় নি বা অন্য মেয়েকে নিয়ে মাতামাতি করেছে, এমন কথাও কখনও শোনে নি।

আসলে তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতাটাই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিয়ে করেছে, মেয়ে হয়েছে—এখন কিছু যে একটা করা দরকার, কোন উপার্জনের চেষ্টা- সেটা তার মাথাতে ঢুকত না কিছুতেই। নিজেকে শিল্পী বলে মনে করত, অহঙ্কারও ছিল যথেষ্ট—সেই ছবিটাও যদি আঁকত! ঘরে যার সুন্দরী স্ত্রী, অন্তত সে যাকে সুন্দর মনে করত—সে স্ত্রীর ছবিও এতদিনে একখানা আঁকল না। কখনও-সখনও আড্ডা দেবার কোন সুবিধে না থাকলে কাজে বসত, আধঘণ্টা এক ঘণ্টা বড় জোর—তারপরই উঠে পড়ত—যা কিছু করেছে, নষ্ট ক'রে ফেলত তখনই—'বাজে' বলে! ভাল শিল্প সৃষ্টির 'মুড'ই তার কখনও

এল না এতদিনে। চারিদিকে এত প্রদর্শনী হ'ত—বন্ধুবান্ধবরা প্রশ্ন করত—কিন্তু নীলাদ্রির পাঠাবার মতো ছবি একখানাও তৈরী হ'ত না। সুপ্রিয়া নিজে দু-একটা পোট্রেট আঁকবার অর্ডার এনে দিয়েছে ; ভাল মোটা-টাকার কাজ—করব বলে হাতে নিয়েও শেষ অবধি একখানাও করে নি। হয়ত খানিকটা ক'রে ফেলে রেখেছে, হয়ত বা আদৌ হাত দেয় নি। তাদের কাছে সুপ্রিয়া অপ্রস্তুত হয়েছে।

আসলে প্রাচীনপন্থী বাবার কাছে মানুষ সুপ্রিয়া, লেখাপড়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপিসে ঢুকেছে—চিরকাল সুসংযত, নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। ওর এই ধরনের মানুষকে বিয়ে করাই উচিত হয় নি। তার ওপর এতগুলো টাকা মাইনে এনে সংসারে ঢেলে দেওয়াটা আরও ভুল হয়েছে। উপার্জন বা কাজের কথা তুললেই বলত, 'কেন, বেশ তো চলে যাচ্ছে, আটকাচ্ছে কোথায় ?'

'চলে যাচ্ছে আমি টাকা আনছি বলে। স্ত্রীর টাকায় সংসার চালিয়ে কুড়েমি করা পুরুষের পক্ষে খুব গৌরবের নয়।'

তিক্ত কঠিন হবারও চেষ্টা করেছে বৈকি সুপ্রিয়া।

কিন্তু সে অবিচল স্থৈর্য কিছুতে টলাতে পারে নি। মুখের নির্মল কৌতুকের হাসিটাও পারে নি ম্লান করতে। হেসেই জবাব দিয়েছে, 'কেন আবহমানকাল থেকে পুরুষে রোজগার করেছে, তাদের বৌরা বসে খেয়েছে, তাতে যদি দোষ না হয়ে থাকে, তো এতে হবে কেন ?'

অবশ্য উপার্জনের প্রশ্নটা সত্যিই খুব বড় ছিল না সুপ্রিয়ার কাছে, এটা সে জোর ক'রেই বলতে পারে। আসলে ঐ কুড়েমি এবং নির্লজ্জতাটাই বেশী লাগত ওর। আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা—থাকা খাওয়া বাড়িতে আসা, কোনটারই কিছু ঠিক ছিল না। কাকী ভাল মানুষ লোক—ভালও বাসেন ভাসুরপোটিকে যথেষ্ট—তিনি সব সহ্য করতেন। তিনি একতলায় সদরের কাছে বসে বসে ঢুলতেন দরজা খুলে দেবার জন্যে—তাও হয়ত সারারাতই বসে বসে কেটে যেত, আদৌ ফিরত না নীলাদ্রি। কোথায় যাচ্ছে, কত রাত হবে বলেও যেত না। বলত, 'বা রে, তা কি জানি! অত ভেবেচিন্তে হিসেব ক'রে বাঁচা যায় নাকি ? তুমি তো জলে পড়ে নেই। অত হিসেব করা, পরের দুঃখ বিবেচনা

করা আমার ধাতে পোষাবে না। ও রকমের বেণেবুদ্ধি থাকলে আর্টিস্ট হবো কেন? তাহলে তোমার মতো কেরানীগিরি করতুম। ওআন ইজ এনাফ ইন এ ফ্যামিলি।'

'আমার মতো কেরানীগিরি করতে গেলে অন্তত আরও দুটো পাশ দিতে হতো, ইচ্ছে করলেই করা যায় না।...আর আর্টিস্টও তো ভারী, তবু যদি একখানা ছবিও আঁকতে দেখতুম! এর চেয়ে কেরানীগিরি করা আমার ঢের গৌরবের।'

'দেখবে দেখবে। যেদিন মনের মতো ছবি একখানা ফিনিস করব সেদিন —"বিশ্বলোক ভাবিবে বিস্ময়ে, যাহার পতাকা অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে কোথা ছিল ঢাকা"!...রাশিরাশি বাজে জিনিসই যদি প্রোডিউস করব তো আর্টিস্ট কিসেব? ..তোমাদের রবিঠাকুরই বোধহয় লিখেছেন না?—সোনার তাল কেউ মাথায় পরে না, তার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক ভরে দিলে তবে মুকুট হয়, রাজার মাথায় বসে। শিল্পীব অবসর চাই বই কি!'

এসব কথায় হাড় পর্যন্ত জ্বালা করাই স্বাভাবিক। জ্বলে যায়ও।

এমনি করেই ছোট ছোট মতান্তর থেকে মনান্তরে দাঁড়ায়। সবচেয়ে অসহ্য লাগে ওর কৃতজ্ঞতার অভাব। কেরানীগিরির টাকাতেই সংসার চলছে, সেই কেরানীগিরিরি ওপরই সীমাহীন অবজ্ঞা।

তবুও হাল ছাড়ে নি সুপ্রিয়া। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল একদিন, ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে বসল সে-ই। মাইনের টাকা এনে আগের দিন দেরাজে রেখেছিল। পরের দিন সকালে কিছু কিছু মোট খরচ করার পর বাকী টাকা গুছিয়ে থাক দিয়ে রেখে দিয়েছিল সেখানেই। এইভাবেই থাকে, চাবি থাকে বালিশের নিচে। একটা বুড়ো চাকর আছে, সেও বহুকালের লোক, তাকে অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।

কিন্তু আপিসে যাবার সময় খুচরো কিছু টাকা বার করতে গিয়ে দেখল এক থাক নোট কম—ঠিক পুরো একশোটি টাকা।

জিজ্ঞাসা করতে চাকর রামপূজনই খবরটি দিল, কে একজন কন্যাদায় জানাতে এসেছিল, তাকে পুরো একশো টাকাই দিয়ে দিয়েছে নীলাদ্রি। হঠাৎ

যেন মাথায় আগুন জ্বলে উঠল সুপ্রিয়ার, নিচের ঘরে এসে বলল, 'কার টাকায় নবাবি করতে যাও তুমি! পরের ধনে পোদ্দারি করতে লজ্জা করে না!'

'ভারি তো টাকা! আজকালকার দিনে একশো টাকার কম কাউকে দেওয়া যায় নাকি?'

'ঐ একশটা টাকা রোজগার ক'রে নিয়ে এসো দিকি আগে, তারপর কথা বলো। যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওটা উপার্জন করতে হয়—তারা জানে ভারী কি হালকা!'

'আরে, টাকা রোজগার তো কেরানীরাও করে—এমন কিছু কঠিন কাজ নয়!' এই অপরিসীম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, আর বার বার ঐ এক কেরানীগিরির খোঁটায় মুহূর্তের জন্য চোখে সব লাল দেখেছিল সুপ্রিয়া, এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার, বাবার উপদেশ সব ভুলে টেনে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল নীলাদ্রির গালে।...

সঙ্গে সঙ্গেই কাজটার অসমীচীনতা ও অপমান উপলব্ধি করেছিল সে, লজ্জা ও কুণ্ঠার সীমা ছিল না! নীলাদ্রি যদি কিছু না বলে উঠে যেত, কি চুপ ক'রে থাকত, তাহলে হয়ত তখনই ছুটে গিয়ে পায়ে পড়ত ও। কিন্তু নীলাদ্রি সে রকম কোন ভদ্র সংযত আচরণেই অভ্যস্ত নয়—সে পালটা তিন-চারটে চড় মেরে বসল ওকে। পরুষ বলিষ্ঠ হাতের চড়, সুপ্রিয়ার শুভ্র সুন্দর কপোলে আঙুলের দাগ বসে গেল তার। কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখল।

আজ বোঝে যে চিরশিশু নীলাদ্রি মনে মনে কখনই সাবালক হয়ে উঠতে পারে নি। খেলার সাথীতে সাথীতে যেমন মারামারি করে, সেই ভাবেই নিয়েছিল ব্যাপারটাকে, কিন্তু সেদিন তা ভাবতে পারে নি। তখনই বেরিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। বর্বর গুহাবাসী যুগের মেয়ে নয় সে, যাদের চুলের মুঠি ধরে ঠেঙিয়ে আবার ইচ্ছামতো সম্ভোগ করা যায়—তাদের একজন যে ও নয়—সেটা বুঝিয়ে দেবে ঐ ইতর পশুটাকে।

তাতেও বোঝে নি নীলাদ্রি। আবারও সুপ্রিয়াকেই আসতে হয়েছিল, বাবা-মার তাড়নায়। তাঁরা নাকি আত্মীয় সমাজে মুখ দেখাতে পারছেন না।

তবে ভাঙা মন আর জোড়া লাগে নি। নীলাদ্রিকে যদি নিজের ব্যবহারের

জন্য এতটুকু অনুতপ্ত দেখত, কি এতটুকু পরিবর্তনের প্রয়াস দেখত তার ব্যবহারে—তাহ'লে কী হ'ত তা বলা যায় না।···নীলাদ্রি কিন্তু সেদিক দিয়েই গেল না। সুতরাং এই চরম পথই নিতে হ'ল তাকে। বাবা মার মুখ চেয়ে, তাঁদের আত্মীয় সমাজের কাছে 'প্রেস্টিজ' বজায় রাখার জন্যে এমন ক'রে তিলে তিলে ভস্মাবশেষে পরিণত হ'তে পারবে না সে।··

অবশ্য এই আঘাতেই কাজ হয়েছে। বাঁধা মাইনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ঘুচে যেতে তাকে কাজ খুঁজতে হয়েছে, চাকরিও করতে হচ্ছে। এত দিন যখন চাকরিতে টিকে আছে, তখন পোষ মেনে গেছে বুঝতে হবে, পোষ মেনেছে অশিক্ষিত স্ত্রীর কাছেও। ভীষণ নাকি জেদী আর প্রখরা এই বৌটি। ঝগড়ার সময় যে সব ভাষা বেরোয় তার মুখ দিয়ে, তাতে কানে আঙুল দিতে হয়। একথা আগেও অন্য লোকের মুখে শুনেছে, সত্যেশের কথাতেও সেটা সমর্থিত হ'ল।

কে জানে এখন প্রথম স্ত্রীর মূল্য বুঝছে কিনা। এই এখন তার মতো—সেও সুপ্রিয়ার কথা চিন্তা করছে কিনা!

সেই বদলাল—যদি আগে বদলাত, আগে একটু বুঝত পৃথিবীটা, জীবনটাকে চিনত একটু!

কিন্তু এখন যা দাঁড়িয়েছে, সেই পোষমানা মিইয়ে-যাওয়া নীলাদ্রিকে কি ভাল লাগত সুপ্রিয়ার?

ঐ প্রাণ-প্রাচুর্য, ঐ বেপরোয়া ভাব, দুনিয়ার সব কিছুকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা—দস্যুর মতো সম্ভোগ করা জোর ক'রে—ঐটেই কি ভাল লাগেনি সুপ্রিয়ার? এখনও কি বসে বসে কতকটা নিজের অজ্ঞাতেই সেই অভাব বোধটার কথাই ভাবছে না—নিজের বর্তমান স্বামীর একান্ত বশম্বদ ভাবটার চিন্তা ক'রেই—?

ছি ছি! যেন কে এক ঘা চাবুকের বাড়ি মারে ওর শিক্ষিত মার্জিত মনে। ···এসব কী ছাইভস্ম ভাবছে সেই থেকে বসে বসে? এ আজ তার হ'ল কি!

তার এমন স্বামী—মানুষ হিসেবে, স্বামী হিসেবে, জীবনের অংশীদার হিসেবে—নীলাদ্রির চেয়ে অনেকগুণে ভাল। তার সৌভাগ্য যে এতদিনে এমন

একটা আশ্রয় আর প্রশ্রয় পেয়েছে। এঁর কাছে নীলাদ্রি।

ক্লান্ত অবসন্ন সুপ্রিয়া খড়মড় ক'রে সোজা হয়ে বসল।

এ চিন্তাটা একেবারে ঝেড়ে ফেলতে হবে। ভারী বদ লোক ঐ সত্যেশ-বাবুটা। ওর ফাইল কালই অন্য অফিসারের কাছে ট্রান্সফার ক'রে দেবে আর যাতে ওর সঙ্গে দেখা করতে না হয়।...

সুপ্রিয় ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিল ওকে নড়ে চড়ে বসতে দেখেই—সেটা না দেখেও টের পেয়েছে সুপ্রিয়া—কিন্তু কাছে এলেও প্রশ্নটা ঠিক তখনই করতে পারল না, জিজ্ঞাসা করতে পারল না শরীরটা আরও খারাপ লাগছে কিনা। অনেক ইতস্তত ক'রে ভয়ে ভয়ে বলল, 'একটু চা খাবে—কি কফি? আনতে বলব?'...

লোকটা তখন থেকে নিঃশব্দে একভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, আশ্চর্য! নিজের বাড়িতে নিজের স্ত্রীর কাছে ভরসা ক'রে দুটো কথা বলতে পারে নি, যে স্ত্রীকে সে সীমাহীন প্রেম, প্রশ্রয় ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে, জোর ক'রে নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার কথা সে ভাবতেই পারে না বোধহয়। বেচারী।...

সে হঠাৎ উঠে এসে—যা কখনও করে না—দু হাতে নিবিড়ভাবে সুপ্রিয়র গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আচ্ছা, তুমি এত ভীতু ভাল মানুষ কেন? তুমি আমাকে ধমক দিতে পার না, বেচাল দেখলে, অবাধ্যতা দেখলে শাসন করতে পার না? পার না নিজেকে য়্যাসার্ট করতে?...আমাকে চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে পার না মধ্যে মধ্যে? এত কুণ্ঠিত হয়ে থাক কেন নিজের বৌয়ের কাছে? তোমাকে পাওয়া যে আমার কত বড় সৌভাগ্য—তাও কি বুঝতে পার না? কেন এমন সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাক—কেন কেন?'

বলতে বলতেই, হতচকিত পুলকিত রোমাঞ্চিত সুপ্রিয় ব্যাপারটা কি বোঝার চেষ্টা করারও আগে, অকস্মাৎ কোন এক অজ্ঞাত কারণে সুপ্রিয়র গলার খাঁজে মুখটা গুঁজে দিয়ে হু হু ক'রে কেঁদে উঠল।

সামান্য ভুল

শিশু মঙ্গলের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় অনিল। সত্যি কথা বলতে কি, ও ঠিক থম্‌কে দাঁড়ায় নি, পা আপনি থেমে গেছে। মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে যে আশঙ্কা ওর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে সেই আশঙ্কাই ওকে থামিয়ে দিয়েছে ঐখানে এসে।

কী খবর পাবে সে। না জানি কি দুঃসংবাদ।

অবশ্য, কি খবর সে পাবে তা জানে। বহু পূর্বেই জানা হয়ে গেছে। সুতরাং আশা কিছু নেই—আছে সেই অশুভটাকে সামনাসামনি গ্রহণ করারই আশঙ্কা। সংবাদটা সম্বন্ধে যেন কোথাও কোন সংশয় নেই—শুধু সেই সংবাদটা পাবার সময় ওর অবস্থা কেমন হবে, সেইটুকু নিয়েই যা-কিছু দুশ্চিন্তা।

ওর স্ত্রী মায়ার দৈহিক অবস্থা বহুদিন থেকেই খারাপ হয়ে এসেছে। দেশ ছাড়বার বহু আগে থেকেই। তার ওপর যে অপরিসীম ভয়ের মধ্যে গত ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস ওদের কাটাতে হয়েছে, তাতে যে-কোন সুস্থ লোকেরই রক্ত জল হয়ে অক্ষম পঙ্গু হয়ে পড়বার কথা। খেতে পায় নি যে এমন কথা নয় —যদিও ওদের পাড়ার বাইরে যাবার ক্ষমতা ছিল না, না জলপথে না স্থলপথে —হাটে বাজারে যাওয়া সম্ভব হয় নি প্রায় দেড় মাস, তবু শাকভাত নুনভাত জুটেছে দু-বেলাই, ঘরের ধানটা কেউ নিয়ে যান নি দয়া করে। শুধু ওদের বাড়ি কেন, ওদের পাড়াতেই কারও বাড়ি লুঠ হয় নি। কিন্তু মানসিক অবস্থারও প্রভাব পড়ে বৈকি দেহের ওপর। খেয়েছে, ঘুমোতে তো পারে নি! তাই গোলার ধান এবং গোয়ালে গরু একটা থাকা সত্ত্বেও দিন দিন কৃশ হয়ে গেছে।

তারপর দেশ থেকে চলে আসার সময়।

হ্যাঁ, মালপত্র আনতে দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু কি মালপত্র আনতে পেরেছে ওরা? মাঠগুলো আনা গেছে? ওদের সোনার মাঠ?···গোলার ধান, গোয়ালের গরু, গাছের ফল—কোন্‌টা আনতে পেরেছে? এছাড়া ছিলই বা কি? বন্যার দেশ ওদের, ছিটে বাঁশের ঘর, টিনের চাল—সেখানে বেশী আসবাব বা তৈজস থাকা সম্ভবও না, ছিলও না। যা ছিল দু-চারটে বাসন-

কোসন এবং সামান্য কিছু গয়না—পথে স্টীমার-ঘাটে চুরি গেল। স্টীমার ঘাটে যে কুড়ি-একুশ দিন জাহাজে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে তাতে অতিরিক্ত ব্যয়ে খাদ্য সংগ্রহ করতেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে অনিল। ঐখানেই না খেয়ে এবং অবিরাম মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে মা মারা গেলেন, দাদার মাথায় বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল। উঃ—সেসব দিনের কথা মনে হলে আজ অনিলেরও মাথায় যেন গোলমাল হয়ে যায়। কি ক'রে সে সময় যে নিজে সুস্থ ছিল, তাই ভেবে অবাক হয়ে যায়।

তারপর শিয়ালদাতে এসে ওর বৌদি দাদাকে এবং ছেলেপুলেকে নিয়ে তাঁর ভাইয়ের কাছে চলে গেলেন নবদ্বীপ—বাঁচল অনিল। শুধু ও আর ওর স্ত্রী—যেমন ক'রেই হোক চালাতে পারবে। সেই অহঙ্কারে সরকারের আতিথ্য নেয় নি, নেয় নি মারোয়াড়ী শোষকদেব ভিক্ষার অন্ন। দিন দুই মাত্র এক বন্ধুর ঘরে উঠে ও নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'বে নিয়েছে।

কিন্তু সে কি ব্যবস্থা!

দিনের পব দিন মুক্ত মাঠে কেটেছে, পেটে অন্ন যায় নি। বার বার চেষ্টা করেছে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার, বার বারই ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে এতদিন পরে অন্যের জমিতে জোর ক'রে এতটুকু আশ্রয় গড়ে নিতে পেরেছে, শহবতলীর তথাকথিত কলোনীতে—খেলাঘরের মতো একরত্তি এতটুকু ঘর গড়েছে, নিজে—নিজের কায়িক শ্রমে। আর ঐখানকার বাজারে আরও এতটুকু একটা দোকান দিয়েছে, শ্লেট, পেন্সিল, দু-চারটে খাতা, কয়েকখানা পাউরুটি, লজেন্স—এমনি সব খুচরো জিনিসের দোকান। এর বেশী মাল কেনার মতো সঙ্গতি আর নেই। এইতেই মায়ার হাত শাঁখা-সার হয়েছে, ওর একটিমাত্র জামা সাবান দিয়ে কেচে পবতে হয়।

সুতরাং এর ভেতর, ঈশ্বর জানেন, সে সন্তান চায় নি। অনাহারে রোগে পরিশ্রমে জীর্ণ মায়া—যক্ষ্মারোগীর মত কৃশ, তাকে যে কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারা যাবে সেইটেই সংশয়; সেই মায়ার সন্তান!

না, সত্যিই চায় নি সে। দোহাই ধর্ম, বহুদিন সে যুদ্ধ করেছে প্রকৃতির সঙ্গে, দেহকে নির্মমভাবে পাষাণ করে তুলতে চেয়েছে। ওরই মধ্যে কোন এক ক্লান্ত সন্ধ্যায় এক মুহূর্তের ভুল এখন তার দানবীয় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে সামনে

এসে দাঁড়িয়েছে।

রক্তহীন ফ্যাকাশে মায়ার মুখ, অস্থিচর্মসার দেহ এবং প্রাণহীন পাণ্ডুর দৃষ্টি—মায়ার দিকে চাইলে ভয় হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসতেই লজ্জা করেছিল ওর। এনে দাঁড় করাতেই মহিলা ডাক্তারটি শান্ত অথচ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে সেই প্রশ্নই করেছিলেন, 'করেছেন কি, এঁকে একেবারে শেষ করে এনেছেন যে!'

মাথা মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল অনিলের। অথচ, জবাবই বা কি দেবে।

ওঁরা রাখতে চান নি মায়াকে প্রথমত। অনেক কষ্টে, অনেক সুপারিশ ধরে—শেষ পর্যন্ত হাতে-পায়ে ধরে অনিল রাজী করিয়েছিল।

কাল প্রসববেদনা ওঠার পর বাসে ক'রে নিয়ে আসতে হয়েছে ওকে, আড়াই টাকা তিন টাকা ট্যাক্সিভাড়াও জোটে নি। তখনই যে মায়ার জীবনটা বেরিয়ে যায় নি এই আশ্চর্য! কঠিন জান বটে! চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল যন্ত্রণায়। পার্চমেন্ট কাগজের মতো চামড়া তাও ঘামে ভেসে গিয়েছিল। প্রাণপণে ডেকেছে ঈশ্বরকে। এমন ক'রে বোধ হয় কখনও ডাকে নি সে। অন্তত নির্বিবাদে পৌঁছতে দাও শিশুমঙ্গলে—হে ঈশ্বর, পথে না একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যায়!

অবশ্য ঐটুকু দয়া ঈশ্বর করেছিলেন। হাসপাতালে পৌঁছেছিল নির্বিবাদেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল অনিল, অনেকদিন বাদে কাল রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে সে—

দু-তিনটি লোক ধাক্কা দিয়ে চলে গেল।

এ কি! সে এখনও দাঁড়িয়ে আছে চুপ ক'রে! আশেপাশের লোক বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের বিস্ময়ের দর্পণে নিজের মুখের চেহারাটা বেশ অনুমান করতে পারে অনিল। উস্কো-খুস্কো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টি—হতভম্বের মতো থম্‌কে দাঁড়িয়ে আছে—

না, যেতে হবেই, প্রশ্নটাও করতে হবে—এখন আর শেষ মুহূর্তে ইতস্ততঃ করে লাভ কি।

পা দুটো কাঁপছে থর-থর করে। তা কাঁপুক। অনিলকে যেতেই হবে। হাঁটু দুটো ভেঙে আসছে? কী করা যাবে।

'শুনুন, নৃসিংহ কলোনী থেকে কাল যে মায়া ব্যানার্জি এসেছিলেন, তার কি হয়েছে জানেন?'

'একটু দাঁড়ান, বলছি।'

এক লহমা? না এক শতাব্দী?

বাইরে যিনি ইন্‌চার্জ ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আর একটি নার্সের দিকে চাইলেন। সে চলে গেল ভেতরে।

কী খবর আনবে ও, কে জানে। অথবা জানাই তো আছে। তবে শুধু শুধু এ প্রশ্ন এবং উত্তরের অভিনয় কেন? কেনই বা এ অহেতুক বিলম্ব।

নার্স ফিরে এল।

'ভাল আছে পেসেন্ট। একটি ছেলে হয়েছে। রাত তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে।'

য়্যাঁ!!

ভুল শুনেছে কি অনিল?

'ছে-ছেলে হয়েছে? না হয়েছিল? মানে বেঁচে আছে?'

'বেঁচে থাকবে না কেন। ভালই আছে।'

তার ছেলে হয়েছে। ছেলে, বেটাছেলে। তার আর মায়ার। এখনও বেঁচে আছে। ইচ্ছা হচ্ছে চিৎকার ক'রে শুনিয়ে দেয় সে খবরটা সমস্ত বিশ্ববাসীকে। ইচ্ছে হচ্ছে লাফ দেয় গোটাকতক, কিংবা শুধু অকারণে হাসে হা-হা ক'রে—অনেক, অনেকক্ষণ ধরে।

ছেলে হয়েছে। ভাল আছে। এখনও বেঁচে আছে।

সে ভুল শোনে নি। ঐ জন্যই আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়েছে।

এই তো জীবনে জয়। এই বিজয়গর্বের জন্যই ঈশ্বর ওকে এত দুঃখ দিয়েছেন। সেই সমস্ত দুঃখ, সমস্ত লাঞ্ছনার শোধ হ'ল এতদিনে। এতদিনের অশ্রুসরোবর রচিত হয়েছে এই অপরূপ আনন্দশতদলটি ফুটবে বলে। আজ ওর জীবন সার্থক, আজ ও ধন্য।

বড় দুর্দিনে এল। আজ ও কী খাওয়াবে, কেমন ক'রে মানুষ করবে ছেলেকে? তা হোক। ও না হয় রাত্রে একটা কোথাও চাকরী করবে। কিংবা করবে টিউশ্যনী। ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে চাই কি কোচিং ক্লাসও করতে পারে। চার আনা মাত্র বেতন নিয়ে পড়ালে অনেক ছেলেই পাবে।

আরও কঠোর পরিশ্রম করবে সে। অমানুষিক একটা কিছু—যা আজ অবধি কেউ কখনও করে নি। কল্পনাও করে নি। প্রাইমারী ইস্কুলটাতে রাত্রিবেলা মাস্টারী জুটবে না ?···ভোর বেলা যদি দোকান খোলার আগে কিছু আনাজ বেচে ? যা হোক—যেমন ক'রেই হোক অর্থ উপার্জন করবে সে। মায়াকে এখন কিছুদিন কোন কাজ করতে দেবে না, ও নিজেই রান্নাবান্না করবে। রাত তিনটেয় উঠবে—রাত বারোটায় শোবে হয়তো। তিন ঘণ্টা বিশ্রাম যথেষ্ট। এখন প্রয়োজন মায়ার জন্যে কিছু পুষ্টিকর খাবার, ছুটো-একটা টনিক। ছেলেটার জন্য বিশেষ কোন খরচ করতে হবে না এখন—এই সময়ে মায়াকে একটু সুস্থ ক'রে নেরে, তারপর ছুজনে মিলে সযত্নে ছেলেটাকে মানুষ ক'রে তুলবে।

মানুষ ? পারবে কি মানুষ করতে ?

যেমন ক'রেই হোক পারবে। এত বড় বিজয়গর্বে যখন ঈশ্বর ওকে বঞ্চিত করেন নি, তখন এটাও পারবে ও। আর চিরকালই কি এমনি দিন যাবে ? ঐ ব্যবসাই বড় করবে, কিংবা অন্য কোন ব্যবসায়ে চলে যাবে ও। ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো চাই ভালো ক'রে। সাহেবদের ইস্কুলে রেখে লেখাপড়া শেখাতে হবে। তারপর—ভাবতেও ভয় করে এখন—তারপর বিলাত পাঠাবে ও ; দশের একজন, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ফিরে আসবে ছেলে। ওর ছেলে হবে স্বাধীন হিন্দুস্থানের আদর্শ নাগরিক।···

ও কারা কথা কইছে ? কি বলছে ওরা ?

স্বপ্নের ঘোরে যেন শুনল অনিল, ইন্‌চার্জের কণ্ঠে সংশয়ের সুর, 'তুমি ঠিক দেখেছ তো ? ক' নম্বর বেড বলো দেখি ?'

'বারো নম্বর তো ?'

'দূর! সে তো মায়া চ্যাটার্জি। কাল সন্ধ্যায় এসেছেন যিনি, নৃসিংহ কলোনী থেকে, খুব রোগা আর ছুর্বল মেয়েটি—?'

ললাটে ঘাম দেখা দেয় অনিলের। এক মুহূর্তে যেন সমস্ত দেহ শিথিল হয়ে আসে। এখনও সংশয়! হে ভগবান!

চুপি চুপি কী এসে বলল সেই নার্সটি ইন্‌চার্জকে। তিনি একটু চাপা কী যেন তিরস্কার করলেন তাকে। তারপর জিভ্‌টা বার ছুই ওপরের ঠোঁটে বুলিয়ে নিয়ে গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বললেন, 'দেখুন সামান্য একটু ভুল হয়ে

গেছে। সেজন্য আমরা খুব দুঃখিত।...আপনার স্ত্রী একটি মরা বাচ্চা প্রসব করেছেন। ওঁরও শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। এখনও সেন্সলেস্ হয়ে আছেন। অবশ্য আমরা যা করবার সবই করছি—'

কতদূর থেকে কে যেন কথা কইছে। অনিল বেশ সহজভাবেই বেরিয়ে এল তো! শিস্ দেবারও চেষ্টা করল বোধ হয়। বহুদিনের অনভ্যাসে বেরোল না।

ফুটপাথে একটু বসবে নাকি? ক্ষতি কি! আজ আর ফেরবার তাড়া নেই তো! বেশ পরিষ্কার ফুটপাথটা। ছায়াও আছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আস্তে আস্তে বসে পড়ে অনিল।

রন্ধনে দ্রৌপদী

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বেশির ভাগ মানুষই দিশাহারা বিহ্বল হয়ে পড়ে—রমলাও পড়বে এ আর আশ্চর্য কি। আর এই বাজারে একটি অলরাউণ্ডার কম্বাইনড্-হ্যাণ্ড পাওয়া—সেটি যদি আবার বিশ্বাসী হয় এবং রান্নাও ভোজন-যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়—তার চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে। এতখানি সৌভাগ্য লাভ ইদানীংকালের মধ্যে কারও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

বয়স কম এবং দেখতে শুনতেও 'মন্দ নয়' বলে রমলারই আপত্তি করার কথা—কিন্তু সে তেমন কোন আপত্তির নামগন্ধ করল না। তার কারণ এখন কোন বাগড়া দিয়ে লোকটিকে হাতছাড়া করলে চাকরিটিও খোয়াতে হবে। রামখেলাওন আর মহারাজিয়া—পর পর দুটি পদাধিকারীই যখন ডুবিয়ে গেল, একজন 'ওনার' সোনার বোতাম ও ঘড়ি নিয়ে হাঁটা দিল—আর একজন 'এনার' বেশ কিছু শাড়ি ও নগদ টাকা নিয়ে সরে পড়ল—তখন দিন কতক চোখে অন্ধকারই দেখতে হয়েছিল বৈকি। রমলার সকালে কলেজ, মণিভূষণের দুপুরে। রমলা ফিরে এসে রেঁধে দিলে মণিভূষণের সকালের দুটো ক্লাস নেওয়া হয় না। আর তার জন্যে রাঁধতে বসলে রমলার দিনটাই মাটি হয়ে যায়। তার সাড়ে ছটা থেকে আটটা পঁয়তাল্লিশ—পর পর তিনটে ক্লাস থাকে। তার পর

পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদ দিয়ে আবার ছুটো।

এই সংকট কালেই, চাকরি এবং জীবন ধারণ এর মধ্যে একটা পন্থা বেছে নেওয়ার প্রশ্নে যখন এরা কণ্টকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়—ঠিক সেই সময়ই সুহাসিনীর আবির্ভাব ঘটল।

বয়স অল্প ঠিকই, দেখতে শুনতেও 'চলনসই'—বরং পাল্লাটা ভালর দিকেই একটু ঝোঁকা—তবু, ঘাড় পর্যন্ত ছোট ক'রে চুল ছাঁটা এবং ধুতি কাপড় পরনে; এই নিবিড় বৈরাগ্যের বেশে মানুষটাকে খুব একটা বিপজ্জনক বলে মনেও হয় নি। আর তা ছাড়া, তখন কাউকে একটা না পেলে চলছেও না। চাকরির প্রবলেম তো আছেই। কদিন কলেজেব পাশের হোটেলটায় খেয়ে মণিভূষণের অর্শ চাড়া দিযে উঠল, রমলারও অত বেলায় এসে শুধু নিজের জন্য রান্না করতে ইচ্ছে করে না বলে ছাতু কচুরি সিঙ্গাড়া ইত্যাদি খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল]—এমনিও বাড়ি চাবি দিয়ে ফেলে রেখে যাওয়া খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। রমলা ফিরে আসা পর্যন্ত মণিভূষণের অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, সপ্তাহে তিন দিন তো নয়ই, সোম বুধ শুক্র ঠিক দশটায় ক্লাস থাকে ওর। ফলে এর মধ্যেই একদিন তালা ভেঙে 'কে বা কাহারা' বাইরের ঘর থেকে পাখা ও রেডিওটা খুলে নিয়ে গেছে! বোধ হয় সময় ছিল না বেশী, নইলে আরও যেত। যথা-সর্বস্বই যেত হয়ত।

একটু খুঁতখুঁত করেছিল বরং মণিভূষণই।

'এটা কি করছ রমা, ইচ্ছে ক'রে একটা অশান্তির চারা লাগাচ্ছ বাড়িতে?'

'কেন, নিজের ওপর বিশ্বাস নেই তোমার? আমার তো পূর্ণ বিশ্বাস আছে তোমার উপর।'

'বিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। কিছু না করলেও লোকে নানা কথা রটাতে পারে। সেটা আরো দুঃসহ যে। জাতও যাবে পেটও ভরবে না। তখন হয়ত তোমার পূর্ণ বিশ্বাসেও বিরাট একটা ফাটল দেখা দেবে।'

'না না। এ সে রকম নয়। তিন বছর হ'ল বিধবা হয়েছে, তেমন হ'লে এর মধ্যেই চুলবুল করত। মায়াদি দিয়েছেন, বলেছেন খুব বিশ্বাসী আর সৎ-স্বভাবের মেয়ে। কখনও কোন পরপুরুষের দিকে নাকি উঁচু নজরে চায় নি—টু কুয়োট মায়া দি একজ্যাকট্‌লি। আর না হলে উপায় কি বলো। এক

আমায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসে বসতে হয়। এতকালের পাকা চাকরি ছেড়ে দোব? সামনের সেসন্‌স্‌-এই ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হবার কথা। তাছাড়া, বহুদিন অভ্যেস নেই, এখন কি এই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব করতে পারব এক হাতে?'

'তাহলে রাখো। কিন্তু অন্য লোকের চেষ্টাতেও থাকো। একেবারে এলে-দিয়ে বসে থেকো না। ভাল লোক আর একটা পেলে একে ছেড়ে দিও।' বিরস মুখে বলেছিল মণিভূষণ।

বলাবাহুল্য—সে 'অন্য লোকের' কোন চেষ্টা হয় নি।

সাত আট দিন কেটে যাওয়ার পর কোন পক্ষেই আর সে ইচ্ছা ছিল না।

কারণ, দেখা গেল, সুহাসিনী মেয়েটি সত্যিই কাজের লোক। রমলার পনেরো বছরের নিজস্ব সংসার-অভিজ্ঞতায় এমন কাজের লোক সে একটিও পায় নি। শাশুড়ি মারা গিছলেন ওর বিয়ের আগে। বিয়ে যখন হয় তখন এ বাড়িতে এক অনূঢ় দাদা মাত্র ছিলেন মণিভূষণের। ফলে কতকটা বাসাড়ে বাড়ির মতোই ছিল সংসারটা। তখনও হয় চাকর নয় ঝি—এরাই ছিল গৃহের কর্তৃস্থানীয়। রমলা নিজেও তত কাজের লোক নয়—পড়াশুনো ক'রে দুটো এম. এ. পাস যে করেছে তাকে সংসারের কাজ শেখাতে যাবে—বাপের বাড়িতেও এমন কারও বুকের পাটা ছিল না। ফলে সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য কাকে বলে কোনদিনই বোঝে নি রমলা। অসুবিধাগুলো অস্বস্তির কারণ হয়েছে —সেগুলোও 'এই-ই নিয়ম' ভেবে মেনে নিয়েছে।

এবার—এতদিনে এই প্রথম বুঝল, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বা আরামের মুখ দেখল।

ভোরবেলা যথাসময়ে চা আসে, ডেকে হয়রান হতে হয় না; শীতকালে গরম জলের কথা মনে করিয়ে দিতে হয় না; রান্না খেয়ে মুখ জুড়িয়ে যায় (এতকাল ধারণা ছিল বাড়ির রান্না হোটেলের মতো হয় না—এখন দেখল হোটেলের রান্না অখাদ্য); কাপড়চোপড় বিছানা মাদুর ফিটফাট পরিষ্কার থাকে; দুবেলা মোছার ফলে ঘরের মেঝেগুলো আয়নার মতো ঝকঝকে হয়ে ওঠে; এরই ফাঁকে ফাঁকে সুহাসিনী বাজার করে, রেশন তোলে, ধোপার বাড়ি যায়—যাকে বলে এক হাতে সাত শূল ধরা—তাই। আরও বড় কথা—চোর

নয়। অন্তত এরা কোনদিন কোন হিসাবের গোলমাল ধরতে পারে নি, বাজারের দামেও ফারাক দেখে নি।

এমন লোককে তাড়াবার চেষ্টা করবে—অধ্যাপনা করলেও রমলা তত বোকা নয়।

অন্য লোকের চেষ্টা তো করেই না, বরং একেই বাঁধবার চেষ্টা করে বিধি-মতো প্রকারে। সুহাসিনী সরুপাড় ধুতি পরত, রমলাই নিজের ভাল ভাল সাদা শাড়ি বার ক'রে দিয়ে বলে, 'তোর এই বয়েস, আজকাল কত বিধবা মেয়ে রঙীন শাড়ি পরছে—তুই সাদা শাড়ি পরবি তাতে দোষ কি? আমার এই কাপড়গুলো ছাখ্, পড়ে নষ্ট হচ্ছে শুধু শুধু। কাপড়ের কি দাম দেখছিস তো। একটা মেয়ে হ'ল না যে তার জন্যে রাখব, আর হ'লেও এসব কাপড় সে হয়ত পরত না।'

['তুমি' থেকে-'তুই'-তে নামাটাও ডিপ্লোমেটিক; আত্মীয়তা প্রমাণ করা]

অনেক পীড়াপীড়িতে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে—প্রথম অপেক্ষাকৃত সরুপাড়গুলো পরে নিয়ে—তাবৎ ভাল ভাল শাড়িই পরতে শুরু করল সুহাসিনী। তারপর, বোধহয়—চওড়াপাড় শাড়ির সঙ্গে খাটো চুল বেমানান বলেই আরও—রমলারও অনুযোগ ছিল—চুল ছাঁটাও বন্ধ ক'রে দিল। দেখতে দেখতে ঘন কালো চুল—সুহাসিনী কেশগৌরবে অন্তত রমলার থেকে বেশী সৌভাগ্যবতী, এটা মানতেই হবে—পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এল। গলায় একটা সরু বিছেহার ওর ছিলই, এখন তিন মাসের মাইনে জমিয়ে তার সঙ্গে নিজে কিছু টাকা যোগ ক'রে দু'গাছা সোনাবাঁধানো পেটি গড়িয়ে দিল রমলা। এবার কিন্তু আর বেশী আপত্তি দেখা গেল না, মাত্র দু-একবার 'না-না' ক'রেই পরে নিল, এবং ফাঁক পেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নবশ্রীমণ্ডিত মণিবন্ধটা দেখতে লাগল। মণিভূষণ ফুট কাটল, 'আগে পরার মতো শাড়ি গয়না ছিল না বলেই বিধবার বেশ ধরেছিল। বুদ্ধিমতী।'

রমলা রাগ ক'রে জবাব দিলে, 'যাও! তোমার যত সব ঐ রকমের ঠেস-দেওয়া কথা। পুরুষরা বড় কুচুটে হয়।'

তবু, হয়ত আশ্বস্তও হয়েছিল—অল্পবয়সী সুদর্শনা মেয়েটা স্বামীর ওপর

কোন কুপ্রভাব বিস্তার করতে পারে নি বলে। সুদর্শনা যে, সেটা আগে অত বোঝা যায় নি। এখন—এখানে নিশ্চিন্তে চারবেলা খাওয়া ও প্রায়-সধবার বেশভূষা ধারণ করার ফলে ওকে সত্যিই ভাল দেখাচ্ছে। রমলা মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে এই তথ্যটা উপলব্ধি ক'রে একটু শঙ্কিতই ছিল।

যে গৃহের সব ভার নেয়, গৃহস্থালী পরিচালনা করে—তাকেই গৃহিণী বলা উচিত। সে গৃহিণীত্ব অনেক সময় আপনিই এসে পড়ে। আবার—'পর লোক', মাইনে করা কোন দাসদাসী এই ধরনের পরিপূর্ণ ভার নিলে অনেক সময় গৃহস্বামীরা তাদের একটু কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য দিয়ে তুষ্ট করার চেষ্টাও করেন। ভালও লাগে কারো কারো—এই কর্তৃত্বের মধ্যে আত্মীয়তা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায় বলে।

সুতরাং সুহাসিনী ক্রমশ—বছর খানেকের মধ্যে—সে গৃহিণীত্ব অধিকার করতে চাইবে, এও যেমন স্বাভাবিক, এরাও সেটা যতদূর সম্ভব ছেড়ে দিয়ে ওকে তুষ্ট এবং নিজেরা নিশ্চিন্ত হতে চাইবে—সেও তেমনি। ছোটখাটো স্নেহের শাসনে, উদ্বেগজনিত মৃদু তিরস্কারে যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়—সে শাসন মেনে নিয়ে সুখ আছে। তাই প্রথম প্রথম তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি।

কিন্তু আরও কিছু দিন পরে দেখা গেল—সুহাসিনীর উচ্চাশা অনেক বেশী। তার ঝোঁক সর্বপ্রকার গৃহিণীত্বের দিকেই, লক্ষ্য গৃহকর্তা স্বয়ং। দেখা গেল—রমলার অনুপস্থিতিতে সে বেশী ক'রে মণিভূষণকে যত্ন করে, অকারণেই তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে স্নেহের শাসন প্রয়োগ করে—এবং তার স্ত্রী যে নিজ কর্তব্য যথাযথ পালন করে না বা করতে পারে না—আকারে-আভাসে সেই ইঙ্গিত দেয়।

মণিভূষণের এতে অস্বস্তি লাগে।

হয়ত এই যত্ন ও আন্তরিকতা, উদ্বেগ-ব্যাকুলতা ভাল লাগে বলেই এই অস্বস্তি, সে সম্বন্ধে একটা আকর্ষণ বোধ করে বলেই। সে অনুযোগও করে রমলার কাছে মধ্যে মধ্যে। যত বেশী অনুযোগ করে রমলা ততই নিশ্চিন্ত হয়, স্বামীর প্রেম সম্বন্ধে তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। সে মণিভূষণকে তিরস্কার করে।

বলে, 'তোমার ক্রমশ একটা কমপ্লেক্স্ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে, পৃথিবীর তাবৎ মেয়ে তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্যে ছটফট করছে! বয়েস যে প্রায় চল্লিশ হ'তে চলল, সে হুঁশ আছে?'

বয়স মনে করিয়ে দেওয়াতে মণিভূষণ আহত হয়। বলে, 'সে বয়েস তোমারও হ'তে দেরি নেই। মেয়েদের বয়েস বছরের তুলনায় অনেক বেশী বেড়ে যায় মনে রেখো।'

তবে এমন একটা সময় এল, এমন সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল যে, রমলারও টনক না নড়ে উপায় রইল না। দেখা গেল সুহাসিনী ওর সামনেই ওকে ডিঙিয়ে মণিভূষণের ওপর খবরদারী অভিভাবকত্ব করে। শেষে এক সময় দেখা গেল সোজাসুজি রমলার মতামত উড়িয়ে দিয়ে নিজেরটা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং মণিভূষণ সেই কর্তৃত্ব মেনে না নিলে আহত হয়, অভিমান বোধ করে।

কথা যে সব সময় খুব অযৌক্তিক বলে তা হয়ত নয়। তবে ওর পদাধিকার-বহির্ভূত বলেই মণিভূষণের আপত্তি।

একদিনের ব্যাপারে মণিভূষণ একটু বেশী বিচলিত হয়ে পড়ল।

রমলা খুব সকালে বেরিয়ে গেছে, যেমন যায়। সুহাসিনী যথারীতি মণিভূষণের ভোরের 'বেড-টি' আনতে সে চা-টা খেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিল—একটু পরে যে জলখাবারটা খায়—রুটি ডিম—সেটা আজ খাবে না।

এক-আধ দিন খুব সকালে কোন কাজ পড়লে আর জলখাবার খায় না মণিভূষণ, একেবারেই দাড়ি কামিয়ে চান ক'রে ভাতে বসে। তাই—উদ্বিগ্ন কি বিচলিত হবার কোন কারণ দেখল না সুহাসিনী, সহজ ভাবেই প্রশ্ন করল, 'আজও সকাল ক'রে বেরোবেন নাকি? কৈ কাল তো বললেন না?'

'না না, আজ বারোটায় ক্লাস। তা নয়, পেটটাই ভাল নেই তেমন। কাল সন্ধ্যায় শর্মাদের বাড়ি অনেকটা ঘুগনি ফুচ্কা খাওয়া হয়ে গেছল—বাড়িতে তুমি আবার অনেক সব ক'রে রেখেছিলে, সেও একটু খাওয়া বেশী হয়ে গেল —তাতেই বোধ হয় ভাল হজম হয় নি—'

নিমেষে যেন বিবর্ণ হয়ে গেল সুহাসিনীর। ব্যাকুলভাবে বলল, 'কেন খেতে

গেলেন? কী আর এমন আহামরি জিনিস করেছিলুম। কুমড়োর ধোকা—সে আর একদিন করলেই হ'ত। পেটে কি খুব ব্যথা করছে দাদাবাবু? একটু তেলজল মালিশ করে দোব—?' ইত্যাদি, ইত্যাদি—

ফলে, এমন যে মারাত্মক কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত নয় সে, এত উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছু ঘটে নি—সেটা বোঝাতেই মণিভূষণের অনেক সময় লাগল। বিশেষ কিছুই নয়, একটু মিউকাস বেড়েছে, সামান্য ব্যথা পেটে, বার দুই মোশন হয়েছিল শেষ রাত্রে। স্টম্যাক্‌কে একটু রেস্ট দিলেই ঠিক-হয়ে যাবে।

কিন্তু এত কথার পরও সুহাসিনীর ব্যাকুল প্রশ্ন বর্ষিত হতেই থাকে। সে যে কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছে না—সেটা প্রমাণ করার জন্যে সে যেন উঠে-পড়ে লেগেছে।

তবু মণিভূষণের সহিষ্ণুতার বর্মে প্রতিহত হয়ে একসময় উদ্বেগকে দমন করতেই হয়। কিন্তু একটু পরেই ঘুরে আসে আবার, 'আমি বলছিলুম কি, ডাক্তারবাবুকে একটা ফোন ক'রে দিই না হয়? তিনি বরং একটু দেখেই যান? কী থেকে কি হয়—বলা তো যায় না। ঘর ঘর ঐ যে কি বলে—ব্যাসিলারী আমাশা না কি—তাই হচ্ছে আজকাল।'

সুহাসিনী সামান্য একটু লেখাপড়াও শিখেছিল কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, শুনে শুনে ইংরেজী শব্দার্থ ও তার ঠিকমতো প্রয়োগ বুঝে নিয়েছিল। উচ্চারণও করত নির্ভুল।

কিন্তু এবার মণিভূষণ বিরক্ত হয়ে ওঠে।

বলে, 'অসুখ হ'লে পেসেন্টকে রেস্ট দেওয়াই হচ্ছে বড় চিকিৎসা। তুমি যদি এমন বারবার একটা ক'রে ধুয়ো তুলে এসে আমার ঘুম ভাঙাও—তাহলে তো আরও খারাপ হয়ে পড়বে শরীর।'

সুহাসিনী লজ্জিত এবং ইংরেজীতে যাকে বলে 'স্নাব্‌ড্‌' হয়ে চলে যায় তখনকার মতো, কিন্তু বোধ করি ওৎ পেতে থাকে তার পর থেকে, সাড়ে আটটা নাগাদ মণিভূষণ উঠে দাড়ি কামাবার মুখ ধোবার তোড়জোড় করছে দেখেই আবার কাছে এসে দাঁড়ায়।

'দাবাবাবু, মিউকাস যখন বলছেন তখন তো আমাশার ভাব রয়েছে। আমাশাতে কিন্তু একেবারে খালি পেটে বেশীক্ষণ থাকতে নেই, রোগ তাতে

বাড়ে। আমি ছুটিখানি হালকা চিঁড়ে ভিজিয়ে রেখেছি—বরং একটু লেবু আর চিনি দিয়ে খেয়ে নিন এখন—! পেটটা ঠাণ্ডা হবে, ব্যথা যন্ত্রণা সব কমে যাবে।'

কথাটা খারাপ বলে নি, কিন্তু মণিভূষণ—ওর ভাষায় এই 'নেই-আঁকড়েমো'তে চটে উঠল, 'না! না! বলছি তো একশো বার যে কিছু খাবো না। কেন এক কথা একশোবার বলো! খেতে হ'লে নিজেই বলব।'

ম্লান মুখে ফিরে যায় সুহাসিনী।

এর একটু পরে, দাড়ি কামানো শেষ হবার আগেই, রমলার ফোন আসে। শেষ রাত্রে ছুবার ওঠার খবর সে জানত, পরপর তিনটে ক্লাস শেষ ক'রে এই-বার একটু অবসর পেতেই খবর নিচ্ছে।

সব শুনে সেও বলল, 'সুহাস খারাপ কিছু বলে নি। লেবু চিনি দিয়ে অল্প ছুটি চিঁড়ে খেয়েই নাও। নইলে পরে আবার হয়ত পেট ব্যথা করবে।'

ফোন নামিয়ে রেখে মণিভূষণ বলল, 'তবে দাও, চিঁড়েটা খেয়েই নিই।'

ও হয়ত ভেবেছিল, সুহাসিনীকে অনুগ্রহই করল এতদ্বারা, সে খুশীই হবে। কিন্তু ফল দেখা গেল বিপরীত। সুহাসিনীর চোখের কোণে যেন নিমেষে বিদ্যুৎ খেলে গেল—যে বিদ্যুতে বজ্রের আভাস থাকে—কৌতুকের লীলা-বিদ্যুৎ নয়।

সুহাসিনী বলল, 'সে চিঁড়ে আমি টান মেরে ফেলে দিয়েছি। একেবারে যখন ভাতই খাবেন, তার আগে কিছুই খাবেন না—তখন আর ও ঠাট সাজিয়ে রাখব কেন? আপনি তো বলেন নি যে ওপরওলার হুকুম পেলে খাবেন—তাকে জিগ্যেসা করতে হবে—তাহলে রেখে দিতুম!'

এই ধরনের ধৃষ্টতা আরও কিছু কিছু প্রকাশ পাচ্ছিল কিন্তু এতটা 'গৃহিণীত্ব' আজ অসহ্য বোধ হ'ল মণিভূষণের। আরও অসহ্য বোধ হ'ল যখন একটু পরে—আবার ও নতুন ক'রে চিঁড়ে ভিজিয়ে লেবু নুন চিনি দিয়ে সাজিয়ে এনে নীরবে টিপয়টায় নামিয়ে রেখে চলে গেল। ক্ষমা প্রার্থনা কি কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করল না।

দাসী মনিবের ওপর অভিমান করার দাবী যখন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়—তখনকই শঙ্কিত হবার কারণ ঘটে, সেটাকে চরম স্পর্ধা বলেও গণ্য করে লোকে।

•

রমলা বাড়ি ফিরতে মণিভূষণ সকালের ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত ক'রে

বলল. 'এরপর যদি কোন দিন ছাখো আমার শোবার ঘরে তোমার ঐ দেবী দরজা দিয়েছেন, তোমার আর প্রবেশাধিকার নেই—আমায় কিন্তু দোষ দিও না।'

এর পরে রমলাও বিরক্তি বোধ না ক'রে পারল না।

তার মনে আগে থাকতেই একটা চাপা রোষ ছিল কদিনকার।

সে স্পর্ধাটাও অসহনীয় বোধ হয়েছিল।

মণিভূষণের জামা-কাপড় রমলাই বাব করে আলমারী থেকে, সেদিনও করেছিল। একটা সাদা টেরিকটের হাওয়াই শার্ট বার করেছিল, সুহাসিনী ওকে কিছু না বলেই সেটা তুলে আলমারীতে রেখে হালকা গোলাপী রঙেরটা বার ক'রে রাখল। বলল, 'এইটেতে দাদাবাবুকে খুব ভাল দেখায়। সাদা পরলে বুড়ুটে বুড়ুটে মনে হয়।'

সেদিনই জবাব দেওয়া উচিত ছিল। মণিভূষণেব বিদ্রূপের ভয়েই চেপে গেছে, কিল খেয়ে কিল চুরি করেছে। আজ এই উত্তম সুযোগ। তাছাড়া এ আরণটাও দুঃসহ, সেই দিনই সঙ্গে সঙ্গে—'পত্র পাঠ' যাকে বলে—মাসের বাকী কদিনের টাকাও যোগ ক'রে পুরো মাইনে দিয়ে জবাব দিল।

ঘরে এসে রাগ ক'রে বলল, 'এবার বুঝুক কত ধানে কত চাল। কে এমন গুরু-আদরে রাখে মাথায় ক'রে, এত যা খুশি করার স্বাধীনতা দিয়ে—দেখুক ঘুরে একবার। এখানে থেকে খেয়ে যার চেহারাই পালটে গেল!'

মাণভূষণ বললে, 'সেই তো কাল হ'ল। ব্যবহারটা আর একটু কম মোলারেম হ'লে এতটা মাথায় উঠত না। তোমরা তাকে সব ব্যাপারেই বাড়ির গিন্নী ক'রে রেখেছ—পুরো মালিকানা দিয়ে—এখন এইটুকু, কর্তার ভাগটুকু সে চাইবে না কেন?'

সুহাসিনী বুঝুক না বুঝুক, কত ধানে কত চাল, রমলা আর মণিভূষণই আগে বুঝল।

সেই পুরাতন সমস্যাগুলি সবই দেখা দিল একে একে—চাকরী থাকে তো ঘরের মালপত্র টাকাকড়ি থাকে না, পেটে ভাত পড়ে না—ঘর সামলাতে গেলে চাকরি যায়। উপরন্তু আরও একটি উপসর্গ যোগ হ'ল। সুহাসিনীর হাতের

রান্না খেয়ে এখন রমলার নিজের রান্নাও পছন্দ হয় না। সে নিজেই স্বীকার করে সে কথা, 'শোভারাম পুজুরী বলত, দেখো জী, আপনার রান্না আপনাকে ভাল, ঠাকুরকে ভাল, কুকুরকে ভাল। কিন্তু আমার তো কই নিজের রান্না ভাল লাগছে না, সবই জোলো পানসে মনে হয়।...ইস্! তখন যদি ছুটির বার-গুলোতে অন্তত কাছে দাঁড়িয়ে একটু রান্নাটা শিখে নিতুম।'

মণিভূষণ হেসে বলে, 'রান্নাটা দ্রৌপদীর মতো যখন দেখেছি, তখনই বুঝেছি ওর অনেকগুলো পুরুষ দরকার। যে পাঁচটা স্বামীকে সামলাতে পারে, সে রান্নাটাও ভাল পারবে বৈকি!'

'দ্রৌপদী ভাল রাঁধত বুঝি?' রমলা শুধোয়।

'কেন বঙ্কিমবাবুর ইন্দিরা পড় নি? "ও ইয়াস, বিবি পাণ্ডব ফার্স্ট ক্লাস বাবুর্চি ছিল।" রন্ধনে দ্রৌপদীতুল্যা—এ তো একটা প্রবাদেই দাঁড়িয়ে গেছে।'

খেতে আজকাল রীতিমতো কষ্টই হয় মণিভূষণের কিন্তু সেটা মুখে বলতে পারে না। রমলা নিজে যতই বলুক—মণিভূষণ বললে মর্মান্তিক লাগবে। তাছাড়া সুহাসিনীকে তাড়ানোর ব্যাপারে সে-ই প্রধান উৎসাহী—এখন কোন্ মুখে সে জন্যে আপসোস করবে?

আর, অসুবিধা কি একটা!

এই দুটো বছর—গৃহকে গৃহ বলে বোধ হয়েছিল, জীবনে এই প্রথম। সাজানো-গোছানো ফিটফাট, যেখানে যেটি থাকা দরকার সেখানেই সেটি থাকত—কাজের জিনিস ঠিক ঠিক হাতের কাছে পাওয়া যেত। এখন দেখতে দেখতে—দু-চার দিনের মধ্যেই ঘরবাড়ি যেন আবার অরণ্য হয়ে উঠল। স্বামী স্ত্রী কারুরই সময় নেই, অভ্যাসও নেই। ঠিকে ঝি, যে বাইরের কাজ করে—তাকে দিয়ে এসব কাজ করাতে গেলে একজনকে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিয়ে করাতে হয়। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরে খাতার বোঝা নিয়ে, সেগুলো দেখা আছে; বাজার-হাট করা, দুধ আনা, রান্না—সবই আছে। ঠিকে ঝি কামাই করলে বাসনের গোছা নিয়েও বসতে হয়। এর মধ্যে ঘরদোর ঝাড়া-মোছা গুছনো—হয়ে ওঠে না আর। তাছাড়া বাসাড়ের মতো থেকে থেকে ওদের স্বভাবটাও নোংরা অগোছালো হয়ে গিছল।

আগেও এই রকমই থাকত কিন্তু তখন এত অসুবিধা বোধ হয় নি। এখন

হয়। আরামে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে আরামের অভাবে কষ্ট হয়। ফলে অসন্তোষ, তা থেকে বিরক্তি—সে বিরক্তিটা মাঝে মাঝে পরস্পরের প্রতি গিয়ে পড়ে রূঢ় বাক্যের আকার ধরে। ফলে কলহ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তা ছাড়াও এর মধ্যে আরও একদিন চুরি হয়ে গেল। এবারে আর পাখা রেডিওর ওপর দিয়ে গেল না। রমলার দামী শাড়ি ও গহনায় ঘা দিল। বেশির ভাগ গয়না ব্যাঙ্কের লকারে থাকে তাই রক্ষা—নইলে সর্বস্বই যেত।

রমলা সক্ষোভে বলে, 'এমন দুর্দশা হবে জানলে বরং তোমার ভাগ দিতুম। সতীন নিয়ে আরামে ঘর করাও ভাল—একেশ্বরী হয়ে এত নাকালের চাইতে। সেকালেব মেয়েরা সেয়ানা ছিল বাপু, তা মানতেই হচ্ছে।'

মণিভূষণ জবাব দেয়, 'এমন জানলে আমিই কি নীতিবাগীশ বলতুম, না তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হতুম! আর ইয়ে—কি বলে দেখতেও তো মন্দ নয়—ঘরনী করার মতোই!'

সুহাসিনীও সুখে নেই অবশ্য। সে খবর ঠিকে ঝি মারফৎ যে পায় না রমলা তা নয়। দু-এক বাড়ি চাকরিতে ঢুকেও ছিল। কিন্তু টিকতে পারে নি। ওরও অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে, অনেকখানি স্বাধীনতা আর কর্তৃত্বে অভ্যস্ত হয়েছে—ততটা অন্য মনিব সহ্য করবে কেন? সর্বত্রই গৃহিণীদের সঙ্গে ঝগড়া বেধে যায় দু-চার দিন না যেতে যেতে।

মাস তিন-চার এমনি ঘুরে আর নাকাল হয়ে হঠাৎ এক কাণ্ড ক'রে বসল সে। আর এক নির্বুদ্ধিতা।

গড়ে এক মাসে এক এক জায়গায় দিন চার-পাঁচ কি বড় জোর আটদিন কাজ করেছে—তারপর আবার নিরবচ্ছিন্ন বসে থেকেছে, কোন দফায় পনেরো-ষোল দিন কোন দফায় হয়ত চার সপ্তাহ। ফলে রমলাদের বাড়ির জমানো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। তেজ দেখিয়ে ওখানকার কাপড়-জামাও—রমলার যেগুলো—ফেলে এসেছে, নিয়ে আসে নি। সে আরও খরচ। ঘরভাড়া ক'রে থাকতে গেলে—একটু ভাল ঘর, কাশী শহরেও আজকাল ত্রিশ-চল্লিশের কম পাওয়া যায় না। এখন আর এঁদো স্যাঁৎসেঁতে ঘরে থাকার কথা ভাবতেও

পারে না সুহাস। একদিন হিসেব ক'রে দেখল, হাতে যা টাকা আছে, এভাবে চললে আর বড় জোর মাস দুই চলবে, তার পরই হয় ভিক্ষে ধরতে হবে, নয়তো মাথা হেঁট ক'রে কোন লাঞ্ছনার চাকরি নিতে হবে। ঠিকে রান্নার কাজও চেষ্টা করেছে, তাতে যা মাইনে পায়, খেয়ে পরে এই ঘরের ভাড়া দেওয়া চলবে না। জাতও যাবে পেটও ভরবে না। এক জায়গায় একটু মাইনে বেশী বলতে কাজ ধরেছিল, দুদিনের দিনই বাবুর উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে হাত ধরে টানাটানি করতে পালিয়ে আসতে পথ পায় নি।

অনেক ভেবে হিসেব ক'রে তাই এই পথ ধরে বসল।

লালচে-গেরুয়া কাপড় ছুপিয়ে কপালে রক্তচন্দন লাগিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা পরে চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে বসতে শুরু করল। ঘাট থেকে একটু উঁচুতে অথচ পাড় দিয়ে যাতায়াত করার সময় পথচারীদের দেখতে না অসুবিধা হয় এমনি একটা জায়গা বেছে নিয়েছিল। স্নান ক'রে চুল এলিয়ে কমণ্ডলু ভর্তি জলে একটা জবাফুল ফেলে সেইখানে বসে উদাস নেত্রে ওপারের চড়ার দিকে চেয়ে থাকত।

আবহাওয়া যথেষ্ট অনুকূল—তবু প্রসার জমল না।

এ মতলব ঠিক করার আগে সুবিধের দিকগুলোই ভেবে ছিল সুহাসিনী, অসুবিধার দিকটা ভাবে নি।

সুবিধের মধ্যে একটিই—চেহারা ভাল, দেহটা লাল কাপড়ে রক্তচন্দনে আরও খুলেছে। লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে অনায়াসে—বিশেষত পুরুষের।

কিন্তু অন্য দিকে অসুবিধা আছে অনেক।

এখানে অনেকদিন আছে, অনেকেই চেনে। এমনিতে সহজ অবস্থায় চেনা লোকের কথা সব সময়ে কেউ আলোচনা করে না, কিন্তু সে চেনা লোক, যাকে সামান্য বলে জানে, সে যদি হঠাৎ নাটকের ভাষায় পাদপ্রদীপের আলোতে এসে অসামান্য হয়ে উঠতে চায়—তাহলে তারা মুখর হয়ে উঠবে বৈকি। যে ইতিহাস জানে, পূর্ব অবস্থার কথা, তা জানাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। মাত্র কিছুদিন আগেই যে ঝি থেকে কম্‌বাইণ্ড্ হ্যাণ্ডে উন্নতী হয়েছে—এই বছরেই সে হঠাৎ মাতাজী হয়ে উঠতে চাইলে লোকে নীরব থাকবে তা সম্ভব নয়।

এছাড়াও অসুবিধা আছে, বেশ বড় অসুবিধা। যদি বা অজানা কি বিদেশী দু-চারজন রূপ ও গেরুয়ার আশ্চর্য সংমিশ্রণে আকৃষ্ট হয়ে এসে প্রণাম ক'রে বসে—স্বভাবতই তারা কিছু ভাল ভাল কথা, ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনতে চাইবে। সুহাসিনীর লেখাপড়া হাই-স্কুলের নিচের দিক পর্যন্ত, বই যা দু-চারখানা চেষ্টা ক'রে পড়েছে তা সবই হয় ছড়ার বই, গোপাল ভাঁড়, নয়ত—রমাদের বাড়ি এসে, দু-চারখানা নাটক নভেল। ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে যে সব ভারী বইতে—তা পড়ার মতো বিদ্যে নেই, তাঁর কথা ভাববে সে প্রবৃত্তিও ছিল না। সে কি উপদেশ দেবে? গোড়া থেকে যদি বুদ্ধিমতীর মতো মৌনী থাকত তবু যা হোক কথা ছিল, সেখানেও মস্ত ভুল ক'রে বসেছে—লোক দেখলেই সাগ্রহে আলাপ করতে গিয়ে।

ফলে এগারো দিন বসে থেকেও সিকে পাঁচেকের বেশি প্রণামী পড়ে নি, সেই সঙ্গে গোটা দুই কমলালেবু, কটা কলা আর সামান্য সামান্য মিষ্টি—মোট উপার্জন এই।

সন্ন্যাস নেওয়ার এই চমকদার 'কিস্‌সা' শুনে রমলা আর মণিভূষণ একদিন দেখতে এল, আড়াল থেকে দেখেও গেল।

রমলাকেও স্বীকার করতে হ'ল যে, ওকে এই বেশে অপরূপ দেখাচ্ছে। সন্ন্যাসিনী ভৈরবী মানিয়েছে। একটু যদি লেখাপড়া পেটে থাকত তাহ'লে সত্যিই ক'রে খেতে পারত।

এরপর মণিভূষণ একাই এল দু-তিন দিন।

বলাবাহুল্য রমলাকে না জানিয়েই।

স্ত্রীলোকের মানসিক ঔদার্য ও কথার গভীরতা সম্বন্ধে ওর তত আস্থা নেই।

এল, দেখেও গেল—সামনে এসে কথা কইতে পারল না। কারণ চক্ষু-লজ্জাও বটে, লোক-জানাজানির আশঙ্কাও বটে।

আরও একদিন এসে দেখল খাট খালি।

দু-একজনকে জিজ্ঞেস ক'রে জানল মাতাজী (কেউ কেউ বলল, 'উয়ো আওরৎ'), দুদিন আসছেন না।

আর একটু খোঁজ-খবর করতে বাসার ঠিকানাও জানা গেল।

এক্ষেত্রেও সেই পুরাতন কারণ—লোক জানাজানির ভয়ে—তখনই যাওয়ার চেষ্টা করল না, খুঁজে খুঁজে রাত্রেই বাড়িটা বার করল।

ভয় শুধু পরিচিতদেরই নয়, বিশেষ পরিচিতদেরও। সে আটঘাট বেঁধেই এল, রমলাকে বলে এল, 'সুহাসের মাথা থেকে শুনছি ভৈরবীর ভূত নেমেছে। ওদিকে বোধ হয় সুবিধে হ'ল না। এবার গিয়ে সোজাসুজিই অফার দিই—কী বল? ঠিকানা যোগাড় করেছি—ধরে নিয়ে আসি একেবারে—য়্যাঁ? নিজেরা একটু সাবধানে থাকলেই হবে। মনে হয় ওরও যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাইবে না।'

রমলার তখন এমন অবস্থা—সে সব সুদূর বিপদের কথা মনেও পড়ছে না।

মণিভূষণ যখন সন্ধ্যার পর খুঁজে খুঁজে সুহাসিনীর বাসায় হাজির হ'ল, তখন সে একা মেঝেয় বসে কাঁদছে। বাঁচবার—সর্ব বিনষ্টি থেকে রক্ষা পাবার সমস্ত উপায় চোখের সামনে মিলিয়ে যেতে দেখলে হতাশায় যে চোখে জল পড়ে—এ সেই নিঃশব্দ কান্না।

সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে, তবে তারও যে তেলের অবস্থা—বেশীক্ষণ জ্বলবে বলে মনে হয় না।

মণিভূষণ প্রথমটা খুব স্বাভাবিক ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার ভঙ্গীতেই পূর্ব পরিকল্পনা মতো কথা শুরু করেছিল। যেন ওর বিপদে অনুগ্রহ করতেই এসেছে, কিন্তু সে ভাবটা বজায় রাখতে পারল না। উপবাসবিবর্ণ কৃশ কপোল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছে—তাতে কম্পমান দীপশিখার সামান্য আলোয় যেন আরও বেশী সুন্দর, আরও মোহনীয় মনে হ'ল ওকে।

আবেগ এসে সতর্কতা ও হিসাবের বাঁধ যখন ভেঙে দেয়—তখন কণ্ঠস্বর আয়ত্তে রাখা কঠিন। মণিভূষণও রাখতে পারল না।

এবং সে দুটোর তফাত সুহাসিনীর অভিজ্ঞ কানে ধরা পড়বে না—এমনও মনে করার কোন কারণ নেই। সে এতক্ষণ—মণিভূষণের এই আগমনে বিস্মিত হ'লেও বিচলিত হয় নি, অস্বাভাবিক কিছু দেখে নি। খুব অসুবিধা হচ্ছে, হবে সে তো জানা কথাই, দুই-ই অকর্মণ্য—সেই জন্যেই মন-কষাকষিটা মিটিয়ে

নিতে এসেছে। কথার মধ্যে বাক্যের অর্থে বার্তাটা যা প্রকাশ পাচ্ছে—সেটা তা-ই।

কিন্তু গলার আওয়াজে অন্য কথা। সুহাসিনী এবার চমকে উঠে তাকাল ভাল ক'রে মণিভূষণের মুখের দিকে। আলো খুবই কম—তবে এই আলো সম্বল ক'রেই সে বসে আছে অনেকক্ষণ, তার দৃষ্টি বাধা পায় না। অবস্থাটা যেটুকু বাকী ছিল সেটুকুও বুঝে নিল।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়ের আঘাত। সংঘাত মনের মধ্যেও কম নয়—প্রেয়ের সঙ্গে শ্রেয়ের—আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শুভবুদ্ধির—কে জানে, হয়ত বা কামের সঙ্গে প্রেমের।

ফলে বিহ্বল হয়েই পড়বার কথা। বিহ্বলই হয়েছিল। চমক ভাঙল, চমকে উঠল মণিভূষণ ওর হাত দুটো টেনে নিয়ে নিজের দু হাতে মুঠো ক'রে ধরতে।

সবেগে হাত দুটো টেনে নিয়ে সুহাসিনী বলল, 'না না দাদাবাবু, এ কাজ করবেন না, ছিঃ। যখন বুঝি নি তখন একরকম, যা চাই তাই ধরতে গেছি, নিজের কী পাওনা না বুঝেই। তখন আপনার দাম বুঝি নি, আপনার কথা ভাবি নি। এখন আর পারব না। আমার জন্যে দুটো জীবন নষ্ট করবেন না। বিশেষ বৌদির সর্বনাশ—না, ছিঃ!'

এর উত্তরে মণিভূষণ পাগলের মতো কি বলেছিল, কেনই বা তার চোখে জল এসে গিয়েছিল—তা সেও জানে না। সুহাসিনীও শোনে নি কথাগুলো, সে অবস্থা ছিল না মনের—কিন্তু মণিভূষণের মনের চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল।

সে বলল, 'আপনার পায়ে পড়ছি দাদাবাবু, আপনি বাড়ি যান।...ঠিক আছে, আমি কাল ভোরেই যাব, কাজকর্ম সব ক'রে দেব কিন্তু রাত্রে থাকব না।...ঠিকে কাজ করব—আপনি আমার এই ঘরের ভাড়াটা দিয়ে দেবেন, মাইনে বলে। যান, এখন বাড়ি যান।'

কথামতো ভোরেই গেল সুহাসিনী। ঘরদোর ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে পরিষ্কারও করল একবেলা ধরে। নিজে বাজার ক'রে এনে বিকেলে অনেক রকম রাঁধল পরিপাটি ক'রে—মণিভূষণ যা-যা ভালবাসে। কাজ সেরে রাত

দশটায় বাড়ি ফিরল। রমলা বলেছিল, 'এত রাতে যাবি কেন, আজ বরং থেকে যা, কাল সকাল ক'রে ফিরিস—যদি ফিরতেই হয়।'

সে কথাটাও শোনে নি। বরং তার পরও এটা-সেটা কাজ করেছে। ফিরল যখন তখন রাত সাড়ে দশটা।

কিন্তু পরের দিন আর এল না।

কোন দিনই এল না আর।

বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল, সেখানেও নেই। ভোরবেলাই নাকি বেরিয়ে গেছে। কাপড় জামা বিছানা—কিছুই নিয়ে যায় নি।

তবে উদ্বিগ্ন হবার কারণটা দূর করে গিছল।

দোরের সামনেই একখানা চিরুনি চাপা এক টুকরো চিঠি পাওয়া গেল। মণিভূষণকেই সম্বোধন ক'রে লেখা অবশ্য। 'দাদাবাবু, ভাল থাকুন সুখে থাকুন। আমার কথা ভাববেন না। আমি বেঁচে থাকবই একরকম ক'রে। যা চেয়েছিলুম তা পেয়েছি, আমার কোন দুঃখু নেই আর।'

আঁকাবাঁকা লেখা, বানান-ভুলে ভর্তি—তবু পড়তে কোন অসুবিধা হয় না, মানে বুঝতেও না।

দত্তক

শকুন্তলা ওপরে উঠে নিজেদের বড় ঘরখানার মধ্যে এসে দাঁড়াল একবার।

কে জানে, এবার হয়ত এ-ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার দীর্ঘ পঁচিশ বছরের এই বাসস্থান ছেড়ে।

কিছুই কোন দিন পায় নি সে জীবনে। যাকে সত্যকারের পাওয়া বলে, যা কামনা করে মানুষ—তার কোনটাই পায় নি। কোন সাধই তার মেটে নি কোন দিন। যেটাকে যখন অবলম্বন বলে ধরতে গেছে, দেখেছে আসলে সেটা কোন নৌকো নয়, এমন কি কাষ্ঠখণ্ডও নয়, সামান্য তৃণখণ্ড মাত্র। অর্থাৎ তা বেশী ক'রেই ডুবিয়েছে, আশ্রয় বা আশ্বাস দিতে পারে নি।

এটা সে জেনেছে, মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করে যে এ পৃথিবীতে কোন কিছুই তার আপন নয়। শুধু এই দেহটাই এখনও আছে—একদিন সেটাও ছেড়ে

চলে যেতে হবে। আর সে ঘটনাটা যত তাড়াতাড়ি ঘটে, ততই ভাল। সে সব ছেড়ে গিয়ে একবার সৃষ্টিকর্তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। জানতে চায় যে কেন—কোন্ অধিকারে তাকে এমন সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করবেন তিনি। কি শত্রুতা করেছে সে তাঁর সঙ্গে ?

কিছুই তার নয়, সত্যকারের কোন অধিকারই যখন নেই—তখন কোন-কিছুর উপরই মমতা রাখবে না সে—এই মন্ত্রই মনে মনে জপ করেছে সে দীর্ঘকাল। তবু এ ঘরখানা যে কখন, তার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এমন প্রিয় হয়ে উঠেছে তা সে টেরও পায় নি।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর সে বাস করেছে এ ঘরে।

পঁচিশ বছরের প্রতিটি রাত্রি।

এই ঘরেই তার ফুলশয্যা হয়েছিল। ঐ খাটে, ঐ বিছানায়। তাদের সামান্য ক'মাসের দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই ঘরের সঙ্গেই।

তারপর বেশ কিছুকাল একা বাস করেছে সে, এই ঘরেই। ছেলে এসেছে, ছেলের সঙ্গেও থেকেছে এই ঘরে। ছেলে বড় হয়ে সিগারেট খেতে শিখে অন্য ঘরে বিছানা করার জন্য জিদ করেছে, চলে গেছে পাশের ঘরে—আবার একা, কিন্তু সে এ ঘর ছাড়ে নি।

পঁচিশ বছরের প্রতিটি রাত্রি। বড় কম দিন নয়। একদিনও সে অন্যত্র রাত কাটায় নি। চেঞ্জে পর্যন্ত যায় নি কখনও। যেতে সাহস করে নি। শরীর ভেঙে পড়েছে, ডাক্তার উপদেশ দিয়েছেন বারে বারে—'কোথাও একটা যান, এ শহর ছেড়ে যেখানে হোক।' ছেলে বলেছে, 'চল মা, তোমাকে নিয়ে যাই —কতই বা খরচা ?' কিন্তু তবু সে যেতে পারে নি। কেন যেতে পারে নি সে কথাটাও ভরসা ক'রে বলতে পারে নি কাউকে। ছেলেকে তো নয়ই। সে বিশ্বাস করত না, ওকেই নীচ ভাবত। অথচ শকুন্তলা জানত, তার দৃঢ় ধারণা ছিল যে দু-দশ দিনের জন্যেও বাইরে গেলে ফিরে এসে আর এ ঘরে দখল পাবে না।

তাই বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল সে এ ঘর, এ বাড়ি। কিন্তু কাল, কাল কি হবে তা কে জানে।

ছেলেরও লোভ আছে এ ঘরে, তা সে জানে। ছেলে যখন জেদ ধরেছিল তার জন্য পৃথক ঘরের পৃথক শয্যার, তখন কে আশা করেছিল তাকেই এ ঘর

ছেড়ে দিয়ে শকুন্তলা চলে যাবে ওপাশের ছোট ঘরখানায়।

এ ঘর সে না ছাড়াতে অজয় একটু হতাশই হয়েছে, তা সে জানে।

হতাশ হয়েছে, ক্ষুন্ন হয়েছে কিন্তু তবু সাহস করে নি কিছু বলতে। সেদিন সে অধিকার তার ছিল না।

কিন্তু কাল? কাল যদি সে বলে, 'এ ঘরে তোমাকে থাকতে দেওয়া সুবিধা হবে না—আমার, তুমি অন্য কোথাও যাও।' কিংবা যদি, যদি ওদের কাউকে এনে ঢোকায় এখানে?

প্রতিবাদ করতে পারবে না শকুন্তলা। সাহস করবে না কিছু বলতে। কারণ আরও অপমান হতে পারে তাহলে। নিঃশব্দে ঐ ঘর ঐ শয্যা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কিছুই তার নয়। এ ঘর, এই বাড়ি, এই সব আসবাবপত্র, কোনটাতেই তার কোন অধিকার নেই।

কাল সকাল থেকে ছেলেই এ-সবের মালিক!

ছেলে!

হায় রে! যদি তার সত্যিকারের ছেলে হ'ত! তার রক্ত মাংস দিয়ে গড়া, তারই জরায়ুতে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা—তিলে তিলে গঠিত হওয়া তারই ছেলে!

তাহলে এই অধিকার ত্যাগ করাটাই কত আনন্দের হত!

অথবা অধিকার থাকা না থাকার কোন প্রশ্নই উঠত না। ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারত, রাগারাগি করতে পারত—ছেলের কাছে হেরে গিয়ে অথবা হার মেনে এ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াও অত দুঃখের হত না।

অপমান তো নয়ই।

আর এ। হ্যাঁ, আইনত তার ছেলে ঠিকই।

দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বুকে করে তাকে মানুষ করেছে—তিলি তিলে, বুকের রক্ত দিয়ে, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে—এটাও ঠিক—তবুও তার ছেলে কি?

সম্পূর্ণ অধিকার, সম্পূর্ণ জোর আছে কি তার ঐ ছেলের ওপর? তাহলে নীচে এত উল্লাস, এত আয়োজন কিসের? কেন ওরা আজ জোড়া পাঁঠা দিয়ে কালিঘাটে পুজো দিয়ে এল? কেন? কেন? কী ভরসায়?

ঘরে এসে একটা জানলার সামনে দাঁড়াল শকুন্তলা।

এই জানলাটা দিয়ে দূরে বড় রাস্তাটা অনেকখানি দেখা যায়। ট্রাম, বাস, পথচারী যাত্রীর দল—বিপুল জীবন্ত জনতার প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায় এখান থেকে।

এই বাতায়ন তার জীবনেরও বাতায়ন বটে।

জীবন যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, যখন কোথাও এতটুকু আলো কি আশ্বাস—আনন্দ যে কি বস্তু সে তো জানলই না কখনও—থাকে না, তখনই ছুটে এসে দাঁড়ায় সে এখানে। সুমহৎ ও সুবৃহৎ জীবনপ্রবাহ প্রত্যক্ষ ক'রে কেমন এক রকমের সান্ত্বনা পায়, সব জ্বালা সব দুশ্চিন্তা যেন আশ্চর্য প্রলেপে জুড়িয়ে যায়, শান্ত হয়।

এই জানলা এই ঘরেরই অঙ্গ। এ ভাবে আব কোন জানলা দিয়ে বড় রাস্তা দেখা যায় না।

হয়তো কাল থেকে এ সান্ত্বনাটুকুও থাকবে না।

তাহলে সে বাঁচবে কি ক'রে? কী নিয়ে।

কথাটা ভাবতে গিয়েও, প্রশ্নটা মনে জাগবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসি পেয়ে যায় তার।

এখনও বাঁচবে সে? এখনও তার বাঁচার সাধ আছে? আছে জীবনের ওপর মমতা?

আশ্চর্য! কী দিয়েছে তাকে জীবন? কতটুকু পেয়েছে সে জীবন থেকে?

সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তার—পঁয়তাল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। এর বেশী তার গরীব কাকা কিছু ক'রে উঠতে পারেন নি। তাও তো খুব বৃদ্ধ ধরে দেন নি, তা দিলেও শকুন্তলার কিছু বলার থাকত না, কারণ কাকার কী ক'রে দিন চলে তা তো দেখাই ছিল তার নিজের চোখে। তাছাড়া যথেষ্ট পয়সা আছে দেখেই তিনি এ বিয়ে দিয়েছিলেন। চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিলেন, 'তোকে তো একদিনও ভাল খাওয়াতে কি একখানা ভাল কাপড় পরাতে পারলুম না মা, তবে যেখানে যাচ্ছিস, অন্তত খাওয়া পরার কোন কষ্ট পাবি না। লোকে হয়ত অনেক কথা বলবে, তোর মতো মেয়েকে দোজবরের হাতে দিতে হ'ল তবে তুই বিশ্বাস করিস অপাত্রে আমি দিই নি। তুই সুখী হবি, এই জেনেই আমি দিচ্ছি।'

কাকাকে সে বিশ্বাস করত। আজও করে। তার কাকা গরীব কিন্তু স্নেহময়। কখনও নিজের ছেলেমেয়েদের থেকে পৃথক ক'রে দেখেন নি।

আর সত্যিই, তিনি অপাত্রে দেনও নি।

এতটা বয়সের ব্যবধান? কিন্তু সেটা এমন কিছু শোচনীয় ঘটনা বলে মনে হয় নি তখন। ভালবাসার পথে কোন বাধা বলেও মনে হয় নি। স্বামীকে সে এক দিনের জন্যও অশ্রদ্ধা করে নি।

শ্রদ্ধা তো বটেই, তার সঙ্গে স্নেহ ও উৎকণ্ঠারও অভাব ছিল না। আর কিছু-দিন সময় পেলে হয়ত ভালবাসতেও পারত।

সেই কিছুদিনটাই পায় নি শকুন্তলা।

কাকা সব দিক হিসেব করেছিলেন কেবল যমরাজের দিকটাই ভাবেন নি। তাঁর খেয়াল-খুশির কথাটা চিন্তা করেন নি।

বিবাহের ঠিক সাতটি মাস পরেই ডবল নিমোনিয়া হয়ে মারা গেলেন শ্রীপতিবাবু। বহু চিকিৎসা, বহু সেবা, বহু অর্থ ব্যয় করেও বাঁচানো গেল না তাঁকে।

সেদিনও এ বাড়ি, এ ঘর ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। আশ্রয় আর কোথাও ছিল না বলে নয়ঃ শকুন্তলা যেতে পারে নি। ওদের শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে কেউই নেই—শাশুড়ীকে কে দেখবে? যারা আছে দূর সম্পর্কের—তাদের লোলুপ ব্যগ্রতাকে সেই শোকাহত অর্ধমৃত বৃদ্ধা কেমন ক'রে ঠেকাবেন? এই সব বিবেচনাতেই সে যেতে পারে নি। নইলে, ওরও তেমন কোন আত্মীয় নেই সত্যকথা, তবু কাকা তো ছিলেন। তিনি নিয়ে যেতে চেয়েওছিলেন, বলে-ছিলেন, 'অন্তত দুটো চারটে দিনের জন্যেও চ' মা—এখানে একা এই শোক এই সর্বনাশ মুখ বুজে সহ্য করছিস এ ভাবতেই আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কী করতে চেয়েছিলুম, ভগবান এ কী করলেন!'

হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠেছিলেন কাকা। ললাটে করাঘাত করেছিলেন বার বার। সে শোক সে দুঃখ আন্তরিক—তাতে কোন ভেজাল ছিল না। সেদিন কাকার কাছে গিয়ে পড়তে পারলে অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করত সে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সেখানে সুখ না হোক, স্বাচ্ছন্দ্য না থাক,—সত্যকারের বুকভরা স্নেহ ছিল। আর দুঃখের দিনে সেইটেই তো পরম সান্ত্বনা।

অমেয় বিশ্বাস। যেতে পারে নি শকুন্তলা শাশুড়ির জন্যই। যদিও সে জানতো শাশুড়ি তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। শ্রীপতিবাবুর অসুখের শুরু থেকেই তিনি রাক্ষুসী ডাইনী সর্পিনী-মেয়েমানুষ ইত্যাদি বলে ওকেই সে জন্যে দায়ী করেছিলেন, এখন যা করবেন তা তো জানা কথাই।

তবু তাঁর জন্যই সে যেতে পারে নি কোথাও, দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে ছিল এখানে। কারণ ওঁর কদর্য মুখ সহ্য ক'রেও কে ওঁকে জোর ক'রে স্নান করাবে, পুজোয় বসাবে,—খাওয়াবে ? তাকে করতেই হবে। কারণ—কর্তব্য ? না তার চেয়েও বেশী। স্বামীর ইহজীবনের শেষ কথা—তার হাত ধরে অশ্রুসজল চোখে বলে গিয়েছিলেন, 'মাকে দেখো—তুমি ছাড়া আর কেউ এত সহ্য করতে পারবে না !' তার পরেই কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

স্বামীর সঙ্গে পরিচয় তার স্বল্প। হয়ত ঠিক যাকে প্রেম বলে তা মনের মধ্যে দানা বাঁধবার অবসরই পায় নি তাদের—তবু তাঁর সম্বন্ধে দুর্বলতার একটু কারণ ছিল বৈকি। বড় ভদ্র, শান্ত, বড় বিবেচক ছিলেন তিনি। যে কটি মাস তারা পেয়েছিল সে কটি মাসে কোন তিক্ততাকেই তিনি কাছে ঘেঁষতে দেন নি। সে কটি মাস সুধা না হোক,—মানুষটি শান্তি দিয়ে ভরে দিয়েছিলেন তার জীবন। তিনি বেঁচে থাকলে সে সুখী হত—তা জানে শকুন্তলা। সুতরাং তাঁর প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞতা আছে বৈকি।

শ্রীপতিবাবু এই অসুখে পড়ে মৃত্যুর মাত্র কদিন আগে একটা কথা বলেছিলেন। সাংঘাতিক কথা—সেটা কেউই জানত না, শকুন্তলার কাকাও না। —জানা সম্ভবও না, অনুমান করার পর্যন্ত কথা নয়।

প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দীর্ঘকাল তিনি বিবাহ করেন নি। আর করবেন না বলেই স্থির করেছিলেন। শুধু মার অত্যাচারেই, বংশরক্ষার জন্য তাঁর ব্যাকুলতাতেই, অতিষ্ঠ হয়ে বিবাহে মত দিতে হয়েছে। দীর্ঘ ন'বছর পরে বিয়ে করেছেন তিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে, পাছে তার অকালমৃত্যু হলে তাঁর দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিরা এসে সব দখল করে এবং মাকে পথে বসায়, সেই ভয়ে তিনি এক উইল ক'রে মাকেই সব বিষয়ের উত্তরাধিকারী ক'রে গেছেন। তিনখানা বাড়ি, কোম্পানীর কাগজ সব।

শ্রীপতিবাবুই সে নির্বুদ্ধিতার কাহিনী শুনিয়েছিলেন ওকে। একটু অপ্রতিভ

ভাবে হেসে বলেছিলেন, 'এবার একটু ভাল হয়ে উঠে আগেই উইলটা বদলাতে হবে। তোমার নামে লিখে দিয়ে যেতে হবে সব—তুমি আমার বুড়ো মাকে ফেলবে না তা জানি, আর যদি আমাদের ছেলে হয়ই তো—সে ছেলে কেমন হবে তারও তো ঠিক নেই—তার হাতে পড়াও ভাল নয়। বরং তোমার হাতে সে থাকে সেই ভাল।'

'ওসব কী হচ্ছে! আর কি কোন কথা নেই তোমার?'

ধমক দিয়ে বলেছিল শকুন্তলা।

'না না, তুমি বুঝছ না, ছেলে মানুষের বোঝার কথাও নয়, মানুষের জীবন পদ্মপত্রে জল—কখন আছে, কখন নেই। ওর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। বরং—'

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, শকুন্তলাই হাত দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরেছিল, 'থাক্ থাক্, হয়েছে। আর অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই। কথার সব ছিরি গ্যাখো না!'

হেসেছিলেন শ্রীপতিবাবু। তৃপ্তির হাসি। আশ্বস্তও হয়েছিলেন তাঁর প্রতি শকুন্তলার স্নেহের পরিচয় পেয়ে। হয়ত মনে মনে স্থির করেছিলেন যে ভাল হয়ে উঠেই এর একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলবেন। কিন্তু যতই তিনি মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার কথা মুখে বলুন—এত শীগ্‌গির এবারের অসুখেই তিনি যাবেন, সে জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাহলে হয়ত উকিলকে খবর দিতেন, কিংবা একটা চেক লিখেও দিয়ে যেতেন শকুন্তলার নামে। অন্তত কিছু নগদ টাকাও তার হাতে থাকত।

সে সব কিছুই ক'রে যেতে পারেন নি শ্রীপতিবাবু, উল্‌টে বরং বুড়ী মাকে তার হাতে গছিয়ে দিয়ে গেছেন। ইহকালের শেষ অনুরোধ স্বামীর—শকুন্তলা সে অনুরোধ ঠেলতে পারবে না।

ফলে ওর শাশুড়িই এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। মামলা মোকদ্দমা করা চলত হয়ত। ওর জ্ঞাতি ভাসুরপোরা সেই পরামর্শ ই দিয়েছিলেন, কিন্তু সাহস হয় নি শকুন্তলার, ইচ্ছেও হয় নি। এদের মনের চেহারাটা দেখতে পেয়েছিল সে, এদের ওপর ভরসা করে মোকদ্দমার অন্ধ গহ্বরে পা বাড়ানো আরও বেশী মূর্খতা হবে তা সে বুঝেছিল। তাছাড়া ভরসার মধ্যে তো ছিল ওর

গায়ের কখানা গহনা—সেও খুব বেশী নয়, ওর সতীনের সব গহনা তাঁর বাপের বাড়ির লোকেদের ডেকে দিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীপতিবাবু,—আর ছিল একটি দু'হাজার টাকার পলিসি। এর আগেকার সব পলিসির টাকাই তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন, এইটে শুধু বাকী ছিল। এই সম্বল ক'রে এত বড় সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ানো উচিত হত না কিছুতেই। তাছাড়া ওর কাকাও বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, তোমার খোরপোশ এবং একটু আশ্রয় এ থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। কিন্তু তার চেয়ে বেশী মোকদ্দমা করলেই কি পারে? তোমার ছেলেমেয়ে হলে আলাদা কথা ছিল। যদি নিতান্ত তোমায় তাড়িয়ে দেন কি অসহ্য হয়ে ওঠে এখানে থাকা, তখনই বরং নালিশ করো। এমন মামলা করবেই বা কি দিয়ে? তাছাড়া এসব মামলা দু-একদিনে মেটে না—অনেকদিন লাগবে। এত ছুটোছুটি করবে কে?'

অবশ্য শাশুড়ি খোরপোশে বঞ্চিত করতে চান নি কোন দিনই; এমন কি সেদিক দিয়ে কোন কর্তৃত্বও চালাতে চান নি। টাকাকড়ি সব তার হাতেই থাকত, ভাড়ার রসিদ সই করলেও কোনদিন হাতে করে টাকা নেন নি। শুধু দিনরাত বাক্যবাণ সহ্য করা ছাড়া—'ভাতারখাকী' 'সর্বনাশী' 'রাক্ষুসী' অবিরত এই অভিধা শোনা ছাড়া আর কোন কষ্টই সহ্য করতে হয় নি। বছর চারেক চলেছিল এমনি।

দীর্ঘ চার বছর।

দুজনের কারুরই অপরের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র প্রীতি ছিল না—তবু পরস্পরকে অবলম্বন ক'রে দিন কাটাচ্ছিল তারা।

পোষ্যপুত্র নেবার কথাও উঠেছিল বৈকি। কয়েকবারই বলেছিলেন শাশুড়ি।

শকুন্তলা কান দেয় নি তাতে। এ জিনিসটায় অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণা ছিল তার। এ যেন খোদার ওপর খোদকারী করা। বিধাতার ওপর কলম চালানো। সে শাশুড়িকে বোঝাবার চেষ্টা করত যে, এ সম্ভব নয়, পরগাছা কখনও জোড়া লাগে না। পর পরই থেকে যায় চিরদিন।

প্রথম প্রথম শাশুড়ি বুঝতেন সে কথা। চুপ ক'রে থাকতেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন শুধু।

কিন্তু এক সময় যখন বুঝতে পারলেন যে মৃত্যু তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে

গ্রহনী রোগে শয্যাগত হয়ে থাকার পর হাত পা ফুলে গেল, তখন যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠলেন।

পরলোকে গিয়ে এক গণ্ডুষ জল পাবেন না তিনি ? তাঁর স্বামীপুত্র উপবাসী থাকবে ? তৃষার্ত থাকবে তাঁর শ্বশুরের বংশ ? যুক্তি তর্ক সব ভেসে গেল সে উন্মত্ত ব্যাকুলতায়। ঢিপ ঢিপ ক'রে বৌয়ের পায়েব কাছে মাথা খুঁড়তে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন।

অগত্যা শকুন্তলাকে রাজী হতে হ'ল। ছেলে যেন যোগানোই ছিল। ওদেরই নিচের তলার ভাড়াটে বিজয়বাবুরা ব্রাহ্মণ, পূর্ববঙ্গে বাড়ি কিন্তু বহু দিন এদেশে আছেন, ওঁদের বংশ-পরিচয় কুটম্ব-ইতিবৃত্ত সব সংগ্রহ করেছিলেন শকুন্তলার শাশুড়ি। ওঁরই তৃতীয় পুত্র অজয় তখন সবে এক বছরের—দত্তক নেবার উপযুক্ত। বিজয়বাবু এমন কি তাঁর বড় ছেলে সঞ্জয়কেই দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আট বছবের ছেলে নিয়ে সুবিধা হবে না শ্রীপতির মা তা বুঝেছিলেন।

'না বাপু ওতে আমার চলবে না, কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ। আমি চাইছি একবার তুধের বালক, যার এখনও জ্ঞান হয় নি। যে জ্ঞান হয়ে বৌমাকেই মা বলে জানবে, আর বৌমারও গু-মুত ঘেঁটে মানুষ করার দরুন মায়া পড়বে।'

কেন বড় ছেলেকে দিতে চেয়েছিলেন বিজয়বাবু শকুন্তলা তা বোঝে। সেইদিনই ওঁদের মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছিল শকুন্তলা। আট বছরের ছেলে — তার মায়া পড়েছে নিজের বাপ-মায়ের ওপর, সে মায়া সহজে যাবার নয়। আর টপ ক'রে সাবালকও হবে সে, বিষয়টা তাড়াতাড়ি ওদের হাতে গিয়ে পড়বে।

বুড়িকে বিস্তর জপিয়েছিলেন বিজয়বাবু, 'আপনাদের তো দেখাশুনার লোকই দরকার একটা, বড় সড় দেখে নিলে তাড়াতাড়ি মাথাধরা হয়ে উঠত, কাজ পেতেন।'

'না না,' বুড়ি ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, 'আমি বলছি ওতে আমার চলবে না, কেন মিছে বকাচ্ছ বাছা শুধু শুধু ? ঐ ধেড়ে ছেলে আমাদের পোষ মানবে কি না ! আর তুমিই বা কিরকম নির্মায়িক বাপ বাপু, জ্যেষ্ঠ সন্তানকে কেউ বেচতে চায় !'

'বেচতে চায়' কথাটায় যেন আঘাত লেগে চমকে উঠেছিলেন বিজয়বাবু। অথচ কথাটা তো তাই। এক হাজার এক টাকা নগদ এবং গত কয়েক মাসের বাড়িভাড়া যা বাকী পড়েছে, তার রসিদ—এই নিয়েই তো ছেলেকে দত্তক দিতে রাজী হয়েছেন তিনি।

অগত্যা অজয়কে নেওয়াই স্থির হলো।

মানুষগুলো ভালো নয় তা এই দু-তিন বছরেই টের পেয়েছিল শকুন্তলা। অথচ উপায়ই বা কি। শাশুড়ির 'এখন-তখন' অবস্থা, সময় হাতে নেই একটুও। ভাল সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ছেলে, ব্রাহ্মণের ঘরের—অথচ দত্তক দিতে রাজী থাকবে বাপ-মা, খুঁজে পাওয়া অত সহজ নয়, তা শকুন্তলা জানত।

তাছাড়া শাশুড়ি যে অমন কাণ্ড ক'রে যাবেন তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। যথারীতি যজ্ঞ এবং লেখাপড়া ক'রে দত্তকপুত্র গৃহীত হবার পরই উকীল ডাকালেন শাশুড়ি। বিজয়বাবুরই বন্ধু উকীল, তিনিই গিয়ে ডেকে আনলেন, আর কে-ই বা আছে। কারুর কথা মনেও পড়ে নি তখন। উকীলের দ্বারা পাকা উইল করালেন অজয়ের ঠাকুমা। একুশ বছর বয়স হ'লে এই সমস্ত সম্পত্তি পাবে অজয়, শকুন্তলার শুধু খোরপোষের অধিকার মাত্র থাকবে। যতদিন না তার বয়স পুরো হয় ততদিন এই সম্পত্তির আয় থেকেই ওর আর শকুন্তলার খরচ চলবে—অবশ্য ন্যায্য খরচ যা তাই। অজয় বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সে হিসেব ওকে বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন ওর অভিভাবক।

এইবার প্রশ্ন উঠল অভিভাবক হবেন কে?

'কেন, বৌমা।' বললেন শকুন্তলার শাশুড়ি।

উকীল বললেন, 'অবিশ্যি ওঁর ছেলে, উনিই যোগ্যতম অভিভাবক। তবে কি জানেন মা, মেয়েছেলে তো, দেখাশুনো কিছুই করতে পারবেন না তেমন। তার চেয়ে বিজয়কেই অভিভাবক করে যান, হাজার হোক ওর আত্মজ, ও যেমন ছেলের দিকটা দেখবে তেমন কি আর কেউ দেখবে? তাছাড়া পুরুষ মানুষ তো!'

তখন বুড়ির প্রায় শেষ অবস্থা। হাঁপাচ্ছেন রীতিমতো। তবু কোটরগত চক্ষুতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললেন, 'কেন বল তো বাপু, বিজয়ের হয়ে অত সুপারিশ, কিছু বলেছে বুঝি?'

তারপর আবার একটা দম নিযে বললেন, 'একমাত্র পোকে ডাইনের হাতে সমর্পন। তার চেয়ে বিষয়টা সোজাসুজি ওর হাতে তুলে দিলেই হয়।...না সে হবে না। তবে একটা কথা তুমি আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছ মন্দ নয়। ওরা দুজনেই থাক অভিভাবক। দুজনেই দুজনের উপর নজর রাখবে, খোকার বিষয়টা কেউ নষ্ট করতে পারবে না।'

তবু উকীল বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বুড়িকে নরম করতে পারেন নি। সেই মর্মেই উইল লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়ে গেল।

শকুন্তলা ও বিজয়বাবু দুজনেই রইলেন অভিভাবক।

সর্বনাশের চেয়ে অর্ধেকনাশ ভাল, উকীলও এই বুঝে আর কিছু বলেন নি শেষ পর্যন্ত।

শাশুড়ির মৃত্যুর আগেই বেশ কয়েক মাসের বাড়িভাড়া পড়ে ছিল, সেটা শোধ হল ছেলের নামে—কিন্তু এখন আর বাকী পড়া বা শোধ দেওয়ার কোন কথাই রইল না। বিজয়বাবু সোজাসুজি ভাড়া দেওয়া বন্ধ করলেন।

বললেন, 'ছেলের আমি অভিভাবক—প্রধান অভিভাবক বলতে গেলে—সে যখন বড় হয়ে উঠে কৈফিয়ত কি হিসেব চাইবে, সে হিসেব আমিই দেব। ওকে অত ভাবতে হবে না।'

'যাও' বলার উপায় নেই। বলতেন, 'হ্যাঁ, তা নইলে বুঝি আর ছেলেটাকে গলা টিপে শেষ করার সুবিধে হচ্ছে না? বলি তিনি তো জানতেন সবই, তাঁর বয়স হয়ে ছিল, ঐ মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘরও করলেন বহুকাল—সেই জন্যই তো আমাকে এর মধ্যে জুড়ে দিয়ে গেলেন। জানতেন যে তা নইলে ওর আর কিছু থাকবে না প্রাণেই বাঁচবে কিনা সন্দেহ। না, উনি যাই বলুন, এ বাড়িতে আমাকে থাকতেই হবে—অজয়ের জন্যে, ওর স্বার্থেই আমার থাকা দরকার।'

আসলে উনি তখন ক্ষেপেই গিয়েছিলেন কতকটা। যে জন্য এত কাণ্ড করলেন সেটার কিছুই হ'ল না। টাকা কিছুই পেলেন না হাতে। বুড়ি জোড়া অভিভাবক ক'রে দিয়ে গেলেও, সুদের টাকা, শেয়ারের ডিভিডেণ্ড এবং বাড়ি ভাড়ার টাকা শকুন্তলাই আদায় করত শেষের দিকে—তেমনিই করবে—এই ব্যবস্থাই অব্যাহত রেখেছিলেন। সে অবশ্য খুব বেশী নয়, পুরনো ভাড়াটে, ভাড়া খুব বেশী কেউই দিত না, সুদ ও ডিভিডেণ্ড দুই মিলিয়েও এমন একটা মোটা টাকা

নয়, কোনমতে এদের সংসার চালানোর মতোই—তবু সেটা হাতে পেলে বিজয়বাবুদের সংসারটাও সচ্ছলে চলত, শকুন্তলাকে জব্দ করতে পারতেন অনেকটা। সেই সম্ভাবনা থেকেই বঞ্চিত হয়ে তাঁর ক্ষোভ ও বিদ্বেষের অবধি রইল না।

সে বিদ্বেষ নানারূপে নানা সুযোগে প্রকাশ পেতে লাগল। ভাতে মারতে না পারলেও অন্য উপায়ে শকুন্তলাকে জব্দ করার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। তাঁদের অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল শকুন্তলার। ভাড়া দেওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না,—এমন আচরণ করতে লাগলেন তাঁরা যে—বাড়িটা তাঁদেরই, অনুগ্রহ করে একাংশে শকুন্তলাকে থাকতে দিয়েছেন মাত্র। তাঁরা নিচের তলার ভাড়াটে, কিন্তু ছাদের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন তাঁরা একদিন, সে তালা আর খোলানো গেল না। দোতলার এই আড়াইখানি ঘরে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা, কিন্তু ওদের দাপটে সেটুকুতে বাস করাও দুরূহ হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

অত্যাচার এবং তার সঙ্গে অপমান। আর অপমানের যে এতরকম রীতি পদ্ধতি ও কৌশল আছে তা শকুন্তলা কখনও ভাবতেও পারে নি। মানুষ যে এত পাজী হয়, এত বদমাইশ হওয়া সম্ভব কারও পক্ষে—এ ছিল ওর কল্পনার অতীত। মানুষকে এত খারাপ দেখতে অভ্যস্ত নয় সে। তার কাকা দরিদ্র হ'লেও অভিজাত বংশের সন্তান তিনি—তাঁর আচার-আচরণও সেই রকমই ছিল। কাকী তো মাটির মানুষ। এখানে এসে শ্রীপতিবাবুকে দেখেছিল—তিনিও অত্যন্ত ভদ্র। ওর তাই ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে মানুষগুলো মোটামুটি এই রকমই। টিকা নেওয়া থাকলে মানুষ রোগের সঙ্গে যুঝতে পারে, তেমনি বদমানুষ দেখা থাকলে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা যায়ঃ—এ ক্ষেত্রে শকুন্তলা আরও অসহায় আরও দুর্বল বোধ করেছিল নিজেকে।

এক এক সময় সবটাই অর্থহীন মনে হ'ত ওর। মনে হ'ত কী দরকার এত হাঙ্গামা করবার? এত টানাটানিরই বা প্রয়োজন কি? যাদের প্রয়োজন বরং তারাই নিক, সুখী হোক। জীবনের অবশিষ্ট কালটুকু কোনমতে জীবনধারণ ক'রে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা। তার ভবিষ্যৎ বলতে তো এই-সেই কোনমতে-বেঁচে-থাকার-মতো দুটি ভাত ও লজ্জা নিবারণের জন্য দুখানা থান কাপড় এই তো মাত্র দরকার তার। সেটুকু লোকের বাড়ি রাঁধুনীগিরি এমন কি দাসীবৃত্তি

করলেও পাওয়া যাবে—বরং তার চেয়ে বেশী, নগদ কিছু টাকাও।

কিন্তু এই যে ছেড়ে যেতে পারে নি, প্রতিদিনের জীবনের জন্য প্রতিদিন যুদ্ধ করতে হয়েছে তাকে, করতে হয়েছে প্রাণপণ টানাটানি—তার কারণ শুনলে হয়ত আজ আর কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য ছেলেকে সে বলতেও যাবে না। পাবে নি—ঐ ছেলের জন্যেই।

অজয়ই যেন দু পায়ে বেড়ি হয়ে আটকে রেখেছিল তাকে। পরের ছেলে, শত্রুর ছেলের জন্যেই যেতে পারি নি কোথাও।

কেউ নয় ও, ওর সঙ্গে সত্যকার কোন সম্পর্ক নেই, কোন বন্ধন, বড় হয়ে কোন কাজেই আসবে না, পর পরই থেকে যাবে তা সে সবই জানত ; মনকে বোঝাবার চেষ্টা করত বারবার, তবুও পারে নি ওকে ত্যাগ ক'রে চলে যেতে।

ওর জন্যও নয়, বিষয়ের জন্যও নয়—ওর কল্যাণের জন্যই সমস্ত সহ্য করেছে শকুন্তলা—মুখ বুজে। তাও যদি ছেলেটাকেও সে পেত!

সেইখানেই ওর সব চেয়ে বড় শত্রুতা করেছে ওরা, ওর শত্রুরা।

ছেলেটাকে ওর কাছে থাকতেই দিত না বেশির ভাগ। নানা অছিলায় ওর ভাই বোন এসে, ওর নিজের মা এসে নিয়ে যেত। প্রথম প্রথম নিয়ে যেত এখনও দুগ্ধ-পোষ্য এই অজুহাতে। তারপর আর অজুহাতও দিত না।

ছেলে যখন চার বছরের হ'ল, শকুন্তলা ওকে এক ভাল নার্সারী ইস্কুলে দিলে। তাতে অবশ্য বিজয়বাবু আর স্ত্রীর ঘোরতর আপত্তি ছিল—'এই কি বয়স নাকি ইস্কুলে যাবার, হেসে খেলে বেড়াবে এখন, তা নয় ইস্কুল! এ শুধু ওকে পীড়ন করার ফন্দি'—এই কথা শোনাতে লাগলেন অহরহ ওঁরা।

তারপরও, লেখাপড়া শেখানোটাতে বারে বারে বাধা দিয়েছেন ওঁরা, প্রবল ও সরব আপত্তি জানিয়েছেন ওদিক দিয়ে যতরকমে পেরেছেন অনিষ্ট করেছেন। কিন্তু শকুন্তলাও এই একটি দিকে কঠিন হয়ে থেকেছে বরাবর, কিছুতে হার মানে নি। ওখানে কোনরকম আপস করে নি ও।

একই বাড়িতে বাস—ওপরে আর নিচে। একপ্রস্থ সিঁড়ির মাত্র ব্যবধান।

কাজে অকাজে, কারণে অকারণে ডেকে নিয়ে যায় ওরা। কিছু ভাল খাবার পিঠে পুলি হ'লে তো কথাই নেই, উত্তম অছিলা। অজয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেশ ভাল ক'রেই যে—সে ওদেরই ছেলে, ঐ ছেলেমেয়েগুলি

তার আপন ভাই বোন। আর শকুন্তলা কেউ নয়, পোষ্য নেওয়া মা। অজয় অত টাকা পাবে, সুখী হবে—এই জন্যই অজয়ের মুখ চেয়েই ওঁরা এত স্বার্থত্যাগ করেছেন—একথা যেন সে না ভোলে।

এইভাবে প্রবল দোটানার মধ্যে মানুষ হয়েছে অজয়। আই.এ. পাস ক'রে বি.এ. পড়ছে। চাকরীরও চেষ্টা দেখছে। বিজয়বাবু অহরহ উপদেশ দিচ্ছেন ব্যবসা করবার, টাকা তো আছেই—মিছিমিছি চাকরি করবে কেন ? উনি যত-দিন বেঁচে আছেন অজয়কে মাথাও ঘামাতে হবে না, উনিই সব দেখাশুনো করতে পারবেন।

অজয় চুপ করে থাকে। সে এটা সমর্থন করে নি, আপত্তিও জানায় নি।

চুপ ক'রেই থাকে সে। সেই জন্যই ছেলেটাকে চিনতে পারে না শকুন্তলা। বড্ড চাপা। ওদের কাছে যায়, দিনেরাতে দু-তিন ঘণ্টা তো কাটায়ই —তবু ওদের কাছেও যে মনের কথা খুলে বলে তা নয়। কিন্তু তবু কথা বলে; শকুন্তলার সঙ্গে কথাও বলে কম। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বলে না।

ইতিমধ্যে সিগারেট খেতে শিখেছে সে। আর সেটা গোপন করারও চেষ্টা করে না। ঠিক সামনে এখনও খায় না এই মাত্র। কিন্তু ঘরের মেঝেতে পোড়া টুকরো অথবা বিছানার ওপর প্যাকেট পড়ে থাকে—সে জন্যও কুণ্ঠিত হয় না।

আরও একটি নেশা ধরেছে তাকে।

একটি মেয়ে এসেছে ওর জীবনে। এই বয়সেই।

দৈবাৎ শুনতে পেয়েছিল শকুন্তলা। পরে একটি চিঠিও দেখতে পায় মেয়েটির। একটু চাড় ক'রে সব ইতিহাসই সংগ্রহ করেছে তারপর।

বৈদ্যের মেয়ে, ওর সহপাঠী। মেয়েটি সুন্দরী নয়, অসামান্যা তো নয়ই। তবে উকীলের মেয়ে। লেখাপড়াতে ভাল, হয়ত বুদ্ধিমতীও।

বাড়িতে আনেনি কখনও। কিন্তু দু-একদিন অজয়কে সে ডাকতে এসেছে। জানলা দিয়ে দেখেছে শকুন্তলা।

একদিন এইভাবেই ডাকতে এসেছে, অজয় তখন বাথরুমে ; ঝিকে দিয়ে ডেকে পাঠাল শকুন্তলা।

মেয়েটি চমকে উঠল, লাল হয়ে উঠল নিমেষে।

হয়ত ভয়ও পেল।

কিন্তু পরক্ষণেই কেমন একটা উদ্ধত বেপরোয়া ভাব মুখে এনে উপরে উঠে এল সে ঝিয়ের সঙ্গে।

এসে নমস্কারও করল না। ভ্রূকুটি ক'রে প্রশ্ন করল, 'আমায় ডেকেছেন ?'

'হ্যাঁ মা। খোকা—মানে অজয় স্নান করছে, তুমি বাইরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে মা। একটু বসো না। তুমি আমার খোকার বন্ধু, আমারও মেয়ের মতো। তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাও, এ বড় খারাপ লাগে আমার।'

চমকে উঠল মেয়েটা। নিজের উদ্ধত প্রশ্নের জন্য বোধহয় অপ্রতিভ হয়ে উঠল মনে মনে। এতক্ষণে এগিয়ে এসে একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

ততক্ষণে অজয়ও এসে পড়েছে। তারও ললাটে ভ্রূকুটি, সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কারও ছায়া মুখে।

'একি। তুমি!'

কোনমতে শুধু প্রশ্ন করতে পারে অজয়।

'তুই তো বেশ, খোকা। তোর বন্ধু নিচে থেকে ডেকে ফিবে যায়—ওপরে আনিস না একবারও। কেন রে, আমি কী এমন জন্তু যে বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করানো যায় না ?'

'না না, তা কেন! বারে।' লজ্জিত হয়ে পড়ে অজয়, 'এমনি, তুমি হয়ত ব্যস্ত থাকো। বাইরের ঘর নেই একটাও—একেবার শোবার ঘরে এনে তোলা—তাই!

'তা হোক না। এ তো আর পুরুষ মানুষ নয়। এ তো আমার মালক্ষ্মী, অন্তঃপুরেই তো আসবে ও।'

আর একবার চমকে ওঠে অজয়। কথাগুলোর মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত অর্থ আছে কিনা—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকিয়ে তাই বোঝবার চেষ্টা করে যেন। কিন্তু কিছুই ঠিক বুঝতে পারে না শেষ পর্যন্ত।

এরপর মেয়েটি আরও দু-একদিন এসেছে, তার বেশী নয়। ভালই লেগেছে মেয়েটিকে শকুন্তলার। তবে অজয়ও খুলে বলে নি কিছু। শুধু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে মায়ের মতামতটা জানবার চেষ্টা করেছে। শকুন্তলা

ছেলের আবিরমাখা ললাটের দিকে চেয়ে উত্তর দিয়েছে, 'বিবাহের মধ্যে সুখী হওয়ার সার্থক হওয়ার প্রশ্নটাই বড় বাবা। অভিভাবকরা চেষ্টা করেন নিজেদের অভিজ্ঞতায় যাচাই ক'রে এমন মেয়ে বেছে দিতে যাতে সন্তানরা সুখী হয়, তাদের সংসার ও জীবন সার্থক হয়। তা নইলে তাদের আর স্বার্থ কি।
কোন ছেলেমেয়ে যদি সে দায়িত্ব থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিতেই চায় তো তাতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? আমি যদি তোর বিবাহের কথা কখনও চিন্তা করি তো তোর সুখের কথাটা, তোর শান্তির কথাটাই আগে চিন্তা করব।'

এরপর আর কিছু বলে নি অজয়। কিন্তু কথাটা বোধকরি নিচের তলাতেও পৌঁছেচে। বিজয়বাবুর হাঁকডাকের শেষ নেই। ছেলের সর্বনাশ হবে জেনেও ছেলের তোষামোদ করার জন্য এটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে শকুন্তলা। ওরাও কোথা থেকে একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয় কন্যাকে আনিয়েছেন, মেয়েটি খুবই সুশ্রী। তাকে দিয়ে খাবার পাঠানো হচ্ছে, জল পাঠানো হচ্ছে—তাকে গল্প করার জন্য কাছে বসিয়ে সবাই সরে যাছে—তাও খবর পেয়েছে শকুন্তলা।

সে হেসেছে শুধু। তার কোন কিছুতেই আর আপত্তি নেই। কিছুতেই তার আর কিছু এসে যায় না।

আর কিছু এসে যায় না।

আজই কুড়ি বছর পূর্ণ হ'ল অজয়ের। কাল ওর জন্মদিন। একুশ বছরে পড়বে সে।

অর্থাৎ কাল থেকে তার নিরঙ্কুশ, নিঃসপত্ন অধিকার এই সমস্ত বিষয়ের ওপর।

এই বাড়ি, আরও দুটো ভাড়াটে বাড়ি—তাছাড়া শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ ও ফিক্সড্ ডিপোজিটে আরও চুয়াত্তর হাজার টাকার মতো, সবই অজয়ের। কাল থেকে সে-ই মালিক। তারই ষোল আনা অধিকার। শকুন্তলা পাবে শুধু খোরপোশ, আর একটু মাথা গোঁজার মতো আশ্রয়। আর কিছু না।

এই উপলক্ষেই নিচের ওরা, বিজয়বাবুরা আজ কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। জোড়া পাঁঠা নাকি মানসিক ছিল তাঁদের—অজয় যদি ভালয়

ভালয় এই রাক্ষুসী ডাইনীর প্রভাব কাটিয়ে নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছতে পারে তাহলে এই পূজো দেবেন তাঁরা। কালীঘাটে পূজো দিয়ে আরও কোন কোন স্থানে ওঁরা গিয়েছিলেন পূজো দিতে। রাত্রে সত্যনারায়ণ পূজো দেওয়া হবে, এখন সেই আয়োজনই চলছে।

মহা উৎসব সমারোহ চলছে নিচে। তার বিপুল উল্লাস-ধ্বনি সমস্ত রকম সংযমের বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসছে মধ্যে মধ্যে—পৌঁছেছে এই ওপর পর্যন্ত।

অর্থাৎ ওঁদেরই যে জয়লাভ হ'ল শেষ পর্যন্ত, এতকাল টানাটানিতে যে ওঁরাই জিতলেন, হার হ'ল শকুন্তলারই, সে বিষয়ে ওঁরা নিশ্চয়ই খুব বেশী নিশ্চিন্ত, নইলে এত আনন্দ কোলাহল কিসের, কিসের এত অধীরতা? রাত্রি প্রভাত হওয়ার জন্যও অপেক্ষা করা গেল না কেন?

অবশ্য, এখনও পর্যন্ত অজয় প্রকাশ্যে এ উৎসবে যোগ দেয় নি। আজ সকালে ওঁরা যখন ডাকতে এসেছিলেন কালীঘাটে যাবার সময়, তখনও সে রাজী হয় নি যেতে—এটাও ঠিক। তবু—

কালীঘাটে যায় নি কিন্তু সেই মেয়েটির বাড়ি গেছে তা জানে শকুন্তলা। সম্ভবত তার উকীল বাপের কাছেই। সম্ভবত তাকে উচ্ছেদ করারই পরামর্শ নিতে। কে জানে!

'মা!'

চমকে ওঠে শকুন্তলা। কেঁপে ওঠে থরথর ক'রে।

অজয়ের গলা না? এমন মিষ্টি ক'রে ডাকে নি কত কাল!

উত্তর দিতে পারল না শকুন্তলা, এদিকে ফিরতেও পারল না। কেমন যেন হয়ে গিয়েছে সে।

'মা গো! এমন ক'রে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ কেন মা?'

হঠাৎ পিছন থেকে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে অজয়, বহু—বহুদিন আগেকার মতো। ওর ছেলেবেলাকার মতো।

'হ্যাঁ মা, আমরা পূজো দিতে যাব না কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে?'

এতক্ষণে স্বর খুঁজে পায় শকুন্তলা, এতক্ষণে বুঝি ওর প্রায়-উদগত অকারণ অশ্রুকে শাসন করতে পারে। গাঢ়কণ্ঠে বলে, 'যাব বৈকি বাবা, কাল সকালেই

যাব। তুই আর আমি। মোটা খরচ করব কাল।'

'অতসীকে নেবে—হ্যাঁ মা? ওর বড্ড শখ।'

কেমন যেন আব্‌দারের ভঙ্গীতে বলে অজয়।

অতসী সেই বৈদ্যের মেয়েটি—ওর বন্ধু।

'ওমা, তা নেব না কেন। আমি গিয়ে ওর মাকে বলে হুকুম করিয়ে তুলে নেব গাড়িতে। সে তো যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী, তার তো যাওয়া দরকারই।'

'তুমি বড্ড ভাল মা। আর বড় ভালমানুষ।'

আরও জোরে জড়িয়ে ধরে অজয়, ওর কাঁধে মুখ ঘষে ছেলেমানুষের মতোই।

তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'আজ ওদের নোটিশ দিয়ে এলুম মা। ব'লে এলুম এতদিন যা শয়তানী করেছ—মাকে ভালমানুষ পেয়ে—যা-তা করেছ, কিন্তু আর চলবে না, আমি সহ্য করব না একদিনও। কাল থেকে আমি মালিক, সেটা বেশ করে বুঝে নিও। সাতদিনের মধ্যে যদি এ বাড়ি ছেড়ে চলে না যাও তো ট্রেসপাসার বলে পুলিশ এনে বার ক'রে দেব রাস্তায়। ভাড়া দাও নি, রসিদ দেখাতে পারবে না একটাও যে, ভাড়াটে বলে অব্যাহতি পাবে, ভাড়াটে-আইনের সুযোগ নেবে। সোজা পথ দ্যাখো, ক্লিয়ার আউট।'

'কিন্তু কাকে এর মধ্যে নোটিশ দিয়ে এলি রে, পাগল ছেলে!'

শকুন্তলার ঘাড়ের মধ্যে মুখটা নিবিড় করে গুঁজে অজয় বলে, 'ঐ নিচের তলার ভাড়াটেদের।'

পিতৃসত্য

অনেক-বছর আগের কথা বলছি। তখন অর্থনীতিতে দশমিক হিসেব ঢোকে নি, এক টাকায় একশো নয়া পয়সা নয়, চৌষট্টিটা ভারিভুরি তামার পয়সা মিলত। টাকায় ষোল আনা দাম পাওয়া যেত—এখনকার মতো শূন্যর বোঝা টেনে বেড়াতে হ'ত না।

একবার ফাফামৌ স্টেশনে যাবার দরকার হয়েছিল। বর্তমান উত্তর প্রদেশে পড়ে জায়গাটা, এলাহাবাদের কাছে, এককালে উৎকৃষ্ট দহিবড়ার জন্য

বিখ্যাত ছিল।

আমি যে পথে যাবো, সে পথের গাড়ি আসার অনেক দেরি। বসে থাকার পালা। এখন স্টেশনটা অনেক বড়সড় ভব্যসভ্য-মতো হয়েছে, তখন নিতান্তই একটা সাধারণ স্টেশন ছিল, স্টেশনের আভিজাত্য হিসেবে তৃতীয় স্তরের—তবে প্ল্যাটফর্মে একটা টিনের চালা ছিল, তার নিচে ফাঁক ফাঁক তক্তার তৈরী খান দু'তিন বেঞ্চিও ছিল তাই রক্ষা, অনেক আগে এসেছি বলে একটু বসার জায়গা মিলেছে, সুটকেসটা আড়াল দিয়ে পাশে চুনকানিওলা একটা যাত্রীর সান্নিধ্য এড়াতেও পেরেছি।

অলস কৌতূহলে চেয়ে আছি, ওদিকের প্ল্যাটফর্ম, লাইন, দূর ধূলিধূসর গ্রাম্যপথ, কতকগুলি অপোগণ্ড যাত্রী—সব জড়িয়ে মন্দ লাগছিল না। এমন সময় দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে একটি উঁচুদরের মেল গাড়ি এল। আমার দিকের নয়। এ গাড়ি বড় লাইনের। বোধ হয় এলাহাবাদে খাবার দেওয়া হয়েছে, এখানে সেই এঁটো বাসন নামাবার ব্যবস্থা। সেইজন্যেই দয়া ক'রে দেড় মিনিটটাক দাঁড়ালেন, মেজাজী মেল ট্রেনটি।

বাসনগুলো নামছে গোছা গোছা—অথচ এদিক ওদিকে—বেশী অবশ্য নয়, কারণ এ স্টেশনে প্রত্যাশা কম—দু'চারটি যে ভিখারী-ভিখারিণী ছিল তারা কেউ এল না, দেখে একটু আশ্চর্য লাগল।

সোজা হয়ে বসে একটু ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম পাত্রে পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খাদ্য নেই, সেগুলি চেঁচে একটা বড় ট্রেতে ঢালা হয়েছে, মানে ওদিকের অন্য বগিগুলোর কথা বলতে পারব না—আমার সামনে যে দুটো বগি ছিল—একটা ইন্টার ক্লাস আর একটা ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস মেলানো—সে দুটোর থালার কথাই বলছি—বড় ট্রে কিন্তু ভাতে রুটিতে, ডালে তরকারীতে—কিছু হয়ত অখাদ্য টক দইও ছিল—সব মিলে একটা পাহাড়ের মতো রচিত হয়েছে—ছোটখাটো পোর্টেবল অন্নকূট বলা যেতে পারে অনায়াসে।

একটি ন-দশ বছরের রোগা চেহারার ছেলে বিরাট একটা কানা-উঁচু পেতলের থালা হাতে নিয়ে এতক্ষণ প্ল্যাটফর্মের চওড়া লোহার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চুপ ক'রে—পাশে রেলিংয়ে একটা লোহার পাত খোলা,

সেখান দিয়ে মাঠে নেমে যাবার পায়ে-চলা পথ, বোধ হয় ছেলেটা ওই পথেই এসেছে, ওই পথেই যাবে। যদি পুলিস বা অপর কেউ তাড়া করে—চট ক'রে গলে পালাতে পারে যাতে—সেই জন্যে ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন চলে যাবার পর ছেলেটা থালা নিয়েই এগিয়ে এল। একটা বয় ট্রে থেকে সেই বিপুল উচ্ছিষ্ট খাদ্যসম্ভার তার থালায় ঢেলে দিল, ছেলেটা কিছু একটা—মুদ্রাই সম্ভবত—তার হাতে দিয়ে থালা নিয়ে চলে গেল। একটা রূপোর টাকা নজরে পড়ল, তবে মনে হ'ল তার সঙ্গে আর কিছু খুচরো পয়সাও ছিল—চার আনা কিংবা আট আনা।

তাব মানে এই সব আধ-খাওয়া এঁটোকাঁটাও বিক্রি করে এরা, আর বিক্রি হয়ও।

এ ঘটনাব এইখানেই যবনিকা পড়ার কথা, কিন্তু পড়ল না।

এতক্ষণ চোখে পড়লেও নজরে পড়ে নি, এক পাশে একটা লোহার রেল-থাম ধরে একটি বছব তেরো-চোদ্দব কিশোরী মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্থির হয়ে, হাতে একটা এনামেলের ভাঙা সান্‌কী। তের-চোদ্দও হ'তে পারে—বেশী হওয়াও বিচিত্র নয়, কারণ এতই শীর্ণ মেদহীন দেহ, বোধ হয় কুড়িতেও ওর দেহে যৌবন লক্ষণ দেখা দেবে না।

তা হোক—শ্যামবর্ণ তো বটেই, বড় জোর উজ্জ্বল শ্যাম বলা যায়—মাজলে ঘষলে কি দাঁড়াবে জানি না—ভারী মিষ্টি মুখ মেয়েটির। চোখের দৃষ্টিতে এত মমতা আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি, চোখ মুখ নাক কাটা কাটা, ঠোঁট দুটি পাতলা তবে প্রণয়ীর পক্ষে অসুবিধাজনক পাতলা নয়—দাঁতগুলোও চমৎকার—হাসলে নিশ্চয় ভালো দেখাবে, তবে হাসি দেখার কোন উপলক্ষ্য হ'ল না বলেই তা দেখা গেল না।

মেয়েটা শুধু যে রোগা তাই নয়—তার পরনের ঘাগরা আর কাঁচুলিও যেমন ময়লা তেমনি জরাজীর্ণ—একেবারেই হতদরিদ্র ঘরের মেয়ে, অথচ কী সুন্দর চেহারা, খেতে পেলে রূপসীতে পরিণত হ'তে পারত—মনে মনে বলি।

গাড়ি এসে থামতেই মেয়েটা সান্‌কি হাতে এগিয়ে এসেছিল। তারপর করুণ ভাবে একবার এ-'বয়' একবার ও-'বয়ে'র কাছে কাকুতি মিনতি করতে

লাগল—সম্ভবত ঐ উচ্ছিষ্টের জন্যেই।

কিন্তু যা নেই, তা দেবে কোথা থেকে তারা?

যে লোকটির কাছে ঐ অন্নকূট—তার কাছেও গেল, বোধ হয় হাতের মুঠোয় একটা এক-আনি ছিল, সেটাও বার ক'রে দেখাল—লোকটা 'ভাগ' বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠতে আর কিছু বলতে সাহস করল না।

তবে যা করল—তা আমি কখনও কল্পনাও করি নি, চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। উঞ্ছবৃত্তি কথাটা বইয়ে পড়া ছিল, অভিধানে অর্থ দেখেছি, শস্য উঠে গেলে মাঠে শিস থেকে ঝরে পড়া যা দু-এক দানা যব কি গম পড়ে থাকে—এক শ্রেণীর লোক তাই খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করে, তাকেই বলে উঞ্ছবৃত্তি। এ মেয়েটি তার চেয়েও কঠিন কর্মে প্রবৃত্ত হ'ল। যে থালাগুলো থেকে সব ভাত ডাল চেঁচে ঢালা হয়ে গেছে, তাই থেকেই যা দু'এক দানা লেগে আছে, ভাত বা দু-একটা আধসেদ্ধ ডালের কুচি—তাও সব থালায় অবশ্যই নেই—তাই একটা একটা ক'রে সংগ্রহ ক'রে সান্‌কিতে জমাতে লাগল।

মাথার ওপর মধ্যদিনের সূর্য। হয়ত সকাল থেকে এক টুকরো খাবারও মুখে পড়ে নি মেয়েটার—শীর্ণ মুখ গলা ঘামে ভেসে যেতে লাগল, সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টিতে হতাশা ক্লান্তি আর বিষাদে এক অপরূপ কারুণ্য এনে দিয়েছে —শেষে যখন হাতের কাছে সব কটা থালা থেকে একমুঠো খাদ্যও হ'ল না তখন মেয়েটি আর থাকতে পারল না, কেঁদেই ফেলল। দুটি চোখের কূল ছাপিয়ে তার সমতল বক্ষের মলিন কাঁচুলি ভিজে উঠতে লাগল।

আমি আর থাকতে পারলুম না—উঠে এগিয়ে এসে সেই বয়টিকে ধরলুম, 'তুমি ও ছেলেটাকে ঐ এঁটোগুলো বিক্রী করলে কোন্ অধিকারে? একেই বা তাড়া দিচ্ছ কেন? এতে দু-তিন রকম চার্জে পড়বে তুমি, জানো? এক—সরকারী মাল বেচে তুমি টাকা নিচ্ছ, ইল্‌লিগ্যাল ট্র্যানজাকশ্যন; দুই—ঐসব খাবার যারা খেয়েছে তাদের কত কি অসুখ থাকতে পারে—সেই সব ঝুটা খাবার তুমি ঐ ছেলেটাকে দিলে—ওদের যদি সেসব খারাপ অসুখ হয়? টি. বি. স্প্রেড্ করার দায়ে পড়তে পারো, তা জানো। আর এই মেয়েটা ছাখো, ক্ষুধায় কাঁদছে—ওকে একটু দিতে কি হয়েছিল? তোমার নাম বলো, আমি

রিপোর্ট করব তোমার নামে—!'

তখনকার জমানা আলাদা ছিল, এসব কর্মচারীরা 'রিপোর্ট' শব্দটা শুনলেই কেঁপে উঠত, তার ওপর আমি এতগুলো 'আংরেজি' শব্দ ব্যবহার করেছি, চার্জ বা চারজ শব্দটা বিশেষ ভয়াবহ—সে কাঁদো কাঁদো হয়ে হাত জোড় ক'রে বিহারী ঠেঁঠি হিন্দীতে বলল, 'হজৌর ওর সঙ্গে আমাদের কনট্রাক—ঐ লওণ্ডা-টার সঙ্গে—মানে ঠিকা আছে, ছু বগির সব ঝুটা খাবার যা কি বাঁচবে ওকে দেব, ও ছুটো টাকা দেবে। এমনি আরও তিন-চার বাড়ি থেকে আসে। অন্য অন্য বগি থেকে দেয়। সব দিন সমান পায়ও না, যেদিন কম পায় সব ভুখা থাকে। এই ছেলেটার বাড়ি সাতজন খেতে, ওর বাবার পক্ষাঘাত, মা পরের খামার-জমিনে কাজ ক'রে যা পায়, আর একটা বহিন আছে, সে এক মহা-জনের বাড়ি ঝি খাটে—তাতে যা হয় এই টাকাও দিতে পারে না সব দিন, এ ছেলেটাও ছোটখাটো মোট বয়, এক গোলদারী দোকান ঝাঁট দেয়—এই ভাবে গুজরাণ হয়। আজ মোটে এক টাকা পাঁচ আনা দিয়েছে—আমরা কিছু বলি না। কিন্তু সাহাব, এমনি দিলে পাঁচ-দশটা ভিখ্‌মাংগা এসে জুটবে—কাড়া-কাড়ি ঝগড়া, কেউই হয়ত পাবে না—তাই আমরা একটা দাম ঠিক করেছি—এটা অবিশ্যি আমরা ভাগ ক'রে নিই, তা কতই বা হয় হজৌর—এতগুলো বয়, ছ টাকা কি সাত টাকা হয় বড় জোর পুরা গাড়িতে।—তবে ভেবে দেখুন—এতেও তো এতগুলো লোক খাচ্ছে—তাদের জীবনধারণ হচ্ছে এতে—নুকসান তো যাচ্ছে না।...গরিব-পরোবর এইটে বুঝে আমাদের মাপ ক'রে দিন।'

'তা একমুঠো এ মেয়েটাকে দিলে না কেন?' আমি একটু নরম হয়ে প্রশ্ন করি।

'এ মেয়েটাও তো রোজই আসে—কোন দিন এক-আধখানা রুটি যে দিই না তা নয়, ওকে জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু এমনি এ থেকে ভাগ দিলে—একশো সওয়াশো ভিখ্‌মাংগা এসে যাবে। তাদের সবার অবস্থাও হয়ত এত খারাপ নয়। আপনিই ভেবে দেখুন হজৌর, আপনি গরিবের মা বাপ!'

ভেবে দেখতে হ'ল। মনে মনে লোকটার ওকালতি শক্তির তারিফ ক'রে মেয়েটার দিকে ফিরলুম, বললুম, 'আর কাঁদে না, চলো তোমাকে কিছু খাইয়ে দিচ্ছি—'

এবার সে বয়টি সাহস পেয়ে একটু অন্তরঙ্গ হবার ভঙ্গীতে বলল, 'ও খাবে না হজৌর, ও নিয়ে যাবে। এক বুড্‌ঢা আছে তাকে সব গেলাবে—নিজে ভুখা থাকবে!'

'বুড্‌ঢা? তোমার বাবা?'

জিজ্ঞাসা করি মেয়েটাকে।

সে চোখ মুছতে মুছতে যেন একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'নেহি জী, মেরা মালিক!'

মালিক! মালিক তো বলে মেয়েরা স্বামীকে অনেক সময়। এইটুকু মেয়ের বুড়ো বর! তা এদেশে সবই সম্ভব। আর এদেশ কেন—বিলেতে, মার্কিন মুল্লুকে সর্বত্রই তো দেখি পয়সার জোরে সত্তর-আশি বছরের বুড়ো তেইশ-বাইশ বছরের মেয়ে বিয়ে করছে, আবার উল্টোটাও আছে, ষাট বছরের বুড়ীকে বিয়ে করছে একুশ বছরের জোয়ান।

কিন্তু বলতে গেলে ভিখিরী পাত্র যেখানে সেখানে বুড়ো বরে দেবে কেন?

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আবারও প্রশ্ন করলুম, 'মালিক মানে? তোমার আদমি? স্বামী?'

সে প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল, 'না, আমার মালিক।'

'তার মানে?'

এবার উত্তর দিল সেই বয়টিই, বলল, 'আমি সব জানি সাহেব, আমি এই অঞ্চলেরই লোক; আমার কাছ থেকে শুনুন, ঐ বুড়োটা দিন দিন পঙ্গু হয়ে পড়ছে দেখে, কোনমতে চল্লিশটা টাকা জমিয়ে এই মেয়েটাকে ওর বাবার কাছ থেকে কিনে নেয়, সে আজ চার-পাঁচ বছরের কথা। তখন এর বয়েস ন-দশ কি ইগারা সাল হবে মোটে, ওর বাবার ছুটো বিয়ে, প্রথম বৌটাকে—মানে এর মাকে এমন লাথি মেরেছিল যে সে বৌটা তিন ঘণ্টার মধ্যে মরে যায়। বেটা মাতাল, মেয়েটাকে বেচে মদ খেয়ে নিশ্চিন্তি। সেই থেকেই এ মেয়েটা ভিক্ষে ক'রে খাওয়াচ্ছে ঐ বুড়োটাকে। কত লোকে কত কাজ দিতে চেয়েছিল—বলেছিল তনখা দেব, তাতেই তোমার চলে যাবে, বুড়োটা যেতে দেয় নি, কোন মাঠে খামারেও খাটতে দেয় না, বলে খুবসুরৎ ভালমানুষ মেয়েটা, কেউ ধরে ইজ্জৎ নষ্ট ক'রে দেবে কি ফুসলে নিয়ে যাবে কোথাও, আমি নাচার

হয়ে পড়ব। না, ও ভিক্ষে করে সেই ভাল, আমার সেবাও তো দরকার।'

আমি খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠি। বলি, 'সে কি! পৃথিবীর কোথাও আজ মানুষ বেচাকেনা হয় না। এ ঘোর বেআইনী, আর এই ভাবে এইটুকু মেয়েকে খাটাচ্ছে! না না, এ হ'তে পারে না। চলো তোমাকে নিয়ে আমি সরকারী কোন আশ্রমে রেখে দিচ্ছি, তারা তোমাকে লেখাপড়া শেখাবে, তুমি নিজে ভাল কাজ ক'রে খেতে পারবে—চাই কি ভাল সাদীও হয়ে যেতে পারে। ঐ স্বার্থপর বুড়োটার কথা তোমাকে আর ভাবতে হবে না। দরকার হয় ও-ই ইস্টিশানে এসে ভিক্ষে করুক।'

মেয়েটা যেন সভয়ে দু পা পিছিয়ে গেল। তবে ঠিক ভয় পেল না। বরং শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, 'তা হয় না বাবু সাহাব, আমার বাবা ঐ বুড়োর কাছ থেকে গুনে গুনে চল্লিশ টাকা নিয়েছে, ওটাই ওর যথাসর্বস্ব, এখন যদি আমি বেইমানী করি—আইনে যাই বলুক—আমার বাবা মহাপাতুকী হবে না? তার একরার ঝুটা হয়ে যাবে। বাবাই মালিক ছিলেন, তিনি মালিকানা বেচে দিয়েছেন, এখন এ-মালিক। বুড়ো যতদিন বেঁচে থাকবে, আমি ওর হুকুমমতো চলতে বাধ্য।'

সে বয়টা এতক্ষণ ওর দিকে চেয়ে কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, এবার একটু তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, 'ঐ বুড়োটা তোর ইজ্জৎ নষ্ট করে নি!'

মেয়েটা মাথা নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ করেছে, দু'তিন দিন। চেষ্টা করে, সব দিন পারে না। কিন্তু কী করব, ও-ই তো মালিক।'

বুঝলুন একে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। ওদিকে আমারও ট্রেনের সময় হয়ে আসছে। বললুম, 'চলো তোমাকে আগে কিছু খাইয়ে দিই।'

'না বাবু সাহেব, যা দেবেন দুজনেই খাবো। সে বুড়োও কাল থেকে কিছু খায় নি।'

আমিও এবার কড়া হলুম একটু। বললুম, 'বেশ, আমি তোমাকে এক সের চূড়া আর পাওভর গুড় কিনে দিচ্ছি—কিন্তু এক শর্তে—তার আগে তোমাকে আমার সামনে কিছু খেতে হবে।'

এবার মেয়ে-রামচন্দ্র একটু নরম হ'ল। আহার্যের সম্ভাবনায় চোখ দুটোও আগ্রহে জ্বলে উঠল একবার, নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

স্টেশনে আর কি খাওয়াব। বাইরে একটা খাবারের দোকানে নিয়ে গেলুম। সেও তেমনি দোকান, তেলেভাজা জিলিপী, মোটা মোটা গুড়পিঠে আর কটকটির নাড়ু!

কিছু জিলিপী আর গুড়পিঠেই কিনে দিলুম। বেশি দিতে সাহস হ'ল না, মরা পেট—অসুখ ক'রে যাবে। এক সের চিঁড়ে আর এক পো (এখনকার প্রায় সওয়া তুশো গ্রাম) গুড়ের দাম দিয়ে দোকানীকে বললুম, 'এর খাওয়া হ'লে একে দিয়ে দিও।'

তারপর ওকে বললুম, 'আর কিছু খেতে ইচ্ছে হয়? ছাখো, তুমি নির্ভয়ে বলো। তোমার মালিকের তো তুদিনের খাবার ব্যবস্থা ক'রেই দিলুম। এখন তুমি কিছু খাও খুশিমতো, আমি দেখি।'

সে যেন একটু লজ্জা বোধ করল, একটু সঙ্কোচ—কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভই জয়ী হ'ল। পাশের পানের দোকানটা দেখিয়ে বলল, 'একটা পান খাওয়াবেন হুজুর—মিঠা মশালা দেওয়া! খুব খেতে ইচ্ছে হয়।'

এক খিলি পান তখনও এক পয়সায় পাওয়া যেত। আমি একটা পয়সা পানওলাকে দিয়ে বললুম, 'ওর খাওয়া হ'লে ওকে দিও। দেখো, ছেলেমানুষ বলে যেন ঠকিও না।'

'নেহি হুজুর। আমরা এ মেয়েটাকে ভালবাসি, বড় ঠাণ্ডা আর সৎ বলে—কিন্তু কি করব, কিছু খেতে দিতে গেলে খায় না—সব নিয়ে গিয়ে ঐ বুড়োকে দেয়। বুড়োটা এমন পাজী না, অল্প খাবার নিয়ে গেলে সবই নিজে খেয়ে নেয়—মেয়েটাকে খেতে দেয় না। তাই আমরা আজকাল কিছু দিই না আর। তুজনকে কত খাওয়াব বলুন!'

আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। সিগন্যাল হয়ে গেছে। আমি দ্রুত স্টেশনের পথ ধরলুম। একবার শুধু যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখলুম, খাবার হাতে ক'রে একদৃষ্টে মেয়েটা আমার দিকে চেয়ে আছে, তু চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে।

ধন্যবাদের ভাষা অনেক রকম হয় এ পৃথিবীতে। ওর ধন্যবাদ বুঝে নিতে অসুবিধা হ'ল না।

নারীর মর্য্যাদা

ছোট একটি মেয়ের অতি সাধারণ ছোট একটুখানি ইতিহাস।

নীলিমার বয়স যখন তিন বছর, তখন তাহার বাপ মারা যান আর ঠিক তাহারই ছয় মাস পরে তাহার মাও তাঁর অনুসরণ করেন। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে অতি দূর সম্পর্কের এক কাকা পাশের গ্রামে বাস করিতেন, সামাজিক নিয়ম অনুসারে তিনি উহার ভার লইতে বাধ্য; সুতরাং নীলিমা তাঁহারই কাছে গেল।

কাকীমা প্রথম প্রথম অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, নিজের পাঁচটিকে সামলাইতেই তাঁর দিনেরাতে একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না, আবার এ ভূতের ব্যাগার কে খাটে বাপু! কিন্তু বছর তিনেক পরে যখন দেখিলেন, এই মেয়েটা বয়সে একরত্তি হইলেও খাটিতে পারে অসাধারণ, তখন তিনি ঐ মেয়েটার ঘাড়ে সংসারের ছোটখাট কাজ প্রায় সবগুলিই চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে পাড়ায় পাড়ায় এই কথাই প্রচার করিতে বাহির হইলেন যে, খাইবার বেলায় দ্বিগুণ খাইলেও কাজের বেলায় কিছুই নয়,—কাজ করিতে বলিলে কাজ বাড়াইতে থাকে, মেয়ে এমনি গুণের।

ঠিক এই ভাবেই, অর্থাৎ কাকীমার দাঁত খিচুনি—খুড়তুতো ভাইদের প্রহার এবং কাকার তিরস্কার খাইয়া এবং রাত্রি চারিটা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত অবিশ্রাম খাটিয়া নীলিমা পনেরয় পা দিল। আর ঘরে রাখা যায় না; প্রতিবেশীরা কিছু বলিলে চুপ করিয়া থাকিতেন বটে, কিন্তু কর্তা কিছু বলিলেই ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেন,—"বেশ তো দাও না শখের ভাইঝির বিয়ে, ক্ষমতা থাকে তো দাও বিয়ে,—আমার অত শখ নেই প্রাণে। পয়সাও আমার নেই আর পাত্র খুঁজে বেড়াবার সময়ও নেই। বিয়ে দেবে পুরুষরা, মেয়েরা কি জানে?"—কথাটা তাঁহার প্রাণে বড়ই লাগিত, একে অমন একটি খাটিবার লোক পরের বাড়ি গেলে সংসার অচল হইবার যোগাড় হইবে; তার উপর আবার এক গাদা পয়সা খরচ হইবে। কি জন্য এত করিবেন তিনি, পর বৈ তো আপন নয়?

কিন্তু লোকাচারকে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায় না, অবশেষে কর্তা

একটি সুপাত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। বয়স একটু বেশী হইয়াছে বটে কিন্তু দোজবরে নয়। এই তাহার প্রথম বিবাহ। আর গাঁজা ভাঙ? বয়সের কালে অমন অনেকই একটু-আধটু নেশা করে। বিবাহ হইলেই শুধরাইয়া যাইবে।...

বিয়ের ঠিক একটি বৎসর পরে যখন সংবাদ আসিল, নীলিমার নোয়া সিঁদুর ঘুচিয়াছে, তখন কাকীমা একটুখানি কাঁদিয়া স্বামীকে বলিলেন, "তুমি এখনই যাও, বাছাকে আমার নিয়ে এসগে—ছেলেমানুষ মেয়ে আমার,—তাকে এই অবস্থায় সেখানে রেখে আমার মুখে অন্নজল উঠবে না,—"পার্শ্ববর্তিনী দত্ত-গিন্নাকে সম্বোধন করিয়া কথাটা শেষ করিলেন,—"এইটুকু থেকে মানুষ করে-ছিলুম দিদি, নিজের মেয়ের বাড়া।"

আবার সেই একটানা জীবনযাত্রা, সেই অবিশ্রাম পরিশ্রম ও তিরস্কার! তবে এবার নাকি একবেলার খাওয়াটা বাঁচাইয়া দিয়াছিল, তাই দয়া করিয়া কাকীমা কাহাকেও আর মারিতে দিতেন না! যাহাই হউক, সেটা মুখের উপর দিয়াই যাইত।

কিন্তু তাহার এই একঘেয়ে জীবন ভগবানের বোধকরি অভিপ্রেত ছিল না, তাই একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল। মাঝেরগাঁয়ের মুসলমানদের সর্দার পুকুর পাড় দিয়া যাইবার সময় নীলিমাকে দেখিয়াছিল। তাহারই দুই-চারি দিন পরে নীলিমার কাকার বাড়ি ডাকাত পড়িল। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে নীলিমাও নিখোঁজ হইল।

ডাকাতেরা যখন অত্যন্ত সাবধানে নিঃশব্দে ঘোষেদের পগার ডিঙ্গাইতে ব্যস্ত, তখন তাদের অন্যমনস্কতার অবসরে নীলিমা তাহাদের হাত ছাড়াইয়া চিৎকার করিতে করিতে প্রাণপণে দৌড় দিল। পাশেই থানা, সুতরাং সেখানে বেশী গোলযোগ না করিয়া পলায়নই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া ডাকাতেরা অন্ধকারে গা ঢাকিল।

নীলিমা যখন বাড়ি ফিরিল তখন রৌদ্র উঠিয়াছে। কাকীমা কাঁদিতেছেন ও কাকা গ্রামস্থ অন্যান্য ভদ্রলোকদের কৌতূহল মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়াই কাকীমা দ্বিগুণ কান্না জুড়িয়া দিলেন ও পুরুষরা রাশি রাশি প্রশ্ন বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সব কথা শুনিতে শুনিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল, গৃহিণী রান্নাবান্নার যোগাড় করিতে অগত্যা উঠিলেন, পাড়ার লোকেরাও নিজ নিজ খাওয়াদাওয়া সারিতে প্রস্থান করিলেন। নীলিমা ঠিক একভাবে সেই উঠানের মাঝখানে বসিয়া রহিল,—জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্র তাহার মাথার উপরে নিঃশব্দে আগুন বর্ষণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা ও মেয়ে-ছেলেরা দল বাঁধিয়া নিঃশব্দে ঐ নতমুখী মেয়েটার চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল,—যেন এমন অপূর্ব জিনিস কখনও দেখে নাই। সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হইয়া গেল। তাহাকে কেহ খাইতে বলিল না, খাবার দিল না, এমন কি কেহ সে প্রসঙ্গ উত্থাপন মাত্র করিল না।

সন্ধ্যার সময় আবার সকলে আসিয়া মিলিত হইলেন। বৃদ্ধেরা কহিলেন, উহার জাতি গিয়াছে; শিক্ষিত যুবকেরা কহিল, যায় নাই। সুতরাং কথা বাড়িয়াই চলিল। তরুণেরা অনেক বড় বড় কথা কহিতে লাগিল এবং বৃদ্ধেরা তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। নারীত্ব, মাতৃত্ব, দেবী, ধর্ষিতা, পতিতা নারীর মর্যাদা প্রভৃতি সব কথাই শোনা গেল। অবশেষে তর্কটা কলহে উপনীত হওয়ায় ছত্রভঙ্গ হইয়া সকলে ঘরে ফিরিলেন। কি শিক্ষিত যুবক, কি অর্ধ-শিক্ষিত বৃদ্ধ কাহারও একথা মাথায় আসিল না যে, মেয়েটার আজ রাত্রির মধ্যেই একটা ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। আর মীমাংসা হইবেই বা কি, সংবাদ পত্রের প্রবন্ধ ও সভার বক্তৃতাদি শুনিবার পর চিরন্তন মীমাংসা নির্দেশ করিবার মতো সাহস বৃদ্ধদের ছিল না,—আর চিরন্তন সংস্কারকে অস্বীকার করিবার মত মনের জোরই বা তাহাদের কোথায়? তরুণদের মনে নীলিমার অবস্থাটা হয়ত স্মরণ হইয়াছিল কিন্তু নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখের কাছে একটা বিধবা মেয়ের চোখের জল যে নিতান্ত তুচ্ছ!

রাত্রে বাড়ির সকলে খাওয়াদাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িল। নীলিমা তখনও অন্ধকারে ঠিক এক ভাবে বসিয়া,—বাহিরে প্রকৃতির আর মনে নৈরাশ্যের অন্ধকার। ভয় তখন আর ছিল না,—সমস্ত দেহ মন যেন ক্রুদ্ধ অদৃষ্টের শাপে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল।

এখন সে কি করিবে? ব্রাহ্মণের মেয়ে, রাঁধিতে জানে, সে শুনিয়াছিল কলিকাতায় নাকি রাঁধুনীর বড় আদর,—সে স্থির করিল, কলিকাতা যাইবে।

উঠিয়া দাঁড়াইল,—যাইতে হইলে রাত্রের মধ্যেই গ্রাম ত্যাগ করা উচিত; কৌতূহলী লোকের নীরব দৃষ্টি ও সরব প্রশ্ন তাহাকে বিঁধিবে না।

ভোরবেলায় গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া গঙ্গার ধারে গিয়া পড়িল। নীলিমা জানিত, গঙ্গার ধার দিয়া গেলেই কলিকাতায় পৌঁছান যায় সুতরাং সে বরাবর গঙ্গার ধার দিয়াই চলিতে লাগিল। বেলা এগারটার সময় একটা বেশ বড় গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িল। প্রকাণ্ড বাঁধা ঘাটে বহু লোক স্নান করিয়া যাইতেছিল। নীলিমা মেয়েদের ঘাটের এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর একজন স্থূলকায়া বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সম্মুখে গিয়া অসীম সাহসে বলিয়া ফেলিল, তাঁহার রাধুনীর প্রয়োজন কি না, সে ব্রাহ্মণের মেয়ে, অসহায়া, একটু আশ্রয় চায়।

বৃদ্ধা বারকয়েক তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "না,—আর থাকলেও জানা নেই শুনো নেই, মুচি মুদ্দফরাসের মেয়েরা ব্রাহ্মণের মেয়ে পরিচয়ে ভদ্রলোকের জাত মেরে যাচ্ছে—"

মাথা হেঁট করিয়া নীলিমা দাঁড়াইয়া রহিল, চারিপাশ হইতে বহু কথা তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। এমন কথাও সে শুনিল যে, সে নাকি প্রণয়ীত্যক্তা কুলত্যাগিনী।

পাশের ঘাটে বহু ভদ্র পুরুষ স্নান করিতেছিলেন, তাঁহারা কেহ চোখ টিপিলেন, কেহ হাসিলেন, কেহবা শিস দিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বাদে ঘাট নির্জন হইলে সে গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিল। ঘণ্টাখানেক জলে ডুবিয়া শীতল হইলে আস্তে আস্তে উঠিয়াই দেখিতে পাইল, পাশের ঘাটের স্নানার্থীদের মধ্যে একজন খামকা দেরি করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সে টপ করিয়া উঠিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি কলেজে বি. এ. পড়ে সম্প্রতি মাসিক পত্রে "নারীত্বের মর্যাদা" নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া নাম কিনিয়াছে। সে ঢোঁক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

লোকটির সমস্ত হাবভাবে একটা কদর্যতার চিহ্ন পাওয়া যাইতেছিল; ঘৃণায় নীলিমা শিহরিয়া উঠিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল,—"আজ দু'দিন খাওয়া হয় নি বাবা, তাই একটু আশ্রয় খুঁজছিলাম।" ছেলেটি একটি শুষ্ক "ওঃ" বলিয়া প্রস্থান করিল। নীলিমা আবার চলিতে লাগিল।

দেশসেবক হীরালালবাবু গ্রামের নারীমঙ্গল সমিতির চাঁদা সংগ্রহের জন্য এক সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। আশাতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার সময় গঙ্গার হাওয়া খাইতে খাইতে ফিরিতেছিলেন,—ক্ষুধার তাড়নায় নীলিমা গিয়া করুণ বচনে ভিক্ষা চাহিল, হীরালালবাবু মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন,—"আ মর্ মাগী, আমার কি তোর ইয়ার ঠাওরেছিস্! বড়লোক কাপ্তেন দেখে ধর্‌গে যা, দু পয়সা হবে।"

নীলিমা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল,—তাহার দুই কানে তখন যেন কে গলানো সীসা ঢালিয়া দিয়াছিল—সারা অঙ্গ জ্বালা করিতেছিল অপমানে ঘৃণায়।

রাত্রে একটা ঘাট পাইবামাত্র নীলিমা বসিয়া পড়িল, পথশ্রমে, ক্লান্তিতে, ক্ষুধায় তাহার পা আর চলিতেছিল না। মা গঙ্গা যেন তাহার দুঃখ বুঝিলেন, স্নিগ্ধ হাওয়ায় সকল শ্রান্তি দুশ্চিন্তা দূর করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিলেন।

ঘণ্টা দুই বাদে কিসের আকর্ষণে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না, সহসা স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া যাওয়ায় সভয়ে চোখ খুলিয়া দেখিল, কি কালো মতন একটা তাহার পাশে বসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেছে। নক্ষত্রালোকে এক প্রকাণ্ড-দেহ যমদূতের মতো ব্যক্তিকে পাশে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য তাহার দেহ যেন অবশ হইয়া গেল…

মুহূর্ত মাত্র—পরক্ষণেই "উঃ, মাগো" বলিয়া সবলে পাষণ্ডের হাত ছাড়াইয়া গঙ্গায় লাফাইয়া পড়িল।*

ইজ্জৎ

মেয়েটা যে এরকম বেইমানি করবে শেষ পর্যন্ত, রঘুবীর তা ভাবতেও পারে নি। এত উল্‌টো বুঝবে. আর এত সাহস হবে ওর—এক বছর ধরে ভাবলেও এ ওর মাথায় যেত না।

আর কেন, কেন। কেনই বা এমন অকারণ জিদ ধরল আর কেনই বা শেষ পর্যন্ত এমন কাজটা করল। কেন?

---

* ১৯২৮ সালে ঋত্বিক্ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত লেখকের এইটিই প্রথম ছাপা গল্প।

বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে রঘুবীর কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পায় না। এক একবার এমন রাগ হয়—ভাবে সামনে যদি পেতুম একবার তো মজা টের পাইয়ে দিতুম। একটু একটু করে সাঁড়াশি দিয়ে দিয়ে জ্যান্ত গায়ের মাংস ছিঁড়ে নিতুম।

কিন্তু সে জো আর নেই। সেইখানেই অসম্ভব টেক্কা মেরে গেল মেয়েটা। একেবারে চিরদিনের মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল।

বেইমানী ছাড়া আর কি বলবে একে!

এমনি, অবস্থাটা যা ঘুলিয়ে দিয়ে যাবার তা তো গেলই। চারিদিক থেকে নানা কথা রটছে। ওর ঐ কানা দাদামশাইটার পেটে পেটে যে এত ছিল তাই বা কে জানত। বুড়ো নাকি কান পেতে ওদের কথা সব শুনেছে সেদিন। থানা পুলিস তো বটেই, বিধান সভায় প্রশ্ন তো উঠবেই, লোকসভাতেই ঝড় বয়ে যাচ্ছে প্রত্যহ—কাগজে কাগজে বাঁকা প্রশ্ন, কড়া কড়া চিঠি—অন্য সব রাজ্য থেকে কত দল কত নেতা এসে গেল তার ঠিক নেই। হোটেলে নাকি জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। তোদের নিজেদের দেশ কে সামলায় তার ঠিক নেই—এসেছে পরের খবরদারী করতে!

তবু দলের হয়ত সুবিধে হয়েই যাবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে হয়ত রঘুবীরেরই ভাগ্যে।

তাছাড়াও বড় কথা, আগে হলে এত পরোয়া করত না—কে জানে কেন, মনে হচ্ছে ছুঁড়ি ওর কোমরটা বোধ হয় ভেঙে দিয়ে গেল চিরকালের মতো। বাইরে যে নানা কথা উঠছে, বেইজ্জুতি হ'ল খানিকটা—আগে হ'লে ও কি পরোয়া করত? ল্যাটা মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে যেত—আসলে মনের মধ্যে যে একটা অপরাধ বোধ আর একটু যেন অনুশোচনা সর্বদা পীড়ন করছে। নিজের কাছেই নিজের লজ্জা—তার জন্যেই সবচেয়ে অসুবিধা বোধ করছে। কিছুতেই সেটা ঝেড়ে ফেলে সহজ হতে পারছে না।

তা নইলে, ঠিক এতটা না হোক, গোলমেলে পরিস্থিতিতে পড়া তো আর নতুন নয়, অনেক শক্ত শক্ত অবস্থাতে পড়েছে এর আগেও। রাজনৈতিক দলবাজিতে ভাড়া খেটে আর পোষা কিছু 'কর্মী'—গুণ্ডা বলাটা ঠিক হবে না—ভাড়া খাটিয়ে যাকে খেতে হয় এবং একটু ফুর্তিও করতে হয়, তাকে তো মধ্যে

মধ্যে মুশকিলে পড়তে হবেই। সে মুশকিল কাটিয়ে উঠতেও জানে রঘুবীর—কিন্তু 'মনের মধ্যে এই যে শালা একটা কেমন কেমন লাগছে সব সময়ে'—এটা কাটিয়ে ওঠা যে বড় সহজ হবে তা তো মনে নিচ্ছে না।

কি থেকে কি হয়ে গেল যেন।

এসব কিছুই তো হবার কথা নয়। এসব এমন একটা কি মারাত্মক ব্যাপার ওদের জীবনে। ঐ মেয়েটা, রতিয়া—রামসুরতিয়া নাকি নাম ছিল এককালে, পণ্ডিত দাদামশাইয়ের দেওয়া নাম—আড়বোঝা হয়ে গেল বলেই না এত কাণ্ড। তীরে এসে নৌকো ডোবে দেখেই মাথায় এমন আগুন জ্বলে গেল রঘুবীরের। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে বসল। পাঁচ হাজার টাকা—নিখরচায়—এ বাজারেও অনেক। অন্তত ওদের কাছে, ওর কাছে। এতটা টাকা হাতের মুঠোর মধ্যে এসে চলে যাবে। শুধু তাই নয়—একটা বদনামি হয়ে গেলে আর কেউ এ ধরনের কাজ দেবে ওকে? খাবে কি, আর কোন কাজই তো শেখে নি। হ্যাঁ, এক কারখানায় নাম লেখানো আছে বটে, তাতে মাইনেও এখন বড় কম দেয় না—তবে তাতে রঘুবীরের কি হবে, এত নবাবী করা চলবে?

ঐ এক শালার অভ্যেস হয়ে গেছে রাত্তিরে একটু করে টানা। এঁরা আবার সব যুধিষ্ঠিরের নাতি এসেছেন, দিলেন মদ বন্ধ করে। তাতে লাভটা হ'ল কি? চোদ্দ টাকার মালটা আশি টাকায় কিনতে হচ্ছে। পচাই দিশী মাল—তাই বলে ছ' টাকা সাত টাকা বোতল। সে ওর খেতে সাহস হয় না। পয়সার লোভে ব্যাটারা কি না দেয়। হামেশাই তো কত লোক মরছে। এক বেটা তো সেদিন রাতারাতি দুটো চোখের মাথা খেয়ে বসে রইল। না, অত সাহস ওর নেই।

নবাবী বলতে তো এই। তাও ঐ রাত্তিরে একবার। মাতাল হয় না। মাতাল হলে এত ঝুঁকির কাজ করা যায় না। আর এই একটু—এদিক ওদিক। দু'একটা মেয়ে ছেলে মধ্যে মধ্যে। তাই বা ছাড়বে কেন? কি জন্যে ছাড়বে?

সেই জন্যেই তো জানাশুনো ছুঁড়িটার সঙ্গে। ও-ই বড় সতীলক্ষ্মী, না।

ওর কথা কে না জানে।

কম কানাঘুষো চলে ওর নামে। ওর বর নাকি তার বড় শালীকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যায়। মামার বাড়ি উঠেছিল, সেখানেও নানা দুর্নাম, ছেলেটা স্বামীর না মামার—এমন প্রশ্নও দেখা দিতে ওর এই দাদামশাই ছেলেকে বেদম মার দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, তারপর নাতনীকে নিয়ে শহরে চলে আসে। কেদার শাস্ত্রী টোলে পড়া লোক, দেশে থাকলেও ক্ষেতিউতি দেখত না। একটা টোল ক'রে গাধা পিটত। ওর আশা ছিল.শহর বাজারে শাস্ত্র জানা ব্রাহ্মণের ভাত ভিক্ষের অভাব হবে না।

হতও না হয়ত। এদান্তে দু-চারটে পূজো হোমের কাজ পেতে শুরুও করেছিল। একটা টোল খুলে দেবার ভরসাও দিয়েছিল দু-চারজন—কিন্তু কী একটা অসুখে হঠাৎ দুটো চোখই তার অন্ধ হয়ে গেল গত দু'বছরের মধ্যে। অন্ধকে দিয়ে কেউ পূজোপাঠ করায় না, পড়ানো তো চলবেই না। একেবারে বসে গেল লোকটা। কাজের মধ্যে শুধু রতিয়ার পাঁচ বছরের ছেলেটাকে কোনমতে সামলায়।

অগত্যা রামসুরতিয়াকেই রোজগারের চেষ্টা করতে হয়। ছেলেটার লেখাপড়া হবে না। সে রতিয়াও বুঝেছে, তার দাদামশাইও। তবু, বড় তো করতে হবে। পনেরো ষোল বছরের হ'লেও একটা ভরসা, মোট বইতে পারে বাজারে সবজি বেচতে পারে। কারও বাড়ি রান্নার কাজও ধরতে পারে। এখন এই কটা বছর চলে কি ক'রে।

পাড়াতে কিছু কিছু মহিলাহিতৈষণা সমিতি আছে।

সেলাইয়ের কাজ ; ক্যারমের জাল, সোয়েটার বোনা ; বিস্কুট তৈরী করা ও বাড়ি কি আপিসে চা পার্টি থাকলে ঠিকা নিয়ে খাবার ক'রে পৌঁছে দেওয়া—এসব কাজ গরিব অনাথা মেয়েদের দিয়ে করানো হত—বা হবার কথা। এ কলকাতা দিল্লীর মতো বড় শহর নয়, এখানে মহিলা সেবা সম্বন্ধে বড় বড় সভা বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন সোজা, কাজ এত কোথায় পাওয়া যাবে ? এই সব সৎ কাজের নামে যা সরকারী আনুকূল্য আসে তা কর্তৃস্থানীয়দের মধ্যেই ভাগ হয়ে যায়, অনাথাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছয় না।

লেখাপড়া না জানা এই ধরনের অসহায় মেয়েদের জন্যে একটিমাত্র

উপার্জনের পথ সদা উন্মুক্ত—বোধহয় সেই সৃষ্টির আদি কাল থেকে। সেই পথই ধরতে হ'ল রতিয়াকেও। ঘরে অন্ধ বুড়ো একটা লোক, আর একটা পাঁচ বছরের শিশু, তাদের অনাহারে রেখে ধর্ম বা ইজ্জৎ আঁকড়ে থাকা যায় না; রান্নার কাজ ধরার চেষ্টা করেছিল তাতে এসব জায়গায় যা মাইনে দিতে চায়—খাওয়া ছাড়া কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাইনে, আর দেওয়ালীতে কাপড়—তাতে দুজনের পেট চলে না।

মুশকিল এই—ঐ আদিম বৃত্তিও, একটু ভদ্রভাবে চালানো, কলগার্ল বলে যাদের অভিহিত করা হয় তাদের মতো—এদেশে বিশেষ চলে না, চলার কথাও না। পতিতালয় অনেক; রতিয়ার বাড়িতে কাউকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পুরুষই বা এমন জায়গা কোথায় খুঁজে পাবে। কদাচিৎ কোন খালি ইস্কুল বাড়িটাড়ি—কিংবা অনেক রাত্রে সরকারী পার্ক ফাঁকা জায়গা বলতে এই। সেও আজকালকার দিনে বেশি রাতে মেয়েছেলে নিয়ে যেতে সাহস করে না কেউ।

এই চরম দুর্দিনেই রঘুবীরের সঙ্গে ওর পরিচয়। রঘুবীরই একরকম খুঁজে বার করেছিল ওকে। ওর মনে হয়েছিল তখন দৈব প্রেরিত ত্রাণকর্তা। দরকার পড়লেই দু টাকা এক টাকা দিত। ইচ্ছে হলে পার্কেও নিয়ে যেত, সেদিন বেশি দিত। সেটা মেজাজের ওপর, কোনদিন পাঁচ, কোনদিন দশ।

রঘুবীরের এমন টাকার অভাব নেই, মানে হিসেব করে খরচ করতে হয় না। কারখানার চাকরি তার ভদ্র। লেখাপড়ার চাকরি—তাতে বেশি কিছু হয় না। আসল কাজ তার এই দলবাজি। দলকে তোলা বা ডোবানো। মানে তার কোন দলের ওপরই কোন টান নেই, কাউকেই সে সৎলোক বলে মনে করে না। কেউ দেশের কাজ করতে চায় শুনলে তার হাসি পায়। হাসেও সে, বক্তার মুখের ওপরই।

এদিক দিয়ে তার অ-পক্ষপাত সর্বজনবিবিত। তবু চায় ওকে। একদলের কাছ থেকে 'খরচা' নিয়ে আর একদলকে অপদস্থ করতে হবে—দরকার হ'লে খুন জখম তো করতে হবেই (অনেক সময় নিজের দলের লোকদেরও খুন করাবার দরকার হয় অপর দলকে দায়ী প্রচার ক'রে বিপাকে ফেলতে)—এসব কে করবে? কেন, রঘুবীর আছে। ওর একটা সুনাম বহুবিস্তৃত, টাকা খেয়ে নেমকহারামি করে না। কাজ তুলে দেয় ঠিক ঠিক। দিতে পারেও, তার

কারণ ও যাদের দিয়ে কাজ করায় তাদের পাওনা মেটাতেও কখনও দেরি করে না। অসময়ে দেখেও। তাই বলে, এ মাসে 'অমুক' দলের কাছ থেকে টাকা খেয়ে কাজ করেছে বলে পরের মাসে অন্য দলের কাজ নিয়ে এই 'অমুক' দলকে নাস্তানাবুদ করবে না—এমন কুসংস্কারও ওর নেই। সেদিক দিয়ে মুক্ত-পুরুষ, নিজস্ব দর্শনে দার্শনিকও।

তার দর্শন—স্পষ্টই সে বলে—'রুপৈয়াসে বাঢ কর কোই চীজ নেহি ব্রাদার ইহ্ দুনিয়ামে। রুপৈয়াই সব কুছ। বাপ ফালানা, ভাইয়া শালা,—সবসে বড়া রুপৈয়া।'

এই সূত্রেই এবারের এই বড় দাঁওটা এসে ছিল। মোটা টাকার খেলা। একটা চুরি সাজাতে হবে, চুরির দায়ে একটা ভদ্রঘরের মেয়েকে ধরাতে হবে—সবই মিথ্যা জেনেও, থানার অফিসারকে হাত ক'রে কিংবা আরও ভাল হয় দু-একজন অন্য লোককে পুলিশের পোশাক পরিয়ে তাদের দিয়ে মেয়েটাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করাতে হবে। প্রকাশ্যে, বহু সাক্ষী রেখে। সে লোক কটার চাকরি না যায় বা 'জেহেল' না হয় সে জিম্মাদারী ঐ দলের। খরচাও তারা দেবে, তাঁবেদারদের টাকা, ঐ মেয়েটাকে যা দিতে হবে সব তারা দেবে—এ ছাড়া নীট পাঁচ হাজার টাকা রঘুবীরের।

এ আর এমন কঠিন কাজ কি।

এর আগে গোলমাল করায় নাম কাটা গেছে এমন দুটি সিপাহীকে খুঁজে বার করতেও দেরি হ'ল না। পোশাক তারাই যোগাড় ক'রে নেবে—মাত্র পঞ্চাশ টাকা খরচা হবে তার জন্যে। আর মেয়ে? মেয়ে তো হাতেই আছে। ব্রাহ্মণের মেয়ে, পণ্ডিতের নাতনী, অল্প বয়েস, দেখতেও মন্দ না,—এ তো যেন ওর জন্যেই বিধাতা এনে জুটিয়ে রেখেছেন।

সেই দিনই পার্কটা একটু নির্জন হ'তে ইশারা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে কথাটা বলল রঘুবীর।

রতিয়া প্রথমটা রাজী হয় নি। না না, বাপ রে! এসব ও পারবে না। পুলিশে মারধোর করবে, সকলের সামনে বেইজ্জতি করবে। ছিঃ! কটা টাকার জন্যে এসব সে পারবে না। পরের দিন মুখ দেখাবে কি করে সে।

রঘুবীর বুঝিয়ে দিল, 'আরে সে তো প্রমাণ হয়ে যাবে তুই দুষী নোস।

ওরা মিথ্যে একটা ভদ্রলোকের মেয়ের এই লাঞ্ছনা করেছে। তোর লজ্জাটা কিসের ? খবরের কাগজে তোর নাম ছাপা হবে। ফোটো বেরুবে—কত নামী নামী লোক ছুটে আসবে তোকে দেখতে।

তাতেও হয়ত রাজি করা যেত না, শেষ অবধি মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল রঘুবীর। দুশোটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'কাজ শেষ হ'লে আরও দুশো পাবি। জানিস তো আমি মিছে কথা বলি না। তাছাড়াও দেখিস, মিথ্যে ক'রে এই বেইজ্জুতি করা হয়েছে বলে সরকার থেকেও মোটা টাকা দেবে তোকে। না দেয়, আমি মামলা ক'রে আদায় ক'রে দেব।

আর 'না' বলতে পারল না রতিয়া।

খাপরার ঘরে ভাড়া থাকে, তারও পনেরো টাকা ভাড়া। তাও 'বাহ্মন' বলে কমে দিয়েছিল বাড়িওলারা। দাদামশাই দেশ থেকে দু-তিন শো টাকা সঙ্গে এনেছিল, এখানেও কিছু টুকটাক কাজ করেছে—তখন অত গায়ে লাগে নি। এখন আর ভাড়া দিতে পারে না। খেতেই পায় না, দেবে কোথা থেকে। প্রায় দেড় বছরের ভাড়া বাকি পড়েছে—তারা রোজ গালিগালাজ ক'রে যায়। আজই ভয় দেখিয়ে গেছে, পেয়াদা এনে বার ক'রে দেবে। কাপড় জামা বলতে কিছু নেই। দাদামশাই গামছা পরে থাকে, ওকে তো বেরোতে হয়, শাড়ি না হলে চলে না। এই দুশো টাকা থেকে দেড়শো বাড়িওলাকে দিয়ে এসে তারা আর কিছুদিন সময় দেবে। একখানা কাপড়ও কিনতে পারবে, কিছু আটা চাল—সে টাকাটা হাত পেতে নিল নিঃশব্দেই।

কি কি ঘটতে পারে যখন বলেছিল রঘুবীর তখন এতটা বুঝতে পারে নি।

লাঞ্ছনা বলতে যে এই কদর্য অত্যাচার, পিশাচের মতো আচরণ—তা সে ভাবতেও পারে নি। কখনও শোনেও নি তো এমন।

দুটো সিপাহী এসে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি থেকে বার করল। অপরাধ ? চুরি।

এই পাড়ারই এক বাড়ি থেকে নগদ টাকা চুরি গেছে কাল। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এই মেয়েটাকে সন্ধ্যের পর আঁধেরাতে ঐ বাড়ির পিছনের গলিতে ঘুরতে দেখেছে দু-তিনজন। মেয়েটা বাড়ি ফিরেছে গভীর রাত্রে। তারপর, সবচেয়ে বড় প্রমাণ দিলেন বাড়িওলারা (তারা ভেতরের কথা না

জেনেই) আজই ভোরবেলাই বকেয়া ভাড়া বাবদ দেড়শো টাকা দিয়ে গেছে রামস্বুরতিয়া।

বাড়ি থেকে টেনে বার ক'রে থানাতেই নিয়ে যাবার কথা—সেটা যে কেন হ'ল না, কেউ প্রশ্নও করল না। রাস্তার ওপর, রতিয়াদের বাড়ির সামনেই—অমানুষিক অত্যাচার চালানো হ'ল প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে। যাদের টাকা গেছে তাদের তো বটেই—দেখা গেল এই দৃশ্যে পাড়ার লোকেরও উৎসাহ অপরিসীম। এমন সুযোগ কদাচিৎ ঘটে। মারধোর দিয়ে হাতের সুখ করবে, বিশেষ মেয়েছেলেকে—এ তো দুর্লভ সৌভাগ্য।

এমন কি পাড়ার মেয়েরাও বিশেষ কেউ এ ব্যাপারে বাধা দিলেন না। বরং সকলেই সকলকে বোঝাতে লাগলেন মেয়েটা যে ভাল নয়, কোন কুকর্মই যে ওর বাকী নেই—বামুনের ঘরের কলঙ্ক। (নইলে শ্বশুর বাড়ি মামার বাড়ি ঠাঁই হয় নি কেন ? সব জায়গায় জ্বালিয়ে এসেছে) এ তিনি সকলের আগে বুঝেছেন এবং বলেছেন। বলুক সকলে তিনি বলেছেন কিনা ?

নির্যাতনটা হচ্ছে 'চোরাই টাকা কোথায় রেখেছিস বল্'—এই ভিত্তিতে। সাধারণ মার—কিল ঘুষি চড় শুধু নয়—চাবুক, মাংস চিমটে ধরে পাকিয়ে পাকিয়ে রক্ত জমিয়ে দেওয়া, থুথু দিয়ে কাগজ সেঁটে তাতে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরা—তাতেও যখন কথা 'বার করা' গেল না তখন প্রকাশ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ ক'রে প্রহারের ব্যবস্থা করল জাল সিপাহী দুজন। তারা হাজার টাকা ক'রে প্রত্যেকে পেয়েছে, পোশাকের জন্যে পঞ্চাশ, সে তো আলাদা—তারা নিমকের মর্যাদা রাখবে বৈকি।

'স্টেজ-ম্যানেজার' রঘুবীরের সময়ের হিসেব নির্ভুল। ঠিক যখন অবস্থা চরমে পৌঁচেছে সেই সময়েই হৈ হৈ ক'রে আসল পুলিশ এসে পড়ল। গাড়ি এল, মেয়েটাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় থানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। থানার লোক অবাক, তারা কাউকেই পাঠায় নি, কিছুই জানে না—তারা চুরির ডায়েরী পেয়ে তদারক করতে আসছে, রঘুবীরবাবু ফোন করে খবর দিলেন যে এখানে এক পৈশাচিক কাণ্ড চলছে।

তারপর ডাক্তার এলেন, জবানবন্দী লেখা হ'ল, সে দু'জনকে খোঁজার হুকুম হ'ল। ততক্ষণে আসল কাজ যা আপনিই শুরু হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতারা

এসে গেছেন, কাগজের রিপোর্টাররা। কয়েকজন এম. এল. এ. ; এম. পি. একজন ; বর্তমান অসংখ্য রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতারা—মনে হ'ল তাঁরা যেন এই রকম একটা ঘটনার জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলেন—ভাগাড়ের পাশের গাছে অপেক্ষমান শকুনি-দলের মতো। মনে হ'ল যেন এ রকম ঘটনা ঘটার পূর্বেই তাঁরা খবর পেয়ে যান, বাতাসের গতিতে টের পান।

যে পড়শীরা মেয়েটির চরিত্র ও স্বভাব সম্বন্ধে এতক্ষণ নিজেদের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত হয়ে ছিলেন—তাঁরাই এখন পুলিশ তথা সরকার, পাড়ার মাতব্বর ও সাধারণভাবে রাজনৈতিক সমস্ত নেতার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

এবং—স্রেফ গরিব বলেই কত জায়গায় এই শ্রেণীর নিরীহ নির্দোষ লোকেদের ওপর এমনি অকারণ নির্যাতন হয়েছে—তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করতে লাগলেন।

রঘুবীর তখন রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়েছে। সে থানার অফিসারদের ওপর তম্বী ক'রে, নেতাদের সামনে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সকলের সম্বন্ধে অসংখ্য অভিযোগ এনে পুলিশের গাড়িতে ক'রেই ওকে বাড়ি পৌঁছে দিল। তখন আর চলবার এমন কি দাঁড়াবারও সামর্থ্য নেই মেয়েটার।

তবে দেখা গেল পাড়ার মহিলারা এর মধ্যে ওদের খাওয়ার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। এখন কে একজন ছুটে এসে দুধের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খাইয়ে দিলেন। একখানা পুরনো শাড়িও পরিয়ে দিলেন একজন। মুখে 'চু-চু' শব্দ ক'রে সমবেদনা জানিয়ে গেলেন অনেকেই। অর্থাৎ সমবেদনা জ্ঞাপনে ও সহৃদয়তা প্রকাশে কোন ত্রুটি ঘটল না। সন্ধ্যা নাগাদ আসল চোর ধরা পড়ল। টাকাও প্রায় সবটাই উদ্ধার হ'ল। সে লোকটা দাগী চোর। তার কোথাও আশ্রয় নেই। সে জেলে যেতেই চায়। সেখানে পিরাপদ আশ্রয় ও নিয়মিত আহার—এমন শান্তি কোথায় পাবে। তাকে জেলে নেশার জিনিস যোগাবার ব্যবস্থা করবে এই আশ্বাস দিয়ে ও নগদ কটা টাকা দিয়ে রঘুবীর এই দায় ঘাড় পেতে নিতে রাজী করিয়েছিল। হাতের টাকায় কটা দিন চুটিয়ে ফুর্তি করেছে—সে বেশ খুশী মনেই দোষ স্বীকার করল।

সন্ধ্যার পর রতিয়ার প্রবল জ্বর এল। পুলিশ সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। রঘুবীর আর পাড়ার লোকের শাসানিতে পারে নি। রঘুবীর ডাক্তার আনল। ওষুধ সুঁই যা যা দরকার সব ব্যবস্থা হ'ল। নিজের চেনা ডাক্তার সাক্ষী হয়ে থাকলে অনেক সুবিধে।

সব চেয়ে বড় যে কাজ—ক্ষুদে নেতা ও রিপোর্টারদের সামলানো, তাতেও রঘুবীরের মতো দক্ষতা কার? অত্যন্ত অসুস্থ এই অজুহাতে রতিয়াকে জেরা করতে দিল না, যা বলবার—যেটুকু ওর বলা দরকার, রতিয়ার সামনে সে-ই বলে নিল। মধ্যে মধ্যে 'কী রে, সুরতিয়া, ঠিক বলছি তো? দেখিস এরপর যেন ফাঁসাস নি' বলে সমর্থন আদায় ক'রে নিল।

সে রাতটা অভিভাবকত্ব করার নাম ক'রে—পুলিস ও রাজনীতিক রিপোর্টারদের হাত থেকে বাঁচানোর নাম ক'রে ওদের ঘরেই থেকে গেল। দরকারও ছিল একজনের, রতিয়ার তখন উঠে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নেবারও অবস্থা নেই। রঘুবীর পাড়ার এক মহাবীর মন্দির থেকে এদের জন্যে প্রসাদ আনাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল আগেই। সাতদিনের টাকা অগ্রিম তাদের হাতে জমাও পড়ে গেছে। অর্থাৎ যন্ত্রের প্রতিটি নাট-বলটুতে মবিল বা চর্বি দেওয়া থাকলে যেমন নির্ভুল ও মসৃণভাবে চলে, তেমনি ভাবেই কাজটা এগিয়ে চলল।

মুশকিল বাধল যখন পরের দিন রতিয়াকে এসবের সঙ্গে ঐ ছোট্ট অভিযোগটা যোগ করার কথা পাড়ল।

ওকে বলতে হবে যে শুধু মারধোর বা উলঙ্গ ক'রে বেইজ্জতি করে নি, আসল বেইজ্জুতিও ক'রে গেছে, ঘর থেকে বার করবার আগেই করেছে সেটা।

রতিয়া শুধু কথাটা বললেই হবে। ডাক্তার তো ঘরের লোক। অন্য সাক্ষী-সাবুদের অভাব হবে না। সে দুজন সিপাহীর অবশ্য এখন আর থানার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তারা পেন্‌সন্‌ও পায় না, অন্য অপরাধে তাদের চাকরি গিছল বলে—কিন্তু সে কথা না কাগজওলারা, না জনসাধারণ আর না কোন কোন দলের নেতারা—কেউই মানতে রাজী নন। ও মিথ্যা ও আই-ওয়াশ, সাজানো, এ তো ভদ্রভাষার বক্তব্য, বাকি যা তা বলার নয়।

এই দলের নেতাদের এ জন্যে অনেক টাকা খরচ হয়েছে, কিসে কি হয়েছে সে কথা তো তাঁরা সবাই জানেন—কিন্তু লোককে অন্য কথা জানাতে হবে, সেই জন্যেই তো এত খরচ করা।

কিন্তু এই সামান্য অনুরোধ এতেই, রামসুরতিয়া কি বুঝল কে জানে—সে একেবারেই বেঁকে বসল।

না, ও তা বলতে পারবে না। যা তারা করে নি তা বলবে কেন? আর করলেও বলত না। কিছুতেই না।

রঘুবীর তো অবাক।

'কেন রে, এতে তোর আপত্তি কি? বরং বেশি টাকা পাবি তো সরকারের কাছ থেকে। আমরা আদায় ক'রে দেব।'

'লাখ টাকা দিলেও পারব না। এ ইজ্জতের কথা। একথা মেনে নিলে আর কি রইল জীবনে। আমি বাহ্‌মনের ঘরের মেয়ে, ভদ্রলোকের মেয়ে।'

'ইঃ!' কদর্য একটা মুখভঙ্গী করে ওঠে রঘুবীর, 'ইজ্জত যেতে খুব বাকি আছে, না। খানকীপানা করেই তো খাস। আমার কাছে কি ক'রে টাকা নিস!'

'সে আলাদা। একটা অন্ধ বুড়ো মানুষ, আমার জন্যেই দেশছাড়া, আর একটা শিশু। তাদের খাওয়াতে তাদের প্রাণ বাঁচাতে যা করেছি, ভগবান তাতে পাপ নেবেন না। এও নানা জানেন না তাই আমার হাতে খাচ্ছেন। আমার রোজগারে খাচ্ছেন। ও কথা পুলিশে বললে শহরের তামাম লোক শুনবে, আরও কতদূর ছড়াবে, দূর দেহাতে কত আত্মীয় আছে—কখনও এক পয়সা দেয় নি সত্য কথা—কিন্তু এখন এসে নানাকে সব শুনিয়ে অপমান ক'রে যাবে। বুড়োটাকে তুমি চেন না, সোজা গিয়ে কোন টমটম কিংবা ট্যাস্‌কি গাড়ির নিচে আছড়ে পড়বে। আর কিছু না পায় আন্দাজেই বঁটি তুলে গলায় বসিয়ে দেবে। না, সে আমি পারব না। আর তারা যখন করেনি ও কাজ, আমি বলব কেন!'

অনেক বোঝাল রঘুবীর। মিনতি করল দু'হাত ধরে। বলল, 'ও বুড়োটা যদি মরেই তাতে তোর কি ক্ষেতি? ওই বা বেঁচে কি সুখ ভোগ করছে।'

'এমনি মরে মরুক। আমার জন্যে আত্মঘাতী হবে তাই বলে! আর কথা ও

রটে গেলে আমাকেও আত্মঘাতী হতে হবে যে।'

'তোর ইজ্জত কি যায় নি?'

সে লুকিয়ে-চুরিয়ে যা হয়েছে পেটের দায়ে। তিনটে প্রাণ বাঁচাতে। সে কেউ দেখতেও আসে নি। কাগজে ফটোকও বেরোয় নি।'

কিন্তু এটাও চাই যে রঘুবীরের। এতগুলো টাকার খেলা, তীরে এসে তরী ডুবলে চলবে না।

সে এবার ভাল কথায় পথ ছাড়ল। নানা রকম ভয় দেখাতে শুরু করল। ওর সামনে ওর ছেলেকে কেটে দু টুকরো ক'রে ফেলবে। ওর সামনে বুড়োর বুকে বাঁশ দিয়ে দলবে। আরও অনেক।

রতিয়ার সেই এক কথা। ওকথা বলতে পারবে না সে। হাজার টাকা পেলেও না। মিথ্যে তাদের নাম বলবে কেন?

'তবে সত্যিই হোক।' দাঁতে দাঁত চেপে বলে রঘুবীর, 'পুরনো শহরে চললুম। বিরজিপ্রসাদ আর আনোয়ারের নাম শুনেছিস তো। দু বোতল মাল পেলেই নাচতে নাচতে মানুষ খুন ক'রে আসতে পারবে, এ তো খুশির কথা। দেখি তোর ইজ্জত কে রাখে এবার।'

কিন্তু অনেক রাত্রে সে দুজনকে নিয়ে যখন ফিরল রঘুবীর তখন আর ঘরে ঢোকা গেল না। বাইরে বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেছে। ছেলেটা নাকি কিছুক্ষণ আগে চিল-চেঁচাতে শুরু করেছিল। কি হয়েছে বুড়ো বুঝতে না পেরে প্রথমটা নাতনীকে ডাকাডাকি করে, সাড়া না পেয়ে হাতড়ে হাতড়ে ঘরে ঢুকে বোঝে ঐ কাণ্ড—

তারপর তার চেঁচামেচিতেই পাড়ার লোক ছুটে এসেছে।

রামসুরতিয়া নাকি ঘরের চালের একটা শালের কড়ি থেকে ঝুলছে। উঠোনের মইখানা এনে কখন ঘরে পুরেছিল কেউ দেখে নি। তাতেই ওপরের সঙ্গে বাঁধার সুবিধে হয়েছে। পরনের কাপড়খানাই পাকিয়ে ফাঁস বেঁধেছে।

ইজ্জতের কথা ভাবতে গিয়ে আবরুর কথা ভাবার আর অবকাশ পায় নি বোধ হয়।

তপস্যায় বিঘ্ন

কুনাল চিঠিটা পেয়ে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল।

আঁকাবাঁকা হাতে লেখা। অসংখ্য বানান-ভুলে ভর্তি একটি পোস্টকার্ড—চল্লিশ মাইল পথ ছ'দিনে অতিক্রম ক'রে এসে পৌঁছেছে। তাতে জনৈক অভিরাম মাইতি জানাচ্ছেন যে, কুনালের স্কুল-জীবনের এক শিক্ষক মরণাপন্ন হয়ে এখানে পড়ে আছেন, বাঁচবার আশা আর নেই, তাঁর শুধু এখন শেষ একটি সাধ—তাঁর প্রাক্তন ছাত্র কুনাল আচার্যকে একবার দেখবেন, তাঁকে একটি কথা জানিয়ে যাবেন।

সে শিক্ষকের নাম আশু ঘোষাল।

না, চিনতে পারার কোন অসুবিধা হয় নি। আশু ঘোষাল কুনালের স্মৃতিতে কেন, বলতে গেলে সমস্ত জীবনেতিহাসের সঙ্গে জড়িত। প্রায়ই তাঁর নাম মনে হয় ওর।

অবাক হ'ল অন্য কারণে।

আশু ঘোষাল তাহলে এতদিন বেঁচে ছিলেন? আছেন এখনও? আশ্চর্য, সে কোন খবরও পায় নি। অথচ তারই খবর রাখার কথা বেশী।

অবশ্য, সে খুব একটা যোগাযোগের চেষ্টাও করে নি। করে নি—কারণ তার ধারণা ছিল আশুবাবুই সে চেষ্টা করবেন। তা যখন করেন নি, হয় সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, নয়ত মারাই গেছেন। তিনি যে প্রকৃতির মানুষ—আত্মহত্যা করাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তিনি এই সুদীর্ঘ কাল বেঁচেই ছিলেন, এক প্রায়-অপরিচিত সামান্য গ্রামে, অজ্ঞাত অবজ্ঞাত জীবন যাপন করছিলেন, অতি দীন দরিদ্রের মতো, দীন দরিদ্র লোকেদের মধ্যে। হয়ত তাদের ছেলেদের কিছু কিছু পড়া বলে দিতেন। তাদের চিঠিপত্র লিখে দিতেন, তার বদলে তারা কিছু চাল-আনাজ দিত। কিংবা একমুঠো খেতেই দিত। হয়ত এই অভিরাম মাইতিরাই তাঁর দেখাশুনো করত, সেবা-শুশ্রূষাও করছে এখন।

কিন্তু কেন, যে লোকটা দেশের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করেন

নি—স্বাধীনতাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান, সাধনা,—সর্বস্ব বলতেও অত্যুক্তি হয় না—স্বাধীনতা আসার পর তাঁর কথা কেউ স্মরণ করল না। কত তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামী—অল্প কিছু স্বার্থ ত্যাগ ক'রে—অথবা আদৌ না ক'রে—নিয়মিত পেনসন পাচ্ছেন, সরকার থেকে তাঁদের তাম্রফলকে নিদর্শন পত্র দেওয়া হচ্ছে—অথচ আশু ঘোষালকে কেউ স্মরণও করল না।

আসলে জেল থেকে বেরিয়েই তিনি কোথায় চলে গিয়েছিলেন—কতকটা অজ্ঞাতবাসে—একেবারে যেন নিজেকে মুছে দিয়েছিলেন পরিচিত লোকদের সমাজ ও সচেতনতা থেকে। নিজেকে বিলুপ্ত করারই সাধনা করেছিলেন। হয়ত মনে হয়েছিল এ জেলখাটাতে তাঁর অপরাধের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় নি। অন্য কোন কঠোর প্রায়শ্চিত্তর জন্যেই এমনভাবে অজ্ঞাতবাসের সঙ্কল্প করেছিলেন। কিংবা নিঃশব্দে দেশবাসীর সেবা করতে চেয়েছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।

জেল হয়েছিল আশুবাবুর—অমন ঋষিতুল্য মানুষটার—সে তো কুনালের জন্যেই।

চিঠিখানা টেবিলে নামিয়ে রেখে চুপ ক'রে বসে রইল সে, অনেক—অনেকক্ষণ। চারিদিকের এই প্রাচুর্য, স্বাচ্ছন্দ্যের ও সচ্ছলতার প্রচুর উপকরণ—আজ যেন মনে মনে পীড়িতই করছে তাকে। যশস্বী ব্যবহারজীবী সে—এখন ছেলের হাতে বেশির ভাগ কাজ ছেড়ে দিয়েও মাস গেলে কয়েক হাজার টাকা রোজগার হয়, লোকে যেন যেচে সেধে দিয়ে যায়; ছেলেও সুপ্রতিষ্ঠিত নাতিরা ভাল লেখাপড়া করে—মেয়ের ভাল বিয়ে হয়েছে, মেয়ে জামাই দুজনেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। এক কথায় সফল সার্থক জীবন তাঁর, সুখী পরিপূর্ণ সংসার।

কিন্তু এ সমস্তর মূলেই কি আশুবাবু নন!

তিনি কয়েকটি সৎ ও বুদ্ধিমান ছেলে বেছে নিয়েছিলেন, যাদের দেখে যাদের সঙ্গে কথা কয়ে মনে হয়েছিল এদের মানুষ করা যাবে, এরা একদিন মানুষ হয়ে দেশ স্বাধীন করার ব্রত নেবে—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—এই ভাবে আত্মদান ক'রে, নিজেদের জীবন দিয়ে দেশের ও দেশবাসীর মুক্তি আনবে।

আসলে তিনিই ঐ পণ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতেন না, তার জন্যে কিছুই তাঁর অকরণীয় ছিল না। প্রতি কালী-পূজার রাত্রে, প্রতি মহাষ্টমীর দিন নিজের বুক চিরে রক্ত দিয়ে দেবীর পূজা করতেন, সেই রক্তের তিলক পরিয়ে দিতেন তাঁর এই প্রিয় এবং নির্বাচিত ছাত্রদের ললাটে। তাঁর জীবদ্দশায় যদি স্বাধীনতা আসে, মৃত্যুর আগে যদি দেখে যেতে না পারেন—এরা দেখবে, এরা আনবে সেই স্বাধীনতা। এদের তিনি সেই উত্তরাধিকারই দিয়ে যাবেন—অবিরাম সংগ্রামের, ঐকান্তিক তপস্যার। তিনি দিনে একবার খেতেন। খাটো খদ্দরের ধুতি পরতেন, গায়ে একটি মিরজাই; জুতো পায়ে দিতেন না। মেঝেয় শুতেন কিংবা শুধু চৌকীর কাঠের ওপর।

প্রথম প্রথম কুনালের মন্দ লাগে নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেশা তাকেও পেয়ে বসেছিল। এর উত্তেজনা অপরিসীম, বিশেষ গোপন ষড়যন্ত্রের মধ্যে যেন একটা মাদক রস আছে, যা শারীরিক সমস্ত প্রকার কষ্ট ও কৃচ্ছ্রসাধনকেও বরণীয় মোহনীয় ক'রে তোলে।

তবে এ গোপন ষড়যন্ত্রটা যে বোমা-পিস্তল নিয়ে ইংরেজ নিধনের; ডিনামাইট দিয়ে ইংরেজ সরকারের দপ্তর উড়িয়ে দেওয়ার; রেলের ব্রীজ ভেঙে দেওয়ার—এটা আগে ঠিক অতটা বুঝতে পারে নি কুনাল। মাস্টার মশাই বুঝতে দেন নি। কৈশোর অতিক্রম করে তারুণ্যে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত এই সব ছেলেদের অন্তরঙ্গ পরামর্শের মধ্যে নিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত বোধ করেন নি। যতটা চারিত্রিক দৃঢ়তা, অটুট মনোবল, কষ্টসহিষ্ণুতা এসব কাজে প্রয়োজন—কিশোর বয়সে ততটা থাকা সম্ভব নয়।

ফলে ওঁদের কর্মপন্থার এই দিকটার কথা কুনাল বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হবার আগে পর্যন্ত জানতে পারে নি। যখন জানল তখন এদের সঙ্গে অনেকটাই জড়িয়ে গেছে সে, আর সে জড়িয়ে যাওয়ার কথাটা অপর দিকেও পৌঁছতে অসুবিধা হয় নি। পুলিশ সবই জানত, এদের ওপর নজরও রেখেছিল।

জানার পরও এ বিষয়ে কিছু বিবেচনা করার আছে, তা মনে হয় নি কুনালের। কিন্তু ওর মামার পুলিশ মহলের সঙ্গে কিছু যোগাযোগ ছিল। তিনি নিজেও সরকারী চাকরি করতেন—চাকরি যাওয়ার ভয়ও ছিল—তিনিই কথাটা তাঁর বোনকে জানালেন। বললেন, 'তুমি বিধবা বেওয়া মানুষ। ঐ একটা ছেলে।

এ পথে গেলে জেল দ্বীপান্তর এমন কি ফাঁসী হওয়াও আশ্চর্য নয়। তখন তো পথে বসে ভিক্ষে করতে হবে। তোমাদের সাহায্য করি বলে আমারও চাকরি যাবে হয়ত—এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমিই বা কোথায় দাঁড়াবো?'

মা এসব কথা জানতেন না, তাঁর অমন ভদ্র নম্র বুদ্ধিমান ছেলে এইসব ক'রে বেড়ায়—বেড়াতে পারে—তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি ছেলেকে ডেকে ঢিব্ ঢিব্ ক'রে তার পায়ে মাথা খুঁড়েছিলেন, বলেছিলেন, 'এই জন্যে কি তোকে এত কষ্ট ক'রে মানুষ করলুম, একপিঠ রুইকে দিয়ে আর আর এক পিঠ ভুঁইকে দিয়ে। তোর বাবার কত সাধ ছিল তুই উকিল হবি, সদরে বসে পয়সা রোজগার ক'রে দেশের গ্রামের পাঁচজনের আশ্রয়স্থল হবি, লক্ষপুষী বলবে সকলে। তিনি বি. এ. পাস করতে পারেন নি বলে মোক্তারী করতেন। তাঁর ঐ একটাই সাধ ছিল ছেলেকে উকিল করবেন। তুই আমাদের কথাটা একবার ভাবলি না! নিজের মা খেতে পাবে না, পথে বসে ভিক্ষে করবে—হয়ত কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে—সেটা ভাবলি না একবার। দেশমায়ের সেবা করবি ঘরের মাকে দু পায়ে থেঁতলে—সে সেবা দেশমা গ্রহণ করবেন?'

কুনাল সেই দিন, তখনই মাকে কথা দিয়েছিল—সে এ পথ ছেড়ে দেবে, বরং ভবিষ্যতে যদি টাকা রোজগার করতে পারে, টাকা দিয়ে এদের সাহায্য করবে—কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবে না।

সে সৎ ও সত্যবাদী ছেলে, সেদিনই গিয়ে আশুবাবুকে কথাটা বলেছিল। বলেছিল, 'আমি পারলুম না স্যার, মায়ের চোখের জল আমার কাছে দেশমাতার চোখের জলের চেয়েও বড়। তবে আমি এই আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, এসব কথা আমার মুখ থেকে কেউ কখনও শুনবে না, আমাকে মেরে ফেললেও না।'

আশুবাবু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, গালিগালাজও করেছিলেন, 'কাওয়ার্ড, সেলফিশ' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়েছিলেন। তার পর বলেছিলেন, 'তবে একটা আমার আদেশ রইল তুমি বিয়ে ক'রো না। বিয়ে ক'রে জড়িয়ে পড়লে আমাদের কোন সাহায্যই করতে পারবে না। তাছাড়া উইক হয়ে পড়বে—তখন ওরা যদি কোন চাপ দেয় কি ভয় দেখায় কি টরচার করে—তুমি এ প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না, আমাদের সব হাড়হদিস বলে ফেলবে।'

কিন্তু এ আদেশও পালন করতে পারে নি কুনাল। ওর মার ভয় ঘোচে নি, কুনাল আইন পাস করার সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। নাম-করা উকিলের মেয়ে, দেখতে সুন্দরী, একটু লেখাপড়াও জানে, আর কি চাই।

সমস্ত ঠিক ক'রে একেবারে মাত্র দুদিন আগে কুনালকে জানিয়েছিলেন। সেই রকমই শর্ত ছিল বেয়াইয়ের সঙ্গে, ভাল পাত্র পাবার জন্য মেয়ের বাবারা তখন পাত্রপক্ষের সব রকম শর্তই নির্বিচারে মেনে নিত। কুনাল সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান, ভাল ছাত্র, বড় বংশের ছেলে। টাকাকড়ি তো অঢেল খরচ করলেনই, বেয়ানকে মেয়ের বাবা প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি জামাইকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবেন নিজের গরজেই।

কুনালের মা সমস্ত আয়োজনই এত নিঃশব্দে করেছিলেন যে কুনাল একটু আঁচও পায় নি। সে অবশ্য তখন পরীক্ষার সাফল্যের পর হাত পা মেলে আরাম করতে একটু বিদেশেও গিছল কদিনের জন্যে। ওর মা সেই সুযোগটাই নিতে পেরেছিলেন।

তখন আর বিয়ে ভেঙে দেওয়া কি পিছিয়ে দেওয়া যায় না। চিঠি ছাপা, বিলিও হয়ে গেছে কিছু কিছু, বাজার হাট সব করা—এখন পিছিয়ে এলে মা মামা এঁদের অপমান তো বটেই—সে অপমানের অংশ ওকেও নিতে হবে কতকটা। আর—মা যা মানুষ, অপমান এড়াতে গলায় দড়ি দেওয়াও আশ্চর্য নয়।

এই বিয়ের খবর পেয়ে মর্মাহত, আশুবাবু একদিন ওদের বাড়িতে এসে-ছিলেন কিন্তু তখন কুনাল বাড়ি ছিল না। নববধূ ওঁকে জানত, সে সম্মান ও সমাদর ক'রে বসাতে গিছল, একটু কিছু খাওয়াবার জন্যেও পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু আশুবাবু কিছু খান নি। এসেছিলেন বেশ শান্ত ও সহজভাবেই। হঠাৎ কি হ'ল, কুনালের দেখা না পেয়ে কিনা কে জানে, কেমন একরকম উদ্‌ভ্রান্তের মতোই বেরিয়ে গেলেন।

কে জানে বিপদের সংকেত কিছু পেয়েছিলেন কিনা!

ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যাবার পরই পুলিশ এসে ধিরেছিল আশুবাবুকে, তাঁর পকেটে নাকি রিভলভার ছিল একটা—টোটাও। কিছুদিন আগে বারাসতে একজনের বাড়ি থেকে ডাকাতি হয়েছিল, অন্য জিনিসের সঙ্গে এটাও নিয়েছিল তারা—সেই রিভলভার।

আশুবাবুর ওপর পুলিশের নজর ছিল বহুদিনই, হাতেনাতে ধরতে পারে, নি এতকাল। এবার যাতে পাখী না পালাতে পারে, সেই ভাবেই আয়োজন করেছিল মামলা সাজাবার। বেশীই শাস্তি হওয়ার কথা—কিন্তু ওঁর ব্যক্তিত্বে ও স্বাধীনতা তপস্যার খ্যাতিতে বোধ করি বিচারকও কিছু অভিভূত হয়ে থাকবেন—মাত্র পাঁচ বছরের জেলের আদেশ হ'ল।...

উনি কবে ছাড়া পাবেন সে খোঁজ কুনাল করেছিল বৈকি। অফিসার হিসাব ক'রে যে তারিখ বলে দিয়েছিলেন, সেটাও ডায়েরীতে লেখা ছিল। কিন্তু কী একটা কারণে সেই নির্দিষ্ট তারিখের দুদিন আগেই ওরা ছেড়ে দিয়েছিল আশুবাবুকে। সেদিন সে একটা বড় মামলায় এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে পাটনা গিয়েছিল। অবশ্য এখানে থাকলেও খবর পেত না।

আশুবাবুও কোন খবর দেন নি। কাউকেই দেন নি। জেল্স থেকে বেরিয়ে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেলেন একেবারে।

সেই জনৈক অভিরাম মাইতির চিঠি পাবার পর কুনাল আর স্থির থাকতে পারল না। পরের দিন ভোরেই বেরিয়ে পড়ল সে। ডায়মণ্ড হারবারের দিকে ফলতার কাছাকাছি একটা গ্রাম। নিতান্তই অখ্যাত সামান্য জায়গা। অনেক খোঁজাখুঁজি জিজ্ঞাসাবাদ করার পর যদি বা পথ মিলল, দেখা গেল সে পথে গাড়ি যাবে না, কাঁচা মেঠো পথ। গোরুর গাড়ির কল্যাণে দুদিকে গর্ত হয়ে গেছে, মাঝখানটা উঁচু। সুতরাং সেইখানেই গাড়ি রেখে হেঁটে যেতে হ'ল বাকীটা পথ। রাস্তায় এমন লোক নেই যে তাকে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করে।

খুবই কষ্ট করে যাওয়া—তবু কুনাল শেষ পর্যন্ত খুঁজে বার করল সেই অভিরামের বাড়ি। একখানা মাত্র ঘর তার—তারও চালে খড় পড়ে নি বহুকাল—বাকী ঘরগুলো ভেঙে গেছে দেওয়ালের মাটি বর্ষায় গলে। সেই একমাত্র ঘরেরই একপ্রান্তে একটা মাদুরের (সেটাও সম্ভবত ছেঁড়া) ওপর একটা ছেঁড়া কাঁথা পাতা, তার ওপর পড়ে আছেন কোটরগত চক্ষু, রগ-বসে-যাওয়া, কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ। যাঁকে আশু ঘোষাল বলে চেনার কোন উপায় নেই—এক অনুমান ছাড়া।

গৃহের মালিক অভিরামও বৃদ্ধ। তারও বেশভূষা যেমন দীন তেমনি মলিন। সে সসম্মানে কুনালকে ঘরে এনে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকেই ফিরে কুনাল বলল, 'এ কি অবস্থা এঁর! ইস! একটু আগে খবর পেলে তো—। চিকিৎসা-টিকিৎসা বোধ হয় কিছুই হয় নি?'

অভিরাম কাতরকণ্ঠে বলল, 'চিকিচ্ছে কি হবে বাবু, যে লোকটা না খেয়ে মরবে বলে ধনুভ্ভঙ্গ পণ করেছে, তাকে বাঁচাবে কোন্ ডাক্তার, বলো। আমার এই আবস্তা তো আপনি চোকেই দেখতে পাচ্ছ, একেই বিশেষ কিছু ছিল না—তার ওপর একটা ছেলে, তার হ'ল ঐ কি বলে ক্যানছার না কি সেই ওগ, তা সেও বাঁচল না, আমাকে ধনে-পেরাণে মেরে গেল। নিজের জমি বিশেষ ছিল না, পরের জমি চাষ করতুম—ছেলেটা যাবার পর বুকে কি ওগ হয়েছে একটু খাটতে গেলে বুকের মধ্যে যেন ইঁদুর ছুটোছুটি করে। তাতেই এই দশা। অথচ বাবু আর কারও বাড়ি যাবে না। সবচেয়ে গরিব বলে আমাদের ঘরেই উঠেছেল, গাঁয়ের ছেলেপিলেকে পড়াত একটু একটু—তারা যা কলাটা মুলোটা, কি কেউ এক পালি ধান দিত—সে সবই আমাদের ধরে দিত, এখানেই এক মুঠো যা জুটত খেত। খায় তো একবেলা, মুঠোখানেক চালের ভাত—আতের বেলা তো শুধু একঘটি জল। তাও এখন বন্ধ করেছে। একেবারে উঠতে পারে না। মাথা ঘোরে। পড়াতে পারে না কাউকে—অমনি পড়ে থাকে। গাঁয়ের লোক অবিশ্যি বেইমান নয়—এখনও কিছু কিছু এটা ওটা পৌঁছে দিয়ে যায়, যার যা সাধ্যি—ওঁকে এখানে সবাই দেবতার মতো দেখে—তা হ'লে কি হবে—আমরা বুড়োবুড়ি আর ঐ বেধবা মেয়েটা, পেটভরে না খেলে উনি মুখে জল তুলবেন না। শুনেছ কখনও এমন ভারত-ছাড়া কথা।'

তার কথা কানে গেলেও কুনাল একদৃষ্টে ওঁর দিকেই চেয়ে ছিল। এখন বোধহয় অভিরামের একটানা গলার আওয়াজেই কঙ্কালে প্রাণ সঞ্চার হ'ল। চোখের পাতা একটু কাঁপতে কাঁপতে একসময় তা খুলেও গেল। খানিকটা বিহ্বলভাবে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে কুনালের দিকে চোখ পড়ল। চিনতেও পারলেন। বললেন, 'এইছিস! আয়, আয়, এখানে বোস। অভিরামের লেক্চার শেষ হতে দিন ফুরিয়ে যাবে। অতক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারব

না। আমার সময় হয়ে এসেছে। কোন রকমে তোর জন্যেই ধরে রেখেছি প্রাণটা। তবে আর পারব না। যা বলবার আছে আমার, শুনে নিয়ে ছুটি দে।

ক্ষীণ, খুবই ক্ষীণ, তবুও আশুবাবুর গলা চিনতে অসুবিধে হয় না। সে ওঁর পাশের ছেঁড়া চটের ওপর বসে পড়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এ কী করেছেন স্যার দেহটাকে! আমাকে একটু আগে খবর দিতে পারলেন না!'

'খবর দিলে কি হ'ত? নিয়ে গিয়ে চিকিচ্ছে করাতিস এই তো? না, তাতে আমার প্রায়শ্চিত্ত হত না। আমার এমনিও বয়েস কম হয় নি। বাঁচিয়ে তুললেই বা কি করতুম! সে যাক, শোন্, যেদিন আমি রিভলভারসুদ্ধ ধরা পড়লুম—সেদিন আমি তোকেই গুলি ক'রে মারতে গিছলুম, কিন্তু মারতে পারি নি। তোর বৌয়ের মুখ চেয়েই পারি নি। অথচ তাকে বিয়ে করেছিলি বলেই তোকে খুন করা দরকার হয়েছিল, অন্তত আমার তাই ধারণা ছিল। সেটা আমার কর্তব্যে ত্রুটি নয়—বিচ্যুতি ঘটল। তার প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। সেইজন্যে ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছি। নইলে আশু ঘোষালকে ধরবে ঐ কটা পুলিশ—সে সম্ভব ছিল না। আরও বহু লোক এলেও ধরতে পারত না, অমন কতবার আমি ওদের চোখে ধুলো দিয়েছি।'

'ওরা—ওরা আপনার ওপর নির্যাতন করে নি!' প্রায় আর্তকণ্ঠে কুনাল বলে।

'করেছিল বৈকি। সে জেনেই তো গিয়েছি। আমার দল কি, কে কে আছে দলে, কী কী করেছি—ওরা জানতে চাইবে সেই তো স্বাভাবিক। তেমনি আমিও সে খবর দেব না সেও জানা কথা। খুবই অত্যাচার করেছে, আর তাইতেই চিরদিনের মতো অক্ষম হয়ে গিছলুম—কোন শারীরিক পরিশ্রমের আর ক্ষমতা ছিল না। এদের ছেলেমেয়েগুলোকে ঐ একটু-আধটু পড়াতুম, ওরা খেতে দিত। তা ছাড়া একটা কুটি ভেঙেও দুটি করতে পারতুম না।'

'কিন্তু আমাকে মারতে গিছলেন কেন স্যার? আমি তো কোন অন্যায় করি নি।'

উত্তর দিতে দেরি হ'ল—কারণ একটানা অনেক কথা বলার ফলে আশুবাবু তখন হাঁপাচ্ছেন, নিঃশ্বাস নিতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে—যেন আরও চুপি চুপি বললেন, 'তুই যাকে বিয়ে করেছিলি তার বাবা সরকারী উকিল, আমাদের ওদিকের অনেক ছেলেকে ও জেলে পাঠিয়েছে।—একটু চেষ্টা করলেই বাঁচতে পারত। অন্তত অনেককে পারত, এটা ঠিক করে নি। চিরদিনই খয়ের খাঁ। তোর বৌকে দিয়ে আমাদের খবর বার করলে রায়বাহাদুর হ'তে পারবে, সে জন্মে চেষ্টা চালাবে নিশ্চয়। তাছাড়া তুই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস—আমার কথা শুনিস নি।···সবটা জড়িয়ে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। অত কিছু তলিয়ে ভাবি নি। আসলে তোর ওপর আমার অনেক আশা ছিল। তোকে দিয়ে দেশের সত্যিকারের কাজ হ'তে পারে—সে সম্ভাবনা তুই একেবারে নষ্ট করলি, রাগ সেজন্যেও কম নয়। এত অল্প বয়সে বিয়ে ক'রে ছেলেপুলে হয়ে সংসারী হয়ে পড়লে—বিষয়কর্মেই মন দিতে হবে—মক্কেলের হয়ে মিথ্যে মামলা গড়ে তোলা, এছাড়া টাকা বেশী আসে না। সেই জন্যই আরও—।'

আবারও দম নেবার জন্মে কিছুক্ষণ থামতে হ'ল। তারপর ইশারায় কুনালকে কানটা ওঁর মুখের কাছে আনতে বলে চুপি চুপি আসল বক্তব্যটা বললেন—কেন সেদিন ওর বৌকে দেখে কুনালকে মারতে পারেন নি সেই কথা। উপন্যাসের মতো সে বিবরণ। আশুবাবু না বললে বিশ্বাস হ'ত না।

সে অনেকদিনের কথা—তখন আশুবাবু তরুণ, সবে বি. এ. পাশ করেছেন। বলতে গেলে নিজেই একটা বিপ্লবী দল গড়ে তুলে, তখন ওঁরা বলতেন 'য়্যানার্কিস্ট,' নিজেই একরকম নেতা হয়ে বসেছেন।

এসব কাজ করার জন্মে টাকা চাই। বড়লোক জমিদার বা মহাজনের বাড়ি লুঠ ক'রে সে টাকা তোলাকে ওঁরা তখন অন্যায় মনে করতেন না। সেদিন তেমনি এক সুদখোর মহাজনের বাড়ি ডাকাতি ক'রে অনেক গহনা পাওয়া গিয়েছিল। বন্ধকী গহনা সব। সেগুলো কলকাতায় বি-সরকারের দোকানে পৌঁছে দেওয়া দরকার। একাধিক লোককে পাঠানো ঠিক হবে না, বিশেষ দলের সকলেই তখন ছেলেমানুষ, আশুবাবুই সে ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত এসেছেন—রেল লাইনটা ছিল লক্ষ্য, তখন বিশেষ সঙ্কেত দিলে ছোট ছোট ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন থামত, মানে সাহেব বা য়্যাংলো

ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার না থাকলে—, ওসব গাড়িতে থাকতও না, ফায়ারম্যানরাই চালাত—হঠাৎ প্রায় চারিদিক থেকে পুলিশ ঘিরে ফেলল।

পকেটে পিস্তল ছিল কিন্তু কজনকে মারবেন? আর মারাটা বিপজ্জনক, অন্য অপরাধে পুলিশ তত চঞ্চল হয় না, পুলিশকে মারলেই সক্রিয় হতে হবে তাদের। বেগতিক দেখে এক জলায় নেমে পড়লেন, কচুরিপানায় ঢাকা জলা, ভেবেছিলেন তাতে ডুবে বসে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না।

কিন্তু খানিকটা পরে সেই অন্ধকারেই বুঝতে পারলেন, পুলিশও জলে নামবার তোড়জোড় করছে। ঠিক জানে না তারা—তবে জলায় লুকোবার চেষ্টাই বেশী সম্ভব, সেটা বোঝে। সেই বিঘে দুই জলার শেষ প্রান্তে একটা বাড়ি আর অন্যদিক সব ফাঁকা, জল থেকে উঠে ছুটে পালাতে গেলেই সকলের নজরে পড়বে। আশুবাবু অগত্যা জুয়াখেলার মতোই ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন সেই বাড়িটার দিকে—কচুরিপানার ঝাড়ে কোন আলোড়ন সৃষ্টি না করে। বাড়িটার এদিকের পাঁচিল একেবারে জলের ওপর বলতে গেলে। শ্যাওলা ধরা দেওয়াল বলে অত দেখাও গেল না, তেমনি সাড়াশব্দ না দেওয়ার চেষ্টা ক'রেই পাঁচিল টপকে বাড়িটার উঠোনে নেমে পড়লেন।

তবু, যত চেষ্টাই করুন, একেবারে শব্দ হবে না তা সম্ভব নয়। গভীর রাত্রে সামান্য শব্দও শোনা যায়—জেগে থাকলে। অবশ্য অত রাত্রে কেউ জেগে থাকবার কথা নয়—কিন্তু ঠিক সেই সময়ই বাড়ির কিশোরী মেয়েটির বাইরে আসার প্রয়োজন হয়েছিল। সে ভয় পেয়ে চিৎকার ক'রেই উঠত কিন্তু আশুবাবুর ভাগ্য ভাল, অতিরিক্ত ভয় পাবার জন্যেই জোর কোন আওয়াজ ফুটল না।

আশুবাবুর আর সময়ও ছিল না, পুলিশ ওদিকে জলে নেমেছে, সে শব্দ পেয়েছেন তিনি। তিনি এগিয়ে এসে একেবারেই মেয়েটার মুখ চেপে ধরলেন —বেশ সজোরে। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'কোন ভয় নেই। শোন, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছি, চোর নই। আমি স্বদেশী করি—স্বদেশী করা বোঝো তো? ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আমাদের লড়াই। আজ হঠাৎ পুলিশের হাতে পড়ে গেছি, চারিদিক থেকে ঘিরেছে—ধরলে হয়ত

ফাঁসি দেবে (একটু বাড়িয়েই বলেছিলেন আশুবাবু, মেয়েটির করুণা উদ্রিক্ত করার জন্যেই)। আমি ঐ জলা দিয়ে উঠে এসেছি। আমাকে এখানে কোথাও একটু লুকিয়ে রাখতে পারো?'

বলে হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

টেররিস্ট, য়্যানার্কিস্ট বা বিপ্লবী, এসব কথা তখন অত কেউ বুঝত না—বিশেষ পাড়াগাঁয়ের দিকে—স্বদেশী করাটা বুঝত।

অত অল্পবয়সী মেয়ে—সতেরো-আঠারোর বেশি বয়স নয়, তাও গ্রাম অঞ্চলের—তার উপস্থিত বুদ্ধি এবং দ্রুত মনস্থির করার ক্ষমতা দেখে আশুবাবু সেদিনও অবাক হয়ে গিছলেন, আজও মনে হ'লে বেশ অবাক লাগে। এমন খুব বেশী তিনি দেখেন নি।

সে ঘাড় নাড়ল। অস্ফুট কণ্ঠে 'আসুন' বলে একেবারে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

ছোট্ট বাড়ি। মাঝে দু'খানা মাঝারি ঘর, দাওয়ার দুপাশে দুটো খুব ছোট্ট ঘর। ইটের গাঁথুনি, খড়ের চাল বাড়ি—মেঝেটা বিলিতি মাটির। ঐ দুটো ছোট ঘরের একটাতে বোধ হয় রান্না হয়, আর একটাতে এই মেয়েটি থাকে। পরে শুনেছিলেন আশুবাবু—ঐ দুটো মাঝারি ঘরের একটাতে মুদির দোকান, আর একটাতে বাবা মা ছোট দুটি ভাই থাকে। এই ঘরটাতে এ মেয়েটি থাকে—মালতী, আর সেই সঙ্গে ভাঁড়ারও।

ঘরে চৌকী নেই, আসলে চৌকী রাখার জায়গাও নেই। মেঝেতেই একটা মাদুরের ওপর তোশক পেতে বিছানা করা, দিশী তাঁতের খাটো মশারী টাঙানো একটা। দিনে এটা গুটিয়ে রেখে পুরোপুরি ভাঁড়ারের কাজ চালানো হয়—সেই সঙ্গে বোধহয় কুটনো-বাটনাও চলে। অত কথা কিছু হয় নি—এসব আশুবাবুর অনুমান, পরে ভেবে দেখেছেন এসব কথা।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে একটা দেশলাই বার করে প্রদীপ জ্বালল। রেড়ির তেলের প্রদীপ, এ আলো বাইরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তা ছাড়াও জলার দিকেই এই দরজাটা, আলো যাবেই বা কোথা দিয়ে। আলো জ্বেলে চকিতে—প্রায় এক লহমায় ওঁর অবস্থাটা দেখে নিয়ে দড়ির আলনা থেকে একখানা গামছা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'গা' মুছুন তাড়াতাড়ি

—জামাকাপড় খুলে দিন, আমি রান্নাঘরে রেখে আসি। আর এই শায়াটা জড়িয়ে নিন কোনমতে—একটু ছেঁড়া তা কী আর হবে।'

সে শাড়ি আড়াল ক'রে শায়াটা ছেড়ে দিল।

মুগ্ধ বিস্মিত আশুবাবু তাই করলেন।

মালতী বলল, 'এবার মশারীর মধ্যে ঢুকে পড়ুন, কাঠ হয়ে শুয়ে থাকুন। যা-ই হোক, যা শুনুন—একটা শব্দও করবেন না।'

তারপর এক ফুঁয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ভিজে কাপড়গুলো নিয়ে কোথায় চলে গেল। পরে জেনেছিলেন, রান্নাঘরে উনুনের খাঁজে রেখে এসেছিল, লুকানোও হবে, গরমে একটু শুকিয়েও যাবে।

তারপর মশারীব মধ্যে থেকেই দেখলেন আশুবাবু, মেয়েটা দ্রুত উঠোনে নেমে ওঁর পায়ে ও কাপড়ে ক'রে আনা জলের চিহ্ন মুছতে শুরু করেছে। কচুরিপানার টুকরোগুলো আবার ওদিকে ফেলে—একবার ভিজে ন্যাতায় আর একবার একটা শুকনো ন্যাকড়ায় ঘষে ঘষে জলের সমস্ত চিহ্ন লোপ ক'রে ফিরে এসে আগের মতোই নিঃশব্দে দোর বন্ধ করে বিনা দ্বিধায় সেই মশারীর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পুলিশ এসেছিল বৈকি।

চেঁচামেচি হাঁকডাকে ওর বাবা-মা উঠে ছিলেন, মালতীও দোর খুলেছিল 'নিদ্রালু' চোখে।

কোন লোক পাঁচিল টপকে ওদের উঠোনে পড়েছিল কি? ওরা কিছু দেখেছে? ঠিক ঠিক বলুক, নইলে নিস্তার নেই।

কেউই দেখে নি। কেউ কিছু জানে না।

একজন এস. আই. জুতোসুদ্ধ দাওয়ায় উঠে একটা লণ্ঠন তুলে ঘরের মধ্যেগুলিতেও চোখ বোলালেন।

একটি মেয়ের সামান্য সংকীর্ণ বিছানা—মেয়েটা তো এইমাত্র ঐ ঘর থেকেই বেরোল—সেখানে আর কে লুকিয়ে থাকবে।

মশারীটা দেশী মোটা কাপড়ের, বেশ ময়লাও—তার মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া-ওঠা লণ্ঠনের আলোতে ভেতরে কিছু আছে কিনা তা দেখাও গেল না স্পষ্ট।

পুলিশ চলে গেলে মালতীর বাবা মা গজগজ করতে করতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। মালতীও এসে যেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেই মশারীর মধ্যে ঢুকল। বিছানার বাইরে মেঝেতে যেটুকু জায়গা খালি পড়ে আছে, তাতে কারও শোওয়া সম্ভব নয়। সে চেষ্টাও করল না মালতী, তবে ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব গা-বাঁচিয়ে শোওয়ারই চেষ্টা করল।

তবে নিতান্তই অপরিসর শয্যা। তাতে একেবারে গায়ে গা না ঠেকিয়ে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। তেমন কোন অসম্ভব প্রয়াস করলও না মালতী।

এরপর দুটো-একটা কথা অস্পষ্ট কণ্ঠে হবে বৈকি! মেয়েটির বাবা শিক্ষক, তবে তার আয়ে সংসার চলে না বলেই সকাল-বিকেলে এই দোকান করেন। অবস্থা ভাল না, একেবারে খারাপও না। মালতীও ইস্কুলে পড়েছে, ম্যাট্রিক পাস করেছে। কলেজে পড়া সম্ভব হয় নি। এখনও বাবা কিছু কিছু পড়ান। বাইরের বই পড়েছে কিছু। স্বদেশীওলাদের সম্বন্ধে তার বাবারও খুব আগ্রহ। সামান্য, যেটুকু পারেন—তিনিও গোপনে সাহায্য করেন।

অশুবাবুও বললেন তাঁর কথা। ঐ ছোট পুঁটুলিতে যে অন্তত চার-পাঁচ হাজার টাকার গহনা আছে—এগুলো তাঁকে যেমন ক'রেই হোক কলকাতায় পৌঁছে দিতে হবে। এর বদলে পাবেন হয়তো মোট পাঁচশো টাকা। কিন্তু তাই বা দেয় কে? টাকার খুব দরকার।

গরমে দুজনেই ঘামছে, সেটা নড়তে চড়তে যেটুকু গায়ে গা লাগে—তাতেই অনুভব করা যায়। মালতী একবার আঁচল দিয়েই একটু হাওয়া করার চেষ্টা করল। আশুবাবু বাধা দিলেন, আঁচলটা টেনে নিয়ে নিজের ঘাম খানিকটা মুছে নিলেন শুধু।

মালতী বলল, 'পাখা একখানা আছে, তবে সেটা ভাঙা, হাওয়া করতে গেলেই শব্দ হবে।' তারপর একসময় ছেলেমানুষের মতোই বলে উঠল, 'এই শাড়িটা আমি কাচব না, লুকিয়ে তুলে রেখে দেব।'

অনেকক্ষণ ধরেই প্রবল একটা আবেগ বোধ করছেন আশুবাবু। কী একটা অননুভূত অস্বস্তি। এমন কখনও বোধ করেন নি এর আগে। ঠিক এমন একটা ইচ্ছা—কি, তাও বুঝতে পারছেন না। শুধু রক্তে যেন তাঁর আগুন লেগেছে—এই রকম মনে হচ্ছে তাঁর।

সেটা বোধহয় মালতী বুঝল, হয়ত নিজের মনের ও দেহের অবস্থা দিয়েই। সে মেয়েছেলে, এ বিষয়ে জ্ঞান আশুবাবুর চেয়ে তার বেশী। এটা যে ঘোর বিপজ্জনক অবস্থা তাও বুঝল।

আর সময় নেই। আবেগটা অমোঘ-বলে সর্বনাশের দিকে টানছে। বাবা বলেন, পুরুভুজ বলে এক জলজ প্রাণী আছে—আট হাতে বেঁধে মানুষকে গভীর জলের দিকে নিয়ে যায়—মৃত্যুর দিকে। এও বুঝি তেমনি।

সে হঠাৎ বাঁধন-ছেঁড়ার মতো ক'রেই উঠে বসল। তারপর একেবারে দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ, বোধহয় পুলিশের গতিবিধিটাই বোঝার জন্যে।

তারপর ঘরে ঢুকে মশারীটা তুলে দিয়ে সামনে বসে তেমনি প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল, 'মনে হচ্ছে ওরা চলেই গেছে। তবু সাবধানের মার নেই। ওদের আসার ফাঁকে আমি ওঘর থেকে একখানা শাড়ি এনে রেখেছি। আপনি ঐ শায়ার ওপর শাড়িটা জড়িয়ে নিন, একটা ফুটো মাটির কলসীর মধ্যে আপনার জামা কাপড় আর পুঁটুলিটা পুরে দিচ্ছি—আপনি সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। রায়েদের পুকুরে অনেক মেয়েছেলেই ভোরবেলা জল আনতে যায়—পুলিশ ঘাপ্‌টি মেরে থাকলেও সন্দেহ করবে না। তারপর এ টহরণ ছাড়িয়ে গিয়ে কোন একটা জায়গায় কাপড় জামা পাল্‌টে নেবেন।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'আপনাকে এভাবে বিদেয় করছি বলে অন্য কিছু ভাববেন না। পুবদিকে এরই মধ্যে একটু ফরসার আভা জেগেছে। পালাতে হ'লে এই সময়।'

আশুবাবুরও বোধহয় এই অস্বস্তিকর অবস্থা অসহ্য লাগছিল—তিনি উঠে পড়ে যেন বাঁচলেন। বললেন, 'কিন্তু শাড়ি শায়া থাকবে না, তোমার বাবা মা টের পাবেন না?'

'ওমা, তাঁদের তো বলতেই হবে।...তবে স্বদেশীওলাকে বাঁচিয়েছি—তাঁরা কিছুই বলবেন না।'

'তোমার এই শায়া কাপড় কিন্তু ফেরত দিতে পারব না—এর জন্যে টাকা দিতে গেলেও অপমান করা হবে। এ ঋণ থেকেই যাবে।'

'ওগুলো আপনার কাছেই রাখবেন—তবু মাঝে মাঝে মনে পড়বে।'

'নইলে পড়বে না ?'

'পড়বে হয়ত। তবু থাক না ওগুলো।' কেমন যেন অনুনয়ের ভাবে বলে।

কিছু পরে কলসীর মধ্যে ক'রে কাপড় জামা নিয়ে এসে বলল, 'আপনার পুঁটুলি-টুটুলি কী আছে এতে পুরে নিন। কাপড় জামা প্রায় শুকিয়েই এসেছিল, আমি পাট ক'রে হাতেই যতটা সম্ভব ইস্ত্রী ক'রে দিয়েছি। কলসীতে পুরেছি সাবধানে। তেমনি সাবধানে আপনিও যদি বার করতে পারেন—খুব খারাপ দেখাবে না, মানে লোকে সন্দেহ করতে পারবে না।'

কলসীটা হাতে নিয়ে রাস্তার দিকের দরজা খুলে যখন আশুবাবুর হাতে দিতে যাবে—তখনই আকস্মিক একটা ব্যাপার ঘটে গেল। এর জন্যে আশু-বাবু প্রস্তুত ছিলেন না, কি কারণে এটা হ'ল তাও ঠিক বুঝতে পারলেন না। আজও পারেন নি। এ ধরনের উন্মত্ত আবেগ অনুভব তাঁর ওই প্রথম আর ওই শেষ। তিনি দুহাতে মালতীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পাগলের মতো পর পর দুটি-তিনটি চুমো খেলেন। মালতী বাধা দিল না ; বরং একরকম আবেগ ও আবেশে চোখ দুটি বুজে এল তার। সে যেন আশুবাবুর বুকের মধ্যে এলিয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময়ই বাড়ির মধ্যে কি একটা শব্দ হ'ল। বোধহয় মালতীর মা কি বাবা কেউ উঠছেন। দূরে কার বাড়ি একটা মুরগীও ডেকে উঠল।

দুজনেরই সচেতনতা ফিরল—প্রায় এক নিমেষে। আশুবাবু কলসীটা ওর হাত থেকে যেন টেনে নিয়েই দ্রুত এগিয়ে চললেন—প্রভাতী আলোর দিক পিছনে রেখে। বেশ দ্রুতই চলছেন—কেবল, তিনি যে ঠিক পথ দেখে চলতে পারছেন না—বার বার হোঁচট খাওয়াতেই সেটা বোঝা গেল।

দু-তিন মুহূর্তের ব্যাপার, তার মধ্যেই, সে স্বল্প আলোতেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন আশুবাবু। মালতীর ওপরের ঠোঁটের ডানদিকে একটি লাল তিল।

কুনালের স্ত্রী যখন হাসিমুখে ওঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন তার ডানদিকের ঠোঁটে ঐ লাল তিলটিই প্রথম নজরে পড়েছিল।

আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই। তার মধ্যেই কোন মতে প্রশ্ন করেছিলেন। 'তোমার—তোমার মায়ের নামটা কি মা, বলতে পারো?'

'তা কেন পারব না। মালতী। কিন্তু কেন বলুন তো?'

সে প্রশ্নের জবাব দেন নি আশুবাবু। দিতে পারেন নি। কোন প্রয়োজনও ছিল না দেবার। আর অপেক্ষা করারও না। কী সব বলছে বৌটি তাও শোনেন নি।

মালতীর মেয়েকে তিনি বিধবা করতে পারবেন না।

নিজের জীবনের মূল্য না হয় নিজের জীবন দিয়েই শোধ হবে।

তিনি তখনই চলে এসেছিলেন, সোজা পুলিশের কাছে।

অতিহিসাবী

হঠাৎ এসে কেউ দেখলে মনে করত, এদের বাড়িতে কোন পুজো কি উৎসব আছে। তবে কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই বলেই এরা নিশ্চিন্ত ছিল। আশ-পাশের কোয়ার্টারগুলিতে সবই অবাঙালীর বাস, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মালয়ালী—একঘর বুঝি সিন্ধীও আছে। বাঙালী কেউ নেই। তবু, কেউ দূর থেকেও এসে পড়তে পারে বলে অরুণা গৃহসজ্জা শুরু করেছে রাত আটটার পর। সম্প্রতি অনেক রাহাজানি, ছিনতাই ও ছুরি-মারার ঘটনা ঘটে যাওয়ায়—আটটার পর রাত্রে আর কেউ বেরোয় না, অন্তত দূরে কোথাও যায় না।

অরুণা নিপুণ শিল্পী, শখ ও শৌখীনতা দুটোই আছে তার পুরোমাত্রায়। এই কোয়ার্টারটার উঠোনে একটা চামেলি গাছ পুঁতেছিল সে নিজেই, সে গাছ ছাদ পর্যন্ত তো উঠেইছে, এদিকেও প্রায় সারা উঠোন জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে, ফলে সেদিকের বারান্দায় আর সূর্যকিরণ নামেই না বলতে গেলে।

সুতরাং ফুলের অভাব নেই। অতবড় গাছ ছেয়ে ফুল ফুটেছে—লক্ষ লক্ষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাদা হয়ে আছে সারা গাছটা। সন্ধ্যার পর সদ্য প্রস্ফুটিত টাটকা ফুল পেড়েছে সে প্রায় দু' ঝুড়ি। তারপর বসে বসে মালা গেঁথেছে, কিছু গোড়ে, কিছু একানে। মালা শেষ হলে মোটা মালাগুলো

দিয়েছে দরজায় দরজায়, পর্দার মতো ক'রে। একানে ও গোড়ে মিলিয়ে সাজিয়েছে আলমারী, বুক কেস, ডেসিং টেবিল। ছবিগুলোর ফ্রেমে আটকে দিয়েছে মালা। মনে হচ্ছে যেন ফুলেরই ফ্রেম। সব শেষে সাজিয়েছে খাট, ধনী-দুহিতার ফুলশয্যার মতো ক'রেই। খাটের ছত্রিতে জড়িয়েছে বড় বড় মালা। সরু মালার ঝালর ঝুলিয়ে দিয়েছে চারিদিকে, মশারির মতো ক'রে। ওর ফুলশয্যায় ভাল ক'রে খাট সাজানো হয় নি, সে দুঃখ ওর আজও আছে কিছুটা, সেই জন্যেই আরও বেশী মনোযোগ দিয়েছে। সব শেষ হলে নতুন পাতা বেডকভারের ওপর কুঁচো ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে আঁজলা আঁজলা ক'রে।

পুষ্পসজ্জা শেষ হতে কেটেছে পুরো আড়াই ঘণ্টা। তবু স্বামী পলাশ সাহায্য করেছে, মালার প্রান্ত ধরে থেকেছে, হাতে হাতে যুগিয়ে দিয়েছে পিন, আঠা, ফুল—যেখানে যেমন দরকার। কিন্তু নামে আড়াইখানা ঘর হ'লেও আসবাব ও ছবির সংখ্যা তো কম নয়।

এর পরে আহারের আয়োজন।

খাবার করাই ছিল। সারা সকাল বসে বসে নানান ধরনের পুলি-পিঠে করেছে, কড়াইশুঁটির কচুরি, মাংসের সিঙাড়া—পলাশ যা যা ভালবাসে—মনে ক'রে ক'রে সব করেছে সে। এখন শুধু ভাজা খাবারগুলো একটু গরম ক'রে নিতে যা দেরি। পলাশের ঘুম পেয়েছে সে তো বোঝাই যাচ্ছে, নেহাৎ অরুণা চটে যাবে বলে কিছু বলতে সাহস করছে না।

চটে যাবে তার কারণ—এত সব আয়োজনেরও যে কারণ,—আজ তাদের বিয়ের তারিখ। নতুন বিয়ে কিছু নয়, ১৭-১৮ বছর আগে বিয়ে হয়েছে তাদের, পলাশের অত মনেও থাকে না—কিন্তু অরুণা বা রুণু ভোলে না। ওকেও ভুলতে দেয় না। বলে, 'আর আমার কি আছে বলো তো, কে আছে? শুধু তুমি। তাই তোমাকে পাবার দিনটাই আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয়।'

আসল ব্যথা যে কোথায় তা পলাশ জানে। তাই এ প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা তোলে না। দুটি সন্তান পর পর মৃত বেরিয়েছে, তাও অপারেশন ক'রে বার করতে হয়েছে। দ্বিতীয়বারের বার ডাক্তার বলে দিয়েছেন যে, এর পর এ ঘটনা ঘটলে প্রসূতিকে আর বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ।

রুণু তা বিশ্বাস করে না, কিন্তু পলাশ আর একদম ঝুঁকি নিতে চায় না।

সে বলে, 'তুমি আমার বার্ড ইন হ্যাণ্ড, তোমাকে খুইয়ে আমি টু-ইন-দ্য-বুশ-এর রিস্ক নিতে রাজী নই।'

এতে সাময়িক আনন্দ হয় কিন্তু দুঃখটাও যায় না। সেটা অনেক বেশী, অনেক বেশী গভীর।

সেটা ভোলার জন্যেই এই সব আয়োজন, যা ক্রমশ পাগলামির পর্যায়ে পৌঁচচ্ছে।

খাবার টেবিলে সাজানো, সহসা বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামার শব্দ। হর্ণের আওয়াজে মনে হল ট্যাক্সি।

কে এল এর রাত্রে ?

গাড়ি কার ?

ডাকাত নয় তো ? প্রথমেই এই ভয়টা মনে এল। বিবর্ণ হয়ে উঠল পলাশের মুখ। ওদিকের দরজা দুটোই বন্ধ আছে, কিন্তু ওদের ডাইনিং টেবিল এই ভেতরের বারান্দায়। সরকারী কোয়ার্টার—দরজা নেই, কোলাপসিব্‌ল্ গেটেরও ব্যবস্থা নেই। ওরা নিজেদের খরচে সবস্ত্র চিকের পর্দা ক'রে নিয়েছে, জলে, শীতে, রোদে সেটা ফেলে দেয়। এখন এই অঘ্রাণের অল্প শীতে সে প্রয়োজনও হয় নি, সবটাই খোলা। ডাকাত হ'লে অনায়াসে পিছনের পাঁচিল টপকে নামতে পারবে।

পলাশ ভয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল, রুণু হয় নি। সে একরকম ওকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল, (পাশের ঘর অর্থাৎ শোবার ঘরের দরজা বন্ধই ছিল) তারপর গলাটাকে যথাসাধ্য সহজ করার চেষ্টা করতে করতে ঈষৎ কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কে ?'

দরজার বাইরে—নিচু বারান্দা থেকে উত্তর এল, 'আমরা চারটি বঙ্গসন্তান। খুব বিপদে পড়েছি, জানলা দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন—এদিকের আলোটা জ্বাললে অবশ্য—আমরা চোর-ডাকাত নই।'

বাংলা ভাষায় একটু আশ্বস্ত হয়ে ওরা আলো জ্বালল। দেখল সত্যিই ধুতি-পাঞ্জাবী পরা চারটি বাঙালী ভদ্রলোক, বয়স কারও খুব কম নয়, মানে ৪০।৫০ এর কম বলে মনে হয় না। ট্যাক্সির মাথায় মোট-ঘাটও আছে।

এবার পলাশ দোর খুলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

যে ভদ্রলোক আগে কথা বলেছিলেন, তিনিই বললেন, 'আমরা তিনজন সাহিত্যিক আর এই ইনি প্রফুল্লবাবু সাংবাদিক। বিখ্যাত নন্দনবাজার পত্রিকার প্রধান সহকারী সম্পাদক-কাম পরিচালক। আমার নাম শ্যামশংকর মুখুজ্যে—নাম শুনেছেন কিনা জানি না, বই লিখে খাই। এঁদের দুজনের একজন কবি গৌরীশংকর সরকার আর একজন আলোক ভট্টাচার্য। গল্প-নাটক-উপন্যাস যা পান তাই লেখেন।'

বক্তার মুখখানা যেন একটু চেনা চেনা মনে হল—কিছুদিন আগেই বোধ হয় কোথাও দেখেছে, ছবিই দেখেছে সম্ভবত। নামটাও পরিচিত, বাকী ক'জনের নাম শোনা নেই। তার সহজ কারণ পলাশের সাহিত্য পাঠের অভ্যাস কম। দু-একখানা বই আনে লাইব্রেরী থেকে—অনেকদিন অন্তর অন্তর, সে রুণুর জন্যে, আর একখানা বাংলা সাপ্তাহিকও এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে আনে সে তিন-চারখানা জমলে—কিন্তু নিজে কোনটাই পড়ে না। বাড়িতেও টাইমটেবল্ আর পাঁজি ছাড়া কোন বই নেই।

তবু বলতে হল, 'আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। তা—মানে—'

'বলছি। কালপ্রিট আমিই। এখানে এক সাহিত্য সভায় আমরা আমন্ত্রিত। যাঁর আগ্রহে আসা—অপূর্ববাবু, তাঁর বাড়িতেই থাকব এই কথা। টিকিট ক'রে ওখান থেকে তাঁর ছেলেই তুলে দিয়েছে। আমরা চারজন আর এত মাল বলে আমরাই বলে দিয়েছিলুম যে স্টেশনে কাউকে আসতে হবে না। কিন্তু এখন নেমে আবিষ্কার করছি ওঁর চিঠি বা ঠিকানা-লেখা কাগজ—কোনটাই আমার কাছে নেই। নেই অর্থাৎ খুঁজে পাচ্ছি না। তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজার অবকাশ হয় নি, ট্যাক্সিতে বসে খোঁজা তো—তবু যতটা সাধ্য খুঁজেছি। অগত্যা স্মৃতির ওপর ভরসা ক'রে সেই থেকে অনেক ঘুরলুম—কিন্তু কোন হদিস হ'ল না। এদিকে ট্যাক্সির মিটার এর মধ্যেই চল্লিশের ওপর উঠে গেছে। চালকটি এমনি যা বলবার তা তো বলছেনই—মাথা কতটা কাটবেন তা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদেরও শরীর আর বইছে না।'

'তা আসুন, ভেতরে আসুন। মালপত্রও নামান। কোনমতে রাতটা কাটাতে পারবেন হয়ত। তবে খাবার এত বাড়তি তৈরী নেই, যদি অপেক্ষা

করেন তো একটু আলুভাতে ভাত চাপিয়ে দিতে পারি। আপনারা সব বিশিষ্ট ব্যক্তি—আমার অবশ্য খুব-একটা পড়াশুনো নেই, তবে আমার স্ত্রীর সাহিত্য-বাতিক খুব। কই কোথায় গেলে—রুণু!'

এ-সব ঝামেলা পছন্দ নয় পলাশের, তবু অর্ধ-অনিচ্ছাতেও গলায় অভ্যর্থনার স্বর আনতে হয়। আর একটু আন্তরিকতার ভাব ফোটাতে পারলে ভাল হ'ত—কিন্তু অনভ্যাসে তা ফুটল না।

তবে স্ত্রীর দিকে ফিরেছিল অনেকটা আশা নিয়েই। সাহিত্য ভালবাসে, ঘরে এতগুলো লেখক উপস্থিত, তাদের বিবাহ-বার্ষিকীর দিনটা সার্থক হ'ল ভেবে খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠবে, হাসি হাসি মুখে এগিয়ে আসবে—এই রকমই ভেবেছিল সে। কিন্তু এখন বেশ একটু অবাক হয়ে গেল রুণুর মুখের দিকে চেয়ে, একটু অপ্রস্তুত, বিব্রতও বোধ করল। কোন এক অজ্ঞাত কারণে তার মুখ একেবারে বিবর্ণ, যেন রক্তহীন হয়ে গেছে, ফলে মুখের ভাবটা কেমন একটা কাঠের মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে এ তার অপরিচিত কোন মানুষ।

এ আবার কি! এঁরা কি মনে করবেন, এমন কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে—ভাববেন অনাহূত শুধু নয়, রীতিমতো অবাঞ্ছিত অতিথি এঁরা।

কিন্তু ওর হ'লই বা কি? এত সাহিত্য ভালবাসে! লেখকদের নাম তো জপমালা বলতে গেলে—এখন এমন হয়ে গেল কেন। বিবাহ-বার্ষিকীর মধুর সন্ধ্যাটা নষ্ট হয়ে গেল বলে? তাই বা কেন। ওদের বিবাহ হয়েছে ১৭ বছর—এখন সে আগের উন্মত্ততা নেই, থাকা সম্ভবও নয়। এই যে সব আয়োজন, এ তো শুধু সন্তানহীনতার দুঃখ ভোলবার জন্যেই।

অতি অল্প সময়—কটা মুহূর্তের মধ্যেই মনে মনে প্রশ্নগুলো খেলে গেল। সামলেও নিল সে তার মধ্যে, কতকটা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, "রুণু, এই ইনিই শ্যামাশংকর মুখোপাধ্যায়—ক'দিন আগেই কোন এক বিজ্ঞাপনে ওঁর ছবি ছাপা হয়েছিল মনে আছে? তুমি তো ওঁর বই পড়ার জন্যে পাগল। এবার একেবারে হাতের কাছে, ঘরের মধ্যে পেয়ে গেলে। এখন—'

সামলে নিয়েছে রুণুও।

সে হাত তুলে একটা নমস্কারের ভঙ্গী ক'রে বলল, 'নমস্কার। তুমি এঁদের বসাও। আমি আগে একটু চা ক'রে দিই—তারপর বরং একটু খিচুড়িই চাপিয়ে

দিই। আর যা আছে ভাগ-যোগ ক'রে খেলেই হবে—'

গৌরীশংকর বাধা দিয়ে বললেন, 'না না, আমরা আসার পথে—তুফানে এসেছি তো, ঘণ্টা দুই লেট ছিল—মথুরাতে চা-টা খেয়ে এসেছি। এখন এত রাত্রে আর অত হাঙ্গামা করবেন না। খিচুড়ি চড়াবারও দরকার নেই—যদি একটু কিছু বাড়তি খাবার থাকে তো—তাই দিন, আমরা অল্পস্বল্প খেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই।'

শ্যামাশংকর বললেন, 'না ভাই গৌরী, উটি লারব। মথুরাতে খাবার মধ্যে তো আধখানা ময়দার ডেলা কেক আর আধ কাপ চা। ওতে হবে না, চাও একটু পেলে খুব ভাল হয়—ঘুরে ঘুরে বকে বকে আর দুশ্চিন্তায় গলা যেন বুক পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। অবিশ্যি যদি খুব কষ্ট হয় তো—'

'না না' পলাশ বলে উঠল, 'চা আমিই ক'রে দিতে পারি। ইন ফ্যাক্ট বেগম সাহেবাকে ভোরের চা আমি ক'রে দিই রোজ।'

'আচ্ছা,' শ্যামশংকর বললেন, 'একটা প্রশ্ন করি কিছু মনে করবেন না। এমন গৃহসজ্জা, পুষ্পসজ্জা বলাই উচিত—আজ বোধ হচ্ছে আপনাদের বিয়ের দিন, না? বা ঐ রকম একটা কিছু?'

হ্যাঁ।' সলজ্জভাবেই বলল পলাশ, 'খুব ভাল দিনেই এসে পড়েছেন। একটু আগে খবর পেলে আয়োজনটাও খারাপ হত না অতিথি সৎকারের।'

'একটু আগে খবর পেলে আমরাও মিথ্যে মিথ্যে অপূর্ব রায়ের ঠিকানা না খুঁজে এখানেই এসে পড়তাম।...কিন্তু সে যাক, এই সজ্জা কি সবই আপনার গৃহিণীর?'

'হ্যাঁ, পরিকল্পনা, তা কার্যকর করা—সবেরই কৃতিত্ব ওর।'

'আশ্চর্য। আপনি মশাই ভাগ্যবান। এ তো ফার্স্ট ক্লাস একজন আর্টিস্ট নিয়ে ঘর করছেন আপনি। সত্যিই দেখার যোগ্য জিনিস, তাতে সন্দেহ নেই।'

রুণু আগেই ভেতরে চলে গিয়েছিল, তবে কথাগুলো তার কানে না যাবার কোন কারণ নেই, যাতে যায় তেমনিভাবে সরবেই বলেছেন শ্যামাশংকর।

অনাহুত মানী অতিথিদের যোগ্য সৎকারের কোন ত্রুটি হ'ল না। নিজেদের

জন্যে যা ফ্রাই, ফ্রায়েড রাইস ইত্যাদি হয়েছিল তাই দিয়েই চা দেওয়া হ'ল। ফ্রীজে মাছ ছিল, মাছ ভাজা, খিচুড়ি, সঙ্গে পায়েস মিষ্টি। এঁরা উচ্চরবে সাধু-বাদ দিলেন, এই অভাবনীয়, কল্পনাতীত সুখাদ্য সম্ভার ওঁদের ভাগ্যে আজ আছে বলেই শ্যামাশংকরবাবুর ঠিকানা নিতে ভুল হয়েছিল সে কথাও বার বার স্বীকার করলেন। গৃহকর্ত্রী যে শুধু রূপসজ্জায় প্রধান শিল্পী তাই নন, রন্ধনেও প্রথম শ্রেণীর শিল্পী তাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন। অপরিচিত অপ্রত্যাশিত অতিথিদের এমন অবিশ্বাস্য রকমের রাজকীয় সৎকার—এ-ওঁদের চিরদিন মনে থাকবে তাও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন।

এর মধ্যে এঁদের শয়নের আয়োজনও হয়ে গেছে। তাতেও পারিপাট্যের অভাব ঘটে নি। ওদেরই খাটে আড়াআড়ি প্রফুল্লবাবুদের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। ছোট্ট ঘরখানায় তোরঙ্গ-বাক্স সরিয়ে তাতে খাটিয়া পেতে শ্যামা-শংকরের জন্যে আলাদা বিছানা করেছে রুণু। একটা টেবিল ফ্যান, ছোট কুঁজোয় খাবার জল এবং একটা বড় গোছের য়্যাশট্রে—কিছুই দিতে ভুল হয় নি তার।

'এত রাতে য়্যাশট্রে দিয়ে লাভ কি ? রাত যে সাড়ে বারোটা পেরিয়ে গেছে —সেটা দেখেছ ।' বলেছিল পলাশ।

'উনি প্রচণ্ড সিগারেট খান, দৈনিক পাঁচ প্যাকেটেও কুলোয় না। শোবার পর ঘুমোবার আগে কোন্ না দশটা সিগারেট পুড়বে, য়্যাশট্রে না দিলে ঘরময় ছাই পড়বে তো। বরং তোমার স্টক থেকে একটা প্যাকেট রেখে যাও।'

'এত খবর রাখো—ক' প্যাকেট সিগারেট খান তা পর্যন্ত, তবে তখন অমন ভাব দেখালে কেন ? আমি অপ্রস্তুত হলুম ওঁদের কাছে খানিকটা।'

'তখন বাপু', মুখ ঘুরিয়ে জবাব দেয় রুণু, 'সত্যিই আমার রাগ হয়েছিল, যা বলব। অসময়ে রসরঙ্গ।...তবে সিগারেট খাওয়া ? সে কে না জানে। কাগজে কাগজে আজকাল এই সব ফষ্টিনষ্টিই তো বেশী থাকে। কোন্ য়্যাকট্রেসের কুকুর কবার হেঁচেছে—তার অভিনয়ের থেকে এই খবরই বেশী মূল্যবান...।'

অতিথিরা শুয়ে পড়লেন। ওরা বাইরের ঘরের চেয়ারগুলো সরিয়ে মেঝেতে লেপখানা পেতে একটা বিছনা ক'রে নিল, বাড়তি তোশক অত নেই বলে।

ওদের শুতে শুতে রাত একটা পেরেয়ে গেল। পলাশ ক্লান্ত হয়েই ছিল, তা

ছাড়া সে চিরদিনই ঘুম-কাতুরে। শোওয়া মাত্র পাথরের মতো ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু রুণুর চোখে তন্দ্রার লেশমাত্র নামল না।

তার কারণ—শুধু পলাশ কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কেউই জানতে পারবে না কোন দিন—শ্যামাশংকর।

শ্যামাশংকরের এই আকস্মিক আবির্ভাবই তার মনে এক বিপুল ঝড় তুলেছে। সে ঝড়ে বিপর্যস্ত এমন কি বুঝি উন্মুলিত হবারই কথা—সে যে কোন মতে সামলে নিতে পেরেছে—এটা নিতান্তই মেয়েছেলের সহজাত একটা অভিনয়-দক্ষতা আছে বলেই। বহুদিন আগে আশাপূর্ণা দেবীর 'অভিনেত্রী' বলে একটা গল্প পড়েছিল, সেদিন তার পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে নি। আজ পারল।

শ্যামাশংকরের সঙ্গে এই ওর প্রথম পরিচয় নয়। খুব অল্প বয়সেই ওদের দেখাশুনো। যার মারফত ওদের এই পরিচয় সে জীবিত নেই বলে সে পরিচয়ের ইতিহাসও আজ বিস্মৃত।

শ্যামাশংকরের বোন গৌরী ছিল ওর সহপাঠিনী, স্কুলের বন্ধু। শ্যামাশংকর তখন কিছুই করে না, একটু-আধটু লেখে, তবে সে লেখা প্রায়ই ছাপা হয় না, পাড়ায় হাতে-লেখা কাগজের পাতা ভরায়। এক-আধটা যা ছাপা হয়ও, অজ্ঞাত অখ্যাত কাগজে, কোন পারিশ্রমিক তো পায়ই না, সে সব লেখা কেউ পড়ে কিনা সন্দেহ।

আয় নেই এক পয়সাও, ব্যয় আছে। সিগারেট খায় তখন থেকেই—খায় মানে দৈনিক তিন-চার প্যাকেট। বাড়িতে এক বৌদি এবং পাড়ার বন্ধু ভক্তর দল,—যাদের কাছে শ্যামাশংকর একটা প্রকাণ্ড প্রতিভা—তারাই সে খরচ যোগাত। মা অনুযোগ করতেন, 'যা হোক দুটো পাস করেছিস—এক-আধটা টিউশনী করলেও তো পারিস!' তার জবাবে ও বলত, 'হ্যাঁ, ঐ গাধা পেটাতে গেলে আমার নিজের লেখা-টেকা ডকে উঠবে!'

'লিখে তো ছাই হবে। ওতে রোজগার হচ্ছে এক পয়সাও!'

'মাদার, ও তুমি বুঝবে না। তা হ'লে কালিদাসের কথা বলতে হয়। স্বর্গে যেতে গেলে এক হাজার সিঁড়ি ভাঙা দরকার, এক লাফে কেউ স্বর্গে পৌঁছয় না। তবে, হবে হবে। এতেই পয়সা হবে, তুমি দেখে নিও।'

শ্যামাশংকর পাগলই হোক আর ক্ষ্যাপাটেই হোক, ওঁর একটা আকর্ষণ

ছিল সেটা রুণুও মানতে বাধ্য। একেই কি প্রতিভার আকর্ষণ বলে? কে জানে। অনেক মেয়েই ওর কাছে কাছে ঘুরত—তখন থেকেই। যে বৌদি ওকে সিগারেটের পয়সা যোগাতেন তাঁরও অমনি কোন আকর্ষণ ছিল কিনা তাই বা কে জানে।

রুণু আকৃষ্ট হয়েছিল এটা ঠিক।

শ্যামাশংকরও। সেইখানেই রুণুর জিত। ওর মধ্যেই শ্যামাশংকর নাকি তাঁর মানসীকে আবিষ্কার করেছিলেন। বলেও ছিলেন সে কথা—যখন প্রথম রুণুর বিয়ের সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে তখনই বলেছিলেন, 'রুণু তুমি কি কোনমতে কিছুদিন এ-ব্যবস্থাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারো না? তাও যদি না পারো—বলো আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি। তার পর লোককে বললেই হবে।'

রুণু তখন ওঁর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই ছিল, তার ঠোঁট দুটো ছিল শ্যামাশংকরের গলায়। সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দু হাতে ওঁর গালটা ধরে কিছু দূরে সরিয়ে চোখের দিকে চেয়ে বেশ সহজ কণ্ঠেই বলেছিল: 'দ্যাখো, প্রেম এক জিনিস, আর ঘর পাতা অন্য। এমনি একটু-আধটু প্রেম ভাল—কিন্তু যায় সঙ্গে আমার জীবন বাঁধব, যাকে অবলম্বন করব—তার কতটা সামর্থ্য সে ভার বইবার, সেটা হিসেব ক'রে দেখা দরকার। টাকার অভাবে, প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার উপকরণের অভাবে অনেকেরই প্রেম অল্পদিনের মধ্যে ঘুলিয়ে ওঠে, এ-কথা বইতেও পড়েছি, নিজেও দু-একটি বন্ধুর ব্যাপারে দেখেছি। না বন্ধু, যা পেয়েছি তার দুনো দিয়েছি, এটা এই প্রেমের পর্যায়েই থাক, প্রত্যহের ম্লান-স্পর্শে তাকে নষ্ট ক'রে লাভ নেই। তোমাকে ভালবেসেছি, তাই বলে জীবনটা বিড়ম্বিত করতে রাজি নই।'

এর পর শ্যামাশংকর যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন, একটা কথাও বলেন নি আর।

তখন এ কথাগুলো বলে, বলতে পেরে নিজেকে মনে মনে খুব বাহবা দিয়েছিল—বুদ্ধিমতী বলে, যথার্থ 'স্মার্ট' বলে। লেখাপড়া যা শিখেছে তাকে কাজে লাগাতে পেরেছে এই ভেবে।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে বৈকি।

শ্যামাশংকর বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর বইয়ের প্রচুর বিক্রি। বহু বই তাঁর চিত্রায়িত হয়েছে। বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন। বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

তার চেয়েও যেটা বড় কথা—অন্তত অরুণার কাছে—বিবাহ করেছেন, পাত্রী উচ্চ শিক্ষিতা এবং চারটি সন্তান হয়েছে। ছুটি মেয়ে, ছুটি ছেলে। যা শুনেছে রুণু—তাদের স্বাস্থ্য ভাল, পড়াশুনোতেও ভাল।

আর রুণু!

যাকে বিয়ে করেছে সে এম. এ. পাস, সুদর্শন, বড় বংশের ছেলে, নিজের বিদ্যার জোরে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিল—কাউকে সুপারিশ করতে হয় নি।।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। চাকরি সেদিনও সামান্য ছিল, আজও প্রায় তাই আছে। অনেকেই এই চাকরি দিয়ে জীবন শুরু করে কিন্তু তার পর নানা পরীক্ষা দিয়ে তদ্বির-তদারক ক'রে অনেক ওপরে উঠে যায়। পলাশের সঙ্গে একই বছরে কাজে ঢুকেছে সুশান্ত—সে আজ এই বয়সেই আণ্ডার সেক্রেটারী হয়ে গেছে।

পলাশ তা পারে নি তার কারণ তার আলস্য। অল্পেই সে খুশী। কী হবে এত হাঁপাহাঁপি ক'রে উন্নতি করার? ভগবান যখন ছেলেপুলে দেন নি, তখন বেশী রোজগার করতে গিয়ে জীবনটা নষ্ট ক'রে লাভ কি? এই কথাটাই বার বার সে রুণুকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

•

রুণু আর শুয়ে থাকতে পারল না, ছটফট ক'রে উঠে বসল, তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে শ্যামাশংকরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

তিনিও যে জেগে আছেন তা সিগারেটের আগুন জ্বলা-নেভায় দূর থেকেই টের পাওয়া গেল। হয়ত একই কারণে ঘুম হয় নি তাঁরও।

রুণু আর দ্বিধা করল না, একেবারেই ঘরে ঢুকে, খাটিয়ার এক প্রান্তে বসে পড়ল। ওঁর পায়ে একটা হাত রেখে প্রায় চুপি চুপি বলল, 'আমাকে—আমাকে তুমি চিনতে পারলে না?'

খুব—খুব সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন শ্যামাশংকর, 'কেন পারব না। না

চিনতে পারার মতো কোন পরিবর্তন তো তোমার হয় নি। তবে চেনা দিয়ে লাভ কি হত—অনর্থক অনেক জবাবদিহি, অনেক পুরাতন ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করা। এই তো তোমাদের সুখের প্রেমের সংসার—পলাশবাবুর মনে যদি বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ দেখা দেয়—হয়ত চিরকালের মতো একটা কাঁটা হয়ে থাকবে সেটা—তাই না?'

'ওঁর যদি সেই কাঁটা বোধ করার মতোও উদ্যম থাকত!' সংকোচেই বলে ফেলে রুণু, তার পর একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই গত ক' বছর ধরে নিত্য নিজের মনে মনেই হচ্ছে—একেই বোধ হয় তুষানল বলে। তবু তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার একটা সুযোগ যদি পেতাম—এটা অনেকবারই ভেবেছি। ভগবান বোধ হয় সে সুযোগ এনে দিলেন। তুমি ক্ষমা করতে পারবে না তা জানি—'

'ক্ষমা!' বলতে বলতে একেবারে উঠে বসলেন শ্যামাশংকর।

ওঁর পায়ে-রাখা রুণুর হাতখানা চেপে ধরে বললেন, 'ক্ষমা কি বলছ! তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার যে শেষ নেই। সেদিন ঐ আঘাত দিয়েই তুমি আমার মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দিয়েছ, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছ। সেদিন থেকেই কঠোর পরিশ্রম করেছি সার্থক হবার সফল হবার প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। অন্য কিছু ভাবি নি, কারও দিকে কোন দিকে চাই নি, শুধু মন্ত্রের মতো জপ করে গেছি অর্থ উপার্জন করব আর সে এই বই লিখেই করব। তুমি সেদিন আমাকে প্রত্যাখ্যান করে মহা উপকার করেছ রুণু। যা কিছু করেছি—যদি কিছু করতে পেরে থাকি, সে তোমারই জন্যে। যে লেখক শ্যামাশংকরকে লোকে জানে—সে তোমারই সৃষ্টি।'

আর বসতে পারল না রুণু, শুনতেও না। মানুষের কথা যে এমন আগুনের মতো মানুষের কানে ঢোকে, ঢুকতে পারে তা সে জানত না, কখনও কল্পনাও করে নি।

সে প্রায় ছুটতে ছুটতে নিজের শয্যায়, তার স্বামীর শয্যায় ফিরে গেল।

সত্যভাষণ

প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই এমন কতগুলি মুহূর্ত আসে যখন পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় তাহাদের হৃদয়ের পাত্র একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে এবং বিহ্বল মুহূর্তে তাহারা সে ভালবাসার আতিশয্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। অকারণ স্বার্থত্যাগ, অসম্ভব প্রতিজ্ঞা, নানারূপ আত্মনিপীড়ন প্রভৃতি নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্য দিয়াই প্রায় সে আতিশয্য প্রকাশ পায়—আর সেই জন্যই অনেক সময়ে তাহারা সাধ করিরা ডাকিয়া আনে দুঃখ।

আমাদের ললিত আর কল্যাণীর জীবনেও সেদিন এমনি একটি মুহূর্ত আসিয়াছিল।

সেদিন পূর্ণিমা, ললিত অফিসের ফেরত একটা রজনীগন্ধার মালা কিনিয়া আনিয়াছিল। সেই মালাটি ছিল পাশে একটি রেকাবীতে সাজানো; ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিল স্বামী আর স্ত্রী, পাশাপাশি—নিবিড়-ভাবে। ললিত তখনই সাবান দিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাহার মৃদু সৌরভ কল্যাণীর প্রসাধনের গন্ধ ও রজনীগন্ধার গন্ধের সহিত মিশিয়া কেমন একটা মোহ সৃষ্টি করিয়াছে, দুজনেরই চোখে নামিয়াছে স্বপ্নের ছায়া। ছোট বাড়ী, অন্য ভাড়াটে নাই, আছে এক ঝি, সে নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ।

সহসা কল্যাণী ললিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, যে জীবনে এত সুখ আছে, বাস্তবিক তা কখনো ভাবি নি। উঃ, বিয়ের সময় কী কান্নাটাই কেঁদেছিলুম; সাহসে কুলোয় নি তাই, নইলে হয়ত আত্মহত্যাই করে বসতুম!

সজোরে তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ললিত মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন রাণু, আমাকে কি তোমার আগে পছন্দ হয়নি?

কল্যাণী খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কি তোমার বুদ্ধি গো। তোমাকে আগে দেখলুম কোথায় যে পছন্দ হবে!

তা বটে। ললিত তাহার খোঁপার মধ্যে মুখটা গুঁজিয়া কহিল, তবে? তা হ'লে এর আগে আর কাউকে পছন্দ হয়েছিল বলো।

কল্যাণী সুখের আবেগে হাতটা উল্‌টা দিকে ঘুরাইয়া ললিতের গলাটা জড়াইয়া রাখিয়াই তাহার বুকে এলাইয়া পড়িয়া কহিল, বা-রে ছেলে! আমার গোপন কথাটি বুঝি ফাঁকি দিয়ে বার ক'রে নিতে চাও? তোমার কীর্ত্তি আগে না শুনে আমি কিছু ভাঙ্গছি না!

তাহার পর আব্‌দারের হাসি হাসিয়া কহিল, সত্য বলো না গো, তুমি আমাকে বিয়ে করবার আগে ক'জনকে ভালবেসেছিলে?···কথাটা মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমাকে দেখলেই সব ভুলে যাই ব'লে কোন দিনই আর জিজ্ঞাসা করা হয় না—

ললিত জবাব দিল, হ্যাঁ, আগে জিজ্ঞাসা করলেই বলতুম কি-না!···তবে এখন বল্‌তে পারি। আর কোন বাধা নেই!

কৌতুকহাস্যে মুখ রঞ্জিত করিয়া কল্যাণী কহিল, বলো না তবে। তিনজন, চারজন, না আরও বেশী?

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ললিত কহিল, সে বরাত ক'রে এসেছি কি না! মোটে একটি, আমারই দিদির ননদ। পাটনা থেকে এসে আমাদের বাড়ীতে মাস দুই প্রায় ছিল। জমেছিল বেশ। একই বাড়ীতে চিঠি লেখালেখি চলত হরদম। ওরা যখন চলে যায়—আমি মাকে বলেছিলুম—ওকে না পেলে আমি বিয়েই করব না। সেও না-কি সেখানে আমার দিদিকে বলেছিল যে আমাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

তারপর?

ললিত হাসিয়া কহিল, তারপর আর কি, যেমন হয়ে থাকে। সে-ও এখন দিব্যি স্বামী-পুত্তুর নিয়ে ঘরকন্না করছে—আর আমি তোমাকে এই বুকে জড়িয়ে ধরে আছি!

কল্যাণী কহিল, তাই বটে। ঐ রকমই তখন মনে হয়। আমারও ঠিক বিয়ের আগে দাদার এক বন্ধুকে দেখে মনে হয়েছিল ওকে না পেলে বাঁচব না। মনে মনে সাবিত্রীর মতো প্রতিজ্ঞা করবার চেষ্টা করতুম যে ঐ আমার স্বামী, 'অন্যপতি নাই!'

একটু থামিয়া আবার কহিল, ইস্‌—কি এঁচোড়ে পাকাই ছিলুম তখন। কত রকম নাটক যে করতুম মনে মনে, তার ঠিক নেই।···সে ছোঁড়াও তেম্‌নি,

সবে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে তখন—পড়াশুনো সব ছেড়ে শুধু আমাকে দেখবার জন্যে বাড়ির চার পাশে ঘুরে বেড়াতো। তেম্‌নি হ'লো, ফার্স্ট ইয়ারেই দু'বার ফেল!...এখন শুনছি ডাক্তারী পড়া ছেড়ে কোথায় চাকরি করছে।

দু'জনেই খানিকটা হাসিয়া উঠিল। তাহার পর মিনিট কয়েক একেবারে চুপচাপ, দুজনেই মনে মনে কি ভাবিতেছিল। কল্যাণী একটু পরে ললিতের গলাটা ছাড়িয়া দিয়া তাহারই কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, ছেলে-বেলায় মানুষ যেন কী এক রকম থাকে! না?

ললিত অন্যমনস্কভাবে কহিল, হ্যাঁ। সেই জন্যেই ত ছেলেমানুষী বলে—

আবার কিছুক্ষণের জন্য দুজনে চুপ করিল। আবেগের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—এখন তাহার পরের শান্ত অবস্থা।

তাহারা যে চুপ করিয়া আছে, অকস্মাৎ মিনিট দশেক পরে দুজনেই এক সঙ্গে তাহা বুঝিতে পারিল। ললিত একটু শব্দ করিয়াই হাই তুলিল; কল্যাণী কহিল, বাতাস একদম নেই, কেমন যেন গরম বোধ হচ্ছে, না?

ললিত কল্যাণীর চুলের মধ্যে একটা আঙ্গুল চালাইয়া কহিল, তোমার মাথা ঘামে ভিজে উঠেছে যে!...টেবিল ফ্যানটা এনে খুলে দিলে না কেন?

থাক্ গে। আর উঠ্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না।

তাহার পর সহসা প্রশ্ন করিল, তোমার এই সামনের শুক্রবার কিসের ছুটি আছে বলছিলে?

এমনিই দুই-একটা খুচরা আলাপ চলিল। কোথা দিয়া কেমন করিয়া সামান্য একটু সঙ্কোচের সুর যেন কথাবার্তার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে; অথচ তাহারা সে কারণটা তখন ভাবিতেও প্রস্তুত নয়।

আরও মিনিট কতক পরে ললিত কহিল, চলো, খেয়ে দেয়ে নিই—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

কল্যাণী উঠিয়া পড়িল, কিন্তু জবাব দিল, কি ভাগ্যি! রোজ বারোটার আগে খেতে চাও না! আজ ঐ ভয়ে আমি ঝিকে আগে খাইয়ে দিয়েছি, সে চাকরি ছেড়ে দিতে চায়।

ললিত কিছু না বলিয়া মালাটা লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরের দিন সকালে ললিত আহারে বসিয়াছে, কল্যাণী একটা পাখা লইয়া কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল,—হ্যাঁগা, আমাকে একবার পাটনায় নিয়ে যাবে?

বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, পাটনায়? এত দেশ থাকতে পাটনা যাবার সখ হ'লো কেন হঠাৎ?

মাথা নীচু করিয়া কল্যাণী কহিল, এমনি—। না হয় একবার সেই মেয়েটিকে দেখে আসতুম!

আরও বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, মেয়ে? কোন্ মেয়ে?

তোমার দিদির সেই ননদ—

ওহো! ললিত হাসিয়া কহিল, কি তোমার বুদ্ধি। সে-ও বুঝি পাটনায় থাকে? তার বিয়ে হয় নি? শ্বশুরবাড়ী নেই?

কল্যাণী কহিল, তার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

কৈ মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে ললিত কহিল, ঐ দিকেই কোথায়—দারভাঙ্গা না মতিহারী—ঠিক জানি না।

কল্যাণী চুপ করিল। ললিতও তখনকার মতো কথাটা ভুলিয়া গেল। কিন্তু অফিসের নির্জ্জন অবসরে কথাটা মনে পড়িতেই কল্যাণীর প্রশ্নের আড়ালে যে একটু ঈর্ষার সুর আছে সেটা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ললিত কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করিল—কল্যাণীর মধ্যেও নীচতা আছে, ছি!

সে বাড়ি ফিরিল একটু গম্ভীর মুখে। কল্যাণী আসিয়া পাখাটা খুলিয়া দিল, অভ্যাসমত হাত হইতে জামা-গেঞ্জিও লইল বটে, কিন্তু অন্যদিনের মতো উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল না। একটা কি যেন ঠাট্টার চেষ্টা করিয়া পরক্ষণেই সংসারের কথা পাড়িল, ওগো, ঝি বলছে দেশে যাবে আসছে মাসে—

—তাই ত। তা ও-ই একটা লোক দিয়ে যেতে পারবে না?

কল্যাণী কহিল, বলছে ত পারবে না। কি যে হবে, মুশকিল!

সেদিনও চাঁদ উঠিল। কিন্তু তাহারা ছাদে গেল না। ললিত ঘরেই একটা বই লইয়া শুইয়া পড়িল। কল্যাণীর রান্নাঘরের কাজ সকাল করিয়াই সারা হইয়া যায়, সে-ও একটা কি সেলাই লইয়া ললিতেরই কাছে আসিয়া বসিল। কালকের মতই পাশাপাশি, কিন্তু সে আবেগ আজ আর যেন নেই। কল্যাণী দুই-একটা কথা কহিল, ললিত বই পড়িতে পড়িতেই উত্তর দিল। এম্‌নি করিয়াই অব-

শেষে এক সময়ে আহারের সময় হইল।

পরের দিনও এই ভাবে কাটিয়া গেল। সেদিন দুজনেই সহজ হইবার চেষ্টা করিল, রসিকতার প্রয়াসও চলিল—কিন্তু কোথায় যেন বারবার তাল কাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা নিজেদের মনের কাছেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, সব আর ঠিক আগের মতো অনায়াসে চলিতেছে না; জীবনের যন্ত্রে কোথায় একটা বেসুরা তার কে যোগ করিয়া দিয়াছে—

দুজনেরই রাগ হইল। একটা সহজ কথা, সহজভাবে স্বীকার করিবার উপায় নাই? সে তো কতদিনকার কথা, তাহার পর কত ঘটনা ঘটিয়া গেছে—সেকথা আজ মনেও নাই। কথা উঠিল তাই, নহিলে নিজেদেরই মনে পড়িত কি-না সন্দেহ।

অভিমান ললিতেরই বেশী, কারণ তাহার মনে সঙ্কোচ থাকিলেও সে তাহা স্বীকার করে নাই। কল্যাণীই নীচতা প্রকাশ করিয়াছে—অকারণে। তাহার এত ভালবাসার পরও এমন একটা তুচ্ছ সন্দেহ সে করিতে পারিল, আশ্চর্য!

কল্যাণীও অভিমান ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল না। নিজের দোষও বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাকেও সে ভুল বুঝিল। তাহাকে সে মনে করিল—তাহার প্রতিই অবিচার, ফলে সে-ও অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল। যেন অভিমান সব কিছু তাহারই প্রকাশ করিবার কথা—বেদনা বা অপমান বোধ করিবার কারণ ঘটিয়াছে কেবলমাত্র তাহারই!

এমনিভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিবার পর সঙ্কোচ বা অভিমান যখন মনোমালিন্যের রূপ ধরিতে চলিয়াছে, তখন সহসা একদিন সন্ধ্যার পর ললিত যেন ফাটিয়া পড়িল। কল্যাণী রান্নাঘরে তখন রান্না করিতেছে, সেইখানে আসিয়া সে উচ্চকণ্ঠে কহিল, আমার দেরাজের কাগজপত্র ঘেঁটেছিলে কেন?

কল্যাণী যেন চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে কহিল, কে বললে?

ললিত কঠিনভাবেই জবাব দিল, কে বললে সেটা তো বড় কথা নয়। কেন হাত দিয়েছিলে সেইটাই জিজ্ঞাসা করছি—

কল্যাণী কড়ায় কি একটা নাড়িতে নাড়িতে জবাব দিল, আমার একটা দরকারী চিঠি খুঁজে পাচ্ছিলুম না তাই—মনে করেছিলুম তোমার কাগজপত্রের মধ্যে থাকতে পারে।

মিছে কথা! ললিত বলিল, তুমি আমার পুরোনো চিঠির বাণ্ডিল খুলে পড়তে গিয়েছিলে—

কল্যাণী যেন আগুনের মতোই জ্বলিয়া উঠিল। ফিরিয়া বসিয়া কহিল, বেশ করেছি। কি করবে তুমি তার জন্যে, মারবে?

ললিত বলিল, মারব না। কিন্তু তুমি কত নীচ তাই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এতদিন তোমায় ভুল বুঝেছিলুম।

—আমি নীচ? কল্যাণী চেঁচাইয়া উঠিল, আর তুমি কি? তুমি আমার দাদার কাছে গিয়ে তার অ্যাল্‌বাম দেখতে চাওনি? ভেবেছ আমি কিছু জানি না, না?

সহসা একটা কড়া জবাব যেন ললিতের মুখের কাছ হইতে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া গেল। সে বার-দুই অন্য কি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলিয়া ফেলিল, বাঃ, এরই মধ্যে গোয়েন্দাগিরিও শুরু হয়ে গেছে বুঝি? বেশ, বেশ, বরং পুলিসে দরখাস্ত ক'রে দিও—ভাল চাকরি মিলবে!

সে আর দাঁড়াইল না, আবার উপরে উঠিয়া চলিয়া গেল। কল্যাণীও সেই-খানেই মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে রাত্রে দুজনের কাহারও খাওয়া হইল না।

ব্যাপারটার কদর্যতায় ললিত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সুস্থ মস্তিষ্কে যতই সে ভাবিতে লাগিল—ততই বুঝিল যে অপরাধ তাহার কম নয়, অথচ সে-ই প্রথম কল্যাণীকে গালি-গালাজ করিয়াছে। তাহার অনুতাপের সীমা রহিল না, পরের দিন নিজেই উপযাচক হইয়া কল্যাণীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বিবাদটা মিটাইয়া লইল।

ইহার পর আবার সহজ জীবনযাত্রা শুরু হইল। সহজ, কিন্তু স্বচ্ছন্দ নয় কিছুতেই যেন ঠিক আগের মতো প্রাণের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে

না, আগের মতো সহজে মেলা যায় না। কোথায় যেন আটকায়।

মাসখানেক পরে সহসা ললিত একটা ট্যুইশন্ লইল। এই কাজটায় আগে সে বন্ধুবান্ধবদের বহু অনুরোধেও রাজী হয় নাই। কল্যাণী অভিযোগ করিল, অফিসের ঐ খাটুনি—তার ওপর আবার ছেলে পড়ালে শরীর কতদিন টিকবে?

ললিত কহিল, বেশী খাটুনি হবে না,—ছেলেটা ভালো আছে। টাকাটাও কম নয়, দেখি না চেষ্টা ক'রে—

কল্যাণী কথা কহিল না। ইহা যে সন্ধ্যার নীরব অবসর অন্যত্র কাটাই-বারই উপলক্ষ্য মাত্র, তাহা বুঝিতে পারিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। কিন্তু তাহার দিন কাটাইবার উপায় কি? ছেলেমেয়ে নাই, কাজও বেশী নয়—একা এই বাড়িতে রাত্রি দশটা অবধি কিছুতেই যেন কাটে না। এক এক দিন তাহার অসহ্য বোধ হয়, বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসে—

অবশেষে একদিন রাত্রে ললিতের কাছে কথাটা না পাড়িয়া পারিল না। কহিল, আমাদের তো নীচের তলার ঘরটা কোন কাজেই আসে না, ওটার জন্যে একটা ভাল ভাড়াটে দেখ না—ছোট সংসার—শুধু স্বামী-স্ত্রী, এমন পাওয়া যায় না?

বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, তা যায়। কিন্তু এইটুকু বাড়ির মধ্যে আবার কতকগুলো অচেনা লোক এসে ঢুকলে কি এখানে বাস করতে পারবে। না না, সে বড় অশান্তি হবে—

কল্যাণী কহিল, কিন্তু একা একা আমার এই বাড়িতে কি ক'রে কাটে বলো দেখি? এমন ক'রে আমি যে আর পারি না!

ললিত বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর বোধহয় অনেকদিন পরে কল্যাণীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপিচুপি কহিল, এমন ক'রে আমিও আর পারি না। রাত অবধি বাইরে ঘোরা আমার কিছুতে সহ্য হয় না।··· আমাকে তুমি কাছে ডেকে নাও না রাণী আবার—

অশ্রু-ছলছল চোখে কল্যাণী কহিল, আমিই কি তা হ'লে তোমাকে তাড়িয়েছি?

প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া ললিত কহিল—না না, দোষ আমারও কম নয়।

কিন্তু কি তুচ্ছ কারণে হঠাৎ আমাদের সুখের বাসা ভাঙল ভেবে দেখ দিকি রাণী, কী থেকে কি হ'লো!

কল্যাণী তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া কহিল, সত্যি, কেন যে মরতে ও কথা-গুলো বলতে গিয়েছিলুম তা জানি না। ওগুলো কি একেবারে ভোলা যায় না?

নিশ্চয়ই যায়। জোর করিয়া কল্যাণীর মুখটা তুলিয়া ধরিয়া ললিত কহিল, কিন্তু তার আগে একটা কথা আজ তুমি বিশ্বাস করো রাণু, সেদিনকার সেই কথাটা আমার আগাগোড়া বানানো, ঝোঁকের মাথায় একেবারে মিছে কথা বলেছিলুম।

কল্যাণী ললিতের বুকের মধ্যেই চমকিয়া উঠিল। তাহার সজল চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সহসা কোন কথা কহিতে পারিল না। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, উঃ, একদম ফাঁকা ব্যাপার নিয়ে দুজনে কি কষ্টই পেলুম।···তুমিও যদি সেদিন আমার দাদার কাছে অ্যালবাম দেখতে না চেয়ে খোলাখুলি কথাটা জিজ্ঞাসা করতে তো জানতে পারতে যে দাদার কোন বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় পর্যন্ত ছিল না, ভালবাসা তো দূরের কথা।···কথাটা ঝোঁকের মাথায় তখনি তখনি বানানো।

ললিত জোরে হাসিয়া কল্যাণীকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিল, কল্যাণীও হাসি-অশ্রু-মাখানো মুখে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মাথা রাখিল।

এমনিভাবে গভীর রাত্রি পর্যন্ত দুজনে বসিয়া বসিয়া অনেকদিন পরে সহজভাবে অনেক গল্প করিল। তাহারা প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে তাহাদের মন হইতে সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে, আজ আবার তাহারা পরস্পরের কাছে আগেকার মতোই সহজ। কিন্তু তবু তাহারা দুজনেই মনে মনে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে, পরস্পরের এই সত্যকার সত্য ভাষণটা দু'জনের কেহই আজ ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সাপলে

ব্যাপারটা খুবই সামান্য। সর্বেশ্বর হাতী হাট করিতে গিয়া হাটের মধ্যেই মঙ্গল ভট্টাচর্যের পা মাড়াইয়া দিয়াছিল। তখনই হেঁট হইয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইলে গোলমালটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত; কিন্তু তিন-চারিজনকে ডিঙ্গাইয়া বেগুন দেখিতে সে এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, ব্যাপারটা তাহার অনুভূতির গোচরই হইল না, বেগুনওয়ালার সহিত তেমনিই তক্‌রার করিতে লাগিল।

মঙ্গল কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, সে কথা কাহারও জানা নাই; কবে যে প্রথম সে গ্রামে আসিয়া বাঁজগাঁ ও মণিপুরের মধ্যের বটগাছটার নীচে আশ্রয় লইয়াছিল সে কথাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। এমন কি, বটগাছের নীচের আশ্রয় যে কবে তাহার মনসা ও শীতলার মন্দিরে পরিণত হইল, সে কথাও অতি অল্প লোকেরই আজ মনে আছে। মা শীতলাও আছেন বটে, কিন্তু সে কেন কি জানি নিজেকে বরাবর মনসার বামুন বলিয়াই পরিচয় দিত এবং ঝাড়-ফুঁকের সময় না ডাকিলেও হাজির হইত। ক্রমে সেই পরিচয়ই তাহার বহাল হইয়া গেল—'আধ-পাগলা' ব্রাহ্মণকে সকলেই স্নেহের চোখে দেখিত এবং দুই মায়ের পূজায় ঠিকমত তাহার পেটটা চলে কি না, সেদিকেও সকলে নজর রাখিত।

অন্যদিন হইলে মঙ্গল অত লক্ষ্যই করিত না, করিলেও হয়ত বা হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিন্তু সেদিন সকাল হইতেই তাহার মেজাজটা কি কারণে চড়িয়া ছিল বলিয়া সহসা সে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। পিছন হইতে সর্বেশ্বরের কনুইটা ধরিয়া এক ঝট্‌কা মারিয়া তাহাকে সোজা করিয়া কহিল, বলি হাতীর পো, চোরাই কোকেনে না হয় দু পয়সা করেইছ, তাই বলে অতটা অহঙ্কার কি ভাল? দেবতা বামুনকে একেবারেই গ্রাহ্য কর না?

একে তাহার বেগুন ওজন হইবার সময়েই এই ব্যাঘাত, তাহার উপর চোরাই কোকেনের উল্লেখে সর্বেশ্বরও দারুণ চটিয়া গেল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে বলিল, যাও যাও ঠাকুর, সব সময়ে রসিকতা ভাল লাগে না; গাঁজার মাত্রাটা

বুঝি আজ কিছু বেশী হয়েছে ?

মঙ্গল গাঁজা সত্যই খাইত না, কিন্তু তাহার উল্লেখমাত্রেই ক্ষেপিয়া যাইত। সে কহিল, গাঁজা তো ভাল নেশা সর্বেশ্বর, স্বয়ং মহাদেব ক'রে থাকেন—কিন্তু কোকেনে শুনেছি মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না!

পুনঃপুনঃ কোকেনের উল্লেখে সর্বেশ্বরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। কহিল, দেখ ঠাকুর, মুখ সামলে কথা কয়ো! একদিন তোমার পাগলামি আমি ঘুচিয়ে দেব তা বলে রাখছি!

মঙ্গল এইবার সোজাসুজি ক্ষেপিয়া গেল; নাচিয়া কুঁদিয়া, লাফাইয়া, চেঁচাইয়া, হাটসুদ্ধ লোক জড়ো করিল। কহিল, ব্যাটা ছোট জাতের বড্ড তেল হয়েছে, না? বামুনকে লাথি মারা, বামুনকে মারব বলা?···য়্যাঁ, শুনছ তোমরা সব!···দুটো পয়সা হয়েছে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান কর? ব্রহ্মতেজে ওর এক পয়সা থাকবে?

সর্বেশ্বরও ততক্ষণে স্বরূপ ধরিয়াছে। সে হাঁকিয়া কহিল, ওরে আমার বামুন রে! উনি আবার বামুন, ওঁর আবার ব্রহ্মতেজ!···ব্যাটা রাস্তার ভিখিরী, এক বুজরুকি খাড়া ক'রে নাম নিয়েছেন মনসার বামুন!···পাগল ছাগল বলে যত ক্ষ্যামাঘেন্না করি, ততই মাথায় উঠতে চাও, না?

রাগে মঙ্গলের মুখ লাল হইয়া ক্রমে ফ্যাকাশে হইয়া গেল; সে মুহূর্ত-খানেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিল, আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাত তুলসীমঞ্চে উঠতে চাস!···আমি রাস্তার ভিখিরী? আমি বুজরুকি করছি?···সর্বনাশ হবে! মা মনসার কোপে তেরাত্তিরের মধ্যে ঝাড়ে-বংশে নির্বংশ হবি—এই আমি বলে গেলুম, হে মা মনসা, যদি সত্যের হও মা, তো দেখিয়ে দেবে!···

হাটসুদ্ধ লোক হৈ চৈ করিয়া উঠিল; একদল মঙ্গলকে মিষ্ট কথায় শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল আর একদল সর্বেশ্বরকে ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়া ক্ষমা চাহিতে উপদেশ দিল। কিন্তু সর্বেশ্বর বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া বার বার এক কথাই বলিল, মা মনসা যদি ওর কথা শুনে আমায় নির্বংশ করেনই, তো সেও আমার সইবে, কিন্তু তা বলে আমি ঐ মড়িপোড়া বামুনের পায়ে ধরতে পারব না।

এবং মঙ্গলও কারুর কথা না শুনিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া বলিয়া গেল, এর

প্রতিকার না হ'লে আর পৈতে পরব না, এই শেষ!

মুখে অতবড় কথাটা বলিয়া গেলেও, মা মনসা যে সত্যই তাহার অপমানের প্রতিকার-স্বরূপ সর্বেশ্বর হাতীকে নির্বংশ করিবেন, এ বিশ্বাস মঙ্গলের ছিল না। সে হাট হইতে শুষ্কমুখে যখন নিজের কুটীরে ফিরিয়া আসিল, তখন রাগ তাহার এক বিন্দুও আর অবশিষ্ট নাই, মনের মধ্যে শুধু নিরতিশয় আত্মগ্লানিই তাহার নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিতেছে! সে বার বার আপন মনেই বলিতে লাগিল, ইস্—শুধু সর্বনাশ হবে বললেই হত, অত বড কথাটা বলা উচিত হয় নি!

সে বহুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া তামাক পোড়াইল, তারপর রায়েদের পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়া অনেকদিন পরে যথারীতি পূজায় বসিল। মন্ত্রটা যতদূর জানা ছিল, অতি সাবধানে আবৃত্তি করিল, আরতি প্রভৃতি কিছুই বাদ গেল না এবং সর্বশেষে মা মনসার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল, মা মনসা, বামুনের মান রেখো মা, অন্তত একটা কিছু ওদের দেখিয়ে দাও—

পূজা শেষ করিয়া বাকী দিনটুকু তেমনিই সে দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া তামাক খাইল। সেদিন রান্না-খাওয়া কিছুই তাহার ভাল লাগিল না; সারাদিন নির্জনে মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শুধু এই ঘোর সমস্যার সমাধানের উপায় ভাবিতে লাগিল। সর্বেশ্বরের সত্যই সর্পাঘাত হউক—এ কামনা যেমন তাহার একতিলও ছিল না, তেমনি নিজের যে ব্রাহ্মণত্বের বড়াই সে হাটসুদ্ধ লোকের সামনে করিয়া আসিয়াছে, সে ব্রাহ্মণত্ব সকলকার কাছে চিরকালের জন্য অসার হইয়া যাইবে, একথাও সে কিছুতে ভাবিতে পারিতেছিল না। অথচ উপায় কি? সত্যযুগ হইলে সে মা মনসাকে অনুরোধ করিত যে, শুধু ভীষণ একটা অজগর গিয়া সর্বেশ্বরকে ভয় দেখাইয়া ফিরিয়া আসুক—কিন্তু এ যে কলিযুগ! কলিযুগের দেবতারা পাষাণের অপেক্ষাও জড়, তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নাই!

রাত্রে তাহার ভাল করিয়া ঘুম হইল না, সকালেও উঠিল দুশ্চিন্তা লইয়া। কোনও রকমে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া লইয়া সে হুঁকা হাতে করিয়াই গ্রামের

দিকে যাত্রা করিল এবং কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই সর্বেশ্বরদের পাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল। নিশাপতি মোদকের খাবার ও চায়ের দোকানের কাছে গিয়া নিশাপতির সহিত চোখোচোখি হইবার সময় কিন্তু তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল, বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় শুরু হইল। সে যে কোন্ সংবাদ শুনিতে চায়, সর্বেশ্বরের সর্বনাশ হইয়াছে কিম্বা সে সর্বতোভাবে কুশলে আছে, তাহা সে নিজেই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার মুখের পাংশু আভায় মনে হইল যেন আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশী এবং নিশাপতি যখন স্মিতমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া কহিল, 'চা চলবে নাকি ঠাকুর?' তখন মনে হইল যে, তাহার বুক হইতে যেন পাষাণ-ভার নামিয়া গেল। সে রসিকতা করিয়া জবাব দিল, অমৃতে আর অরুচি কার মোদকের পো? তবে মৃৎভাণ্ডে দিও; তোমার ঐ গেলাসে বহু লোকের যে অধরামৃত লেগে আছে ওতে আমার লোভ নেই।

একটা মাটির ভাঁড় ধুইতে ধুইতে মোদকের পুত্র কহিল, কাল হঠাৎ অমন চটে গেলেন ঠাকুর মশাই, কাজটা ভাল করলেন না।

মঙ্গল উষ্ণ হইয়া জবাব দিল, ভাল তো করি নি, কিন্তু সর্বেশ্বরের ব্যাভারটা দেখ দেখি।

নিশাপতি মুচকি হাসিয়া কহিল, সবই বুঝি ঠাকুর মশাই—কিন্তু অমন ভাবে পৈতে ছিঁড়ে অভিসম্পাতটা দিলেন যে, যদি কিছু ভাল-মন্দ হয়ই, তাতেও আপনার মনে ঘা লাগবে, আর যদি কিছু না হয় তাহলেই বা আপনার মর্যোদাটা কোথায় থাকবে বলুন দেখি?

যদিচ এই দুটা প্রশ্নই কাল হইতে সমান ভাবে মঙ্গলকে পীড়া দিতেছিল, তবুও বর্তমানে নিশাপতির শেষের কথাটাই তাহাতে আঘাত করিল বেশী। সে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক না দিয়াই নামাইয়া রাখিয়া কহিল, হবে না? দেবতা বামুন তাহলে কি সব মিছে কথা? দিনরাত্রি মিথ্যে?···তোরা তাহলে কিছুই বিশ্বাস করিস না বল্?

নিশাপতি ব্যস্ত হইয়া কহিল, না, না ঠাকুর, সে কথা কি আমি বলছি। আমি শুধু বলছিলুম—

মঙ্গল আরও এক পর্দা গলা চড়াইয়া কহিল, বলছিস না কি? সবই তো

বললি !...তবে এ-ও বলে রাখছি নিশাপতি, কলিতে যে এখনও বামুন আছে, চন্দ্র-সূয্যি উঠছে, তা তোরা সবাই দেখতে পাবি। নইলে আমি মা মনসার সেবা আর করব না—চাঁড়ালের বাড় চাকরী ক'রে খাব !...এখনও বাসী-মুখে জল দিই নি, এই দিব্যি ক'রে গেলুম—তোরা সাক্ষী রইলি !

বলিতে বলিতে মঙ্গল উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশাপতি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ে হাত দিয়া কহিল, অপরাধ নেবেন না ঠাকুর, চা-টা খেয়ে যান ! নইলে সমস্ত দিন মুখে আর কিছু তুলতে পারব না !

মঙ্গল তুই-একবার 'না' 'না' করিয়া বসিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে এক চুমুকে সমস্ত চা-টা পান করিয়া চলিয়া গেল। নিশাপতির সাজা বিষ্ণুপুরের তামাকের গন্ধও তাহাকে কোনমতে আর প্রলুব্ধ করিতে পারিল না।

কিন্তু সেদিন গ্রহ বিরূপ—তাই নিশাপতির দোকান ছাড়াইতে না ছাড়াইতে দক্ষিণখণ্ডের বিষ্ণু চাটুয্যের সহিত সাক্ষাৎ। বিষ্ণু চাটুয্যে এ অঞ্চলের ডাকসাইটে স্পষ্ট বক্তা ; প্রয়োজন হইলে নিজের জন্মদাতাকেও রেহাই দেয় না, এমনিই একটা বদনাম ছিল। সে মঙ্গলকে দেখামাত্র হাসিয়া কহিল, কি গো ঠাকুর, কাল নাকি হাটের মধ্যে খুব জোর যাত্রা গেয়েছো ?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু বিষ্ণুর মুখ শুকাইয়া উঠিল। কারণ মঙ্গলকে সে আধ-পাগলা ভালমানুষ বলিয়াই জানিত, অথচ এখন তাহার মুখে যে অপরিসীম ক্রোধের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা বিষ্ণুর সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে ক্রোধ যাহার মুখেই প্রকাশ পায়—মানুষ ভয় পায়। মঙ্গল বিবাদ করিল না, বাগ্‌বিতণ্ডা করিল না, শুধু রক্তচক্ষু মেলিয়া মিনিটখানেক নিঃশব্দে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হ্যাঁ—গাওনা খুব জোরই হয়েছিল বটে—কিন্তু কই, তোমায় দোয়ারকি করবার জন্য ডেকেছিলুম বলে তো মনে হচ্ছে না।

জীবনে বোধ করি এই প্রথম বিষ্ণু চাটুয্যে কথার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া গেল।...

মঙ্গল রাগের ধমকে গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া একেবারে মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাঃ—উপায় একটা করিতেই হইবে, তা সে যেমন করিয়াই হউক ! তাহার অপমানের কথা লইয়া সমস্ত গ্রামে যে হাসাহাসি চলিয়াছে,

ঐ সমস্ত হাসি-ঠাট্টা সে যদি বন্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে আর এ গ্রামে বাস করা চলিবে না। তাহার সমস্ত মান-সম্ভ্রম প্রতিপত্তি নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। দু দিন পরে সকলে তাহার মাথায় পা দিয়া চলিতে শুরু করিবে।

অথচ উপায়ই বা কি করা যায়? রৌদ্রদগ্ধ, তৃণশূন্য প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ক্রমাগত চলিতে লাগিল, কিন্তু কোনও উপায়ই চিন্তা করিতে পারিল না। তাহার অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের মধ্যে এই কথাটাই শুধু বার বার ঘুরপাক খাইতে লাগিল যে, সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতির সম্মান ও প্রতিপত্তি তাহার উপর নির্ভর করিতেছে; কোনমতে যেমন করিয়াই হউক, একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রয়োজন মতো অসাধু উপায় অবলম্বন করিলেও ক্ষতি নাই; স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব তাহা মার্জনা করিবেন।

এইভাবে চলিতে চলিতে সে কখন যে নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা খেয়াল করে নাই। ঠাণ্ডা জলটা পায়ে ঠেকিতে সে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, ইস্, এরই মধ্যে বারো ক্রোশ রাস্তা হেঁটে চলে এলুম! আবার ফিরতে হবে যে!

হেঁট হইয়া নদীর জল তুলিয়া লইয়া মুখে-চোখে মাথায় দিল—দুই আঁজলা পানও করিল। স্নান করিবার উপায়ও নাই; নদীটির একটা গালভরা নাম আছে বটে কিন্তু জলে কোথাও পায়ের গোছ ডোবে না। যাহা হউক, এমনিভাবেই খানিকটা সুস্থ হইয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় দূরে দৃষ্টি পড়িয়া সে নিমেষে পাথর হইয়া গেল।

একটি বেদে শ্রেণীর লোক, হাত-প্রমাণ দুইটি কঞ্চির লাঠি লইয়া জলের ধারে ধারে উপুড় হইয়া কি খুঁজিতেছে।

এ সরঞ্জাম সে চিনিত। এই উপায়ে এখানে বেদেরা সাপ ধরে। সাপের গর্ত খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোনমতে সাপের মাথাটা ঐ দুটি কঞ্চির সাহায্যে চাপিয়া ধরে। তাহার পর অতর্কিত আক্রমণে ক্রুদ্ধ সর্প লেজ দিয়া তাহার হাতটা নিজে হইতেই জড়াইতে থাকে, তখন তাহাকে অনায়াসে লইয়া আসিয়া হাঁড়ির মধ্যে পোরা যায়। এই সময়টা বহু লোক এই অঞ্চল হইতে সাপ ধরিয়া কলিকাতার হাসপাতালে চালান দেয়, কেহ বা আমেরিকাতে পাঠাইবার

ব্যবস্থা করে।

এ সবই মঙ্গলের জানা ছিল। মুহূর্তকতক সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়াই অকস্মাৎ সে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, অস্ফুটস্বরে মনে মনে বলিল, হে মা মনসা, মুখ তুলে কি চাইলে মা?

তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতে লাগিল, তখন তাহার পরিপূর্ণ উন্মাদ অবস্থা। সে ছুটিয়া গিয়া বেদেটাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, এই, আমাকে একটা কেউটে সাপ দিতে পারিস?

বেদেটা বোধ করি কোনও গর্তে সাপের সন্ধান পাইয়াছিল, সে এই উৎপাতে বিরক্ত হইয়া কহিল, কেন ঝামেলা করিস, মিছিমিছি? সাপ চাইছিস সাপের দাম দিতে পারবি?

মঙ্গল তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, নগদ এক টাকা দেব, দেখ্, চাস তো আগাম দেব—

সুখন তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; বোধ করি মঙ্গলের পাগলের মতো মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া তাহার একটু ভয়ও হইল; সে কহিল, শেষকালে যদি কোন হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুত বাধে? না, সে আমি পারব না।

মঙ্গল সহসা চাদরের নীচে হাতটা ঢুকাইয়া কহিল, এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি, কেউ তোর নাম জানতে পারবে না; কাউকে বলব না আমি, আর যদি না দিস তাহলে এখনই পৈতে ছিঁড়ে শাপ দেব, তা বলে দিচ্ছি—

সুখন উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া কহিল, তবে দে টাকা, সাপ কাল পাবি।

মঙ্গল কোন কথা না বলিয়া কোমর হইতে টাকার গেঁজেটা বাহির করিল।

সর্বেশ্বর শয়নের পূর্বে ডিবেটা ধরিয়া বিছানাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। এমনিই সে একটু ভীতু লোক, বাড়ির দ্বার নিজে হাতে বন্ধ করিয়াও একবার আলো হাতে করিয়া দেখিয়া আসে, তাহার উপর এ কয়দিন তো তাহার আতঙ্কের সীমা নাই। মুখে যতই সে বড়াই করুক, গত হাটের দিন হইতে তাহার মনে একেবারেই শান্তি ছিল না। অভিসম্পাতের কথাটা মনে

হইলেই সর্ব শরীর তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। ব্যাপারটা যদি হাটে অতগুলি লোকের মধ্যে না ঘটিত, তাহা হইলে সে কখন গিয়া মঙ্গলের পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিয়া আসিত; কিন্তু অত লোক জানাজানির পর আর কোনও উপায়েই সেখানে মাথা হেঁট করিয়া যাওয়া চলে না। যাহা হইবার হউক।

যাক—আজই অভিশাপের তৃতীয় রাত্রি। আজিকার রাতটা যদি কোনও রকমে কাটাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে সকালেই সে মঙ্গলের থোঁতা মুখখানি ভোঁতা করিয়া দিয়া আসিবে। বামনাকে যদি অপমানের চোটে গ্রামছাড়া করিতে না পারে তো অর্জুন হাতীর ঔরসে তাহার জন্মই নয়।

সর্বেশ্বর স্থির করিয়াছিল যে, আজ রাত্রিতে সে কিছুতেই ঘুমাইবে না। বড় ছেলেটা তাহার মামার বাড়িতে, ছোট ছেলেটা আর মেয়েটাকে সে নিজের কাছে লইয়াই শুইয়াছে, মাঝে মাঝে উঠিয়া দেখিতে হইবে বলিয়া আলোটাও ঘরের মধ্যেই জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।

রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সর্বেশ্বর চোখ মেলিয়াই শুইয়া ছিল, কিন্তু তাহার পরেই চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল; প্রাণপণে ঘুমের সঙ্গে লড়াই করিয়াও রায়েদের ঘড়িতে একটা বাজিবার পূর্বেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাই কখন যে মঙ্গল অন্ধকারে প্রেত-মূর্তির মতো জানালার ধারে আসিয়া সুখনের দেওয়া বাঁশের চোঙ্গাটা খুলিয়া ধরিল, তাহা সে বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিল না।

এমন কি, ক্রুদ্ধ সর্পরাজের দংশনটাও আধো-তন্দ্রার মধ্যে সর্বেশ্বর ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিল না। শুধু যখন খুকী চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাবা, আমার পায়ের ওপর দিয়ে কী একটা চলে গেল', তখন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল বিষধর কেউটে সাপটা একটা ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ করিতেছে এবং তাহার পায়ের একটা সামান্য ক্ষত হইতে দুইটি ফোঁটা মাত্র রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।

তাহার পর চেঁচামেচি, গণ্ডগোল। পাড়ার লোক আসিয়া জড়ো হইল। কেহ দড়ি দিয়া সর্বেশ্বরের পা বাঁধিতে বসিল, কেহ রোজা আনিতে দৌড়িল। ভয়েই হউক আর বিষেই হউক, সর্বেশ্বর তখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মিনিট পনেরো পরে সে-ই প্রথম মনে করিল, খোকা? খোকাকে কেউ দেখেছ?

একসঙ্গে তিন-চারিজন আলো হাতে করিয়া তখনই ঘরে ঢুকিল। কিন্তু দুই বছরের শিশুর মৃতদেহ তখন নীল হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত দেহ ইতিমধ্যেই আড়ষ্ট, কাঠ হইয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব সর্বেশ্বরেরও পূর্বে তাহাকে কামড়াইয়াছে—

তাহাদের আর্তনাদেই সর্বেশ্বর যে চোখ বুজিল, সে চোখ আর ইহ-জীবনে খুলিল না। ওঝা যখন আসিয়া পৌঁছল, তখন পাড়ার লোকেরা বাঁশ এবং দড়ি সংগ্রহে ব্যস্ত। সর্বেশ্বরের স্ত্রী পিত্রালয়ে, ভগ্নী শ্বশুরবাড়িতে, শুধু বুড়ী মা মাথা কুটিতেছে এবং তখনও চেঁচাইতেছে, ওগো তোমরা কেউ মঙ্গলকে পায়ে ধরে ডেকে নিয়ে এস, তার মুখে বেম্মা আছেন, সে এখনও বাঁচয়ে দিতে পারে।

পাড়ার লোকেরা যে কেহ সে চেষ্টা করে নাই, এমন নহে। কিন্তু কোথায় মঙ্গল? বাড়ি, আড্ডা, যেখানে যেখানে তাহার থাকিবার সম্ভাবনা আছে, সব স্থানগুলিই খুঁজিয়া আসা হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গলের দেখা মেলে নাই!

জানলা দিয়া বাঁশের চোঙ্গাটা গলাইয়া দিয়া সাপটাকে ছাড়িবার সময় সাপটা হিস্ হিস্ করিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলের মনে হইতে লাগিল যে, সেই ভয়ঙ্কর বিষধরটা তাহার দক্ষিণে বামে, সামনে পিছনে, সর্বত্র হিস্ হিস্ করিয়া বেড়াইতেছে। সে নিঃশব্দে বাঁশের চোঙ্গাটা আশশেওড়ার জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মাঠের মধ্য দিয়া ছুটিতে লাগিল; গ্রাম পিছনে ফেলিয়া সমস্ত ডাঙ্গাটা পার হইয়া রেল লাইন পর্যন্ত পৌঁছিল যখন, তখনও যেন সেই গর্জনের বিরাম নাই। বোধ হইল যেন বহুকাল পর্যন্ত, হয়ত বা চিরকালই, তাহার কানে ঐ গর্জন ছাড়া অন্য কোনও শব্দ পৌঁছিবে না। সে প্রথমটা কোনও কিছু ভাবিতেও পারে নাই, ঐ শব্দটা কাল্পনিক, কিংবা সত্য—তাহাও বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই, শুধু প্রাণভয়ে, একটা একান্ত আতঙ্কেই সে দৌড়িয়াছিল; রেল লাইনেও এখন যে সে বসিয়া পড়িল সে নিতান্ত শারীরিক ক্লান্তিতেই, নচেৎ আতঙ্ক তাহার এখনও কমে নাই।

কিন্তু ঠাণ্ডায় কিছুক্ষণ বসিবার পরই তাহার গোড়ার আতঙ্ক-বিহ্বল ভাবটা

কাটিয়া গেল, অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া সে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনাটা মনের মধ্যে ধারণা করিবার চেষ্টা করিল।

এ কি করিল সে?

নরহত্যা করিয়া বসিল!

নিজের সামান্য মুখের কথা, যাহা সহসা রাগের ধমকে বাহির হইয়াছিল, তাহাই মিথ্যা হইয়া যাইবার ভয়ে সে একটা সুস্থ লোককে ভয়াবহ মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিল? একটা কি না, তাহাই বা কে জানে? হয়ত সর্বেশ্বর ছেলেপুলে লইয়া শুইয়া ছিল। কী ক্ষতি হইত তাহার—কথাটা যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হইত? না হয় এ গ্রাম ছাড়িয়া সে চলিয়াই যাইত; চিরকাল তো এ গ্রামে তাহার কাটে নাই, আরও কিছুকাল অন্যত্র কাটিলেই বা তাহার কি অসুবিধা হইত?...

সে চোখ বুজিয়া মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল সেই ক্রুদ্ধ সরীসৃপটার হিমশীতল স্পর্শ ও কুটিল গতির কথা। না-জানি তাহার বিষে কী উগ্র জ্বালা, তাহার দংশনের পর সারা দেহে না-জানি কী অব্যক্ত যন্ত্রণাই হইতে থাকে।

পাশে কী একটা নড়িয়া উঠিতেই মঙ্গল চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সেটা আর যাহাই হউক সাপ নয়—ছোট কি একটা জানোয়ার। কিন্তু মঙ্গলের মনে হইল সেই হিস্ হিস্ শব্দ নিকটেই কোথাও হইতেছে, বিষধরটা এইখানেই বেড়াইতেছে। সে চোখ বুজিয়া মনে মনে মনসার ধ্যান করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অন্য দিনকার মতো প্রসন্ন মাতৃমূর্তি সে কিছুতেই মনে আনিতে পারিল না; ক্রুদ্ধা নাগিনীর মুখের সঙ্গে মায়ের মুখ মিলিয়া গিয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন অস্থির করিয়া তুলিল, সে তাড়াতাড়ি চোখ খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তখনও উষার বিলম্ব ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্বাকাশ যেন একটু পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া সে জোর করিয়া একবার মনে বল আনিল। পূর্বাপর সমস্ত অপমানগুলির কথা ভাবিয়া মনে করিল, এমন কি আর অন্যায় করিয়াছি? ছোট জাত সে, একবার হেঁট হইয়া পায়ে হাত দিলেই তো সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইত; সে ব্রাহ্মণ হইয়া কি যাইবে সর্বেশ্বরের কাছে পায়ে ধরিতে? মনকে সে প্রবোধ দিল যে, এ নিতান্ত মা মনসারই ইচ্ছা, সে উপলক্ষ মাত্র, তাঁহার প্রতিশোধ তিনিই লইয়াছেন।

মঙ্গল আবার গ্রামের পথ ধরিল। তাহার মন শেষের কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে একটু সুস্থ হইয়াছে ; সুতরাং ফলাফল জানিবার জন্য কৌতূহলও একটু জাগিয়াছে। হয়ত বা মনের কোণে একটু ক্ষীণ আশাও ছিল যে, সাপটা শেষ পর্যন্ত কাহাকেও না কামড়াইয়া কোথাও পলাইয়া গিয়া থাকিতে পারে, মিছামিছিই সে নিজেকে দোষ দিতেছে হয়ত।

কিন্তু গ্রামের প্রান্তে গিয়াই তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিল। বাসুদেব গোয়ালার খামার-বাড়ির কাছ হইতেই দূরে কান্নার অস্ফুটধ্বনি শোনা যাইতেছিল। শব্দটা যে ঠিক কোন্‌দিক হইতে আসিতেছে সে বিষয়ে মঙ্গলের সংশয়-মাত্র রহিল না। কিছুক্ষণ পাথরের মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে নিঃশব্দে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কী জন্য যাইতেছে, আরও কী শুনিবার বা জানিবার আশা আছে, সে কথা ভাবিবার মতো মঙ্গলের মনের অবস্থা ছিল না, শুধু কী একটা দুর্নিবার শক্তি তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল সর্বেশ্বর হাতীর বাড়ির দিকে।

তখন গ্রামের কোনও কোনও লোক ঐ দিক হইতে ফিরিতেছে। দুই-একজন মঙ্গলের কাছ দিয়াই চলিয়া গেল, কিন্তু মঙ্গল তখন চোরের মতো অন্ধকারের আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে দেখা গেল না। ঘোষাল মহাশয়ের কণ্ঠটা মঙ্গলের বিশেষ পরিচিত, তাঁহার কথাগুলি স্পষ্ট তাহার কানে পৌঁছিল, যাই বল আর তাই বল বাপু, মঙ্গল পাগলই হোক আর যাই হোক—ব্রাহ্মণ বটে! মুখ দিয়ে যা বার করলে, তাই হ'ল। কলিতে ব্রাহ্মণ নেই তোমরা বল, আর তোমরাই বা কেন—নিজেরাও তো তাই বলি, কিন্তু এ কী, মনে করলে গায়ে কাঁটা দেয় যে!

সঙ্গে ছিল রতন মল্লিক, সে-ই জবাব দিল, মা মনসার পূজো না ক'রে মুখে জল দেয় না, তার মানটা মা মনসা রাখবেন না? ঠাকুর দেবতা কি সব মিছে কথা ঘোষাল মশাই?...

মঙ্গল আরও দুই পা অগ্রসর হইল। এবার ক্রমশ কান্নার শব্দটা স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে ; সর্বেশ্বরের মা তখনও আছাড় খাইতেছে, তাহার মাথা-কোটার শব্দটা পর্যন্ত মঙ্গলের কানে গেল।

—হেই বাবা, তোদের পায়ে পড়ি, আমায় কেউ মঙ্গলের কাছে নিয়ে চল্

—সে এখনও বাঁচিয়ে দিতে পারে ; আমি তার পায়ে মাথা খুঁড়ব, তবু কি তার দয়া হবে না ? অন্তত ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিক সে—আহা, দুধের বাছা, ওর অপরাধ কি ?

মঙ্গল আর শুনিতে পারিল না, দুই হাতে কান ঢাকিয়া সে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। প্রাণপণে—যেন তাহার পিছনে সাক্ষাৎ কৃতান্ত তাড়া করিয়াছেন. এমনি জোরে—একেবারে নিজের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার প্রদীপটা তখনও জ্বলিতেছে, তাহারই ম্লান আলোকে সে মা মনসার সিন্দুরচর্চিত প্রস্তর মূর্তির দিকে চাহিয়া রহিল ; অন্যদিন। যাহা শুধুই পাথর বলিয়া বোধ হয়. আজ মনে হইল তাহাতে দিব্য মুখ-চোখ আঁকা রহিয়াছে এবং সে দৃষ্টি—ক্রুদ্ধ, ক্রুর !

সে চোখ বুজিয়া আর একবার সমস্ত কথাটা মনের মধ্যে শান্তভাবে ভাবিবার চেষ্টা করিল ; হিংস্র সরীসৃপের সর্পিল নিঃশব্দ গতি ও সেই হিস্ হিস্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

শুধু সর্বেশ্বর নয়, তাহার নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশুপুত্র পর্যন্ত মঙ্গলের ভয়ঙ্কর কুটিল ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।...

আর একবার মাত্র চোখ মেলিয়া মঙ্গল মায়ের মূর্তির দিকে চাহিল, দেখিল সে দৃষ্টি তখনও তেমনি অপ্রসন্ন। তাহার পরই পাগলের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রাণপণে ছুট দিল। ক্রমশ সেই প্রথম উষার অস্পষ্ট আলোকে কোথায় যেন মিলাইয়া গেল—

তিন চার দিন পরে সুখন বেদেই গ্রামে আসিয়া প্রথম সংবাদটা দিল, নির্জন নদীর ধারে এক গাছের ডালে নিজেরই পরিধেয় বস্ত্র গলায় দিয়া মঙ্গল ঝুলিতেছে। তাহার দেহ নাকি ইতিমধ্যেই পচিতে শুরু করিয়াছে।

অব্যক্ত

ভোরবেলা আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চারিদিকে পাহাড়ের সারি আকাশের বুকে গিয়া মিশিয়াছে, তাহাদের গায়ের উপর যেন ধোঁয়ার মতো মেঘগুলি জমিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে ঝাপ্‌সা, মেঘলা করিয়া তুলিয়াছে। ভারি মিষ্ট ঝির্‌ঝিরে হাওয়া, মনকে যেন অকারণে পুলকিত করিয়া তোলে।

চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে এই প্রথম সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে পা দিল। কলিকাতার গরম, কলিকাতার ধোঁয়া, কলিকাতার কোলাহল, ঐ সব আবেষ্টনীর মধ্যেই এতকাল কাটিয়াছে; স্কুল, কলেজ, আফিস, বাড়ি—সবই ঐটুকু সীমা-রেখার মধ্যে। কত আনন্দ, কত শোক, জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির পিছনে চিরকালের মতো সেই একই পৃষ্ঠপট রহিয়াছে—কলিকাতা। আজ এই চল্লিশ বছর পরে সে প্রথম তাহার চিরকালের অভ্যস্ত পৃষ্ঠপটকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাই সমস্ত ব্যাপারটা যেন তাহার কাছে বিরাট বিস্ময়, অসীম কৌতূহল, প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা।

স্নান সারিয়া সে বাংলোর বারান্দায় আসিয়া বসিল। নির্জন, ভারি নির্জন। যেন পরম শান্তি, পরম বিশ্রামের মতো সেই গভীর নির্জনতা তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আজ আর অফিস যাওয়ার তাড়া নাই, কিম্বা ছুটির দিনে তাস খেলিবার ডাক নাই, সে-সব সে পিছনে রাখিয়া আসিয়াছে; আজ তাহার নূতন জীবন আরম্ভ হইল—

দূর পাহাড়ের দিকে চাহিয়া নিজের জীবনের একান্ত গতানুগতিকতার কথা ভাবিতে লাগিল। কোথাও কোন বৈচিত্র্য নাই, সব যথানিয়মে চলিয়া আসিয়াছে। পাঁচজন ছেলের সহিত বাড়িয়াছে, খেলিয়াছে, স্কুলে গিয়াছে; স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিয়াছে। তখনকার দিনে যেটাকে অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছিল, আজ তাহাই নিতান্ত একাকার বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার পর কলেজ ছাড়িয়াছে, বিবাহ হইয়াছে—বাবারই অফিসে চাক্‌রীতে ঢুকিয়াছে; ইহাতেও সেই গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম হয় নাই—বাবা মারা গিয়াছেন, মা

মারা গিয়াছেন, তাহার নিজের ছেলেমেয়ে হইয়াছে—তাহারা একটু একটু করিয়া বড় হইয়াছে, কিন্তু এই সমস্তর চারিপাশে সেই একটিমাত্র আবহাওয়া। চিরপরিচিত সেই কলতলা এবং সেই সংকীর্ণ বারান্দা—নীল আকাশের প্রসারতাকে বাধা দিয়া পুবে বোসেদের বাড়ি এবং দক্ষিণে মুখুয্যেদের ; সবই সেই এক, পরিবর্তনহীন !

আজ ছুটি মিলিয়াছে। বুক দুর্বল, দেহে রক্ত কম, ডাক্তারেরা বলিয়াছেন চেঞ্জে না গেলে চলিবে না। তাই জোর করিয়া চিরপরিচিত, চিরাভ্যস্ত সংসারকে পিছনে রাখিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, নূতনত্বের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে।

এখানে তাহার মাসতুতো ভাই আছে—রেলের ওভারসিয়ার। বিবাহ করে নাই, বাংলো খালিই পড়িয়া থাকে। যাক্—আশ্রয় মিলিয়াছে ভালই।

সমস্ত রাত্রি সে গাড়িতে বসিয়া ছিল, বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু তাহার জন্য আজ কিছুমাত্র তন্দ্রালুতা নাই। এই একেবারে নূতন পারিপার্শ্বিকের অত্যাশ্চর্য অভিনবতা চোখ হইতে নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে।

ইন্দিরা বলিয়া দিয়াছে, 'পৌঁছেই চিঠি দিও। কখনও বাইরে যাও নি—কি বিপদে পড়বে, কে জানে !'

বেচারী ইন্দু ! সংসারের নাগপাশ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া আনা গেল না। খরচ বেশি—অসুবিধাও ঢের।···ছোট্ট টিপয়খানি টানিয়া লইয়া কাগজ-কলম গুছাইয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল।

সহসা তাহার মনে হইল—এই তাহার প্রিয়া-সকাশে দ্বিতীয় চিঠি !

শ্বশুরবাড়ি তাহার কলিকাতাতেই—চিঠি লিখিবার প্রয়োজন বেশী হয় নাই। তা ছাড়া ইন্দু তাহার কাছ-ছাড়াও বড় একটা হয় নাই। তবু, প্রথম-যৌবনে প্রেমপত্র লিখিবার মোহে, কি একটা চিঠি সে লিখিয়াছিল, আবোল-তাবোল, যা-তা—সে কথা আজ মনেও নাই। তার পর একেবারে এই চিঠি—

কি বলিয়া সম্বোধন করিবে কে জানে ! 'প্রিয়তমাসু' লিখিবে ?···চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ইন্দিরার পঁয়ত্রিশ বছরের গৃহিণী-মূর্তি, বড় যেন লজ্জাবোধ করিতে লাগিল। না, 'প্রিয়তমাসু' আর লেখা যায় না। তাহার চেয়ে

'কল্যাণীয়াসু' বরং চলে। স্ত্রী সকল অবস্থাতেই কল্যাণীয়া—

সে 'কল্যাণীয়াসু' দিয়াই পত্র শুরু করিল।

লিখিল,—

'কল্যাণীয়াসু—

আমি নির্বিবাদে ও নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। গাড়িতে বিশেষ ভিড় ছিল না, কিন্তু আমি মোটেই ঘুমাইতে পারি নাই। সমস্ত ব্যাপারটা এমন আশ্চর্য ঠেকিতেছিল আমার কাছে যে, অবাক হইয়া চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। তা ছাড়া তোমার ও ছেলেমেয়েদের কথা মনে হইয়া বড়ই খারাপ লাগিতেছিল।

এখানে জায়গাটি ভালই, চারিদিকে পাহাড় এবং খুব নির্জন। দাদার বাংলোটিও একেবারে নদীর গায়ে। দাদা তো প্রায় সব সময় লাইনেই থাকেন—তার চাকরগুলি খুব ভদ্র, অত্যন্ত যত্ন করিতেছে। মোটের উপর আমার শারীরিক আরামের জন্য কোনও ভয় নাই। আমার জন্য ভাবিও না।'

এই পর্যন্ত লিখিয়া সে কলম থামাইল। আর কি লেখা যায়?···অনেক ভাবিয়াও বিশেষ কিছু মাথায় আসিল না। তখন সে শুরু করিল—

'তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে এবং তুমি প্রায়ই চিঠি লিখিবে। ছোট খুকীকে সাবধানে রাখিও, যেন বেশী ঠাণ্ডা না লাগে। গোকুলকে নিয়মিত পড়াশুনা করিতে বলিও। সতীশের ছেলেমেয়েরা, মেজবৌমা সব কে কেমন থাকে জানাইও। তোমার নিজের শরীর খুব সাবধান, বেশী অত্যাচার, অনিয়ম করিও না। কারণ এখন তুমি পড়িলে আর কে কাহাকে দেখিবে? ছেলেমেয়ে ও বাটীস্থ সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইও—'·

এই পর্যন্ত লিখিয়া সহসা সে যেন নিজে-নিজেই অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। এইবার ইন্দিরার সম্বন্ধে কি লেখা উচিত? সে কলম হাতে করিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—

মনে পড়িতে লাগিল বিবাহের সময়ের কথা। লজ্জাজড়িতা, নতমুখী বধূ ইন্দিরার কথা, তাহাদের প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ। তাহার পর একটু একটু করিয়া চারিপাশের গতানুগতিকতার মধ্যে সে কেমন ভাবে মিশিয়া গেল। সে তাহার পরামর্শদাত্রী, সে তাহার গৃহিণী, তবুও সে সেই চিরাভ্যস্ত সংসারেরই একটা অঙ্গ। ঘনিষ্ঠতা যত বাড়িয়া উঠিয়াছে, যত সে হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে

আসিয়াছে, ততই যেন তাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু ভাবিবার সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছে ; সে আছে, সে অপরিহার্য, কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

কিন্তু আজ সেই সংসার হইতে দূরে আসিয়া তাহারই কথা ভাবিতে মনটা যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল। আজ সহসা মনে হইল—সে ইন্দিরাকে ভালবাসে এবং সে কথাটা সে তাহাকে জানাইতে চায়। সে লিখিতে চায়—'এবং তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিও।' সমস্ত বুককে নাড়া দিয়া যেন মনে হইল, হাঁ, ইহাই সে চায়, বুক ভরিয়া বলিতে চায়, আমি তোমাকে ভালবাসি।

কিন্তু ছিঃ! তাহার কানের ডগা পর্যন্ত যেন লাল হইয়া উঠিল। দিনে-দিনে তিলে-তিলে তাহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে আজ আর তাহাকে প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণের মতো 'তোমায় ভালবাসি' এ কথা লেখা যায় না। সংসারের সুখে দুঃখে, নিভৃত পরামর্শে যে একান্ত আপন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সে আজ কেমন করিয়া শুষ্ক কালির অক্ষরে লিখিবে 'তুমি আমার ভালবাসা জানিও!'…সে বড় লজ্জার কথা! আর এই চল্লিশ বছর বয়সে? ছিঃ!

সহসা যেন তাহার মনে হইল তাহার সত্তা তাহার দেহ হইতে পৃথক হইয়া বাহিরে বসিয়া তাহার এই চিঠি-লেখার বিড়ম্বনা লক্ষ্য করিতেছে। এ কথার কোনোই মানে নেই, অর্থহীন, তবুও যেন সেই রকম কি একটা মনে হইতেছে। মনে হইতেছে যেন সে বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছে—তাহাকেই!

সে জোর করিয়া কলম দোয়াতে ডুবাইল, লিখিল—'এবং তুমি আমার—'

কিন্তু তার পর? কথাটার যে মীমাংসাই হয় নাই এখনও।

কি লিখিবে? 'আশীর্বাদ জানিও',—শুধু আশীর্বাদ?

মনের মধ্যে আজ এই ভালবাসার আলোড়ন যেন তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল—সে ভাবিবার চেষ্টা করিল ইন্দিরার গৃহিণী-মূর্তি, তাহার পঁয়ত্রিশ বছরের আঁটসাঁট দেহ। তাহার মধ্যে আর কোনও স্বপ্নের ঠাঁই আছে কি? সেই বকাবকি, ছেলেমেয়েদের শাসন, চাকরদের সঙ্গে বাজারের হিসাব বোঝা, রান্নাঘরের ভীষণ তাপের মধ্যে ছোট জায়ের সঙ্গে রাঁধিতে বসা—

ইহার কাছে ভালবাসা নিবেদন, সে তো বৃথা! সে হয়ত বুঝিবে ইহা শুধুই

চিঠি লেখার বাঁধা গৎ, ইহাই নিয়ম। চিঠির শেষের দিকটা সে হয়ত মনোযোগ দিয়া পড়িবেই না, একবার চোখ বুলাইয়া মেয়ের হাতে দিয়া বলিবে—'আমার বালিশের নিচে রেখে আয়, আর বাজার বেলায় তোর কাকাকে একখানা পোস্ট-কার্ড আনতে বলিস। জবাব দিতে হবে।'

এ ভালবাসা জানানোর মধ্যে যে বিশেষ কিছু আছে, সে একবারও সে-কথা ভাবিবে না, ভাবা সম্ভবও নয়। আঠারো বছরের জীবনযাত্রাকে পিছনে ফেলিয়া আজ সে নূতন করিয়া প্রেম নিবেদন করিতে চায়, এ কথা কেমন করিয়া ভাবিবে ইন্দু?

না—। সে আবার দোয়াতে কলম ডুবাইল। কিন্তু শুধুই আশীর্বাদ—শুষ্ক আশীর্বাদ মাত্র?…

সে আরও মিনিটখানেক ভাবিয়া লিখিল, 'এবং তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও।'

দূর পাহাড়ের চূড়া ছাড়াইয়া সূর্যদেব তখন মধ্য গগনে আসিয়াছেন। পাহাড়ের উপরকার মেঘলা আবরণ ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহার কঠিন বন্ধুর দেহ এখন চক্ষুর সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্মরণীয়

সেদিনটি স্মরণীয় বৈকি। ইতিহাসে—অন্তত ওর ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার মতো দিন।

সেদিন চারিদিক থেকে এসেছিল অভিনন্দন, এসেছিল আনন্দোচ্ছ্বাস—তার চেয়েও বড় কথা, বহু বান্ধবী-আত্মীয়ার চোখে দেখেছিল কুটিল ঈর্ষার প্রকাশ। সেদিনটা ওর জীবনে চরম বিজয়-গর্বের দিন সন্দেহ নেই।

কত কী বলেছিল ওকে।

সেদিনের সে উন্মত্ত আনন্দের ঘূর্ণাবর্তে কত কী উড়ে এসে পড়েছিল—রোমের কার্নিভালে দেখা সেই অনন্ত কাগজের ফিতের মতো—চারিদিক থেকে, অজস্র।

বন্ধুদের কেউ বলেছিল, 'তুই-ই এ যুগের উমা। সেই ট্র্যাডিশনকে আবার রিভাইভ্ করলি!'

কেউ বলেছিল, 'সাক্ষাৎ পার্বতী। সত্যি—তোরই তপস্যা সার্থক!'

কেউ বা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল, 'নামটা পালটে নে নীলা। ও নাম তোকে মানায় না। তোর নাম অর্পণা রাখাই উচিত। সেই পর্ণহীন উপবাসের কাহিনী যে সত্য—তা তোকে দেখেই বুঝছি।'

হ্যা—আজ আর আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে লাভ নেই—গর্ব একটু হয়েছিল তার।

আর গর্ব হবারই তো কথা। চারিদিক থেকে এই যে স্তুতি ও ঈর্ষার ঝড় বয়ে গিয়েছিল তাকে কেন্দ্র ক'রে—তার মধ্যে বড় সাফল্য একটা কিছু নিশ্চয়ই ছিল। একটা বড় রকমের কৃতিত্ব, বড় একটা বিজয়ের ইতিহাস।

শিবের ব্রত নষ্ট করেছে সে। যোগীশ্বরের ধ্যান ভেঙেছে।

চির-উদাসীন চির-নিস্পৃহ বৈরাগী ভোলা মহেশ্বর আজ গৃহবাসী হয়েছে—সে তো তারই জন্যে। তারই কৃতিত্বে।

শেষাদ্রি ঘোষাল মনসিজের আয়ত্তের বাইরে, যেহেতু মন বলে বস্তুটি তাঁর নেই, এই কথাই সকলে জানত।

সেই শেষাদ্রি ঘোষাল পরাজিত হলেন তার কাছে—একটা সাধারণ সামান্য মেয়ের কাছে—এ কি কম কথা!

এই একটি দিনের বিজয়গর্বের বিনিময়ে বাকী সমস্ত পরমায়ু দিতেও প্রস্তুত ছিল সে। সমস্ত প্রাণ পণ ক'রেই তো এ তপস্যায় নামা তার।

কিন্তু বিধাতা যে তার প্রাণ নিয়েই এ তপস্যা সার্থক করবেন—এ-হেন সিদ্ধি দেবেন তাকে—তা কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল? জয় হ'ল তার ঠিকই—কিন্তু এর আনন্দ যে ভোগ করবে সে কোথায়?

শেষাদ্রি ঘোষাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক।

কিন্তু সেইটাই তো তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়!

তিনি সত্যকারের পণ্ডিত, জ্ঞানতপস্বী। লেখাপড়াই তাঁর জগৎ, ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর প্রাণ—তার বাইরে আর কিছু আছে বলে তিনি জানেন না। তাঁর

এক-একটি ছাত্রের কৃতিত্বই তাঁর জীবনের এক-একটি সার্থকতা। তাঁর ঐ আপার সার্কুলার রোডের অত বড় বাড়িটা এককালে হা-হা করত—তাঁর বাবা মা মারা যাবার পর। কিন্তু আজ সেখানে বোধ করি একটি ফুলদানীও রাখার স্থান নেই। সদরের চলন থেকে শুরু ক'রে ওপরের চিলেকোঠা পর্যন্ত ভরে গেছে বই আর পুঁথিতে। আলমারী, র‍্যাক, তক্তপোশ, খাট, টেবিল যেখানে যা ছিল, সব বইতে ভরে গেছে। যেসব আসবাব বই-বহন করার মতো নয়, তা নির্মম ভাবে বিদায় দিয়েছেন তিনি—বইয়ের র‍্যাক কিংবা আলমারীর স্থান করবার জন্যে

সেকালের বাড়ি, প্রতি তলায় বাথরুম ও পাইখানা ছিল। তার মধ্যে দোতালাটি মাত্র রেখে বাকী দুপ্রস্থই ঘর ক'রে ফেলেছেন—এবং সে ঘরে এখন বই থাকে। রান্না ভাঁড়ার দুটি ঘর এখন ছাত্রদের গবেষণা করার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে—কারণ সেই ঘরেই যত দুষ্প্রাপ্য বই থাকে—সেখানে একটা ক'রে টেবিলও পাতা আছে, তার সঙ্গে দু'খানা ক'রে টুল।

এই হলেন শেষাদ্রি ঘোষাল।

সুপুরুষ—হ্যাঁ, একদা সুপুরুষই ছিলেন হয়ত, আজও একেবারে সে কান্তি বিনষ্ট হয় নি, কিন্তু তিনি নিজে সে বিষয়ে সচেতন নন। কখন যৌবন এল, কতদিন ছিল, কবে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করলেন—তা বোধ করি কোনদিন ভেবেও দেখেন নি। আজ তাঁর সব চুলই প্রায় পেকে এসেছে—হয়ত একটু অকালেই পেকেছে, কিন্তু তাঁরই ভ্রমরকৃষ্ণ বিপুল অবিন্যস্ত চুল যে এককালে তরুণ-তরুণীরা হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখত তা তিনি আজও জানেন না। এমন কি, কোন কালে সে চুল কালো ছিল কিনা তা আজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বিব্রত হয়ে পুরনো পুঁথির পাতা ওল্টাতে বসবেন, অর্থাৎ তাতে কিছু লেখা আছে কিনা সে বিষয়ে।

যিনি নিজের চেহারা সম্বন্ধে সচেতন নন—তাঁর কাছে বাহ্যিক আর-কোন বিষয়ের সচেতনতা আশা করাই অন্যায়। বিবাহ তিনি করেন নি—জ্ঞানচর্চায় ব্যাঘাত ঘটবে বলে। বাপ-মায়ের এক ছেলে তিনি—অবশ্য একমাত্র সন্তান নন। একটি বোন ছিল, তার ছেলেমেয়েরা আজও আছে। তারা আসেও কখনো সখনো, এলে তিনি যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে যান এই দেখা,

ছু'ঘণ্টার মধ্যেই আবার দেখা হ'লে আকাশ থেকে পড়েন, 'আরে সুনীল যে, কখন এলি ?' কিংবা 'বুড়ুয়া, কখন এলে মা ?' ইত্যাদি। তারা আজকাল তাই আসাই ছেড়ে দিয়েছে। কলকাতায় এলেও অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ি ওঠবার চেষ্টা করে।

শেষাদ্রির মা মারা গিয়েছিলেন অনেক আগে। তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে কী হ'ত বলা যায় না। বাবা বেঁচে ছিলেন, ওঁর ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু বিবাহ দিয়ে যেতে পারেন নি। বহুবারই বলেছেন, চেষ্টার যে খুব ত্রুটি করেছেন বা কর্তব্যে অবহেলা করেছেন তা নয়—কিন্তু যত বারই কথা পেড়েছেন তত বারই শেষাদ্রি তা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন আগামী কোন অনিশ্চিত দিনের জন্যে। বাবা তো আর মা নন—মায়ের তূণে যতরকম অস্ত্র থাকে তার কিছুই প্রায় নেই। তাই একদা ছেলেকে বাউণ্ডুলে রেখেই শেষাদ্রির বাবাকে পরলোকে যাত্রা করতে হয়েছিল।

ব্যাস, তার পর থেকে শেষাদ্রি নিশ্চিন্ত।

বোন থাকত বিদেশে—চিঠি লেখা ছাড়া বিশেষ কিছু ক'রে উঠতে পারত না সে। তাও সে অতি অল্প বয়সে মারা গেল। আর চেষ্টা করে কে ? মাসী, কাকী, জেঠী, পিসি একেবারে যে কেউ না ছিল তা নয়, কিন্তু শেষাদ্রি তাঁর চার পাশে নিরস শুষ্ক বইয়ের নিশ্ছিদ্র প্রাচীর রচনা ক'রে তাঁদের আক্রমণ অনায়াসেই প্রতিহত করতে পেরেছিলেন।

সুতরাং শেষাদ্রির সংসার বলতে ছুটি চাকর ভরসা। এরাই রান্না-খাওয়া, বাড়িঘর সাফ করা, অতিথি সৎকার, ছাত্রদের চা জল ইত্যাদি সরবরাহ, এমন কি আত্মীয় এলে আদর-আপ্যায়ন সব করে। তার চেয়েও বড় কাজ—বইয়ের পরিচর্যাও তাদেরই করতে হয়। কাজের তুলনায় লোক বরং কম—কিন্তু বেশী লোক রাখা মানেই বেশী জায়গা জুড়ে থাকা—কাজেই ছুজনের বেশী লোক রাখতে তিনি রাজী নন। আগে একজনই ছিল, তবে তাতে বড় অসুবিধা—সে দেশে যেতে চাইলে কি অসুস্থ হয়ে পড়লে বড় মুশকিলে পড়তে হয়। একবার বংশীবদন একজন বদলী রেখে দেশে গিয়েছিল। নতুন লোকটা এ বাড়ির হালচাল এবং বাড়িওলার ধরন-ধারণ দেখে হকচকিয়ে গেল। বুঝল যে এ কাজ তার দ্বারা চলবে না। তখন বুদ্ধিমানের যা কাজ সে তাই করল—

বাজার করার নাম ক'রে একটি দশ টাকার নোট বাগিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। শেষাদ্রি তা টেরও পেলেন না, তাঁর মনেও ছিল না কথাটা। এমন কি তাঁর দুপুরের খাওয়া যে হয় নি তাও মনে পড়ল না। তিনি জামাকাপড় ছেড়ে যথা-রীতি অন্যদিনের মতোই পোর্টফোলিও ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দরজা দেবার কথা কাউকে বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ বংশীবদন নিত্য বন্ধ করে। সেই কারণেই নিজেও বন্ধ করলেন না। ঐ রকম হা-হা করছিল সদর দরজা বলেই বোধ হয় কোন চোর ভাবতে পারে নি যে বাড়ি সম্পূর্ণ খালি, বাড়িতে কেউ নেই। তাই বড় রকমের চুরি কিছু হয় নি। কেবল পাড়ার বস্তির ছেলেরা সদরের স্তূপাকার করা বই থেকে কিছু নিয়ে গিয়েছিল খেলা করার জন্যে, দু'-একখানা ঐখানে বসেই ছিঁড়ে নষ্ট করেছিল।

বাড়ি ফিরে সে দৃশ্য দেখে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শেষাদ্রি চিৎকার ক'রে বংশীবদনকে ডেকেছিলেন। সাড়া না পেয়েও মনে পড়ে নি কথাটা, ভেবেছিলেন বাইরে কোথাও গেছে। আরও চটে গিয়েছিলেন ওর এই বেআক্কেল-পণাতে। তারপর রাত আটটা পর্যন্ত যখন কাউকে দেখলেন না, তখন তাঁর মনে পড়ল যে বংশীবদন দেশে গেছে এবং তার বদলা একটা লোক রেখে গেছে। সে লোকটাই বা কোথায় গেল? তখন মনে পড়ল তাঁর দশ টাকার নোট নিয়ে বাজার যাবার কথা—আর তখনই মনে পড়ল যে সকালে আজ তাঁর খাওয়া হয় নি। কেন যে দুপুরে অত ক্ষিদে পাচ্ছিল এবার তাও পরিষ্কার হয়ে গেল।

এর পর তাঁকে আর একটা চাকর খুঁজে বার ক'রে কাজ বুঝিয়ে দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। সেই কারণেই বংশীবদন ফিরলেও একে আর ছাড়ান নি, দুজনেই আছে। এই লোকটা নাকি চোর, বংশীবদন প্রায়ই অনু-যোগ করে—কিন্তু সে অনুযোগ শেষাদ্রি গায়ে মাখেন নি। তাঁর আছেই বা কি এমন আর তার কতই বা চুরি করবে? বইটই ওরা তত বোঝে না, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

দু'দশ টাকা চুরি বরং সহ্য হবে—কিন্তু ভৃত্যহীন অসহায় অবস্থা সহ্য হবে না।

এই শেষাদ্রি ঘোষাল।

এতদিন ধরে নিরঙ্কুশ ভাবে নিভৃত নীরব জ্ঞানতপস্যা চালিয়ে এসে—এই প্রায় বৃদ্ধবয়সে নীলার কাছে পরাজিত হলেন।

এ গৌরব কি কম!

নীলা তাঁর ছাত্রী। সুনাম শোনাই ছিল, কাছে এসে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এ-ই তো যথার্থ অধ্যাপক, এ-ই তো সেই প্রাচীন কালের আচার্য। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ—পঠন ও পাঠন, এর বাইরের জগৎ বলতে কিছুই জানা নেই।

কিন্তু শ্রদ্ধা তো করে অনেকেই, যারা যারা শেষাদ্রির সংস্পর্শে এসেছে, সকলেই! মুগ্ধও হয় তাঁর নির্মল দেবতুল্য চরিত্রে, শিশুর মতো স্বভাবে

নীলা সেইখানেই থামল না।

ওর মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল, এক আকাশস্পর্শী দুরাশা।

এই যোগীশ্বরের যোগ ভাঙাতে হবে, শ্মশানবাসীকে করতে হবে গৃহী। তপস্বীর তপস্যাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে ওর রাঙা পায়ের ধূলোয়।

'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।'

না-ই বা হ'ল সে উর্বশী, তবু সেই জাতেরই তো! ঐ সাধকের সমস্ত সাধনা তার এই কমলকোমল-রক্ত-চরণপ্রান্তে সমাধিস্থ করতে না পারলে, তাঁর এতদিনের তিল তিল তপস্যায় রচিত চারিত্রিক সুনামকে ধূল্যবলুণ্ঠিত না দেখতে পেলে বৃথাই তার নারীজন্ম!

সে অবশ্য নিজের সংকল্পের কথা জানাল না কাউকে, কিন্তু কাজে লেগে গেল।

তখন শেষাদ্রির বয়স আটচল্লিশ, নীলার একুশ।

তাই নীলা যখন ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল, তখন শেষাদ্রির বা তাঁর পরিচিত অন্য কেউ—তার এই সংকল্পের কথা অনুমানমাত্র করতে পারে নি। এদিকে যে কিছু অনুমান করার আছে, তাও ভাবতে পারে নি। পাঠে অনুরাগিণী ছাত্রী এমন অনেক আছে যাদের সাধ্যের চেয়ে সাধ বেশী—তারা পড়ার চেয়ে অধ্যাপকদের সেবা ক'রেই পরীক্ষাপর্ব এবং তার পরের পর্বটাও তরে যেতে চায়। তাছাড়া শেষাদ্রি ঘোষালের ক্ষেত্রে অন্তত, এ রকম তদ্গত ভক্তির নিদর্শন খুব দুর্লভ ছিল না।

না, কেউই সন্দেহ করে নি—নীলার গোপন-অন্তরবাসিনী চিরকালীন নারীর শাশ্বত বিজয়বাসনা।

নীলা এম. এ. পাস করল, রিসার্চ স্কলারশিপ পেল, থিসিসও দিল। সে থিসিস বলতে গেলে শেষাদ্রির মুখ থেকে শ্রুতিলিখনে লেখা—সুতরাং ডি. ফিলও আটকাল না।

ডি. ফিল পাওয়ার সংবাদ যেদিন বেরোল সেদিন শেষাদ্রি প্রশ্ন করলেন, 'তাহ'লে নীলা, তুমি এখন কি করবে?'

'আপনি তো স্যার বিলেত যাচ্ছেন—সে কবে?'

'সামনের অক্টোবরে।'

'আমিও যাব।'

'কি ক'রে?' বিস্মিত শেষাদ্রি আকাশ থেকে পড়লেন।

'সে আমি যেমন ক'রেই হোক যাব। ভাববেন না।'

'কিন্তু তুমি—তুমি বিয়ে-থা করবে না? সংসারী হবে না?'

'আপনার মুখেও এ প্রশ্ন স্যার? আমি যদি বলি আপনি পথ দেখান।'

এই বয়সেও লাল হয়ে ওঠেন শেষাদ্রি। মাথা হেঁট ক'রে বলেন, 'কী যে বলো নীলা!'

'ঠিকই বলছি—আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও।'

শেষাদ্রি আরও বিব্রত হয়ে হাতের খাতাটার দিকে চেয়ে রইলেন।

'সে সব কথা থাক স্যার। কিন্তু আমি না গেলে আপনি বড় অসুবিধায় পড়বেন। বই খাতা কাগজ এ সব গুছিয়ে রাখে কে?'

তা বটে। কথাটা সত্য।

মনে মনে শেষাদ্রিও স্বীকার করেন। নীলা কবে যে তাঁর ছাত্রী থেকে সেক্রেটারীতে রূপান্তরিতা হয়েছে তা তিনিও জানেন না। শুধু এইটুকু জানেন যে আজকাল তাঁর সব দরকারী কাগজপত্রগুলো নীলা ঠিক ক'রে রাখে এবং প্রয়োজনমতো ঠিক ঠিক হাতে জুগিয়ে দেয়—সে ভারি আরাম। আগের মতো একটা খাতা কি একটা বই হাতড়ে বার করতে এক ঘণ্টা সময় লাগে না।

তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'যেতে পারো তো ভালই। কিন্তু কী পড়বে?' এবং তার পরই মহা উৎসাহে নীলা এখন ওখানে কী কী পড়তে পারে, কী পড়া

উচিত, কত কি সুযোগ আছে—সেই আলোচনাতে ডুবে গেলেন।

নীলা করলেও অসাধ্য সাধন। কোথা থেকে কী সূত্রে যে সে একটা স্কলারশিপ যোগাড় করল তা কেউ টেরও পেল না। বাকী রইল যাওয়া-আসার খরচা—সেটাও এক জ্যেঠার কাছ থেকে নিয়ে শেষাদ্রির আগেই সে বিলেতে পৌঁছে গেল।

শেষাদ্রির তাতে সুবিধে হ'ল খুব, সেটা তিনিও একদিন স্বীকার করলেন।

শেষাদ্রি গিয়েছিলেন অধ্যাপক হয়ে—এক বছরের জন্য। তাঁর যখন ফেরবার সময় হ'ল তখনও নীলার কাজ সামান্য বাকী আছে।

শেষাদ্রি বললেন, 'তোমার ওপর নির্ভর করা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে নীলা, যে এই ক'টা মাস ওখানে গিয়ে খুব অসুবিধা বোধ করব।'

নীলা আর তিনি একই পাড়াতে দুখানা ঘর পেয়েছিলেন—কাছাকাছি বাড়িতে। সেও অবশ্য নীলারই কৃতিত্ব, কারণ ঘর সে-ই ঠিক ক'রে রেখেছিল। এখানে আসার পর কোন অসুবিধাতেই তাই পড়তে হয় নি শেষাদ্রিকে। ঠিক নিজের কাজে যতটুকু অনুপস্থিত থাকা প্রয়োজন ততটুকু—এবং রাত্রে ঘুমের সময় ছাড়া সমস্ত সময়ই কাছে কাছে থাকত। ভোরে উঠে চলে আসত, ওধারেও বহু রাত্রি পর্যন্ত থাকত। সেক্রেটারী, ছাত্রী, ব্যক্তিগত সেবিকা—নীলা ছিল একাধারে সব। কী নোট কোন্‌দিন টাইপ করতে হবে, পরের দিনের লেকচার নোট তৈরী করতে কোন্ কোন্ বই লাগবে—সেসব ছিল ওর নখদর্পণে—চাইবার আগেই হাতের কাছে যুগিয়ে রাখত সে।

তাতে কাজ করার খুব সুবিধা হত শেষাদ্রির। সময়ও অনেক বাঁচত।

সেদিনও নীলা ভোরের চা খেয়েই চলে এসেছিল ওঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে। সে শেষাদ্রির কথার উত্তরে বেশ সপ্রতিভ ভাবে বললে, 'কিন্তু ক'টা মাসই বা বলছেন কেন স্যার! এবার দেশে ফিরলেই বা আমাকে ক'দিন পাবেন?'

'কেন? পাবো না কেন?' শেষাদ্রি যেন আকাশ থেকে পড়েন।

'বাঃ, আমি কি চিরকালই এমনি থাকব? আমাকে এবার যা হোক কিছু সেট্‌ল্ করতে হবে না? হয় বিয়ে, নয় চাকরি—যা-ই কেন না করি এখনকার মতো অত স্বাধীনতা থাকবে না এটা তো ঠিক? হয়ত কলকাতাতে থাকাই হবে না।'

শেষাদ্রির মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ বিহ্বল ভাবে বসে থেকে বললেন, 'তাই তো। এটা তো ভেবে দেখি নি। সত্যিই তো, তোমারও তো ভবিষ্যৎটা ভাবতে হবে। স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই তো শুধু ভাবলে চলবে না।'

স্যুটকেশটার জিনিসগুলো মেঝের ম্যাটিং-এর ওপর ঢালতে ঢালতে নীলা বললে, 'একটা কিন্তু উপায় আছে স্যার।'

'কী বলো তো?' সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন শেষাদ্রি।

'আপনার আর আমার ভবিষ্যৎ মিলিয়ে দেওয়া।'

খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে বলে নীলা।

এত সহজ এবং এত স্বাভাবিক যে-শেষাদ্রি কথাটা ধরতেই পারেন না। অবাক হয়ে খানিকটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'অর্থাৎ—'

'অর্থাৎ আমাকে যদি বিবাহ করেন তা হ'লে এসব কোন সমস্যাই আর থাকে না।'

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শেষাদ্রির গৌর বর্ণ তামাটে হয়ে গেছে। তার ওপরও মেচেতার মতো ছোপ পড়েছে স্থানে স্থানে—তবু তিনি যে অরুণবর্ণ হয়ে উঠলেন তা বেশ বোঝা গেল।

'যাঃ, কী যে বল নীলা। তোমার ঠাট্টাগুলো—। যাঃ।'

যার-পর-নাই অপ্রতিভ হয়ে পড়েন শেষাদ্রি। কথাগুলো ছেলেমানুষের মতোই অসংলগ্ন হয়ে পড়ে তাই। কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে বিশেষ কিছুই বলতে পারেন না।

'আমি কিন্তু ঠাট্টা করি নি স্যার। সিরিয়াসলিই বলছি। অনেকদিন ধরে ভেবে দেখেছি। আপনার যা অসহায় অবস্থা, আমি চলে গেলে আপনি খুব অসুবিধেয় পড়বেন—আমিও ফেলে গিয়ে স্বস্তি পাব না।'

'তাই বলে—। নাঃ, কী যে বলো। তোমার বয়স আর আমার বয়স।'

'সে আপত্তি তো আমার তরফ থেকেই ওঠবার কথা। আপনি সে কথা চিন্তা করছেন কেন?'

'না না। আমার এই বয়সে বিয়ে। কি বলছ নীলা। সে যে আমি ভাবতেই পারি না।'

'সে দিক দিয়ে ভাবছেনই বা কেন ? যেমন আছি তেমনই থাকব। শুধু সেই ভাবে চিরকাল হাতের কাছে থাকবার একটা সামাজিক অনুমোদন নেওয়া বইতো নয়।'

'না না—এসব জিনিস এত তুচ্ছ নয় নীলা। দেহের ধর্ম আছে। বয়সের এত তফাৎ—। ধরো আমি আর দু'-এক বছরের মধ্যেই বুড়ো হয়ে যাব—তুমি তখনও যুবতী থাকবে। তোমার বাবা-মা-ই বা রাজী হবেন কেন ? আর লোকেও যা-তা বলবে !'

'আপনি এসব কথা এখনও চিন্তা করেন তাহ'লে। লোকে কী বলবে, দেহের ধর্ম—এই সব তুচ্ছ কথা !'

ঈষৎ কি ব্যঙ্গের সুরই গলায় ফোটে নীলার ?

ফুটলেও শেষাদ্রি সেদিক দিয়ে যান না। বলেন, 'না না—এসব ভাবতে হবে বৈকি। জীবন নিয়ে কথা। না, ওসব কথা যাক নীলা !'

নীলা আর কথা কয় না ! যেমন জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিল তেমনিই দিতে থাকে।

তার পরবর্তী কথা এবং আচরণও সহজ এবং স্বাভাবিক স্তরেই নেমে আসে। অন্য দিনের সঙ্গে এদিনের কোন তফাৎ বোঝা যায় না। যেন এই মধ্যবর্তী সময়ের কথাগুলো কোনপক্ষেই উচ্চারিত হয় নি।

শেষাদ্রি কিন্তু সত্যিই বিলেত থেকে ফিরে বড় অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন। যখন একা ছিলেন তখন ঠিকই চলে যেত—কিন্তু মধ্যে এই কটা বছর নীলা এসে সব ওলট-পালট ক'রে দিয়ে গেছে। অভ্যাসটা গেছে খারাপ হয়ে। এখন কিছুই হাতের কাছে খুঁজে পান না। না বই, না খাতা, না কোন নোট্স্—এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস জামা-কাপড় পর্যন্ত।

খুঁজে পান না—তার ফলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অথচ সে বিরক্তি কার ওপর তাও বোঝা যায় না। অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু তাদের আনাড়িপনা আরও বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে।

আর তার ফলে—যে দুর্নাম ওঁর কখনও ছিল না—খিটখিটে বলে একটা দুর্নাম রটে যায় ছাত্রসমাজে।

এর মধ্যে একদিন এসে পড়ল নীলা।

সত্যি-সত্যিই যাকে বলে 'বেঁচে গেলেন' শেষাদ্রি। যেন কোন জাদুমন্ত্র-বলে সব আবার ঠিক হয়ে গেল।

তেল-দেওয়া কলের মতো সব নিঃশব্দে ও নিশ্চিত গতিতে চলতে লাগল।

এ শ্রেণীর জিনিস শেষাদ্রির চোখে পড়বার কথা নয়, কিন্তু এবার যেন তফাৎটা বড় বেশী বলেই চোখে পড়ল।

আর চোখে পড়ল বলেই যে কথাটা একদা অসম্ভব, অবাস্তব, বিবেচনার অযোগ্য বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কথাটাই নতুন ক'রে ভেবে দেখতে লাগলেন।

অবশ্য ভাবাও তাকে ঠিক বলে না। মনের অবচেতন থেকে সচেতনতার মধ্যে এই চিন্তাটা উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধমক দেন, জোর ক'রে ঠেলে সরিয়ে দেন তাকে। কিন্তু আবারও সে উঁকি দেয়—আবারও নিজের উপস্থিতিটা জানিয়ে দেয়।

ছি ছি! কী লজ্জা, কী লজ্জা!

এ কী স্বার্থপর হয়ে উঠলেন তিনি!

কিন্তু সুবিধা খুব—এটাও মনে মনে স্বীকার না ক'রে পারেন না।

তবু—হয়ত কথাটা শেষাদ্রি কিছুতেই তুলতে পারতেন না—যদি না নীলা নিজে থেকেই কথাটা তুলত।

নিজেই একদিন বললে, 'আমি স্যার সাগর ইউনিভার্সিটিতে একটা কাজ পাচ্ছি। ভাল মাইনে। ওখানেই চলে যাব ভাবছি।'

'সাগরে?' চমকে ওঠেন শেষাদ্রি, 'সে যে অনেক দূর।'

'হ্যাঁ, তা দূর আছে একটু।' স্বীকার করে নীলা।

'কেন—এখানে তো সেই কী বলছিলে কী একটা কলেজে—'

'সে অনেক কম মাইনে। এখানে যা পাচ্ছি তার সিকি।'

'তা—তা তোমার বাবা-মা তোমার বিয়ের কথা তুলছেন না?'

'তুলছেন বৈকি। কিন্তু তাতে আপনার কি সুবিধে হবে বলতে পারেন? সে তো আরও দূরে চলে যাব।'

'কেন—এখানে কি সম্বন্ধ হ'তে পারে না? কলকাতাতেও তো ঢের ভাল

পাত্র আছে।'

'সে দূরত্বের কথা বলি নি।' শেষাদ্রির অবৈষয়িকতায় প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে নীলা, 'আমি বলছি বিয়ের পর আমার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ি তো আর আমাকে এমন ক'রে দৈনিক ষোল ঘণ্টা আপনার কাছে থাকতে দেবেন না?'

'ও, তুমি সেই কথা বলছ!' বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েন তিনি, 'আমি অবশ্য সে ভেবে, শুধু নিজের অসুবিধার কথা ভেবেই বলি নি!'

'কিন্তু সেটা কি ভাববার মতো কিছু নয়?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে নীলা।

'কিন্তু—কিন্তু সে আর—মানে তার আর আমি কি করব? কী আর করতে পারি? মানে তুমি কি বলতে চাইছ নীলা?'

'বলতে চাইছি যে জীবনে ঢের নির্বুদ্ধিতা করেছেন, আর করবেন না! আমিই আপনার লাস্ট চান্স! আর কেউ সহজে আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না। চাইলেও—আপনার তাতে কোন সুবিধে হবে না! এখনও সময় আছে, আমাকে বিয়ে করুন—আর কিছুই ভাবতে হবে না।'

প্রথম প্রথম নীলার কথায় বিস্মিত হতেন শেষাদ্রি, তাঁর ভদ্রতায় আঘাত লাগত। কিন্তু আজকাল আর হন না। কারণ বুঝে নিয়েছেন যে ওর স্বভাবই ঐ রকম। তাছাড়া এতদিনের ঘনিষ্ঠতাতেও অনেকটা অধিকার বেড়েছে নীলার! অনেক বেশী সহজে কথা বলার অধিকার।

আজ আর তিনি উড়িয়েও দিলেন না কথাটা সেদিনের মতো। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কথাটা কি তুমি ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ নীলা?'

'দেখেছি বৈকি! অনেক দিন ধরেই ভাবছি বলতে গেলে।'

'সব প্রস্ য়্যাণ্ড কন্স্? এ বিবাহে আমিই জিতব, পাব অনেক, তুমি কিছুই পাবে না। টাকাকড়িও আমার বিশেষ নেই। পৈতৃক অর্থ যা ছিল তা সব ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দিয়েছি। থাকার মধ্যে এই বাড়িটা আছে আর বইগুলো। বইগুলো সরাবার জায়গা নেই বলে বাড়ি মেরামত করা হচ্ছে না। ভাবছি আর একটা বাড়ি ভাড়া করব বইগুলো রাখার জন্যে—সে আরও খরচা। আমার যা আয় তাও তুমি জান। সংসার চালাতে পারবে?'

'না পারি নিজেও চাকরি করব। তখন এখানে থেকে যা পাই তাতেই

খানিকটা উপকার হবে।'

'তোমার আমার বয়সে কিন্তু অনেক তফাৎ।'

'তা জানি।'

'তবু একবার ভাল ক'রে ভেবে ছাখো নীলা। মনস্থির করার আগে একটু সব দিক ভেবে নাও। হয়ত সে সুযোগ আর পাবে না। এর পর ফেরবারও পথ থাকবে না।'

'কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন?'

এবার আর কণ্ঠের নিস্পৃহতা রাখা যায় না। আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বেরিয়েই পড়ে।

'হ্যাঁ—তা মানে লাভের পাল্লা তো আমার দিকেই ঝুঁকছে। কিন্তু আমার কথা ভেবো না নীলা—তোমার কথাই ভাবো। শুধু তোমার দিকটা।'

পরের দিন নীলা ট্যাক্সি নিয়ে আসে একেবারে।

'চলুন।'

'কোথায়?' আকাশ থেকে পড়েন শেষাদ্রি।

'রেজিস্ট্রারকে একটা নোটিশ দিতে হয় সেটা সেরে ফেলা দরকার। ফর্ম আমি নিয়েই এসেছি, ফিল্-আপও করেছি, শুধু সইটা বাকী। গাড়ি নিচে দাঁড়িয়ে আছে।'

'রেজিস্ট্রার?'

'হ্যাঁ। রেজেস্ট্রী বিয়েই তো হবে? এ বয়সে নিশ্চয়ই আনুষ্ঠানিক বিয়ে করতে চাইবেন না আপনি। সুতরাং একটা নোটিশ দেওয়া দরকার।'

'ওঃ।'

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন শেষাদ্রি। এত শীঘ্র মনস্থির করা শুধু নয়, কাজও সেরে ফেলতে হবে—তা তিনি ভাবেন নি।

একেবারে চিরদিনের মতো অন্ধ গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া। প্রত্যাবর্তনের, ভুল সংশোধনের আর সুযোগ পর্যন্ত না রেখে।

'তুমি মন স্থির করেছ তো? সব দিক ভেবে দেখেছ তো?' অনেকক্ষণ

পরে প্রশ্ন করেন শেষাদ্রি।

'সে তো আমার স্থির করাই ছিল—আপনাকে বলেছি।'

'তা বটে। তবু—ছাখ, ফেরবার আর পথ থাকবে না। কাজটা করতে যাচ্ছ চিরদিনের মতো!'

'সে চিরদিনের আর কত বাকী আছে আপনার? বেশীর ভাগই তো একা একা স্বার্থপরের মতো কাটিয়ে দিলেন। এখন দুশ্চিন্তা তো বরং আমারই হবার কথা।'

'না, সেই তোমার কথাই বলছি।'

'চলুন চলুন, উঠুন। এতকাল আপনার কথাই তো শুধু ভাবলেন। এই যে দৈনিক এতখানি সময় আপনার কাছে কাটাই তাতে কে কী বলছে, আমার ভবিষ্যৎটা কি হবে তা কখনও ভেবেছেন? নিজের কথা ছাড়া আর কারুর কথা ভাবা আপনার অভ্যেস আছে?'

'তা বটে। বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। তোমার কথাটা ভাবা উচিত ছিল। বরং—'

'উঠুন, বেরিয়ে পড়ুন। আর বরং-এ কাজ নেই। এত কাল যা করলেন না—এখন আর পারবেন না।'

অগত্যা শেষাদ্রিকে উঠতে হয়েছিল। রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে নোটিশও দিতে হয়েছিল একটা।

তার পর বিয়ে, তদুপলক্ষে গ্রেট ইস্টার্ণে প্রীতিভোজ—আপনার সহজ নিয়মেই এসেছিল—একটার পর একটা। অভিনন্দনে-ঈর্ষায়-উপহারে জড়ানো সে অদ্ভুত দিন কটা গেছে। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলবান দিন। মনে হয়েছে সে সকলকে ডেকে বলে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' কথার কথা নয়।

সে নিজেই তার প্রমাণ।

সে আজ এক বছরের কথা। আজ তাদের বিবাহ-বার্ষিকী।

সেই কথাই ভাবছে নীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এই স্বপ্ন-মাখানো সন্ধ্যায়।

সুদীর্ঘ একটি বছর কেটে গেছে। বিজয়িনীর জীবনপাত্রের সমস্ত গৌরব

সুধাটুকু নিঃশেষিত হয়েছে।

আজ আর স্বপ্ন নেই। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে।

আজ মনে সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। তপস্যার সিদ্ধি তো মিলেছে—কিন্তু কী মিলল শেষ পর্যন্ত?

কী লাভ হ'ল তার?

শেষাদ্রি নিশ্চিন্ত হয়েছেন, সুখীই হয়েছেন, বলতে হবে। সংসার সম্বন্ধে, নিজের জীবনের দৈহিক বা ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবতে হয় না। কোন কিছুই ভাবতে হয় না তাঁকে—সমস্ত সময়টাই তাঁর বই ও পুঁথিতে দিতে পারেন।

কিন্তু নীলার যে একটা জীবন আছে, তারও যে জৈবিক সত্তা আছে, একথাটা শেষাদ্রি একবারও ভেবে দেখেন না।

বরং বিয়ের আগে ভেবেছিলেন। কথাটা তুলেও ছিলেন। তাই থেকেই নীলার কোথায় একটা সূক্ষ্ম আশা জেগেছিল মনে। কিন্তু এখন একেবারেই নির্বিকার শেষাদ্রি। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত পড়াশুনা ক'রে যখন তিনি এসে শোন, তখন এই ঘরেরই আর একটা খাটে, তাঁর চার হাতের মধ্যেই আর একটা প্রাণী যে তখনও পর্যন্ত হয়ত বা বিনিদ্র জেগে বসে আছে, সে কথাটা একবারও মনে পড়ে না তাঁর।

নীলাকে একটা চাকরি নিতে হয়েছে। হয়ত শীগ্‌গিরই টিউশানী খুঁজতে হবে। এত টাকা মাইনে শেষাদ্রির—কিন্তু সংসার চলে না তাতে। বইয়ের দোকানেই সব টাকা চলে যায়। শেষাদ্রি যে এমন নিঃস্ব, কোথাও এক পয়সা জমানো বা উদ্‌বৃত্ত নেই—একটা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স পলিসি পর্যন্ত না—তা একবারও ভাবতে পারে নি নীলা। আছে শুধু এই বাড়িটা, সেও যে কতকাল মেরামত হয় নি তার ঠিক নেই, এবার হয়ত ভেঙে পড়ে যাবে। দু'বছরের ট্যাক্স-ই বাকী পড়েছিল—নীলা শোধ করেছে। বাড়ি মেরামতের টাকা তাকেই যোগাড় করতে হবে—এবং দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থাও।

তাহ'লে সে পেলে কি?

গৌরব। মূর্খ নির্বোধ নীলা। সেটাও সে নিজের সৃষ্টি করা মানসিক দূরবীন দিয়ে অনেকটা বাড়িয়ে দেখেছিল।

কিছুদিন পরেই সে ভুল ভেঙেছে তার।

শেষাদ্রির পরিচয় কতটুকু গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ? শুধু এই বিশেষ বিষয়ের ছাত্রসমাজে ও কতকগুলি অধ্যাপকের মধ্যে। বাকী কে খবর রাখে? অপরে তাদের স্বামী-স্ত্রী পরিচয় পেলে মুচকি হাসে। করুণার হাসি। কৌতুকের হাসি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। যারা শেষাদ্রির পরিচয় জানে তারাও মনে করে নীলা পয়সার লোভে শেষাদ্রিকে বিয়ে করেছে। তারাও হাসে মনে মনে। সুতরাং কী এমন গৌরবই বা পেল সে?

কোন এক অপরিণত বয়সে মনকে সে বুঝিয়েছিল যে এরকম ঘটনা ঘটলে শিক্ষিত সমাজের মাথার ওপর দিয়ে চলতে পারবে সে, সবাই তাকে খাতির করবে, সমীহ করবে, স্ত্রীলোকেরা ঈর্ষা করবে। আজ সে কল্পনার সঙ্গে বাস্তব কিছু মাত্র মেলে না। কেউ তাদের কথা নিয়ে মাথাই ঘামায় না। তাছাড়া তারা যায়ই বা কোথায়? কোথায় তাদের সমাজ? চাকরি বজায় রাখতে যাওয়া ছাড়া শেষাদ্রি কোথাও নড়তেই যে চান না। তার ফলে শরীরও ভেঙে পড়েছে তাঁর। ডায়াবেটিস, লো প্রেসার, বাত। সেই তরিবৎ করতে করতে নীলার অর্ধেক সময় চলে যায় আজকাল।

অর্থাৎ বর্তমানও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। কিছুই নেই তার। সন্তান হবে না, টাকাও থাকবে না। যতদিন বেঁচে থাকবে নিজেকে চাকরি ক'রে খেতে হবে। হয়ত বা স্বামীকেও খাওয়াতে হবে···

ঘর থেকে শেষাদ্রি ডাকলেন, 'নীলা—।'

'কী বলছ?' ঘরে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'আচ্ছা, ক্যালেণ্ডারের আজকের তারিখে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছ কেন বল তো?···আজ কি কোন এন্‌গেজমেন্ট ছিল আমার?'

'না। ওটা আমার এক নির্বুদ্ধিতার স্মারক, ও কিছু না। ও পাতাটাই ছিঁড়ে ফেল।'

'নির্বুদ্ধিতা? কিসের নির্বুদ্ধিতা? কী বলছ কিছুই বুঝছি না। তোমার মুখটাই বা অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন নীলা? শরীর খারাপ হয়েছে?'

বহুকাল পরে বোধহয় নীলার মুখের দিকে তাকাবার সময় হ'ল তাঁর। এধরনের কুশল প্রশ্নও তাঁদের বিবাহিত জীবনে সম্ভবত এই প্রথম।

সহসা নীলার দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে।

তবু তার দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয় না—বরং তা থেকে যেন আগুনই ঠিকরে বেরিয়ে আসে: 'তুমি, তুমি আমাকে আগাগোড়া ঠকিয়েছ। তুমি ভণ্ড, তুমি অপদার্থ—তুমি জোচ্চোর। তুমি আমার সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলে!'

বহুদিনের রুদ্ধ রোষ আর ব্যর্থতা ফেটে পড়ে তার কণ্ঠস্বরে।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে চেয়ে বসে থাকেন শেষাদ্রি। কী বোঝেন কে জানে। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে ঠকাতে চাই নি নীলা! তোমার কাছে গোপনও করি নি কিছু—বরং সত্য বলে সতর্ক ক'রে দিতেই চেয়েছিলুম। তুমিই শুনতে চাও নি কোন কথা যে! ·· আসলে তুমিই তোমাকে ঠকিয়েছ!'

এই মর্মান্তিক সত্য—যা ক্রমাগত ক'দিন ধরে তার নিজের মনের মধ্যেই ধ্বনিত হচ্ছিল—স্বামীর মুখ থেকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না নীলা। সেইখানেই মেঝেতে আছড়ে পড়ে নির্মম ভাবে মাথা ঠুকতে থাকে।

শিল্পী

ঘরে উজ্জ্বল আলো যেমন জ্বলছিল তেমনিই জ্বলতে লাগল, চারিদিকের মহার্ঘ্য গৃহসজ্জার দীপ্তি এতটুকু ম্লান হ'ল না—শুধু এই সমস্তর মালিক যিনি, সেই গৃহস্বামীই যেন নিমেষে শুকিয়ে উঠলেন—দর্শনার্থী আগন্তুকের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে। শুধু যে শুষ্ক বা বিবর্ণ হয়ে উঠলেন তাই নয়—কোন্ এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় দেখতে দেখতে, বোধ করি ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই, ঘেমে উঠলেন। সেই প্রথম-শীতের-আমেজ-লাগা সন্ধ্যাতেও তাঁর কপালে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম জমে উঠল—জামার গলার কাছটা ভিজে ন্যাতার মতো হয়ে গেল।

অস্বস্তিটা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, নামটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই। ঠিক তখনই চিনতে পারেন নি, এই নামের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটা ধরতে পারেন নি তখনও—তবু কী যেন এক অজ্ঞাত কারণে অস্বস্তি বোধ করেছেন। আব্ছা আব্ছা ঝাপ্সা ঝাপ্সা একটা পরিচয়ের অদৃশ্য সূত্র মনে পড়েছে,

সেইটেই হাতড়ে বেড়িয়েছেন মনে মনে এবং স্মৃতিটা পরিষ্কার হওয়ার আগেই কে জানে কেন—একটা অপরাধ বোধ জেগেছে। নামটার সঙ্গে কোথায় কী একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার জড়িয়ে বলে মনে হয়েছে, তাঁর কাছে অপ্রীতিকর, তাঁর পক্ষেই লজ্জাকর।

আর ঠিক সেই কারণেই 'না' বলতে পারেন নি। চাকর রামলাল নতুন লোক, সে বাবুর সৌভাগ্যের সময়েই এসেছে, আগের ইতিহাস তার জানবার কথা নয়। যারা জানত তাদের সকলকেই তাড়িয়েছেন শৌরিপদ, বেশ হিসেব ক'রে, বুঝেসুঝেই। কারণ তিনি জানেন যে, সামান্য অবস্থা থেকে বড় হ'লে—যারা সেই আগের সামান্য অবস্থাটা দেখেছে তাদের কাছে বিদ্বেষের পাত্র হয়ে ওঠে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা। আমি যাকে নিতান্ত নগণ্য কি করুণার পাত্র দেখেছি, সে আমার সামনে বড় বাড়ি করবে বা গাড়ি হাঁকাবে সেটা আমার কাছে অসহ্য। তাই সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগ্যের সমস্ত চিহ্ন, পূর্বের সমস্ত সম্পর্কও মুছে ফেলেছেন তিনি। সুতরাং রামলালের কাছে লোকটার বিনত প্রার্থনা আবদার বলে মনে হয়েছে। অনুনয়টা ধৃষ্টতার মতো শুনিয়েছে। এই দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তি—অন্তত ওর বেশভূষা ও হাতের গামছায় বাঁধা পুঁটলি দেখে তার যা মনে হয়েছে—ভিক্ষা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে তার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চায়, একথা বিশ্বাস করতে পারে নি রামলাল। সে তাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিল, 'বাবুর সময় নেই' বলে। 'যা বলবার আমার কাছে আগে বলতে হবে, নইলে হুট করে বাবুর কাছে গিয়ে বলতেও পারব না,' একথাও বলেছিল।

কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা, বার বার সেই একই কথা বলেছে, 'একটিবার আমার নামটা বলে ছাখো—তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন। ভয় নেই বাবা—আমি কিছু চাইতে আসি নি, বরং দিতেই এসেছি। তুমি শৌরিবাবুকে গিয়ে বলো যে সুলতানপুর থেকে মহেশ সাঁপুই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমার সঙ্গে দেখা হ'লে তাঁর কিছু সুবিধেই হবে—অসুবিধে নয়। এটাও তাঁকে বলো। লক্ষ্মী বাবা আমার—তুমি একবারটি বলে ছাখো, আমি তো জোর করছি না, হ্যাঙ্গাম হুজ্জুত করছি না—যদি সব শোনার পরও তিনি না বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ চলে যাবো।

আর একবার রামলাল মহেশ সাঁপুইয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষা ক'রে দেখেছিল। আধময়লা গুনচটের মতো মোটা কাপড়, সেটা পরবার গুণে হাঁটুর কাছাকাছি উঠেছে। পায়ের গোছ ছাড়িয়ে ওপরে বহুদূর পর্যন্ত ধূলিধূসর, একটা খাকি রঙের ক্যাম্বিসের জুতো তাতে তিন-চারটে ক'রে তালি। গায়ে টুইলের শার্ট—লাল ধুলোয় সেটারও প্রায় বর্ণান্তর ঘটেছে—তার ওপর একটা সস্তা দামের তাঁতে-বোনা চৌকুপি-কাটা সুতি-চাদর—তাদের দেশঘাটের দিকে হাটে এই সব চাদর বিক্রী হয়—তাদের মতো গরিব গেরস্তরা কেনে—কোন ভদ্রলোককে অদ্যাপি কিনতে বা পরতে দেখে নি রামলাল। এ লোকের সঙ্গে তার মনিবের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে—বিশ্বাস করা শক্ত। এর দ্বারা তার কোন উপকার কি সুবিধে হবে সে তো আরও অবিশ্বাস্য। সে আবারও তাই ঘাড় নেড়েছে, রূঢ় ভাবেই বলেছে সরে পড়তে।

তবু লোকটি যায় নি। 'বাবা বাছা' করেছে, কাকুতি মিনতি করেছে। আগত্যা গিয়ে খবরটা দিতে হয়েছে বাবুকে। তবু তখনও সে ধারণা করতে পারে নি যে বাবু ঐ লোকটার সঙ্গে সত্যিই দেখা করবেন বা নিয়ে আসতে বলবেন। এই দামী সোফা-সেটী, মেঝেতে পাতা পুরু কার্পেট, মাথার ওপর সদ্য-কেনা বড় ঝাড়ের আলো—সমস্তগুলোর সঙ্গেই যে একেবারে বেমানান লোকটা। সে কথা বলেওছে রামলাল—আগন্তুকের আকৃতি বেশভূষা এক হাঁটু ধুলোর কথা—সব।

কিন্তু রামলালের বিস্ময় শতগুণ বেড়ে গেছে বাবুর মুখের চেহারাটা দেখে। একটা অপরিচিত ভিক্ষার্থী শ্রেণীর লোক দেখা করতে চায়—রামলাল এসে এই সংবাদ দেওয়ার প্রারম্ভে যে বিরক্তি-কঠোর ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছিল বাবুর মুখে সেটা রামলাল বুঝতে পারে, সেইটেই স্বাভাবিক—কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হ'ল পরবর্তী অবস্থাটা। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখল রামলাল, আগন্তুকের নামটা শোনার পর কেমন ভূত দেখার মতো বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইলেন বাবু ওর মুখের দিকে, একটু একটু ক'রে পূর্বের যে ভ্রূকুটি মিলিয়ে গিয়ে সেই উদ্ধত সৌভাগ্যতৃপ্ত মুখ কেমন ক'রে পাংশু বিবর্ণ হয়ে উঠল, স্পষ্টই একটা কি যেন অজ্ঞাত ভয়ে এবং অস্বস্তিতে ছটফট ক'রে উঠলেন।

আরও অবাক হ'ল যখন দেখল যে তার বাবু নির্বাকই হয়ে গেলেন—

কথার কোন খবর উত্তর দিতে পারলেন না। নীরবে ইঙ্গিত করলেন লোকটাকে নিয়ে আসতে—এবং লোকটি এসে ঘরে ঢুকে সসঙ্কোচে দাঁড়াতে রামলালকেই ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলেন চলে যেতে—আর যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে যেতে।

'বড়লোকের মর্জি বোঝা ভার'—এছাড়া তার কোন সান্ত্বনা বা কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় দেখল না রামলাল। আধুনিক চাবি-পড়ে-যাওয়া এক-পাল্লার দরজা—তাতে কান দিয়ে আড়ি পাতাও কঠিন—তাছাড়া সে চেষ্টার অন্য বিপদও আছে। ঝি সরলা তার একটি ভালবাসার মানুষকে এখানে ঢোকাবার তাল খুঁজছে অনেক দিন ধরে—সে যদি দেখতে পায় তো এ সুযোগ সহজে ছেড়ে দেবে না। পুরুষের হৃদয় গলানো ঢের সহজ, স্ত্রীলোক বিশেষ সে যখন স্বার্থের গন্ধ পায় তখন তার হৃদয় পাষাণের চেয়েও কঠোর হয়ে ওঠে। এ জ্ঞান তেমন লেখাপড়া না থাকলেও রামলালের হয়েছে এই বয়সেই।

মহেশ সাঁপুইকেও ইঙ্গিতে বলতে বলেছিলেন শৌরিপদ, আড়ষ্ট শিথিল হাতটা কোনমতে তুলে সামনের গদী-আঁটা চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মহেশ বসে নি। বসতে ভরসা হয় নি তার, সঙ্কোচে বেধেছিল। তার ঐ সাততালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে এই দামী কার্পেটে এসে দাঁড়াবার জন্যেই লজ্জার শেষ নেই যেন—তার ওপর এই ময়লা কাপড়জামা, ধূলিবিবর্ণ সাড়ে চার টাকা জোড়ার চাদর নিয়ে ঐ দামী রেশমের আস্তরণ-ঢাকা সুবিপুল আসনে বসা নিতান্ত ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস বলেই বোধ হয়েছে।

তাই তেমনি জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েই রইল সে, বলল, 'না না, ঠিক আছে, ব্যস্ত হবেন না। আমার কাপড়চোপড়ের যা অবস্থা—। চিনতে পেরেছেন এই ঢের।···আপনার চাকরটি তো তাড়িয়েই দিচ্ছিল। অবিশ্যি তাকে দোষও দিই না। তাড়িয়ে দেবারই তো কথা, যা আমার বেশভূষা—এ বাড়িতে একেবারেই বেমানান।···আমাকে—আমাকে চিনতে পেরেছেন তো?'

বিদ্রূপ নয় ব্যঙ্গও নয়—শেষের কথাগুলো সত্যকার সংশয় ও উৎকণ্ঠার সঙ্গেই উচ্চারণ করে মহেশ সাঁপুই।

তখনও ঠিক সামলে নিতে পারেন নি শৌরিপদবাবু। অভাবনীয় অনভিপ্রেত এই আবির্ভাবের আঘাত—একটা ঐকান্তিক সর্বনাশের আশঙ্কা বা আতঙ্ক তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য যেন জড় ক'রে দিয়েছিল। একেবারে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বলেই এতটা আঘাত লেগেছে তাঁর স্নায়ুকেন্দ্রে। তখনও তাই বাক্ বা কর্মশক্তি ফিরে পান তিনি—সাধারণ কথা কইবার মতো এতটুকু শক্তিও ফিরে আসে নি। সে জন্যে এবারেও নিঃশব্দে ঘাড় নাড়তে হ'ল তাঁকে—চিনতে পেরেছেন।

এবং সেই সঙ্গে আবারও একবার ইঙ্গিত করলেন—সামনের আসনটা দেখাবার চেষ্টা ক'রে—বসতে। অর্থাৎ ভাল ক'রেই চিনতে পেরেছেন। সে সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ কোথাও নেই। চিনতে না পারারও কোন কারণ নেই। গত কয়েক বছর ধরেই এই লোকটির আগমন আশঙ্কা করছিলেন শৌরিপদবাবু। প্রথম প্রথম তো কণ্টকিত হয়ে থাকতেন—বরং দীর্ঘদিন না আসাতে ইদানীং সে ভয়টা ছিল না, একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। ভয় যত দিন প্রবল ছিল, এই আবির্ভাবের জন্যে প্রহর গুনছিলেন বলতে গেলে—ততদিন, সে অবস্থায় ঠিক কি ভঙ্গী নেবেন, বিস্ময় ও আহত-সম্মানের কোন্ সুরটি দিয়ে খেলাবেন—কেমন করে অস্বীকার করবেন সমস্ত ব্যাপারটা—মনে মনে মহড়া দিয়ে রাখতেন। একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন, উড়িয়ে দেবেন আগাগোড়া সমস্ত অভিযোগটা, চেঁচামেচি করবেন, পাগল বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন মহেশ সাঁপুইকে। এসবই ঠিক করা ছিল, তখন এলে কোন অসুবিধেই হ'ত না।

দীর্ঘদিন কেটে যাবার ফলে যেমন আশঙ্কাটা কেটেছে একটু একটু ক'রে, তেমনি সে প্রস্তুতিও নষ্ট হয়েছে। অতর্কিতে এমন ভাবে এসে পড়ার ফলে ঠিক যা যা করবেন বলে এতকাল ভেবে রেখেছিলেন তার আর কোনটাই মনে পড়ল না। অসহায় বিহ্বল ভাবে চেয়েই রইলেন শুধু—ভাগ্যবিড়ম্বিত, ভাগ্যের হাতে প্রহৃত ব্যক্তির মতো।

অনেকদিন কেটে গেছে সত্যিই—তবু চিনতে না পারার কথাও নয়। ঠিক তেমনিই আছে মহেশ সাঁপুই—আজ থেকে সাত বছর আগে যেমন ছিল। সেই একবারই দেখেছিলেন এটা ঠিক—তবু তাঁর এই ভাগ্যের সঙ্গে, অথবা

আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে, (এখনও মনে হ'লে দৈহিক চিম্‌টি খাওয়ার মতো মুখ বিকৃত করেন শৌরিপদ) সৌভাগ্যের সঙ্গে জড়িত বলেই, মনে আছে। মুখ চোখ আর মনে ছিল না, থাকা সম্ভব নয়—একটা আব্‌ছা অস্পষ্ট মাত্র মনে ছিল। কিন্তু এখন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল। আসল যেটা মনে ছিল সেটা এই বেশভূষাই। এমনিই পোশাক ছিল সেদিনও, এক-হাঁটু ধুলো, তালিদেওয়া কেড্‌স্ জুতো, ময়লা জামার ওপর এই সস্তা দরের চাদর, হাতে তেমনিই তেলচিটে গামছায় জড়ানো বাণ্ডিল একটা। উপরন্তু যেটা ছিল —একটা তাল দেওয়া বিবর্ণ ছাতা। বোধকরি সেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে বলে নেওয়া চলে নি।

তবে সেদিনকার শৌরিপদর পরিবেশে খুব একটা বেমানান হয় নি। আজ যেখানে তাঁর এই—ঠিক প্রাসাদোপম না হ'লেও—নতুন অট্টালিকা গড়ে উঠেছে, তার ঠিক পাশে-ঐ যে 'নিত্যসুধা লণ্ড্রী'টা এখন যেখানে আছে, ঐখানে ঐ গ্যারেজ ঘরে শৌরিপদ একটা ছাপাখানা খুলে বসেছিলেন। মহেশ সাঁপুই সেখানেই এসেছিল সেবার। অর্থাৎ সেখানেই প্রথম দেখা হয়েছিল।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অনেক ব্যবসা চেখে দেখে—শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে এই ছাপাখানা করেছিলেন। প্রেসও অবশ্য নামেই—একটা ছোট হাফ্ ফুলস্ক্যাপ ট্রিড্‌ল্ মেশিন ও কিছু ইংরাজী বাংলা টাইপ, সবই পুরনো দরে কেনা মায় কেস গ্যালি সুদ্ধ। এ পাড়ায় প্রেস চলার কথা নয়—কিন্তু যে পাড়ায় চলে সে পাড়ায় ত্রিশ টাকায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না। অগত্যাই এ পাড়ায় ঐ গ্যারেজ ঘরখানি ভরসা ক'রে বসতে হয়েছিল। একটু আশা ছিল, বিয়ের প্রীতি-উপহার, ভাড়ার রসিদ বই—চিঠির কাগজ—এ কাজ কি দু-চারটে পাওয়া যাবে না? এই রকম গোটা কতক কাজ পেলেই খরচা উঠে যাবে। খরচাও তো খুব বেশী নয়, একটি ঠিকে চুক্তির 'মাল্‌টি পারপজ' কম্পোজিটার আর একটি ট্রিড্‌ল্ ম্যান—লোক বলতে তো এই।

কিন্তু তাও পাওয়া যায় নি—সে রকম দু-চারটে কাজও। কাজ মিলত কদাচিৎ কখনও। ফলে ঘরে-বাইরে লাঞ্ছনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীর ডবল তাগাদা, নিজের গহনা ও সংসার খরচা। এখানে কর্মচারিদের মাইনে, বাড়িভাড়া। শুধু পাওনাদার ছাড়া যেন পৃথিবীতে কেউ নেই এমনি একটা

ধারণা হয়ে গিয়েছিল শৌরিপদর। সারাদিন টো টো ক'রে ঘুরেও কাজ যোগাড় হয় না—লোকগুলোকে বসিয়েই মাইনে দিতে হয় একরকম। এক এক সময় ভাবেন ছাড়িয়েই দেন—কাজ এলে নিজেই না হয় কম্পোজ ক'রে মেসিনে ছেপে দেবেন। আবার সাহস হয় না—এমনিই কাজ দেয় না কেউ। লোকজন নেই দেখলে আরও দেবে না।

এই অবস্থাতেই একা গুম্ হয়ে বসেছিলেন সেদিন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, প্রেসের দুজন লোক সারাদিন চুপ ক'রে টুলে বসে থেকে বাড়ি চলে গেছে, একটা কাজও ছিল না করার মতো। কিন্তু শৌরিপদ যেতে পারেন নি। পারেন নি—মানে এখানে কোন কাজ ছিল বা কাজের আশা ছিল বলে নয়, পারেন নি বাড়ি ফেরার মুখ ছিল না বলেই। অন্তত পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরা উচিত আজ। নইলে চলবে না—কিন্তু পকেটে তাঁর ষোলটি পয়সা বা চার আনার বেশী পড়ে নেই। এখানে ক্যাসের কৌটোতে আছে সবসুদ্ধ জড়িয়ে টাকাখানেকের রেজগি। এতে হাত দেওয়ার উপায় নেই, কাল সকালে ধুনো-গঙ্গাজল দেওয়া থেকেই শুরু হবে দেহি দেহি; চার আনা ক'রে দুজনের জলপানি আছে, এটা-ওটা পঞ্চাশ রকমের খুচরো খরচ। তাই একাই নিজের চেয়ারে গুম্ হয়ে বসে ছিলেন। আলো মিছিমিছি দুটো জলছে, তা জেনেও। গভীর রাত না হ'লে—স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু না করলে— ছেলেকে দিয়ে ডাকতে না পাঠালে বাড়ি ফেরার উপায় নেই। একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই লাঞ্ছনা বা বাক্যযন্ত্রণা কিছু কম হবে।

এমনিও নড়তে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এইখানে এই চেয়ারে বসে বসে মরে যাওয়ার মতো ঈপ্সিত পরিণতি আর কিছুই হ'তে পারে না।

ঠিক সেই সময়েই এসেছিল মহেশ সাঁপুই। ঠিক এই ভাবে, আজ যেমন এসেছে। এই রকম দীনহীন বেশ, এই রকম ধূলিমলিন। সুলতানপুর থেকে সকালে রওনা হয়ে এখানে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, কিছুই জানে না—কোথায় যেতে হবে, কার কাছে। এ পাড়ায় কে কুটুম ছিল তার সন্ধানেই এই বাগবাজারের প্রান্তে খাল ধারে এসে পড়েছিল। সে কুটুম যে বছর-খানেক আগে মারা গেছে সে খবরটা জানত না। তার পর থেকে লক্ষ্যহীন ভাবেই ঘুরছে। হঠাৎ ওঁর ছাপাখানার সাইনবোর্ডটা নজরে পড়তে এবং সামনেই ওঁকে

বসে থাকতে দেখে ভরসা ক'রে ঢুকে পড়েছিল।

'ভেতরে আসব বাবু?' প্রশ্ন করেছিল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

প্রথমটা শৌরিপদও ভেবেছিলেন ভিক্ষার্থী। কিন্তু তার পর আর একটু তাকিয়ে দেখে কে জানে কেন মনে হয়েছিল যে ঠিক সাধারণ ভিক্ষা এমন কি তার চেয়ে কোন উচ্চশ্রেণীর সাহায্য চাইতেও আসে নি লোকটি। তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েই বলেছিলেন—আসুন বসুন, কী চাই আপনার? ছাপাবেন কিছু?

হঠাৎই মনে হয়েছিল কথাটা। ওকে সাইনবোর্ডের দিকে বার দুই তিন তাকাবার পর এদিকে এগিয়ে আসতে দেখেই মনে হয়েছিল। আশাও হয়েছিল একটু, হয়ত লোকটি কোন জমিদারের গোমস্তা কি সরকার, চেক বা দাখিলা ছাপাতে এসেছে।

লোকটিও সাগ্রহে ঘাড় নেড়েছিল। ক্লান্ত মুখ আশাতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যেন। ঘরে ঢুকে নিজেই ওঁর ডেস্কের সামনের টুলে বসে বলেছিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই আশাতেই এতদূর আসা। আমি আসছি সেই সুলতানপুর থেকে—বীরভূম জেলার সুলতানপুর নাম শুনে থাকবেন বোধহয়।'

তারপর গামছার পুঁটলি খুলে বার করেছিল চার-পাঁচখানা খাতা, ওঁর সামনের ডেস্কের ওপর রেখে বলেছিল, 'অনেকদিনের সাধনা বাবু, দীর্ঘকালের। কবে থেকে যে লিখছি তা অনুমান করতেও পারবেন না। সেই ষোল বছর বয়স থেকে। কবিতা ছড়া গান নাটক গল্প নভেল। তা এই রকম চল্লিশ-পঞ্চাশখানা খাতা-বোঝাই লেখা আছে সে সব। উরি মধ্যে থেকে বেছে এই কখানা নভেল এনেছি, যদি পারেন এই কটা ছেপে দিতে বাবু। আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। বয়েস হয়ে আসছে, আর কটা দিনই বা বাঁচব—একখানাও যদি ছাপা দেখে যেতে পারি। আপনার লোকসান হবে না বাবু, পড়ে দেখুন। নিশ্চিত পছন্দ হবে।'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একান্ত মিনতির সুরে শেষের কথাগুলো বলেছিল মহেশ সাঁপুই।

হতাশ হয়েছিলেন বৈকি। এই শ্রেণীর আশাভঙ্গে সাধারণত ক্রুদ্ধই হয়ে ওঠে লোক, বিশেষ এই অবস্থায়—কিন্তু কে জানে কেন শৌরিপদ তা হন নি।

বোধহয় হতাশার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁচেছিলেন বলেই ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসে কৌতুক বোধই করেছিলেন। অনেক কিছুই করেছেন, গত ক'বছরে জীবিকার জন্যে অনেক রকম ক'রে দেখেছেন। এর আগে কিছুদিন এক ছাপাখানাতে চাকরিও করেছিলেন। এ লোকটি যে ভুল করেছে—সে ভুল অনেকেই করে। সেটা সেই প্রেসে থাকতেও লক্ষ্য করেছেন—তাই কি বলতে চাইছে লোকটি বুঝতে অসুবিধে হয় নি তাঁর।

বাংলা শব্দ ব্যবহারের শৈথিল্য এটা। বই প্রকাশ করাকে অনেকেই বই ছাপা বলে উল্লেখ করেন। 'অমুক প্রকাশক আমার অমুক বইখানা ছেপেছেন' একথা অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখকও বলে থাকেন। 'ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন' এই কথাই বলতে চান তিনি সে ক্ষেত্রে। প্রকাশক ও মুদ্রাকরে যে অনেক তফাৎ, সেটা বহু লোক ভাল জানে না। হয়ত এককালে সব প্রকাশকেরই নিজস্ব ছাপাখানা থাকত—কিংবা সেই কেরী সাহেবের আমল থেকে বিদ্যাসাগরের আমল পর্যন্ত ছাপাখানা থেকেই বই প্রকাশিত হ'ত—তখন থেকেই ধারণাটা চলে আসছে তাই। এ লোকটিও প্রেসের সাইনবোর্ড দেখে ঢুকে পড়েছে অনেক আশা করে।

অপরিসীম ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল, তবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলারই চেষ্টা করেছিলেন শৌরিপদবাবু। কে জানে কেন, সম্ভবত লোকটির একান্ত দীন ও বিনত ভঙ্গিতেই—রাগ করতে পারেন নি, আর হাতে কোন কাজ না থাকাতে —অথবা কাজ না থাকার চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেতেই বিরক্তও হন নি। বরং কিছুক্ষণ লোকটির সঙ্গে বকবক ক'রে হয়ত ভুলে থাকতেই চেয়েছিলেন। প্রকাশক ও মুদ্রাকরে যে ঢের তফাত, মুদ্রাকররা চিনির বলদ মাত্র, বই ছাপা বলতে যা বোঝায়—অর্থাৎ ছাপিয়ে বাঁধিয়ে প্রচার করা—সেটা করেন প্রকাশকরা। কোন কোন প্রকাশকের নিজেরও ছাপাখানা আছে—কিন্তু ছাপাখানা থাকলেই প্রকাশক হয় না। তাছাড়া প্রকাশকরা এমন ভাবে অপরিচিত লোকের লেখা প্রকাশ করতে চান না। সাময়িক পত্র অর্থাৎ মাসিক ও সাপ্তাহিকে লিখে খানিকটা নাম হ'লে তবেই প্রকাশকরা ভরসা ক'রে ছাপার খবর বার করেন। এ সবকথাই বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলেন ওকে।

কিন্তু লোকটি শোনে নি। এত কথা হয়ত বুঝতে পারে নি, এত গোলমেলে

কথা, এত রকমের ভিন্ন ব্যবস্থা। সে একেবারে তাঁর হাত দুটি চেপে ধরেছে, 'দোহাই বাবু, আপনিই একটা যাহোক সদগতি ক'রে দিন। আমি এত জানি না, কোথায় কার কাছে কি যেতে হয়, এত ঘুরতেও পারব না। আমার সঙ্গে হয়ত দেখাই করবে না কেউ। প্রাইমারী ইস্কুলে মাস্টারী করি—এর বেশী ভাল জামা কাপড়ের সঙ্গতি নেই। কলকাতা শহরে এ পোশাকে ভিখিরী ভাবে সবাই। আপনার অনেক দয়া, তাই কথা বলেছেন, বসতে দিয়েছেন। তাছাড়া আমাকে আজই ফিরতে হবে—কলকাতা শহরে এক ঘর যে কুটুম ছিল জানতাম, তারা নেই,—আমার সে ভাইপোর শ্বশুর মারা গেছে, তারা অন্যত্তরে চলে গেছে। জানতামও না, আজ এসে শুনলুম। এখানে রাত কাটাবার জায়গা নেই। রাত দশটা চল্লিশের গাড়ি ধরে আমোদপুর গিয়ে পড়ে থাকতে হবে।...আপনি যখন এত দয়া করেছেন—আর একটু করুন। এগুলো থাক আপনার কাছে, অবসর পেলে পড়ে দেখবেন একটু। যদি ভাল লাগে, যদি মনে হয় চলবে—দয়া ক'রে আপনিই কাউকে বলে কয়ে একটু ছাপাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পায়ে ধরলেও আমার ক্ষতি নেই। মনে করুন আমি পায়েই ধরছি আপনার।'

আর বকার অবস্থা ছিল না শৌরিপদবাবুর। সারাদিনে—সেই যা ভোরে দুখানা বাসি রুটি খেয়ে বেরিয়েছেন, তারপর আর চার-পাঁচ বার চা ছাড়া আর কিছু পেটে পড়ে নি। মাথা ঝিমঝিম করছে এখন। আর বকে কিছু সুফল হবে বলেও মনে হয় না। পুস্তক-প্রকাশন জগতের এত ভজোকটো সদ্য পল্লী-গ্রামাগত এই অনভিজ্ঞ প্রাইমারী পণ্ডিতের মাথায় ঢুকবে না। এতক্ষণ তো বকে দেখলেনও। এর পর বোঝানো মানে আরও খানিকটা বকা, উনি পড়লে কোন সুবিধা হওয়া যে সম্ভব নয়, ওঁর ভাল লাগলেও যে প্রকাশকরা সে কথার উপর নির্ভর ক'রে বই প্রকাশ করবেন না, এমন কি তাঁদের ভাল লাগলেও ছাপতে চাইবেন না তাঁরা—কারণ বই কেউ পড়ে কেনে না, লেখকের নাম দেখে কেনে, কেনার পর পড়ে—আর সে 'নাম' করতে হয় দীর্ঘকাল সাময়িক-পত্রে লিখে। প্রকাশকরাও লেখকের নাম হ'লে তবে ভরসা ক'রে ছাপেন—যথেষ্ট নাম হ'লে ছাইভস্ম যা লেখেন তাই ছাপা যায়। মহেশ সাঁপুইয়ের লেখা যত ভালই হোক, কেউ প্রকাশ করবে না, হয়ত কোন সম্পাদককেও

পড়ানো যাবে না। বহু জায়গায় পাঠাতে হবে, বেশির ভাগ জায়গা থেকেই ফেরৎ আসবে—দীর্ঘকাল ধরে পাঠাতে পাঠাতে হয়ত দৈবাৎ কেউ ছাপাবেন দয়া ক'রে। সে দীর্ঘদিনব্যাপী-বিস্তৃত প্রক্রিয়া। অত দিন ধরে অত কাণ্ড করার সময় হবে না শৌরিপদবাবুর, এ দাবী করাও মহেশের উচিত নয়—সমস্ত প্রস্তাবটাই অবাস্তব ও অসঙ্গত।

এমনি অনেক কথা বোঝাতে বলতে হয় তখন, অনেক বকতে হয়, তাতেও সম্ভবত মাথায় ঢুকবে না লোকটির। আরও অনেক বকাবে, অনেক অনুরোধ মিনতি করবে। সত্যিসত্যি পায়ে ধরাও আশ্চর্য নয়।

না, অত ঝঞ্ঝাট পোষায় নি সেদিন। অপরিসীম ক্লান্তিতেই আরও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন শৌরিপদ। আরও কিছু মিনতি এবং তোষামোদ ক'রে খাতাগুলো রেখেই যখন চলে গিয়েছিল মহেশ সাঁপুই—তখনও বাধা দিতে চেষ্টা করেন নি। খাতাগুলো তাদের সাধনাচিত ধামে—অর্থাৎ ঝাঁটানো কাগজের সঙ্গে একদিন বাইরে ফেলে দিলেই হবে, এই ভেবেই চুপ ক'রে ছিলেন। শুধু শুধু খালি পেটে বকার চেয়ে সেটা ঢের সোজা।

পড়েইছিল খাতাগুলো। ফেলে দেওয়া বা সরিয়ে রাখাও হয়ে ওঠে নি। এমনি পড়ে থাকতে থাকতে সেই দিনের মতো কর্মহীন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় অলস কৌতূহলভরে একটা খাতা টেনে নিয়েছিলেন শৌরিপদবাবু, উল্‌টে দেখেও ছিলেন। কিন্তু দেখতে দেখতেই—কয়েক পৃষ্ঠা পড়বার পরই যেন চমকে উঠে- ছিলেন। যতটা 'ননসেন্স' দেখবেন ভেবেছিলেন তা তো নয়ই—উপরন্তু তাঁর মনে হয়েছিল—রীতিমতো পাকা লেখা।

পড়তে পড়তে গভীর রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন—তাই কত রাত হয়ে গেছে টের পান নি। ছেলে ডাকতে আসতে তবে হুঁশ হয়েছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতা উল্‌টে রেখে উঠে পড়তে হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও কাটে নি। বিস্ময় ও মুগ্ধতার ভাব তাঁকে বহুক্ষণ পর্যন্ত অন্যমনস্ক অভিভূত ক'রে রেখেছিল। শৌরিপদবাবু নেহাৎ "ছাপাড়ে ভূত" নন—সাহিত্য- প্রীতি ছিল তাঁর বরাবরই, এককালে কিছু চর্চাও করেছেন। কলেজে পড়ার সময় কলেজ ম্যাগাজিনে অনেক লিখেছেন। তার পরও পড়ার অভ্যাসটা বজায়

রেখেছিলেন দীর্ঘকাল অবধি। একেবারে এই দৈন্য দশায় পৌঁছবার আগেও, লাইব্রেরী থেকে নিয়মিত বই আনিয়ে পড়তেন। তেমন ভাল লিখতে না পারুন—ভাল লেখা কাকে বলে তা জানেন।

পরের দিন সকালে গিয়ে খাতার বাকী অংশটুকু শেষ করেছেন, তারপর আর একখানা খাতা টেনে নিয়েছেন, তারপর আর একখানা। রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়েছেন বলতে গেলে। পড়ে চমকে গেছেন, অবাক হয়ে গেছেন। দু-একটা ছোটোখাটো গ্রাম্যতা দোষ ছাড়া, ভাষার দু-একটা শৈথিল্য ছাড়া কোথাও কোন ত্রুটি নেই। একেবারে প্রথম শ্রেণীর রচনা। এ লেখা যদি এমন অখ্যাত অজ্ঞাত রয়ে যায় তো সেটা বঙ্গভারতীরই দুর্ভাগ্য বুঝতে হবে, শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অপরাধ বলে গণ্য হবে।

অনেক ভেবেছেন শৌরিপদবাবু, কী করা যায়—অনেক চিন্তা করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে এই দুর্বুদ্ধি দেখা দিয়েছে মাথায়। লোভ প্রবল হয়ে উঠেছে। অভাবে স্বভাব মন্দ হয়, নিদারুণ অভাবেই এতখানি নিচে নেমেছেন শৌরিপদ, নামতে পেরেছেন। কিছুদিন আগে হ'লেও—একথা ভাবতে পারতেন না, কখনও কোন অসতর্ক মুহূর্তে মনের কোণে চিন্তাটা দেখা দিলে লজ্জিত বোধ করতেন, নিজেকে ধিক্কার দিতেন।

আরও একটা ব্যাপার ছিল অবশ্য। শৌরিপদবাবুর তরফ থেকে বলা যায়।

মহেশ সাঁপুই নাম, আর দেশী কলম ও কালিতে লেখা ঐ পাণ্ডুলিপি—এ দেখলে কেউই ছাপবে না, কোন সম্পাদকই।

সে চেষ্টাও তাই করেন নি শৌরিপদ। সাবধানে যত্ন ক'রে 'কপি' করেছেন সমস্ত বইগুলো, দোষ-ত্রুটি যা ছিল সংশোধন ক'রে, গ্রাম্য দুষ্ট শব্দগুলো বদলে নিখুঁত নির্ভুল ক'রে নকল করেছেন। তার পর গেছেন তাঁর পরিচিত এক মাসিক পত্রের সম্পাদকের কাছে। যখন ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছেন তখন দিন-কতক এই দৈনিক-কাম-মাসিকপত্রের আপিসেও কাজ করেছিলেন। সেই থেকেই পরিচয় ছিল সম্পাদকের সঙ্গে। হঠাৎ এতদিন পরে শৌরিপদকে লেখক হতে দেখে বিস্মিত হয়েছেন তিনি, কিছু ঠাট্টা-তামাসাও করেছেন কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি—উল্‌টে দেখতে স্বীকৃত হয়েছেন।

তারপর, তিনিও চমকে উঠেছেন, শেষ পর্যন্ত পড়তে হয়েছে তাঁকেও। সঙ্গে

সঙ্গে দুটি পরিচ্ছেদ ছেপে দিয়েছেন। শৌরিপদকে ডেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং কিছু-কিঞ্চিৎ সম্মানদক্ষিণা দেবেন এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। সামান্য কিছু অগ্রিম দিয়েছেনও। তারপর—প্রকাশিত ঐ প্রথম কিস্তি নিয়ে শৌরিপদ গেছেন এক বিখ্যাত সাপ্তাহিকের সম্পাদকের কাছে। জনরব যে প্রচুর পরিমাণে পান ভোজন না করালে কোন নতুন লেখকের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন না—কিন্তু শৌরিপদবাবুকে তাও করাতে হয় নি! ভাগ্যই ভাল—এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মারফৎ যাওয়ার ফলেই হয়ত—বিনা ঘুষেই সেই কিস্তিটি পড়াতে পেরেছেন শৌরিপদ। তার পর আর কোন বেগ পেতে হয় নি, অন্য লেখা সরিয়ে রেখে, এমন কি পূর্ব-বিজ্ঞাপিত লেখাও—শৌরিপদ একটি নূতন রচনা অবিলম্বে শুরু ক'রে দিয়েছেন ছাপতে।

এর পর শৌরিপদর জয়রথের গতি আর কোথাও ব্যাহত হয় নি। প্রকাশক নিজে থেকেই ছুটে এসেছেন, অগ্রিম টাকা দিয়ে গেছেন। বই ছাপার পর বিক্রীও যেমন দ্রুত হয়েছে তেমনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিলম্ রাইট বিক্রী হয়েছে। হিন্দী, মারাঠী সংস্করণ ছাপা হয়েছে। কাগজে কাগজে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে—ওঁর লেখার জন্যে। পূজাসংখ্যার জন্যে উপন্যাস চাই—দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত অফার পেয়েছেন! একটা গৌরব ও সাফল্যের শিখরচূড়া থেকে আর একটায় চলে গেছেন অনায়াসে। প্রথম কাহিনীর ফিলম্ দেখানো শুরু হতেই বোম্বে থেকে হিন্দী এবং মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণ ভারতীয় চিত্ররূপের জন্য ছুটে এসেছেন প্রযোজকরা, মোটা মোটা টাকা দিয়ে গেছেন, তার ফলেই এই বাড়িটি করা সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে। কিছু দেনা ক'রেই করতে হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু সে দেনা দেবার লোকের অভাব হয় নি তখন, শুধতেও বেশী দেরি লাগে নি।

শুধু দুটি অসুবিধা ছিল এর মধ্যে। এই দুটি চিন্তাই তাঁর কুসুমকোমল সৌভাগ্যশয্যাকে কণ্টকিত ক'রে রেখেছিল। সাফল্যের অমৃতপাত্র একটা বড় রকম তিক্ততার সৃষ্টি করত মধ্যে মধ্যে। প্রথমত—মহেশ সাঁপুই যে কখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিয়ে গিয়েছিল—মোট ছখানি উপন্যাস ও একটি নাটক (যে নাটকও ছাপা হয়েছে, স্টেজে অভিনয়ও হচ্ছে), তা তো সবই প্রায় ছাপা হয়ে গেছে। এখন কি হবে? চারিদিক থেকে লেখার তাগাদা আসছে

অনবরত। কিছু কিছু চেষ্টা যে না করেছেন শৌরিপদবাবু তাও না, কয়েকটা গল্প তো লিখতেই হয়েছে—কিন্তু রচনার মানে যে আকাশপাতাল তফাৎ হয়ে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে শৌরিপদবাবু নিজেই যথেষ্ট সচেতন। তিনি খাটছেন খুবই—এক একটি লেখা তিন বার চার বার ক'রে লিখছেন—ঘষামাজার অন্ত নেই—তবু ঠিক ঐ সুরটি আনতে পারছেন না, দূর পল্লীগ্রামের অর্ধশিক্ষিত এক পাঠশালার পণ্ডিত যা অনায়াসে পেরেছে।

আর একটি দুশ্চিন্তা ছিল, এইটেই বেশী, যদি কোনদিন ঐ মহেশ সাঁপুই এসে হাজির হয়, খুঁজে বার করে তাঁকে—কৈফিয়ৎ চায়। যদি জানতে পারে যে তার সব লেখাই ছাপা হয়েছে, তা বিক্রীও হচ্ছে প্রচুর, সেই সব লেখার জন্যেই আজ শৌরিপদবাবুর এত সম্মান ও অর্থ অথচ সে নিজে এর একটুখানি ফলভোগ করতে পারছে না, তাহ'লে যেমন ক'রেই হোক ওঁকে খুঁজে বার করবে এবং কৈফিয়ৎ চাইবে।

কিন্তু দিন দিন করে মাস ঋতু বৎসর—বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে যখন—সে ভয়ঙ্কর বোঝাপড়ার দিন দেখা দেয় নি—তখন বিপদের সে আতঙ্কটাও কমেছে একটু একটু ক'রে—প্রস্তুতিটাও নষ্ট হয়েছে।

একেবারে আজ—বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো এই আগমন, আকস্মিক অতর্কিত এই আক্রমণ।

সেই জন্যেই শৌরিপদবাবুর এই বিহ্বল স্তম্ভিত অবস্থা।

কিছুই করতে পারছেন না, কিছু বলতেও না। না-চেনার ভান করাই যে উচিত ছিল গোড়া থেকে, এতদিনের ভেবে রাখা সেই মূল্যবান বুদ্ধিটাও যোগাল না প্রয়োজনের সময়টায়।,

কিন্তু তাঁকে বাঁচিয়ে দিল মহেশই। সে তেমনি সসঙ্কোচ বিনয়ের সুরেই বলল, 'বইগুলো ছাপা হয়েছে দেখলুম বাবু। জানতাম না, হঠাৎ একখানা চোখে পড়ল 'ধরিত্রী ধূসর' বইখানা—। বিপদ এই সেদিন আপনার নামটাও জেনে যাওয়া হয় নি তো, তাই বিজ্ঞাপন দেখে কিছু বুঝতে পারি নি। ওখানা পড়বার পর খুঁজে খুঁজে চেয়েচিন্তে সব কখানাই দেখলুম। তার মানে আপনার পছন্দ হয়েছিল পড়ে দেখে। দেখলেন তো বাবু সেদিন আমি মিছে কথা বলে যাই নি। পছন্দ হবে আপনার—সবাইকারই হবে—তা আমি

বরাবরই জানতাম।'

আবারও চমকে ওঠেন শৌরিপদ, আরও হতভম্ব বিহ্বল হয়ে পড়েন। কই, এর কণ্ঠে তো এতটুকু উষ্মা কি তিরস্কার নেই! এ কেমন ধারা লোক? কিংবা এটা সেই একান্ত আশঙ্কিত প্রচণ্ড বিস্ফোরণেরই ভূমিকা? ঝড়ের আগে যেমন প্রকৃতি শান্ত স্থির হয়ে থাকে তেমনি?

মহেশ সাঁপুই কিন্তু বলেই চলেছে—'ভালই করেছেন বাবু। আমার নাম দেন নি। মহেশচন্দ্র সাঁপুই লেখকের নাম থাকলে কেউ বই ছাপত না। কিনতও না কেউ। এতে তবু বই কখানার নাম হয়েছে, পড়ছে তো এত লোক। আমার চিন্তার সঙ্গে এতগুলো লোকের মিল হচ্ছে, আমার যে লিখতে আসা ভুল হয় নি, কিছু শক্তি যে আছে সেটা তো জেনে গেলুম, তাতেই আমার শান্তি।'

তারপর একটু থেমে—যেন আরও কিছুটা অনুনয়ের ভঙ্গিতে অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত মুখে বলল, 'একটি কথা বাবু, তা এতই যখন করলেন, এগুলোরও একটা সদগতি ক'রে দেন। আপনারও তো লাগবে, নিশ্চয় আরও অনেকে আপনার বই চাইছে—আর আমারও ধরুন শরীর যেমন খারাপ হয়েছে—কবে আছি কবে নেই, আমার বাড়ির লোকেরা তো ভাবে আমি একটা পাগল, না খেয়ে না দেয়ে দিন রাত কী সব বাজে হিজিবিজি লিখছি, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, লেখক বলে কেউ পোঁছে না, একটা লেখা ছাপা হয় না—শুধু লিখেই যাচ্ছি। তার মানে আমি চোখ বুজলেই সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেবে ঐ সব বাজে কাগজের বোঝা—কেউ উলটেও দেখবে না। তাই যে কখানা পেয়েছি এনেছি বাবু, কটা গল্প নাটক—আরও তিন-চারটে উপন্যাস। এগুলোও ছেপে দেন আজ্ঞে। বোধহয় বেশীদিন আর বাঁচব না, শরীর একেবারে ভেঙে এসেছে, তবু আপনার হাতে পড়লে এককালে ছাপা হবে—এইটে ভেবেও শান্তি পাব।...যদি পারেন, আমি আর বেশী বয়ে আনতে পারলুম না—যদি সময় ক'রে কাউকে আমার বাড়ি পাঠাতে পারেন, যদি কাজে লাগবে মনে করেন অবিশ্যি—আরও কিছু আছে, সেগুলোও দিয়ে দিতে পারি। কী আর হবে—তবু যদি কিছু কাজে লাগে। ওখানে থাকলে উনুনে পোড়ানো ছাড়া কোন গতি হবে না।'

হয়ত এরপর কিছু উত্তর আশা করেছিল মহেশ। কেমন একটু ব্যগ্র উৎসুক চোখ মেলেই চেয়ে রইল ওঁর মুখের দিকে। কিন্তু শৌরিপদবাবু তখনও কোন কথা কইতে পারলেন না। প্রাথমিক বিস্ময় কেটে গেছে কিন্তু বিস্ময়ের যে শেষ হচ্ছে না। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছেই যে।

মহেশ যেন সূক্ষ্ম একটা কি হতাশা বোধ করল কিন্তু আর কিছু বলল না, ধীরে ধীরে গামছার পুঁটুলিটা খুলে সেই রকম আগের মতো বিবর্ণ কয়েকটি খাতা ও কিছু এমনিই সেলাই করা কাগজের তাড়া বার ক'রে, শৌরিপদবাবুর সামনে কাশ্মীরী-কাজ-করা কাঠের তেপায়াতে রাখা বিরাট জয়পুরী থালাটার ওপর রাখল। তারপর গামছাখানা জড়িয়ে পাট ক'রে নিয়ে বলল, 'চলি বাবু তাহ'লে, নমস্কার। ঠিকানা ঐ খাতাতেই লেখা আছে—যদি দরকার মনে করেন—'

এইবার যেন সহসা সজীব হয়ে উঠলেন,—আর নীরব থাকলে চলবে না বলেই বোধহয় প্রাণপণে কথা কইলেন শৌরিপদবাবু। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, 'দাঁড়ান দাঁড়ান—সে কি কথা। আমি—অবিশ্যি আমার খুবই অন্যায় হয়েছে—তবে ঐ বা বললেন, কারণটা ওই, আর ঠিকানাটাও তো জেনে রাখি নি—মানে নইলে অন্তত কিছু টাকা—তা আপনি—এখন কিছু নেবেন নাকি?'

এতখানি জিভ কেটে মহেশ বলল, 'ছিঃ বাবু, ছেলে দত্তক দিয়েছি সে একরকম কিন্তু তাই বলে তার দাম নিতে পারব না। ও আদেশ আর করবেন না—'

'তা একটু বসুন অন্তত'—আরও যেন ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন শৌরিপদ, এরই মধ্যে।

'না বাবু, ট্রেনটা আবার এগিয়ে দিয়েছে—সাড়ে দশটার গাড়ি। এতটা হেঁটে হাওড়া স্টেশনে যাওয়া—গাড়িটা পেলে হয় তাই—।'

তা অন্তত—মানে বেশ তো, আমার কাছেই থাকুন না রাতটা। অন্তত কিছু খেয়ে যান—এবং বিশ্রাম করে—আমি গাড়ি ঠিক ক'রে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—'

'মাপ করবেন বাবু, ছেলে দত্তক দেবার পর—যে বাড়িতে পুষ্যি দেওয়া হয়

—সে বাড়িতে আর খেতে নেই। সেও এক রকম ছেলে বেচে খাওয়া হয়। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি বললেন এই ঢের। আমি আসি আজ।'

আবারও হেঁট হয়ে একটি নমস্কার ক'রে মহেশ সাঁপুই বেরিয়ে গেল শৌরিপদবাবুর বৈঠকখানা থেকে।

সে ঘরের উজ্জ্বল আলো যেমন জ্বলছিল তেমনই জ্বলতে লাগল চারিদিকের মহার্ঘ্য গৃহসজ্জার দীপ্তি এতটুকু ম্লান হল না—শুধু এই সমস্তর মালিক যিনি তাঁর মুখেই কে যেন গভীরতর কালি লেপে দিয়ে গেল, শুধু মনেই নয়—মনে হতে লাগল বাইরেও তিনি যেন শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছেন—এই গত কয়েকটি মিনিটের মধ্যে।

পুত্রার্থে

কিরণবাবু কিছু বুঝতে পারেন নি সে সময়টায়। প্রচণ্ড উষ্মায় ও প্রবল ধিক্কারে তিনি বাড়ি ছেড়ে ছিলেন,—এমনিতেই তাঁর রক্তের গতি প্রবল—এই দুই মনোভাবে সে গতি আরও বেড়ে যাবে এইটেই স্বাভাবিক। তার ওপর পথ-কষ্টও কম হয় নি। পাঁচ মিনিট থাকতে এসে গাড়ি ধরা—রিজার্ভেস্থানের প্রশ্নই ওঠে না, সে সময় খোঁজ খবর করার সময় ছিল না—ঠেলাঠেল ক'রে একটা কামরায় উঠে পড়েছিলেন কোনমতে। সে কামরায় ব্যবস্থার দেড়া-লোকে ভর্তি, হয়ত বা বেশী ; নিতান্ত বুড়োমানুষ—উত্তেজনায় পরিশ্রমে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন সেটা মুখ দেখেই বোঝা যায়—তাই কেউ ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেয় নি, এক পাশে ইঞ্চি ছয়েক জায়গাও ক'রে দিয়েছিল বসবার মতো।

কিন্তু তাতে কিছুমাত্র সুস্থ হতে পারেন নি। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, ঘাড়ে সুদ্ধ। এতদিনের অভিজ্ঞতায় এটা যে রক্তে ঔদ্ধত্যের আতিশয্য তা বুঝতে বিলম্ব হয় নি। কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। ডায়াবেটিসের ভাবও আছে একটু, তার জন্যে অতিরিক্ত দুর্বল শরীর তখন একটু শোবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু সহজভাবে শোওয়া তো দূরের কথা, একটু কাৎ হবারও জায়গা মেলে নি। ওঁর অবস্থা দেখে যতই সহানুভূতি জাগুক সহযাত্রীদের মনে, সে জায়গা কেউ দিতে পারে নি। মালে ও মানুষে এমনই ঠাসাঠাসি যে মেঝেতেও একটু খালি

জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। কেউ উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ক'রে দেবে—সে উপায় নেই।

অবশেষে মুঘলসরাইতে ট্রেন আসতে—কিরণবাবু তখন চোখ বুজে ডান পাশের লোকটির গায়ে এলিয়ে পড়ে গোঙাচ্ছেন একটু একটু—সেই সকালেও ঘামছেন দরদর ক'রে—এক চেকার দয়ার্দ্র হয়ে একটা ফার্স্ট ক্লাসের বার্থে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। সঙ্গে কোন মাল নেই—কোথাও পৌঁছে জামাকাপড় বিছানা কিনে নেবেন, এই সঙ্কল্প ক'রেই বেরিয়ে ছিলেন—অর্থাৎ টাকাকড়ি, এমন কি টিকিটও আছে কিনা সন্দেহ, তবু তার জন্যে ইতস্তত করেন নি ভদ্রলোক। কিন্তু সেই হুঁশটুকু কিরণবাবুর তখনও পর্যন্ত ছিল। তিনি কোন-মতে, প্রায় চোখ বুজেই, পকেট থেকে একশো টাকার একখানা নোট এবং থার্ড ক্লাস টিকিটখানা বার ক'রে দিয়েছিলেন। রসিদ লেখা পর্যন্ত জ্ঞান ছিল না আর। চেকার ভদ্রলোক অবস্থা বুঝে সেই রসিদ আর আগের টিকিট এবং ফেরত টাকা পয়সা পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন—পাশের সীটের যাত্রীকে সাক্ষী রেখে।

এর পর তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না, আর কিছুই টের পান নি। যা ঘটেছে তা কিছু রামস্বরূপের মুখে শুনেছেন, বাকীটা অনুমান ক'রে নিয়েছেন।

ঐ অবস্থায় বাকী সমস্ত পথটা—দ্বিপ্রহর, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা ও রাত্রি—বেহুঁশের মতো পড়ে থাকতে দেখে—রাত্রের দিকেই—সহযাত্রী ভদ্রলোক একটা কমলালেবু ও একটু মিষ্টি বার ক'রে দিয়েছেন—মিষ্টিটা খান নি, সাগ্রহে সেই লেবুটাই যা খেয়েছেন—কিন্তু কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি, এতই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন তখন। কোথায় যাবেন সে প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছেন 'হরিদ্বার'—কি কষ্ট হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে বুকে ও মাথায় হাত দিয়েছেন।

তারপর—যা মনে হয়—সেই যাত্রীটিই হরিদ্বারে লোকজন ডেকে ধরাধরি ক'রে নামিয়ে দিয়েছেন। চেকাররা ভীড় ক'রে এসেছিলেন ভীড় দেখে, তাঁরাই খোঁজ ক'রে পকেটে টিকিটটাও পেয়েছেন, কিন্তু অতঃপর কি করা উচিত ভেবে পান নি। অনেক আলোচনার পর স্টেশন-মাস্টারকে খবর দেওয়া সাব্যস্ত করেছেন। তিনিও সম্ভবত এত বড় গুরুতর সমস্যা মীমাংসার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে ভরসা না হওয়ায় ওপরওলাদের জানাতে চেষ্টা করেছিলেন

টেলিফোনে। সকলেরই মত, 'কোনমতে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।' কিন্তু সে ভারটা নেয় কে—এইটেই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইতিমধ্যে চারিদিকে যে বিপুল জনতা জমে উঠবে—সেটা সহজেই অনুমেয়। দু-একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি (প্রাজ্ঞ নয়ই বা কে ? বিশেষ এই সব ঘটনাস্থলে) নাড়ি দেখে চোখের পাতা টেনে রহস্যময় ভাবে ঘাড় নাড়ছেন মধ্যে মধ্যে—তাতে লোকটার ব্যাধি নির্ণয়ের কি সুবিধা হবে তা না বুঝেই বাকী লোক সসম্ভ্রমে চেয়ে আছে।

ঠিক সেই সময়েই ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসেছে রামস্বরূপ মাথুর।

রামস্বরূপ এই হরিদ্বারেরই অধিবাসী। অন্তত সাময়িক ভাবে। মানে সে এখানকার 'নগরপালিকা' বা সিধে বাংলায় 'মিউনিসিপ্যালিটি'তে কাজ করে। বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। কনখল খালের ধারে একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া ক'রে থাকে। এক 'মাহারিন্' এসে দু'বেলা ঘরে ঝাড়ু লাগিয়ে 'বর্তন' মলে দিয়ে যায়। খায় কোন দিন হোটেলে, কোন দিন স্বপাকে। বিয়ে করে নি, আত্মীয়স্বজন কেউ আছে বলেও জানা যায় না। মাঝে মাঝে ইন্দোর থেকে এক দম্পতি এসে দু-চার দিন কাটিয়ে যায় ; রামস্বরূপ বলে বোন আর ভগ্নীপতি। কিন্তু পরে জানা গেছে বোনটা এক বন্ধুর, এবং ভগ্নীপতিও আর এক বন্ধু।

এসব তথ্যই পরে জেনেছেন কিরণবাবু, বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে, একটু একটু ক'রে।

রামস্বরূপ এগিয়ে এসে কাউকে বা ঠেলে কাউকে বা ধমক দিয়ে সরিয়ে কাছে এসেছে, তারপর নাকে হাত দিয়ে এবং নাড়ি দেখে—এখনও প্রাণ আছে বুঝে তুলে বসিয়ে একেবারে কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছে।

তখন নানা দিক থেকে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

কেউ বা বলতে গেছে, 'বেওয়ারিশ মুর্দা কাঁহা লে যাতে হো ?' কেউ বা অধিকারের প্রশ্ন তুলেছে।

রামস্বরূপ ধমক দিয়ে উঠেছে, 'মুর্দা ? এখনও যে লোকটা নিঃশ্বাস ফেলছে সে মুর্দা ? কেমন বেওকুফ্ তোমরা ?'

এগিয়ে এসেছে এক রেলের কর্মচারীও।

'একে নিয়ে যাচ্ছ, তুমি কে ? এ তোমার কে হয় ?'

'আমার জান-পছানা।' গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছে রামস্বরূপ।

'এঁর নাম কি, পাত্তা কি—জানো?'

'জানি বৈকি।' এসময়ে আমতা আমতা করলে একটা মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ত—তা রামস্বরূপ বুঝেছিল। সে গোলমালের নিষ্পত্তি ক'রে লোকটাকে এখান থেকে বার করতে হ'লে আর বার করারই দরকার থাকবে না। তাই সে কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে বলেছে, 'কিদার রায়—বাড়ি কলকাত্তা, বড়তলা।'

অনেকদিন আগে কলকাতায় ছিল রামস্বরূপ—তখন এইসব নাম পদবী-গুলো শুনেছিল। তার মধ্যে যেটা প্রথম মনে এল, সেটাই বলে দিল। মহল্লাও—বালিগঞ্জ, কালিঘাট এমন কি শ্যামবাজার বাগবাজারও শুনেছে, পরে বলে-ছিল রামস্বরূপ। 'জী হাঁ, ইসব নাম শুনা হ্যায়—ইয়াদ ভি থা—লেকিন যৌন মহল্লা আচ্ছাসে জানতে হ্যায় ওহি নাম বোলনা চাহিয়ে না? হাম বড়তলামে ঠাহরা থা তিন মাহিনা, উধার কা গল্লিউল্লি সব মালুম হ্যায়। কোই চ্যালেঞ্জ করনেসে বোল সকেঙ্গে।'

সেদিক দিয়ে না গিয়ে একজন এগিয়ে এসে অন্য প্রশ্ন করেছিল, 'তা এভাবে ইনি একা আসছেন কেন? তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?'

রামস্বরূপ বলেছে, 'আমাকে খৎ ভেজেছিলেন স্টেশনে থাকতে, আমার ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেছে তাতেই এই বিপত্তি। কিন্তু এখন পথ ছাড়। নইলে এ লোকটা বাঁচবে না। ব্রাহ্মন লোক, পথে খায় না কিছু—তার ওপর বেমার আদমি—দেখছ না কি অবস্থা!'

আর কেউ বাধা দেয় নি। স্টেশন মাস্টার তো দেবেনই না। ঘাড় থেকে একটা এত বড় দায়িত্ব নেমে গেল, সেই ভাল।

রামস্বরূপ রিকশায় চাপিয়ে সোজা নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল 'বাংগালী হাসপাতাল' বা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে। সেখানের ডাক্তার দেখে বলেছেন, 'রক্তের চাপ অতিরিক্ত, তাতেই শরীর কাহিল হয়েছিল—তার ওপর, মনে হচ্ছে তিন-চার দিন কিছু খাওয়া হয় নি। তাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন নইলে অন্য কিছু—স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক নয়।'

কথাটা মিথ্যে নয়, পরে কিরণবাবুর মনে পড়েছিল—ছেলের সঙ্গে রাগা-রাগি ক'রে বেরোবার দিন মুখে জল পর্যন্তও দেন নি।

হাসপাতালে ছিলেন মাত্র চার দিন। প্রথম দিনটা স্যালাইন গ্লুকোজ দিতেই জ্ঞান ফিরেছে। তারপর দিন হাল্কা পথ্য ও ওষুধে আরও কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠে খোঁজ করেছেন কে তাঁকে এখানে দিয়ে গেল, তাঁর কি হয়েছিল? ইত্যাদি—

নানা কথার সৃষ্টি হবে বুঝে রামস্বরূপ আর হাসপাতালে রাখতে চায় নি। স্বামীজীদের, ডাক্তার সাহেবদের বলে ছাড় করিয়ে সোজা নিজের বাসায় নিয়ে গেছে। প্রথমটায় কিরণবাবু একটু শঙ্কিতই হয়েছিলেন। বাড়িতে কেউ নেই, ঠিকে ঝি ভরসা—এখনও কিছুদিন সাবধানে—যাকে তাকুতে থাকা বলে—সেইভাবে থাকতে হবে ডাক্তাররা বার বার বলে দিয়েছেন। রামস্বরূপ কি পারবে এতবড় ঝক্কি একা সামলাতে? বিশেষ ক'রে ওকে যখন চাকরি ক'রে খেতে হবে।

কিন্তু দু-চার দিনেই বুঝলেন সে শঙ্কা অমূলক। রামস্বরূপ তাঁকে যে যত্নে রাখল ততটা হাসপাতালে সম্ভব হ'ত না। রামস্বরূপ নিজে চা খায় না, ওঁর জন্যে সে চা, কেটলি, ভাল বিস্কুট কিনে এনেছিল এই চার দিনের মধ্যেই। ভোরে উঠে ওঁকে চা বিস্কুট দিয়ে নিজের স্নান পূজো সারত। তারপর উনুনে আঁচ দিত, ওঁর মতো একটু ভাল পুরনো বাসমতী চালের ভাত আর আলু ছাড়া অন্য সব্জীর একটু ঝোল বানিয়ে দিত, তার সঙ্গে অন্য একটু 'শুখা' তরকারি। নিজের জন্যে রুটি করত। কখানা রুটি আর একটু দুধ কিরণবাবুর হাতের কাছে রেখে যেত—বিকেলে, খিদে পেলে খাবেন। এছাড়া কলা, আঙুর, 'সেও' অর্থাৎ আপেল এনে রাখত প্রচুর, সকালে কিছু জোর ক'রে নিজে খাওয়াত আর বলে যেত বিকেলে যেন নিশ্চয় খান কিছু। যে ঝি দু'বেলা ওর ঘরে ঝাড়ু লাগিয়ে বর্তন মলে চলে যায় তাকেই অতিরিক্ত দুটো টাকা কবুল ক'রে ব্যবস্থা করেছে—সে বেলা চারটে নাগাদ এসে চা ক'রে দেয় কিরণবাবুকে। রামস্বরূপ সন্ধ্যা বেলা এসে আবার চুলা ধরিয়ে রান্না করে—রুটি আর যা হয় একটা 'ভাজি'।

শুধু এ দৈহিক কষ্টই না, কিরণবাবু এসে পড়াতে অন্য অসুবিধাটাও যথেষ্ট হচ্ছে। ঘরে যে অদ্বিতীয় খাটিয়াখানি পাতা ছিল সেটাই ছেড়ে দিতে হয়েছে কিরণবাবুকে। নিজে বাইরের বারান্দায় শোয় একখানা কম্বল ও চাদর বিছিয়ে। দুদিন ঐ অবস্থা দেখে বাড়িওলারা একটা খাটিয়া ও বালিশ দিয়েছেন, তাই

রক্ষা। কিরণবাবু ব্যাকুল হয়ে নিজেই বাইরে শোবার প্রস্তাব করেছেন বারবার, প্রথমটা কর্ণপাত করে নি, শেষে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে।

এই সময়গুলোতেই চোখে জল এসে যেত কিরণবাবুর, নিজের ছেলের কথা স্মরণ ক'রে।

সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য লাগে ওঁর—প্রায় পনেরো ষোল দিন কেটে যাবার পরও সে জানতে চায় নি ওঁর বাড়ি কোথায়, কে আছে সেখানে—কেন এভাবে একা এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছেন! বাড়িতে কোন খবর দেওয়া দরকার—সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় নি। সত্যিই একবস্ত্রে—নিঃসম্বল। সঙ্গে যে টাকার খামটি ছিল, সেটি ভীড়ের মধ্যেই কেউ চক্ষুদান ক'রে থাকবে। পাশের পকেটে কয়েক আনা মাত্র পয়সা পাওয়া গিছল—হাসপাতালের খাতায় সেই রকমই লেখা আছে। তিনি নিঃসম্বল হয়েই বেরিয়েছেন সেইটেই ভাবা স্বাভাবিক। কারণ একটা বাক্স বা সুটকেসও পাওয়া যায় নি, যে ভদ্রলোক নামিয়ে দিয়েছেন তিনিও বলে গেছেন স্টেশনের কর্মচারীদের, সঙ্গে কিছুই ছিল না। টাকা ছিল, বাড়তি ভাড়া দিয়েছেন, সে খাম সম্ভবত পকেটেই আছে।

এ ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করে নি রামস্বরূপ। বরং এমন সহজ ব্যবহার করেছে যেন ওঁর সমস্ত ইতিহাসই সে জানে, যেন বহুকালের পরিচিত উনি, নিকট আত্মীয়।

দেখেন আর নিঃশ্বাস পড়ে কিরণবাবুর। মনে হয় এই রামস্বরূপই যদি ওঁর সত্যিকার ছেলে হ'ত! এর চেয়ে শান্তি বা তৃপ্তি, জীবনের পূর্ণতাবোধ তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। এর চেয়ে সৌভাগ্য মানুষের আর কিছু নেই—একটি সুপুত্র লাভ।

তাঁর জন্যে খরচাও হচ্ছে ঢের, কিরণবাবু চোখেই দেখছেন। রামস্বরূপের কত আয় তা তিনি জানেন না, জিজ্ঞাসা করতেও সঙ্কোচে বাধে। তবে বেশভূষা চালচলনে যতটা বোঝা যায়—একেবারে কনিষ্ঠ কেরানী না হ'লেও খুব একটা উচ্চপদস্থ কিছু নয়। তাছাড়া এখানের নগর-পালিকার কর্মচারী—কতই বা মাইনে হবে। শুধু ওষুধ কি পথ্যই তো নয়—কাপড় জামার খরচও টানতে হচ্ছে বেচারীকে।

দেখেন, লক্ষ্য করেন—এবং লজ্জাবোধ করেন। ছেলেটির ঔদার্য শুধু নয়,

মহাপ্রাণতার একটু বেশী সুযোগ নিচ্ছেন না কি ? অথচ সম্পূর্ণ অকারণই এটা। তিনি তো নিঃস্ব নন, পরনির্ভরশীল পরভৃত হয়ে থাকার কোন প্রয়োজনই নেই।

বারবার বলতে যান, কিন্তু কোথায় যেন একটা বাধে—দুদিনের এই সম্পর্কের মধ্যে টাকা-আনা-পাইয়ের কথা আনবেন ? এ ছেলেটি এতই মহৎ, এই এক মাস দেড় মাসে এত আপন হয়ে গেছে—এর কাছে খোরাকির কথা তুলতে নিজেরই লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

তবু বলেই ফেলেন একদিন কথাটা, কতকটা মরীয়ার মতোই। বলেন, 'বাবা, আমার অবস্থা একেবারে খারাপ নয়। ব্যাঙ্কে কিছু টাকাও আছে, বাড়ি ঘর অন্য সম্পত্তিও আছে কিছু কিছু। পৈতৃক টাকা ছিল, বড় চাকরিও করেছি, টাকা যা লগ্নী করেছি তাতেও কম আয় হয় না। বাড়ি ছেড়েছি অন্য কারণে। তবে—কাপড় জামা কি বিছানা না থাকলেও টাকা সঙ্গে ছিল। হাজারখানেক টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলুম, ওগুলো কিনে নেব, এই জন্যেই। বেহুঁশ অবস্থায় কেউ চক্ষুদান করেছে। তবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে চেক বইয়ের তিন চারখানা পাতা ছিঁড়ে একটা পুরনো ব্যবহার-করা ডাকের খামে পুরে নিয়েছিলুম—সেটা পাশ পকেটে পড়ে ছিল, এখনও আছে। কেউ নেয় নি সেটা। তুমি যদি তোমার কি আর কারও য়্যাকাউণ্টে ভাঙিয়ে নিতে পারো তো হাজার কতক টাকা আনিয়ে নিই। মিছিমিছি তোমার এত খরচ করাচ্ছি—আমার আছে যখন—'

হঠাৎ যেন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে রামস্বরূপ, 'ব্যস্ ব্যস! ঐ পর্যন্ত। ফের টাকার কথা তুললে সব সম্পর্ক চুকে যাবে। টাকা খরচ করতে চাও, অনেক হোটেল আছে, এখানে, দেহ্‌রাদুনে, মুসৌরীতে—দেদার খরচ ক'রে বড়লোকের মতো, সাহেবদের মতো থাকতে পারো। আমার কাছে থাকতে হ'লে এই খেয়ে এইভাবে গরিবের মতো থাকতে হবে—আমার যা জোটে তাই ভরসা ক'রে। আমি কি হোটেল খুলেছি যে বাহ্মনকে খাইয়ে পয়সা নেবো ?'

ভয়ে চুপ ক'রে যান কিরণবাবু। এত সুখ এত আরাম এত শান্তি জীবনে পান নি। এ তিনি ছাড়তে পারবেন না। স্বর্গসুখ কাকে বলে তা ঠিক জানেন না, কিন্তু সবাই বলে কথাটা—না, তার বদলেও পারবেন না এই আশ্রয় ছাড়তে। এ ছেলেটার কাছে ভিক্ষায় খেয়ে থাকাও ঢের বেশী কাম্য।

এর পর যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিজের অবস্থাটা, আরও যন্ত্রণাদায়ক।

এ তো পর, পরস্যাপি পর। মাত্র এই মাসদেড়েকের পরিচয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা বুড়ো লোককে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে—এক জাত নয়, এক ভাষাভাষী নয়, জীবনযাত্রার কোথাও কোন মিল নেই। পথ থেকে কুড়িয়ে এনে গুরু আদরে রেখেছে বললেও সবটা বলা হয় না, মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। এক পয়সাও প্রত্যাশা করে নি। বরং নিজের কষ্টার্জিত পয়সা জলের মতো খরচ করছে ওঁর জন্যে। তিনি চোর কি বদমাইশ, দাগী আসামী কি লোচ্চা—এসব প্রশ্নই করে নি।

এর পাশে তাঁর ছেলে।

কী বলবেন ? বিউটি য়্যাণ্ড দ্য বাস্ট ? আলোর পাশে অন্ধকার ? কী বললে ঠিক বোঝানো যায় তা তিনি ভেবে পান না।

স্ত্রী মারা গেছেন তখন তাঁর মাত্র আটত্রিশ বছর বয়স। সবাই বলেছিল, এমন কি শাশুড়ি পর্যন্ত—আবার বিয়ে করতে। নিজের দৈহিক প্রয়োজন যে বোধ না হয়েছিল তাও না—তবু তিনি ও কাজে আর যান নি, ঐ একমাত্র ছেলে বাবলার মুখ চেয়েই। পাছে সৎমা এসে ওকে পর ক'রে দেয়—সে এলে তারও ছেলেপুলে হবে নিশ্চয়, তাদের জন্যেই একে 'দূর ছাই' করবে—এই ভয়েই তিনি আর বিয়ে করতে পারেন নি। অভিমানী আদুরে ছেলে তাঁর, মুখে কিছু হয়ত বলতে পারবে না, অনাদরে ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াবে, হয়ত বকে যাবে—কিম্বা কোথাও পালিয়ে যাবে নিরুদ্দেশ হয়ে। না, তার চেয়ে তিনি একটু অসুবিধে বোধ করেন সেও ভাল।

না, ছেলে বকে যায় নি। কিরণবাবুর, বলতে গেলে দিনরাত্রির সাধনায়, মানুষই হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে ; বিলেত যেতে চেয়েছিল, স্কলারশিপও পেয়েছিল একটা, উনিই যেতে দেন নি, ছেলে পর হয়ে যাবে, হয়ত সে দেশেই বসবাস করবে, মৃত্যুকালে দেখতেও পাবেন না—এই ভয়ে। তার বদলে তদ্বির করে—আরও বিস্তর টাকা খরচ ক'রে বিনা বিলিতি ডিগ্রিতেই বড় চাকরি করে দিয়েছেন। তারপর, আরও অনেক চেষ্টায় পরমাসুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়েছেন—গরিবের ঘরের মেয়ে—রূপ দেখেই ঘরে এনেছেন নিজেই বিপুল টাকা খরচ ক'রে। তাদের ঘর-খরচাও উনি বহন করেছেন, এমন কি আশীর্বাদের

নেকলেসটাও ওঁকেই কিনে দিতে হয়েছে।

এবার শান্তি পাবার কথা। শান্তি ও সুখ দুই-ই। যে সব কারণে অশান্তি হয় সাধারণত, সে সব কোন কারণই ছিল না তাঁর সংসারে। ছেলে বড় চাকরি করে, মোটা আয়। তার এক পয়সাও তাঁকে দিতে হ'ত না। ছেলেরও তেমনি তাঁর মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর নিজেরও আয় এবং সম্পদ যথেষ্ট। তিনটে লোকের সংসারে তিনটে ঝি-চাকর-রাঁধুনী। শাশুড়ি নেই যে বৌমার সঙ্গে অশান্তি বাধবে। কর্তৃত্ব নিয়ে অশান্তি হয়—বৌমা আসার পর তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে—সাধ করেই গৃহিণীত্ব তার হাতে তুলে দিয়েছেন। এটা বহুদিনের শখ তাঁর, ছেলের বৌ এসে সংসারের সব ভার নিজের হাতে তুলে নেবে, মায়ের মতো তাঁকে স্নেহচ্ছায়ায় ঢেকে রাখবে—তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে অবসর ভোগ করবেন। ছেলেকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারতেন না—এবার একটু দেশ বিদেশে ঘুরবেন, তীর্থধর্মও করবেন।

কিন্তু কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই লক্ষ্য করলেন, তাঁর বৌমা এত সুখেও তৃপ্ত নয়। অকারণে বিরক্তি ও রুক্ষতা প্রকাশ পায় তার কথায়বার্তায় আচরণে। হয়ত ওঁরই দোষ—কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলেও নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে পারেন নি। বৌমা দু-একটা গুরুতর প্রশ্নে তাঁর মত জানবে, এটুকু এখনও আশা করেন, তাঁর খাওয়াদাওয়া এবং ওষুধ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখবে—এটা ধরেই নিয়েছিলেন, না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হন, অভিমান বোধ করেন, সেটা বৌমাকে জানিয়েও দেন। এতেই সে অসুখী বোধ করে, অপমানিতও বোধ করে হয়ত। বৌমা নিত্যই সন্ধ্যায় বেরিয়ে যান, ছেলের ছুটি হ'লে সিনেমায়—নয়ত একাই ট্যাক্সি ডেকে বাপের বাড়ি—ছেলে সেখান থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। অনেক রাত্রেই ফেরে। তখন কিরণবাবু কি খেয়েছেন, আদৌ খেয়েছেন কিনা—তা খোঁজ করা সম্ভব নয়, নিজেরা সব গরম না পেয়ে বৌমা রাঁধুনী ও চাকরের ওপর গরম হয়ে ওঠেন।

ছেলে এ ব্যবস্থায় কিছু প্রতিবাদ করবে এটা আশা করেছিলেন বৈকি। কিন্তু দেখলেন তার তেমন কোন ক্ষমতাই নেই। সেও অসুখী ভাব ভিন্ন কারণে। আসলে মুখরা ও প্রখরা স্ত্রীকে সে নিদারুণ ভয় করে, তাতেই একটা অস্বস্তি, দিনরাত উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না তার।

কিছুদিন দেখে কিরণবাবু ছেড়ে দেওয়া কর্তৃত্ব আংশিক আবার হাতে নেবার চেষ্টা করলেন ; কোথাও কোথাও তাঁর আদেশের সঙ্গে বৌমার ইচ্ছায় বা আদেশে সংঘাত বাধল। একদিন বলেই ফেললেন, 'নিত্য ঘরের বৌ একা বেড়াতে বেরোও—এটা আমাদের চোখে বড় খারাপ দেখায়। বাবলাকে একটা গাড়ি কিনতে বলো, নিজের গাড়িতে চড়ে অত দৃষ্টিকটু লাগে না।'

সর্প ক্রুদ্ধ হয়েই ছিল, এবার বঙ্কিমবাবুর ভাষায় 'লাঙ্গুলাবমৃষ্ট' হ'ল। সাধারণ প্রতিরোধ নয়—এ আপদ উন্মূলিত করার পন্থা খুঁজতে লাগল। এবং—দুরাত্মার ছলেরও অভাব ঘটে না, বিশেষ আমাদের সংসারে সে জানা কথাই।

'কুকুরকে ফাঁসি দেবার আগে একটা দুর্নাম রটানো দরকার' লেখাপড়া না জানলেও ইংরেজী এ প্রবাদ বাক্যের সত্যতা রত্নার জানা ছিল। ওঁদের রাঁধুনী ভোঁদার মা বহুদিনের লোক হ'লেও কিরণবাবুর চেয়ে অন্তত পনেরো ষোল বছরের ছোট। সে দশ বছর এ সংসারে আছে, নির্বিরোধী মুক্তহস্ত মনিবকে সে যত্ন করবে এটা স্বাভাবিক। বিশেষ বৌমা আসার পর নিজের টাকায় চালিত নিজের সংসারে লোকটা চোরের মতো, ভিখিরীর মতো থাকে—এটা যে কোন ভৃত্যেরই চক্ষুশূল হবার কথা, যে দশ বছর এ সংসারের বস্তুত গৃহিণীর মতো আছে তার তো হবেই। সে ইদানিং একটু বেশীই যত্ন করত, সেটা কিরণবাবুও লক্ষ্য করতেন। তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতেন। সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এবার পূজোয় তাকে একখানা তসরের ধুতি কিনে দিয়েছিলেন।

এতেই রত্নার সুবিধা হয়ে গেল। ভোঁদার মার নামের সঙ্গে শ্বশুরের নাম জড়িত করে চরম কুৎসা গেয়ে বেড়াতে লাগল সে। আত্মীয়স্বজন কুটুম্ব মহলে কারও আর জানতে বাকী রইল না। এ নিয়ে ঝগড়া করা যায় না, সরল মনে ঢিল ছুঁড়লে নিজের গায়েও তার ছিটে লাগে। কিরণবাবু ভোঁদার মাকে হাজার খানেক টাকা ও একটা বিছে হার দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। সে চোখের জল মুছতে মুছতে বিদায় নিল, এবং যাবার আগে চেঁচিয়ে সকলকে শুনিয়ে রত্না সম্বন্ধে তার মনোভাব জানিয়ে গেল। যাকে বলে 'A piece of her mind' এবং উপসংহারে ওর নিত্য বাপের বাড়ি যাওয়ার মূলে যে ভাই সম্বন্ধেই অশোভন আকর্ষণ, দাদাবাবু গাড়ল বলেই দেখতে পায় না—এ ইঙ্গিত দিয়ে যেতেও দ্বিধা করল না।

অগ্নি অসহ উত্তাপে তরল হয়ে ছিল, এবার তা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগারের আকার ধারণ করল। হেন কুকথা নেই যা শ্বশুর সম্বন্ধে বলল না রত্না। যে দু-দিন নতুন রান্নার লোক না পাওয়া গেল সে দুদিন নিজেদের রান্না করল, শ্বশুরকে খেতে দিল না। কিরণবাবুকে বাজারের খাবার আনিয়ে জীবনধারণ করতে হ'ল। সে পথও বন্ধ করল রত্না। পুরনো ঝি চাকর দুজনকেই তাড়িয়ে বাপের বাড়ি মারফৎ নতুন লোক সংগ্রহ করল, তাদের বুঝিয়ে দিল বুড়ো-বাবুর মাথা খারাপ, ভীমরতি মতো হয়েছে, ওঁর কোন কথায় কান দেবার দরকার নেই।

এইবার একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠায় একদিন কিরণবাবু বললেন, 'তোমরা অন্যত্র চলে যাও। আমার বাড়ি, আমি একাই থাকব।'

ফোঁস করে উঠল রত্না, 'ইস্! বেরিয়ে যাব! বেরিয়ে যাওয়াচ্ছি। বেরোতে হয় বুড়ো মড়া তুমি বেরোবে। আমরা যাবো কোন্ দুঃখে? বেশী ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করতে চাও তো গুণ্ডা ডেকে ঠ্যাং ভেঙে দেবো, ঘরে পড়ে যত খুশি চেঁচিও। জীবনে আর বেরোতে না হয় সেই ব্যবস্থাই করব। বেরিয়ে যাও! কেন, কিসের জন্য? আমরা থাকতে বুঝি বুড়ো বয়সে ঝি চাকর নিয়ে রস করার খুব সুবিধে হয় না। চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে থাকবে বলে দিচ্ছি, ভিক্ষের মতো দুটো ভাত ফেলে দেবো, তাই খাবে। লজ্জাও করে না মেজাজ দেখাতে?'

এর ওপর চূড়ান্ত হ'ল, পরের দিন ছেলে যখন এসে বললে, 'আজকাল নানা রকমের ট্যাক্স হয়েছে, ডেথ ডিউটি, ওয়েল্‌থ ট্যাক্স, সাকসেশন ট্যাক্স—আপনি আমার কি আপনার বৌমার নামে একটা দানপত্র করে দিন, এই দুটো বাড়ি আর যা শেয়ার বা এফ-ডি আছে। কারেন্ট য়্যাকাউন্টে যা আছে তা থাক—দরকার হয় আপনি খরচপত্র করতে পারবেন—'

কিরণবাবুর কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হয় নি কথাটা শোনার পর। তারপর অতিকষ্টে বলেছিলেন, 'সে কি রে! তুই আমার এক ছেলে, যা আছে সবই তো তুই পাবি। তাছাড়া দানপত্র করতেও তো ট্যাক্স লাগবে, গিফ্‌ট্ ট্যাক্স, স্ট্যাম্প—'

'তবু সে অনেক কম। এ আপনি এখনও বেঁচে আছেন, যা লাগবে আপনিই

তুলে দিতে পারবেন। আপনি মারা গেলে তখন এ টাকায় তো হাতই দিতে পারবো না—সাকসেশন সার্টিফিকেট নেব কোথা থেকে ?'

কথাটা ভাল লাগে নি। অথবা বহুদিনের অবরুদ্ধ রোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। উনি বলেছিলেন, 'না, সে আমি পারব না। বৌমার যা মতিগতি দেখছি, সর্বস্ব দিয়ে দিলে যদি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন তো খাবো কি, যাবো কোথায় ?'

'আপনার তো যা দেখছি, পুরো ভীমরতি এসেছে। কদিন বা বাঁচবেন ? ব্যাঙ্কে যা নগদ আছে তাতেই চলে যাবে—'

'তা হলে এ ট্যাক্স, কি, স্ট্যাম্পের টাকাটা থাকবে কোথা থেকে—?'

'সে না হয় আমি দেব।'

'না, সে আমি পারব না। তোমাদের মতলব ভাল নয়। এখন ভীমরতি দেখছ, এবার পাগল বলবে।'

'সে আর মিথ্যে কি !' ছেলেও সদর্পে উত্তর দিয়েছিল, 'আপনার বৌমা যা বলে তাই তো সত্যি দেখছি ! যে টান ভোঁদার মার ওপর—গয়না টাকা তো দিয়েইছেন, এখন যদি তাকে বিয়ে ক'রে ঘরে এনে ঢোকান তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন আমরা কোথায় দাঁড়াব ?'

'সে ক্ষমতা কি ক'রে দিই নি ? দেড় হাজার টাকা মাইনে পাস—ইঞ্জিনীয়ার —দুটো লোকের সংসার টানতে পারবি না ? এখনই বাপের টাকা ট্যাঁকে পুরতে না পারলে চলছে না ?'

'ও, তাহলে সত্যিই আমাদের তাড়াবারই মতলব আপনার। আশ্চর্য, আমি এতকাল কিছুই চিনি নি, আপনার বৌমা দুদিন এসেই আপনাকে ঠিক চিনে নিয়েছে। আচ্ছা, দেখি—কেমন আমাদের লিখে না দিয়ে পারেন।'

এরপর যা শুরু হ'ল—অকথ্য নির্যাতন। মানুষ বোধ হয় ক্ষ্যাপা কুকুরের সঙ্গেও এ ব্যবহার করে না। কিন্তু যতই ওদিক থেকে চাপ আসে, ততই রোখ বেড়ে যায় কিরণবাবুর, তিনি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেন সব।

কিন্তু এ দুজনও যেন ক্ষেপে ওঠে এবার, রীতিমতো। শেষে একদিন ছেলে একটা দলিল ক'রে নিয়ে এসে সামনে ফেলে দিয়ে বলল, 'হয় সই করুন, নইলে আজই আপনার শেষ।' চেয়ে দেখেন, হাতে একটা এত বড় ছোরা। দরজা

আগলে সে দাঁড়িয়েছে—ছুটে পালিয়ে যাবেন সে পথ আর নেই।

কিরণবাবু বলেছিলেন, 'সেই ভাল। তুই শেষই ক'রে দে, এ বিষয় তোকে আর ভোগ করতে হবে না কোনদিনই—তাতেই আমার শান্তি। ফাঁসি যদি নাও দেয়—চোদ্দ বছর জেল তো খাটতে হবে—কী সুখ, কী ঐশ্বর্য ভোগ করলি আমাকে মেরে ফেলে তাই আমিও দেখতে চাই—'

বাবলাও বোধ করি স্ত্রীর ক্রমাগত প্ররোচনায় পাগল হয়েই গিয়েছিল, তার দুই চোখ করমচার মতো লাল, সমস্ত ভঙ্গীটাই উদ্‌ভ্রান্ত।

হয়তো সেদিনই শেষ হয়ে যেতেন সত্যি সত্যিই—কিন্তু চাকরটা—নতুন হ'লেও এতটা তার সহ্য হয়্‌নি, কিম্বা হাঙ্গামার ভয় করেছিল, সে নীরবে ছুটে গিয়ে পাশের বাড়ির ভদ্রলোককে খবর দিয়েছিল। তাঁদের বাড়িতে অনেক লোক। চার-পাঁচটি ছোকরা ছুটে এসেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

তার পরও বাবলা যা কাণ্ড করেছিল, এখন এই নির্বান্ধব অবস্থায় দূর বিদেশে বসেও ভাবলে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়। 'ঐ লম্পট বুড়োটাকে আমি খুন করব—আপনারা আমায় ছেড়ে দিন। ফাঁসি যেতে হয় সেও যাবো। জানেন না ও কী করেছে, কী করছে! মানুষ নয়, নরকের কীট।' এই বলতে বলতে বার বার তাদের হাত ছাড়িয়ে তেড়ে আসতে চেয়েছে ছুরি হাতে করে ওঁর দিকে।

প্রতিবেশী বলহরিবাবু বলবান লোক, ছেলে ভাইপো ভাগ্নে—তরুণ বয়স্ক অনেকগুলি ছেলে নিয়ে বাস করেন। তাদের হাতে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডাই হ'তে হয়েছিল বাবলাকে। বলহরিবাবুর এক কথা, 'উনি যাই হোন, এ বাড়ি সম্পত্তি ওঁরই। ওঁকে বাবা বলে ডাকতে ঘেন্না হয়, তুমি দূরে সরে যাও, তোমাকে মানুষ ক'রে দিয়েছেন—পথে তো বসিয়ে দিচ্ছেন না। মানুষটাকে যখন অত ঘেন্না, তাকে বাপ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়—তার পয়সায় লোভ কেন? তাতে ঘেন্না হয় না? যাও, আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলুম, বাসা ঠিক ক'রে এসে তোমাদের মাল নিয়ে যেয়ো। নইলে অ্যাটেম্‌প্‌ট টু মার্ডার চার্জে পুলিশে দেব, এতগুলো সাক্ষী!'

শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর আপিসের একটি দারোয়ানকেও এ বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল রত্নার বুদ্ধি তার স্বামীর চেয়ে

বেশী। সে পরের দিন এসে সকলের সামনে শ্বশুরের পায়ে ধরে মাপ চাইল এবং পুনশ্চ জেঁকে বসল। তবে তার ফলে—সম্ভবত ভয়েই—সে চাকরটি সরে পড়ল, পরে রান্নার ঝি-টিও। হয়ত ভয়ানক রকমের কিছু ভয় দেখিয়েছিল তাদের—বা টাকা দিয়েই সরিয়েছিল। আবারও রান্না খাওয়া বন্ধ। ছেলে বৌ হোটেলে খায়, কিরণবাবুর জন্যে পাড়ার উড়ের হোটেলে ব্যবস্থা। লঙ্কা ও সর্ষে একেবারে সহ্য হয় না, নুন বেশী খেলে প্রেসার বাড়ে। বোধ হয় এসব জেনেই এই ব্যবস্থা। এধারে ওঁকে শুনিয়েই প্রত্যহ বলে, 'এখনই হয়েছে কি, ওকে পাগল সাব্যস্ত ক'রে যদি পাগলা গারদে না পুরতে পারি তো আমি শিবু ভটচাযের মেয়ে নই। গুণ্ডা এনে আমাদের জব্দ করবে? করুক।'

আর সহ্য হ'ল না। প্রাণের ভয়ও হ'ল। এ মেয়ে সব পারে, বিষ দিয়ে মারাও আশ্চর্য নয়। তার ফলেই তুদিন উপবাসী থেকে নিজের বাড়ি থেকে বাড়ির কর্তা অমন একবস্ত্রে চোরের মতো বেরিয়ে এসেছিলেন!

যত দিন যায়—কিরণবাবু রামস্বরূপের মাথায় তত জড়িয়ে পড়েন। প্রথম প্রথম ঝোঁকের মাথায় সেবা হয়ত অনেকেই করে কিন্তু তারপরেই ক্লান্তি আসে, সে ক্লান্তি ক্রমশ বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়। কিন্তু এ ছেলেটার অরুচি নেই, ক্লান্তি নেই, দিনরাত অস্খলিত সেবায় ঘিরে রেখেছে তাঁকে। বরং আচ্ছন্ন অভিভূত করে রেখেছে বলাই উচিত। কোন মানুষ যে কোন মানুষকে এমন সেবা করতে পারে তা জানা ছিল না তাঁর। বাপ করে সন্তানকে, হয়ত মাও করে—কিন্তু এমনটা কখনও শোনেন নি, চোখে না দেখলে বিশ্বাসও হ'ত না।

কিন্তু কেন, কী এমন, পেল রামস্বরূপ তাঁর মধ্যে? এ টান কিসের?

সেইটেই তিনি বুঝতে পারেন না।

আর বুঝতে পারেন না কিভাবে এর এই ভালবাসার (নিঃস্বার্থ আবরণকে অন্য কি নাম দেওয়া যায়?) সামান্য কিছু প্রতিদান দেবেন।

একদিন অতি সন্তর্পণে (সেদিনের ধমক খাবার পর ভারী ভয় হয়ে গেছে তাঁর) কথাটা পাড়েন, 'বাবা রামস্বরূপ, আমার খুব ইচ্ছে করছে—গঙ্গার তীরে বা কাছাকাছি একটা ছোট বাড়ি করি। দেখব খোঁজ ক'রে? তুমি কি বলো?'

'আমি কি বলব? আপনার বিস্তর টাকা আছে। আপনি খরচ করবেন—

তার মধ্যে আমার কথা উঠছে কেন ?'

'না, মানে—সে বাড়ি হ'লে তুমি থাকবে ?'

'না।'

'তাহলে আর বাড়ি কেনার মানে কি হ'ল ? তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে রাজী নই।'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'তুমি না হয় এখানে যে ভাড়া দিচ্ছেলে তাই দিও।'

'ও তো নিজের সঙ্গে জুচ্চুরি। যে বাড়ির তিনশো টাকা ভাড়া হতে পারে —সে বাড়ির জন্য পঞ্চাশ টাকা দেব।'

আস্তে কাছে সরে আসেন কিরণবাবু, ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'রামু বেটা, তুমি তো আমাকে বাপের মতো দেখো—তোমার বাবা এই বাড়ি কিনতে চাইলে তুমি এমন করে না বলতে পারতে ?'

ঠিক যেন হঠাৎ বিছে কামড়াবার মতো চমকে লাফিয়ে উঠে দু হাত দূরে সরে যায় রামস্বরূপ। মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে তার দেখতে দেখতে। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে ওঠেন কিরণবাবু। কিন্তু সে বিস্ফোরণ ঘটে না। কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে সামলেই নেয় নিজেকে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে কেমন এক রকমের ভাঙা গলায় বলে, 'আপনারা—বড়-লোক বিষয়ী লোকেরা অনেক রকম ফিকির জানেন। যা খুশি করুন, বাড়ি করতে হয় করুন কিন্তু সে বাড়ি আমাকে লিখে দেবার কৌশল করবেন না। তা হ'লে আমিও একদিন সরে পড়ব না বলে।'

'ঠিক আছে। আমি রামকৃষ্ণ মিশন কিম্বা কোন সাধুদের আখড়ায় দিয়ে যাবো। শুধু লেখা থাকবে তুমি যতদিন বাঁচবে ততদিন ও বাড়ি তুমিই পুরো ব্যবহার করবে।'

'না।' কঠিন শব্দ ক'রে ওঠে রামস্বরূপ, 'আপনি না থাকলে কি হবে সে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি এখানেই থাকব আর এই চাকরি করব—তাই বা আপনাকে কে বললে।'

আর কথা বাড়ান না কিরণবাবু, তাঁর আশা এবার নতুন আলো দেখেছে। তিনি এই ছেলেটাকে নিয়ে নতুন ক'রে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখছেন। ইতি-

মধ্যেই অ্যাটর্নীকে চিঠি দিয়েছেন, ব্যাঙ্কে লিখেছেন—তাঁর বিনা অনুমতিতে যেন কেউ না কোন টাকা তুলতে পারে। অ্যাটর্নীকে বলেছেন, ছুটো বাড়ির খদ্দের দেখতে। আর বলেছেন, তাঁর এই ঠিকানা যেন কেউ না জানতে পারে। বিষয়ী মানুষ নিজের বৃত্তে এসে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন।···

হরিদ্বারে বাড়ি বায়না হয়ে যাবার পর একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর কিরণবাবু রামস্বরূপের ছুখানা হাত ধরে বলেন, 'বেটা আমার একটা কথা শুনবে? আমি একটা ভিক্ষা চাইব তোমার কাছে।'

রামস্বরূপ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে যায় খানিকটা ; বলে, 'তোমার মতলব ভাল না। তুমি লোক খারাপ। আমাকে একটা আরও কি প্যাঁচে ফেলতে চাইছ।'

রামস্বরূপ 'তুমি'-ও বলে, 'আপনি'-ও বলে—যখন যেটা মুখে আসে।

আর ভূমিকা করতে সাহস হয় না। আসল কথাটাই বলে ফেলেন কিরণবাবু, 'তুমি বাবা এইবার একটা বিয়ে করো, তোমার প্রতিদিন এই কষ্ট—তাছাড়া এখনও বয়স আছে, এরপর আর পারবে না, তখন কে দেখবে তোমাকে? তুমি বললে আমি লোক লাগাই—ভালো সদ্‌বংশের একটি মেয়ে দেখি। না, রূপ চাই না, রূপে ঘেন্না হয়ে গেছে—ভালো বড় বংশের একটি মেয়ে—? তুমি 'না' বলো না, লক্ষ্মী বাবা আমার!'

রামস্বরূপ এতদিনে ওঁর পুরো কাহিনীই শুনেছে। সে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে বলে, 'কেন, একবারও কি শিক্ষা হয় নি? আবার আমিও গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দোব—এই কি চাও?'

'না, সে তুমি করবে না। পারবে না। এটুকু আমি এই ক মাসে বেশ বুঝেছি। আমার ছেলেকে আমি শিক্ষা দিতে পারিনি, আদর দিয়েছি, পাস করিয়েছি, বিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে চাকরি ক'রে দিয়েছি, কিন্তু মানুষ করতে পারি নি। তোমার বাবা তোমাকে মানুষ করেছেন, তুমি একটা আওরতের হাতে পুতুল বনবে না।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে রামস্বরূপ, তারপর প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'সে আর হবার জো নেই, জিন্দিগীর মতো বন্ধ হয়ে গেছে সে পথ। আমি

মরা বাবার নামে কিরিয়া কেটেছি, এ জীবনে বিয়ে করব না। এ কথা আর কোন দিন উঠিও না, এই আখেরি বাৎ।'

'কিন্তু কেন—তাও কি শুনতে পাবো না?'

আরও একটুখানি নীরব থেকে উত্তর দেয় রামস্বরূপ, বলে, 'হ্যাঁ, জানবে। বলছি। কিন্তু কোনদিন আর এর পর এসব কথা তুলবে না। তাহলে আমি এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবো, আর কোনদিন দেখা পাবে না।······ আমিও মা-মরা, বাপের এক ছেলে। বাবা গরিব ইস্কুল মাস্টার ছিলেন, তবু প্রাণপণে খেটে রোজগার ক'রে আমাকে মানুষ করেছিলেন, মায়ের অভাব টের পেতে দেন নি। যখন বি. কম পাস করলুম, তখন ওঁরই দু-তিনজন পুরনো ছাত্রকে ধরে আমাকে একটা ব্যাঙ্কে চাকরি ক'রে দিয়েছিলেন। ফৈজাবাদে আমাদের বাড়ি, লক্ষ্ণৌতে চাকরি হ'ল। বাবা নিশ্চিন্ত হলেন। বোধ হয় আপনারই মতো সংসার পাতবার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেদিন।···কিন্তু পাস করার পর চাকরি পাবার আগে পর্যন্ত বসে না থেকে শর্ট হ্যাণ্ড টাইপের কাজ শিখছিলুম একটা ইস্কুলে। সেখানে একটা মেয়েও আসত। আমারই বয়সী হবে, কি দু-এক বছরের বড়, দেখতে তেমন ভাল না—কিন্তু অনেক রকম ছলা জানত। সেটা এখন বুঝতে পারি—তখন তাকে সরলা দেবী বলে বোধ হয়েছিল। আসলে মেয়েটারই আমাকে পছন্দ হয়েছিল—সে যত রকম শয়তানী হাতিয়ার আছে সব কটাই ব্যবহার করেছিল, আমি পাগল হয়ে উঠেছিলুম তাকে পাবার জন্যে। কথাটা বাবার কানে উঠল ক্রমশ। ঐ মেয়েটাই সে ব্যবস্থা করেছিল, সেও পরে জেনেছিলাম। বাবা বেঁকে দাঁড়ালেন। বললেন, "ওদের বংশ নিচু, তা ছাড়া ওর স্বভাব চরিত্রও ভাল না। এমন আরও দুবার দুজনের সঙ্গে করেছে। ওর কথা তুই ভুলে যা।"

'আমিও সেই বাপেরই বেটা। নেশায় অন্ধ পাগল হয়ে গেছি। বললুম—ওকেই আমি বিয়ে করব—তুমি থাকতে না দাও, আমি অন্য জায়গায় বাসা ভাড়া করব। বাবা কম কথা কইতেন। বললেন—তার দরকার হবে না, আমি আত্মহত্যা করছি, তোমরা এখানেই থাকতে পারবে। বাবাকে চিনতাম, তিনি বাজে কথা বলছেন না। চমকে উঠলাম, কিন্তু এতখানি এগিয়েছি আমিও। বলে ফেললাম—বেশ, এ বিয়ে করব না। তবে অন্য কোনও মেয়েকেও করব

না, এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি গাললুম। আর কোনদিনই এ চেষ্টা করবেন না।

বাবার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল, কি সেদিকে নজর দেবার অবস্থা ছিল না আমার। সেদিনই, বলতে গেলে এক কাপড়ে—টিউশ্যনীর কিছু টাকা জমা ছিল তাই ভরসা ক'রে বাড়ি ছাড়লুম। বাবার ঠিক ক'রে দেওয়া চাকরি করব না—ঠিক ক'রে ফেলেছিলুম। প্রায় মাস দুই ঘোরবার পর মাথা ঠাণ্ডা হ'তে দেশে ফিরলুম। বাবার জন্যেই খুব মন খারাপ হয়েছিল। এতদিন কোনও খবরও দিই নি। দিল্লী থেকে একটা চিঠি দিয়ে দেশে ফিরে এলুম। এসে শুনলুম, এর মধ্যে অনেক হয়ে গেছে। সে মেয়েটা নাকি এসে খুব চেঁচামেচি করেছিল, আমি নাকি তার ধর্ম নষ্ট করেছি—অথচ ঈশ্বর জানেন, কোনদিন তাকে একটু চুমোও খাইনি—তাহ'লে বোধ হয় অত নেশা আর থাকতও না—সে আমাকে জেলে দেবে। মামলা করবে এই সব ভয় দেখিয়েছে। বাবাকেও গালাগালি করছে, তিনিই আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন এই বলে। বাবা গরিব হ'লেও মানী ব্যক্তি—তিনি এক হাজার টাকা ওকে গুণে দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করেছেন কিন্তু তারপর আর একদম বাড়ি থেকে বেরোন নি, কাউকে মুখ দেখান নি। সাতদিন পরে এক রাত্রে ঘুমের মধ্যেই মারা গিয়েছেন, চাকর সকালে এসে দেখেছে।'

'সেই থেকে এমনি আছি বাবুজী। পাগলের মতো ঘুরেছি বহুদিন। আত্ম-হত্যা করি নি, তাতে প্রায়শ্চিত্ত হ'ত না। বাবার জন্যই এই নোকরি নিয়েছি। বেঁচেছি আর ভগবানকে ডেকেছি—প্রায়শ্চিত্তের একটা পথ দেখিয়ে দাও। সে-দিন খুব অসহ্য কষ্ট হ'তেই—ছুটে স্টেশনে গিয়েছিলাম। আপনাকে দেখে মনে হ'ল ভগবানই হাত ধরে টেনে এনেছেন, আপনার সেবা করলেই আমার পিতৃ-ঋণ শোধ হবে। আমি আপনাকে চিনি না, বাবাকেই দেখেছি আপনার মধ্যে, আপনার গল্প শুনে আরও বিশ্বাস হয়েছে—আমার বাবাই আপনাকে টেনে এনে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার সেবার মধ্য দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে বলে। এখনও তাঁর দেহ যে আমাকে ঘিরে আছে এটাই তার প্রমাণ। কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত না হ'লে আমি স্থির হ'তে পারব না—এটা তিনি জানেন।······এই আসল কথা। বিয়ে, সংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখী হওয়া—

এসব আমার শেষ হয়ে গিয়েছে চিরদিনের মতো।'

এরপর নেমে এল এক অখণ্ড নীরবতা। না, সুষুপ্তির নীরবতা নয়। দু-জনেরই দুঃস্মৃতির স্তব্ধতা এটা।

রাত অনেক হয়ে গেছে, সমস্ত কনখল হয়ত বা হরিদ্বার শহরও সুষুপ্ত। বোধ করি শুধু এ বাড়ির এই দুটি মানুষই এখনও জেগে আছে। হয়ত সারা রাতই এদের এমনি বসে বসে কাটবে, অথচ এমনি নির্বাক নিশ্চল।

হরিদ্বার অঞ্চলে এই সময় রাত্রে একটা বাতাস ওঠে, সকাল আটটা অবধি থাকে। ঝোড়ো হাওয়ার মতো। গাছপালা কাঁপিয়ে, বন্ধ দরজা জানলার সামান্য ফাঁকে বা খাঁজে বিচিত্র একটা কান্নার মতো শব্দ তুলে এক সময় যেন আছড়ে পড়ে বাড়িগুলোর ওপর, তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে যায়—আবার প্রবলতর শব্দ তুলে যেন অধিকতর আক্রেশে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিন এ বাতাসের কোন বিশেষ অর্থ আছে বলে মনে হয় নি কিরণবাবুর, আজ মনে হ'ল পৃথিবীর বহু কোটি মানুষের সন্তপ্ত চিত্তের নিস্ফল হাহাকার একটা ভাগ্যের কাছে অবিরাম ব্যর্থ মাথা কুটছে।

অতি বড় রূপসী

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তপনের কথাটা বুঝতেই পারল না কেয়া। কী বলছে ও? কেয়া ঠিক শুনেছে কি শব্দগুলো? না কানে কম শুনছে আজকাল, এক শুনতে আর এক শুনেছে? না কি তপনেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এলোমেলো আবোলতাবোল বকছে? এতদিনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে উঠেছে, ইংরেজীতে যাকে বলে 'সেক্স্ রিপ্রেশ্যন'—তারই অবশ্যম্ভাবী ফল?

তপন বিয়ের প্রস্তাব করছে। তাকে বিয়ে করতে চায়!

তপন সুশ্রী, সুদর্শন—এবং এখনও যুবক। হয়ত পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স হয়েছে কিন্তু দেখায় আরও কম। মনে হয় আটাশ কি ত্রিশ বড় জোর। বেকার নয়, ব্যাঙ্কে চাকরি করে—অফিসার গ্রেড, বারোশো কি আরও বেশী মাইনে পায়। নির্দায় নির্ঝঞ্ঝাট। এক বন্ধুর বাড়ি পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকে, কিন্তু

ইচ্ছে করলেই আলাদা বাসা করতে পারে। অর্থাৎ টাকার লোভে ওকে বিয়ে করতে চাইছে তা মনে করবার কোন কারণ নেই।

তবে ?

কেয়া এককালে রূপসী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। উদ্ধত-যৌবনা, পুরুষের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠত ওকে দেখলে। কিন্তু আজ এই এতকাল পরে—সে রূপ-যৌবনের স্মৃতি মাত্র লেগে আছে ওর দেহে, দেখতে খারাপ লাগে না হয়ত, তবে চিত্ত-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার মতো কিছু নেই আর, পুরুষকে আকর্ষণও করে না।

না, রূপও নেই, রূপোও নেই আর। অর্থাৎ পয়সার লোভে, সম্পত্তির লোভে এ কাজ করতে চাইছে—তাও নয়।…

অনেকক্ষণ বিহ্বলভাবে তপনের মুখের দিকে চেয়ে থেকে স্খলিত কণ্ঠে কেয়া বলে, 'যাঃ! কী বলছ যা তা! নেশা ক'রে এসেছ নাকি ? না আমাকে পাগল পেয়েছ ? বিয়ে পাগলা—তাই নাচতে চাইছ।'

'না, আপন গড্! আমার মরা বাবার নামে দিব্যি গালতে রাজী আছি। …আর তুমিই বা এসব যা তা ভাবছ কেন! কেন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না ? এতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে! বিয়ের প্রস্তাব কি কেউ করে নি তোমার কাছে ? আমিই তো করেছি, এর আগেও।'

করেছে বৈকি। সত্যিই করেছে। অনেকে করেছে। কিন্তু সেই জন্যেই তো আরও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে প্রস্তাবটা। যে জন্যে সেদিন তারা পাগল হয়ে উঠেছিল, যে কারণে এই তপনও প্রস্তাব করেছিল আগে—সে কারণই যে আর নেই। সে যে বহুকালের কথা, মনে হয় বুঝি গত জন্মের ইতিহাস সে সব। তপন তখন আরও তরুণ ছিল—আজ বয়েসে অন্ততঃ পরিণত হয়েছে, কিন্তু তার বয়েস যতই বাড়ুক কেয়ারও সেই সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে যে! ব্যবধান তো আর তাতে ঘুচবে না। কেয়া যে তপনের চেয়ে কম ক'রেও পাঁচ-ছ বছরের বড়—সে সত্যটা থেকেই যাচ্ছে যে!

আসলে ওর এই রূপ—রূপ বললেও সব বলা হয় না, রূপ ও লক্ষণীয় যৌবন মিলিয়ে যে প্রবল আকর্ষণী শক্তি—সেইটেই যে কাল হ'ল ওর। জীবনে

সুখী হবার পথে, সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপন করার পথে—প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াল।

বি. এ. পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই মা বাবা উঠে পড়ে লেগেছিলেন ওর বিয়ের জন্যে। সেইটেই স্বাভাবিক। উনিশ বছর মাত্র বয়েস তখন—সবে কুড়িতে পড়েছে। বন্ধুরা কাব্য করে বলত, 'যৌবনসরসী নীরে "প্রস্ফুট" শতদল।' এ মেয়ের পাত্রের অভাব হয় না, বলা বাহুল্য ওরও হয় নি। অনেক বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ এসেছে, ভাল ভাল পাত্ররা যেচে সেধে এসে অনুনয় বিনয় করেছে। রাজী হয় নি কেয়াই। এত লোকের এই পাগল হয়ে বা রূপে মাতাল হয়ে ছুটে আসাটাওর ভাল লেগেছিল হয়ত—এটাই আরও কিছুকাল ভোগ করতে চেয়েছিল অথবা প্রশস্তি শুনতে শুনতে নিজের সম্বন্ধে ধারণাটাই অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সে সব কোন পাত্রকে নিজের উপযুক্ত মনে হয় নি। অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে, ঔদ্ধত্যের সঙ্গে। যাকে ইংরেজীতে বলে 'ডিস্‌ডেনফুলী।'

রূপের খ্যাতি ছড়িয়েছিল বহুদূর, সম্ভবতঃ এই সব প্রত্যাখ্যাত প্রার্থীদের মুখে মুখেই আরও। ছুটে এসেছিল ফিল্ম-ডিরেক্টর-প্রোডিউসারের দলও প্রথমটা কেয়াও একটু প্রলুব্ধ হয়েছিল বৈকি। 'প্রস্ফুট শতদল' দু-চার-দশজনের মুগ্ধ চোখের সামনে মেলে ধরলে বুঝি পূর্ণ তৃপ্তি হয় না, আরও বহু লোকের স্তুতি শুনতে চায় মন, দেখতে চায় পুরুষের চোখে সর্বনাশের আভাস। পতঙ্গের মতো নিজেদের পুড়িয়ে দেবার আকুতি। ছবিতে নামলে লক্ষ লক্ষ দর্শক পাবে সে, তাদের কামনা-চঞ্চল বিহ্বল দৃষ্টি অনুমানে উপভোগ করতে পারবে।

গিয়েছিল কিছুদিন, কিন্তু ভাল লাগে নি তার। সহ্য করতে পারে নি সে পরিবেশ, সে আবহাওয়া। দুটো ছবি শেষ করেছিল, প্রশংসা পেয়েছিল প্রচুর। দাক্ষিণাত্যের এক নবাব এবং নেপালের এক রানা বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। প্রশংসা অবশ্য অভিনয়-দক্ষতার নয়—সে প্রশংসা ঐ সর্বনাশিনী শক্তির—যা পুরুষ-চিত্তকে শিবের মতো ওর চরণতলে বুক পেতে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

তবু সেটাই একমাত্র কারণ নয়—ওর অভিনয়-নৈপুণ্য সম্বন্ধে কর্তাব্যক্তিদের মনে একটু কুণ্ঠা, প্রশংসার ভাষায় উচ্ছ্বাসের অভাব অথচ নতুন ছবির জন্য বুক করার প্রশংসা ; আসলে ঐ জাতটাই ওর কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। এই পৃথিবী ছাড়া আলাদা জগৎ ওটা। সবটাই কৃত্রিম। আগাগোড়া কৃত্রিমতায়

ভরা। কৃত্রিম জীবন, কৃত্রিম হৃদ্যতা—ওখানের প্রেমও কৃত্রিম। কেউ সহজ নয়, কেউ সত্য বলে না। ওর হাঁফ ধরে গিয়েছিল আট-দশ মাসেই। ওখানেও ওর অনেক প্রার্থী ছিল বৈকি—ওর পাগল-করা যৌবনের, ওর দেহটার। নানা লোকে নানা উপায়ে চেষ্টা করেছে সম্ভোগ করার—কিন্তু নিজের সম্বন্ধে অতুচ্চ ধারণাই ওকে রক্ষা করেছে সে পুরুভুজের সাংঘাতিক বন্ধন থেকে।

এরপর সোজাসুজি চাকরিতে ঢুকেছে কেয়া। ভাল, বড় চাকরি। এ চাকরি পেতে যে ওর অসুবিধা হবে না, সে তো জানা কথাই। কাউকে সুপারিশ করতে হয় নি, নিজেই যোগাড় ক'রে নিয়েছে, একেবারে অফিসারের পদবী। কিন্তু এ চাকরিও ওর কাল হয়ে দাঁড়াল। মাস গেলে মোটা টাকা হাতে এসে পড়াতে ওর সদ্য-রিটায়ার করা বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। বরং নিজের কর্মকালেও এতটা সচ্ছলতার মুখ দেখেন নি কখনও। বাবা মা নিশ্চিন্ত হলেন, ভাই বোনেরা মানুষ হ'ল, বোনের বিয়েও হয়ে গেল—অবশ্যই স্বয়ম্বর বিবাহ—কিন্তু ওরও যে বিয়ে হওয়া দরকার সেটা ভুলে গেল সবাই। আর কেউ উচ্চবাচ্যও করত না। কেয়া—বহুজনের আকাঙ্ক্ষার ধন—জীবনে কারও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে জন্ম নেয় নি, এইটেই ধরে নিয়েছিল সবাই। 'ওর যুগ্যি বর কোথায় যে ও বে করবে?' এই বলে কেয়ার মা নিজেও বোধহয় সান্ত্বনা পেতেন—আত্মীয় বা পড়শীদেরও কৈফিয়ৎ দিতেন।

অবশ্য একেবারে কেউ চেষ্টা করেনি বললে একটু অসত্য ভাষণ হয়। পাত্ররা—মানে সম্ভাব্য পাত্র—অনেক এসেছে, চেয়েছে ওকে বিয়ে করতে। প্রথম প্রথম অন্ততঃ। এমন কি পাত্র হবার বয়স যাদের পার হয়ে গেছে—এমনও কজন; বোঝাবার চেষ্টা করেছে পরিণতবয়সী স্বামী পেলে মেয়েরা সুখী হয়। যাদের বয়স হয় নি মানে ওর পাত্র হবার মতো, অর্থাৎ বয়সে ছোট—তারাও।

তাদের মধ্যে এই তপনও একজন। বরং বলা চলে প্রধান। কেয়ারই ছোট ভাইয়ের বন্ধু, প্রথম প্রথম দিদিই বলত। প্রায়ই আসত ওদের বাড়ি। মা নেই বলেই আসে—ভাবত ওরা। কেয়ার মা বিশেষ ক'রে। মা বাবা কেউ নেই,

একটা নিজের বোন পর্যন্ত হয় নি। একটি মাত্র দাদা আছেন আত্মীয় বলতে, তিনি দেশেই থাকেন, মাস্টারী করেন আর জমি জায়গা দেখেন। স্নেহবুভুক্ষু ছেলেটা মাতৃস্নেহ পেতেই এমন কাঙ্গালের মতো ছুটে আসে, সেই ভেবেই তিনিও যত্ন করতেন, আসতে বলতেন, ধরে রাখতে চাইতেন।

কেয়াও সেই চোখে দেখত। তাই প্রথম যখন বিয়ের প্রস্তাব করে তপন তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। পরে পীড়াপীড়ি করতে ধমক দিয়েছে। গুরুজনের মতো উপদেশ দিয়েছে আর একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করতে— মেয়ে খুঁজে দেবারও প্রস্তাব করেছে।

তাতেই চুপ ক'রে গেছে তপন, আসা-যাওয়াও কমিয়ে দিয়েছে। তবে একেবারে বন্ধ করে নি, মধ্যে মধ্যে আসে, এমন কি বিয়ের পরও কেয়ার নিজের বাসাতেও এসেছে। ফুল নিয়ে, মিষ্টি নিয়ে—ভাল বই নিয়ে গেছে। তবে সে ঘন ঘন নয়, দু-তিন মাস অন্তর। এতদিনে সে পাগলামীটা গেছে ছেলেটার—ভেবে কেয়াও সহজে গ্রহণ করেছে ওকে, হাসি তামশা করেছে, জোর ক'রে ধরে রেখে নিজে রেঁধে খাইয়েছে।

ঠিক যখন বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে বলে নিজেও ভাবতে শুরু করেছে কেয়া—তখন হঠাৎ এই প্রেমশংকর চোপরা আবির্ভূত হ'ল ওর জীবনে। বড় সাহেবের বন্ধু, নিজেও বড় অফিসার—তাছাড়াও কিছু লাভজনক ব্যবসা করে। অগাধ টাকা। বছর পঞ্চাশ বয়স, শক্তসমর্থ পুরুষ; বহু বছর বিলেত আমেরিকা কাটিয়েছে—কথাবার্তায়, আদবকায়দায় চোস্ত যাকে বলে, সে দেখা মাত্র ঝুঁকে পড়ল ওর দিকে। বড় সাহেব ভয় দেখিয়েছিলেন—'এ বরফ গলাতে পারবে না, তাতেই নাকি প্রেমশংকরের জেদ চেপে গিয়েছিল আরও। জীবনে সর্বক্ষেত্রেই জয়ী হয়েছে সে, একটা মেয়ের কাছে হার মানবে? বন্ধুর সঙ্গে বাজি রেখেই সে আরও উঠে পড়ে লাগল—এবং জিতেও গেল।

আসলে কেয়াও বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মনে মনে। শঙ্কিতও। 'এখনও ঢের সময় আছে' এ বিশ্বাস যতদিন থাকে মেয়েদের, ততদিন প্রত্যাখ্যান করার সাহস বা স্পর্ধার অভাব হয় না। সম্ভাবনাটা চলে যাচ্ছে চিরদিনের মতো—এই সন্দেহটা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেয়ারও সেই

বয়স এসে গিছল। সে শঙ্কা বা ব্যকুলতা বাইরে তত প্রকাশ পায় নি। এমনিও ওর মা-বাবার চোখে পড়ার কথা নয়। এ মনোভাব ওঁদের ধারণা বা কল্পনার বাইরে, ধারণা করাও অসুবিধেজনক। তাই প্রেমশংকরের কাছে অনেক অল্পেই ধরা দিল সে। বাধা এল—যাঁদের উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দেবার কথা তাঁদের কাছ থেকেই। ওর মা-বাবা বিরক্ত হলেন, মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে বেড়াতে লাগলেন। অবস্থা বুঝে প্রেমশংকর সোজাসুজি রেজেস্ট্রী বিয়ে ক'রে একেবারেই নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তুলল। বৌভাতের ব্যাপারটা সারল গ্র্যাণ্ড হোটেলে।

প্রেমশংকরের ফ্ল্যাটে গিয়ে প্রথমটা মনে হয়েছিল কেয়ার সে কোন রূপ-কথার দেশে এসে পড়েছে। কেয়া নিজে ভাল চাকরি করেছে—কিন্তু এ প্রাচুর্য ওর স্বপ্নেরও অগোচর। এক-একখানা বিছানার চাদর আড়াইশো-তিনশো টাকা। এক-একটা পর্দার খরচ চার-পাঁচশো। শাড়ি কেনে পাঁচশো-আটশো। সিল্কের শাড়ি হাজার দু হাজার। গহনার রাশি এনে জড়ো করল। বলে, আরও কি চাই বলো। তুমি না পরলে পৃথিবীর এত শাড়ি গয়না সবই তো মূল্য-হীন।'

সে স্তুতির নেশা কেয়ারও লাগে। তার যৌবন বিগত-প্রায়, প্রেমশংকরের যৌবন অতিক্রান্ত। তবু মনে হয় বিবাহিত জীবনের চেয়ে বড় সার্থকতা মানুষের আর কিছু নেই। এত কাল যে এ সুখে বঞ্চিত ছিল তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। বরং তার সুদসুদ্ধ পুষিয়ে দিয়েছে প্রেমশংকর। প্রাণের পাত্র ভরতে দেরি হয়েছে কিন্তু ভরে গেছে কানায় কানায়। বরং উপচে পড়েছে।

কেয়া চাকরি ছেড়ে দেয়। প্রেমশংকরই ছাড়তে বাধ্য করে। বলে, 'তোমার এ দেহ ভগবান চাকরি করার জন্যে দেন নি। তুমি সুন্দর ফুলের মতো থাকবে—সুখে ও আরামে—এইটেই বিধি-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। তোমাকে সেই আরামে রাখার জন্যে আমরা পুরুষরা প্রাণপাত করব—তাতেই আমাদের পরিপূর্ণতা। এ সাফল্য এ সুখ থেকে বঞ্চিত ক'রো না লক্ষ্মীটি।'

দীর্ঘকাল চাকরি ক'রে ক'রে কেয়াও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচল। তারও ধারণা হ'ল, শুধু ভাল শাড়ি গহনা

পরে, বড় বড় হোটেলে খেয়ে, দামী গাড়ি চড়ে থিয়েটার সিনেমা দেখে বেড়াবার জন্যেই তার জন্ম—এতকাল বিধাতার ভুলেই শুধু তাকে ব্যর্থতা সহ্য করতে হয়েছে।

প্রেমশংকর চোপরার কত টাকা, কত আয় তা কেয়া জানত না। জানার চেষ্টাও করে নি কখনও। ইচ্ছামতো সব জিনিস মুখের কাছে এসে যাচ্ছে, ইচ্ছার আগেই আসছে অনেক সময়ে—সুতরাং মিছিমিছি টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! শুধু—এই ভাবে অকারণে বেহিসেবী খরচ করতে দেখে একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে প্রেমশংকরের অনেক টাকা। তাতেই নিশ্চিন্ত ছিল। ফলে টাকা যে দরকার-মতো, হিসেব ক'রে খরচ করতে হয়, সে কথা ক্রমশঃ কেয়ারও মনে রইল না আর।

কিন্তু পরে দেখা গেল প্রেমশংকরের এত টাকা ছিল না। বোধ হয় ওর ধারণা হয়েছিল একটা যে তার বয়স বেশী, এমনিভাবে বিশ্বসুদ্ধ বিলাসসামগ্রী কেয়ার পায়ে উজাড় ক'রে না দিলে সে কেয়ার ভালবাসা পাবে না। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতেই এই সর্বনাশের সাধনা তার। চাকরি—তা সে যত বড় হোক, তার আয় সীমাবদ্ধ। আপিস থেকে ওর আয় ছিল মাসিক চার হাজারের কাছাকাছি। ব্যবসা থেকে আরও হাজার দুই পেত। তাতে বারোশো টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে তিন-চারটে ঝি-চাকর রেখে বড় ঢাউস মার্কিন গাড়ি চালিয়ে নিত্য শাড়ি গহনা কিনে কুলনো যায় না।

সেটা বুঝল এবং অবস্থাটা জানল কেয়া অনেক পরে। বছর দুই পর থেকেই নাকি দেনা শুরু হয়েছিল। পরে সে ঋণ পর্বতপ্রমাণ হতে ব্যবসাটা বেচে দিতে হয়। তাতে দেনা শোধ হয় নি সবটা—অথচ অনেকখানি আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গিছল। খরচটার হাত বাড়িয়ে দিলে আর গুটিয়ে নেওয়া যায় না। ফলে ঋণের অঙ্ক বিপুলতর হয়ে ওঠে। শেষে শুধু বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, পেশাদার মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়, তারা সুযোগ বুঝে চড়া সুদ হাঁকে।

যখন একেবারে ডোবার মতো অবস্থা তখন একদিন সংবাদটা জানাল কেয়াকে। তাও ঋণের বিপুলতার কথাটা বলে নি—সাহসে কুলোয় নি। অনেক

আমতা আমতা ক'রে, মাথা চুলকে যা বলেছে শেষ পর্যন্ত—তার সারমর্ম এই:
ব্যবসার ব্যাপারে একটু অসুবিধে চলছে কিছুদিন ধরে, তাতেই কিছু দেনা হয়ে গেছে। ভেবেছিল সহজেই শোধ দিতে পারবে, সেই কথাই বলা ছিল মহাজনদের—এখন কড়ার মতো না পেয়ে বড় তাগাদা করছে তারা। কেয়া কি সামান্য কিছু দিতে পারবে, কয়েক মাসের জন্যে?

কেয়ার স্বচ্ছন্দ জীবনস্রোতে এই প্রথম যেন একটা বাধা এল। কোথায় একটা আঘাতও পেল সে। প্রেমশংকরের আয় ও সম্পদ অফুরন্ত—এতদিনে এমনি একটা ধারণা হয়ে গিছল, আঘাতটা সেইখানেই লাগল, সেই বিশ্বাসে।

তবু তখনও অত মাথা ঘামায় নি। যা ছিল হাতে—চাকরি ছাড়ার সময় আপিস থেকে যা পেয়েছিল তার সবটাই ধরে দিল প্রেমশংকরকে। তাতে প্রেমশংকরের এ বিপদ কাটল না। কাটবে না সে তো জানা কথাই, তবু কেন যে সে স্ত্রীর এই যথাসর্বস্ব বার ক'রে নিল তা প্রেমশংকরই জানে। হয়ত অত না ভেবেই নিয়েছিল। হয়ত ভেবেছিল এবার খরচ কমাতে পারবে—অথবা আশা করেছিল হঠাৎ কোথাও থেকে কিছু এসে যাবে। তার কোনটাই হ'ল না; হ'ল যেটা—এক বড় মহাজন নালিশ ক'রে বসলেন। আর সে খবরটা দৈবাৎ কেয়ার কাছে পৌঁছে গেল। এবারও সে কোন দ্বিধা করল না—প্রেমশংকরেরই দেওয়া বিপুল অলংকারের রাশি প্রেমশংকরকে দিয়ে দিল, 'এইগুলো বিক্রি ক'রে তুমি ওর টাকা শোধ করে দাও।'

সে ধাক্কা সামলালেও, এখানে থাকলে এমন ধাক্কা অবিরত আসতে থাকবে এবার, এটা প্রেমশংকর বুঝেছিল। এত দেনা শোধ ক'রে সামলে ওঠা অসম্ভব। ফলে অপমানের শেষ থাকবে না। আর তা বাঁচাতে গেলে হয় দেউলে হ'তে হবে নয় তো আত্মহত্যা ক'রে বাঁচতে হবে। এছাড়া যা করণীয় তাই করল সে, একদিন নিঃশব্দে কোথায় সরে পড়ল।

প্রথমটা বিশ্বাস হয় নি। যে-লোকটা এত ভালবাসত, বলতে গেলে পূজো করত ওকে—সে এখন কিনা বিদায়-সম্ভাষণে, ইঙ্গিতমাত্র না দিয়ে চিরকালের মতো ত্যাগ করতে পারে—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি। তাই কদিন শুধুই অপেক্ষা করল। তারপর সামান্য সামান্য খোঁজখবর। তখনও আশা—

নিজেই ফিরে আসবে প্রেমশংকর। কিন্তু যখন তিন মাস কেটে গেল তখন উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না।

তারপরই, সচেতন ও সক্রিয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই, একে একে দুঃসংবাদগুলো আসতে থাকল। চারিদিকে বিপুল ঋণ; ব্যবসা বহু পূর্বেই হস্তান্তরিত হয়েছে; চাকরিতেও ইস্তফা দিয়ে গেছে—এবং সেখানেও বিশেষ কিছু পাওনা নেই; যতটা সম্ভব টাকা ধার নিয়ে গেছে সে। হিসেব-নিকেশ ক'রে যেটুকু পাওনা হ'তে পারে, সেও অগাধ জলে এখনও। সহজে কেয়ার হাতে সেটা আসবে না।

পরে আরও জানা গেল—কোনদিনই আসবে না।

কেন আসবে না সে সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ নিতে গিয়ে জানল—কেয়া প্রেমশংকরের বিবাহিত স্ত্রী নয়। রেজেস্ট্রি হয়েছিল ঠিকই, তবে সেটা অসিদ্ধ। কারণ প্রেমশংকরের পূর্বেই একবার বিবাহ হয়েছিল এবং সে স্ত্রী এখনও জীবিতা। ভদ্রমহিলা আরবের মেয়ে—মিডল্ ইস্টে ঘুরতে ঘুরতে প্রেম হয়, বিবাহ হয় বিলাতে। প্রেমশংকর ত্যাগ করাতে তিনি আবার পিতৃগৃহে ফিরে এসেছেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদটা এখনও হয় নি। হয়ত তার প্রয়োজন বোঝে নি প্রেমশংকর। ওর বিবেক এসব তুচ্ছ তথ্য নিয়ে মাথা ঘামায় নি কখনও, এবারেও তাই এইভাবে ডুব দিতে অসুবিধে বোধ করে নি—অন্ততঃ বিবেকের দিক থেকে কোন বাধা আসে নি।

চরম সর্বনাশ ও রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন কেয়া চোখে অন্ধকার দেখল একেবারে।

যে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সে চাকরি আর পাবে না। কোথাও পাবে কিনা সন্দেহ। ছোটখাটো ইস্কুল মাস্টারী পেতে পারে—তাও বহু দুঃখে পেতে হবে নিশ্চয়, আর তার আয়ও দুশো-আড়াইশোর বেশী হবে না। ব্যাঙ্কে কিছুই নেই, বলতে গেলে হাজার কি পাঁচশোর মতো থাকতে পারে। গহনা বলতেও হাতের বালা আর গলায় বারোমেসে হার: কিছু কুচো জড়োয়ার গহনা আছে, তার বিক্রীমূল্য কিছু নেই। কিছু শাড়ি আর এই আসবাব। তেমনি বাড়িভাড়াও অনেক বাকী পড়ে আছে নাকি, পালাবার খবর শুনে মালিকরা জোর

তাগাদা শুরু করেছেন, বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছেন।

ইতিমধ্যে—বিহ্বলতা কেটে সক্রিয় হতে এবং সর্বনাশের পরিমাণ বুঝতে বুঝতেও তিন-চার মাস কেটে গেছে। ওর নিজেরও দেনা হয়ে গেছে বিস্তর। এ বাড়ি এখনই ছেড়ে দেওয়া ছাড়া পথ নেই।

কিন্তু কোথায় দাঁড়াবে সে, কি খাবে? বাবা মারা গেছেন, ভাইরা আলাদা। ছোট ছোট ফ্ল্যাটে কোনমতে মাথা গুঁজে থাকে। বড় এলাহাবাদে কাজ করে, মা সেখানেই থাকেন। আর বেশী ভার বইবার শক্তি নেই তার। ওর প্রাচুর্যের সময় ছোট ভাই বহুবার এসে বহু টাকা নিয়ে গেছে, হয়ত সেখানে গিয়ে উঠলে তাড়িয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু তার স্ত্রী অত্যন্ত মুখরা ও প্রখরা—রাগলে জ্ঞান থাকে না। স্বামীকে ধরে মারে, ছেলেমেয়ের গলা টিপতে যায়। সে হয়ত ননদকে ঝাঁটা মেরেই তাড়াবে।

না, আর কোন পথ কোথাও নেই। দেহ ভাঙিয়ে খাবারও অবস্থা নেই আর—যৌবন ও রূপে বয়সের ছাপ পড়েছে।

অনেক ভেবে দেখেছে সে। এখন একমাত্র যে পথ চোখে পড়ে তা হ'ল, এই দেহটাই ত্যাগ করা। অর্থাৎ আত্মহত্যা ক'রে সব সমস্যার সমাধান করা।

তাই করবে নাকি?

করতে হ'লে এখনই। আর কিছুমাত্র সময় নেই। অপমানিত হয়ে সকলের ধিক্কারের মধ্যে দিয়ে এ ফ্ল্যাট ছাড়ার আগে মানে-মানে সারে পড়াই ভাল।

কাল সারা রাতই ভেবেছে সে। আজ সকালেও ভেবেছে।

আর কোন পথই চোখে পড়ে নি দ্রুত অব্যাহতির।

শেষ পর্যন্ত এই একটু আগে মন স্থির ক'রে ফেলেছে। আর ভাবতে পারে না সে, আর ভাবার সময় নেই।

সেই ভাল। সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মরে বাঁচবে সে।

অনেকদিন ভাল ক'রে ঘুমোতে পারে নি, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে প্রাণ ভরে ঘুমোবে—চিরদিনের মতো।

সংকল্প ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকখানি স্বস্তি বোধ করেছে। নির্জন ঘরে হা হা ক'রে হেসে উঠেছে আপন মনে। ভাগ্যে ঝি-চাকর আর কেউ নেই

—জবাব দিয়ে দিয়েছে সে গত মাসেই—নইলে তারা পাগল ভাবত।

ঠিক সেই মুহূর্তেই এসে পড়েছে তপন।

ওর মুখ দেখে কি ভেবেছে কে জানে—হয়ত আসল কথাটাই অনুমান করতে পেরেছে। ওর বর্তমান মনোভাবটা।

বিনা ভূমিকাতেই এই প্রস্তাব করেছে সে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বিয়ের প্রস্তাব।

তপন কোনদিনই আগের সম্পর্ক একেবারে কেটে দেয় নি, তার সুখের দিনে আসত দৈবাৎ, হয়ত চার-পাঁচ মাসে একদিন। কেয়া নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালেও সব দিন আসত না, যা হোক একটা ছুতো ক'রে এড়িয়ে যেত।

কিন্তু বিপদের দিনে সে নিজেই ছুটে এসেছে।

বোধ হয় একমাত্র সে-ই এসেছে।

না, কেয়া খবর দেয় নি, ওকে যে খবর দেওয়া দরকার, কাউকে যে এ খবর দেওয়া যায়—তা তখন মনেও হয় নি ওর।

তপন অন্য কোন্ সূত্রে খবর পেয়েছে। আর পাওয়া মাত্রই ছুটে এসেছে—বিপন্নার পাশে দাঁড়িয়ে বিপদ যেন ভাগ ক'রে নিয়েছে।

এই ক মাসে যা কিছু খোঁজখবর—ছুটোছুটি, চিঠিপত্র লেখালেখি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া সবই তপন করেছে প্রায়। যেখানে কেয়ার নিজে যাওয়া দরকার, সেখানেই শুধু সঙ্গে নিয়ে গেছে। তাও একা যেতে হয় নি। এর মধ্যে হাজার দুই টাকাও দিয়েছে সে। কেয়া নিতে চায় নি, জোর ক'রেই দিয়েছে। বলেছে, 'এতেই খুচরো দেনাগুলো চুকিয়ে দাও। সব দিকে অশান্তি পুষে রেখে না।'

কেয়া বাধা দিয়ে বলেছে, 'এখনও তো আমার শাড়িগুলো আছে তপন, আসবাবও। এগুলোই বিক্রির ব্যবস্থা করো না। হাতের বালাটাও—বোধ হয় সাত-আট ভরি হবে।'

'ওগুলো এখন থাক। প্রয়োজন তো এখনই শেষ হচ্ছে না। আরও কত বিপদ আসে কে জানে।'

সেই ভাবেই আসা-যাওয়া করছিল, এ কথাটা কখনো এর মধ্যে মুখ ফুটে বলে নি। আজ এলে ওর মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় ওর সংকল্পটা আঁচ ক'রে

নিয়েই বলল, সরাসরি, সোজাসুজি।

লোভ হয় বৈ কি।

জীবন আর কার সহজে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে? প্রেমের নেশাও বুঝি বড় বেশী উগ্র।

তবু বলে, 'না না, আমার অদৃষ্টে শান্তি নেই তপন, মিছিমিছি আমাকে তোমার জীবনের সঙ্গে জড়াতে গিয়ে অকারণ অশান্তি টেনে এনো না। তুমি আমার যা করেছ, যা করছ তাই ঢের, জীবনে এমন আর এত—কারও কাছ থেকেই পাই নি। এখন আস্তে আস্তে আমাকে চলে যেতে দাও। একজনও যে আমাকে আজও ভালবাসে, এই তৃপ্তি, এই মধুর স্মৃতিটুকু নিয়েই যেতে দাও।'

তপন যেন অসহিষ্ণু হয়েই ওঠে। বলে, 'ফ্ল্যাট খুঁজছিলুম অনেকদিন থেকেই, আজই সকালে আগাম টাকা দিয়ে পাকা ক'রে এসেছি। দেড় কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাট। আড়ম্বর কিছু থাকবে না। একটি ঠিকে ঝি থাকবে শুধু। তুমি চা করবে, রান্না করবে, আমাদের বিছানা করবে—আমি শুধু সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনা চেয়ে দেখব বসে বসে। ঐশ্চর্য ও বিলাস তো প্রচুর ভোগ করলে—তার মজাও দেখলে এতদিন ; সংসারের রস, নিজের ছোট্ট সংসার করার সুখ তো পাও নি, সেইটেই অফার করছি তোমাকে।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে কেয়া।

লোভ বড় বেশী। কিন্তু ভরসা হয় না। সাহসে কুলোয় না। এই একটি-মাত্র লোক তাকে যথার্থ ভালবেসেছে—শেষে কি তার জীবনটাও নষ্ট ক'রে দেবে?

সে বলতে যায়, 'না না, তপু, সে হয় না—'

তপন বলে, 'ত্যাখো, তোমার অত্যাচার অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। সহজে না যাও, আমি জোর ক'রে নিয়ে যাবো। কিডন্যাপ্ ক'রে। দরকার পড়লে সেকালের কেভ্‌ম্যানের মতো নিষ্ঠুর হতেও আমার বাধবে না। ...আমার জীবন নিয়ে আর যা খুশি করতে দেব না তোমাকে।'

অকস্মাৎ যেন সোজা হয়ে উঠে বসে কেয়া। অনেকদিন পরে তার মুখে হাসি ফোটে, দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাবে? সত্যিই? গুহা-মানুষের মতো মারধোর করবে? মিছে কথা বলে আমাকে স্তোক দিচ্ছ না?'

'না। আমি এর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি কেয়া। রেজেস্ট্রী অফিসে নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে। চোপরার সঙ্গে বিয়েটাই যখন অসিদ্ধ, তখন তো আর ডিভোর্সের প্রশ্ন নেই। চলো এখনই আমরা যাই সেখানে। এসব এমনি পড়ে থাক। এর কিছুতে দরকার নেই। আমার ঘরে গিয়ে আমার দারিদ্র্য ভাগ ক'রে নাও—এই আমার ইচ্ছা।'

'চলো তাই যাই। আজই, এখনই—এই এক বস্ত্রে। তবে বিয়ে আর নয়। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি, যা পেলাম আজ—এতখানি সম্মান আর কেউ দেয় নি। কেউ আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যেতে চায় নি, পশুর মতো গুহা-মানবের মতো সম্ভোগ করতে চায় নি। এ যে আমার কি পাওয়া তা তুমি বুঝবে না। এতখানি দুর্লভ পাওয়ার বদলে তোমার জীবনটা আমি বিড়ম্বিত করতে চাই না। ছাখো, আর দশ বছর পরে আমি সত্যিই বুড়ী হয়ে যাব, তখনও তুমি থাকবে সমর্থ পুরুষ। তখন হয়ত সেই সিন্ধুবাদ নাবিকের কাঁধের বৃদ্ধের মতো বোঝা মনে হবে আমাকে। সেদিন যাতে সহজে বিনা দ্বিধায় আমাকে ত্যাগ করতে পারো সেই পথটা খোলা থাক। চলো, আমি এমনিই যাচ্ছি তোমার ঘরে। যতদিন ভালো লাগে, যতদিন খুশী আমাকে রেখো—তারপর নিঃসংকোচে বিদায় দিও। আমি হাসিমুখেই সরে যাবো। এই কৃতজ্ঞতাটুকু আমাকে জানাতে দাও আজ।'

বিচিত্র ইচ্ছা

বিখ্যাত শিল্পপতি কুন্দভূষণ দত্ত এত জায়গা থাকতে, বেছে বেছে তাঁর ফুলশয্যার জন্য ট্রেনের একটি থার্ড ক্লাস কামরা নির্বাচন করলেন কেন, তা আজও কেউ জানে না। শুধু তো ফুলশয্যাই নয়—মধুচন্দ্রমাও তো বটে, কারণ একেবারে পক্ষকালের ব্যবস্থা এটা, এই পনেরো দিন কোথাও কোন স্টেশনে নামবেন না, কোন শহরে ঢুকবেন না, এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

পয়সার অভাবে অবশ্যই এ কাজ করেন নি। এত সাধের বিয়ে তাঁর, এত

প্রতীক্ষিত। জীবনের পঞ্চান্ন বছর পেরিয়ে এসে এই প্রথম বিয়ে করলেন তিনি। পাত্রীও মনের মতো নিশ্চয়ই, কারণ একদিনের আলাপেই বিয়ে ঠিক হয়েছে, শুধু আইন-মোতাবেক বিয়ের তারিখ ঠিক করতেই যা দেরি। সুতরাং এই 'হনিমুনে'র জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মনে করতেন না নিজেকে।

স্থানেরও কিছু অভাব হয় নি। শ্রীনগর থেকে শিলং—উত্তর ভারতের এমন কোন উল্লেখযোগ্য শহর নেই যেখানে তাঁর কোন কারবার, কারখানা কি নিদেন একটা আপিস নেই। সুতরাং যেখানে খুশি তিনি স্থান পেতে পারতেন, টাকার জোরে কোন বড় হোটেল একেবারে খালি করিয়ে নেওয়াও অসম্ভব হ'ত না তাঁর পক্ষে। আর, এই যে থার্ড ক্লাস কামরা ঠিক করলেন—এর জন্যেও তো কিছু কম খরচ হয় নি। একটা গোটা ট্যুরিস্ট বগি ভাড়া করতে হয়েছে। এক এক জায়গা থেকে এক একটা ট্রেনের সঙ্গে জোড়া হবে তা, তার জন্য প্রচুর টাকা নিয়েছেন রেল কোম্পানী। কোথাও কেটে ফেলে রাখা হবে না, কুন্দবাবুর এই হুকুম। ঐ বগির মধ্যেই প্রচুর মাল ও ভৃত্য উঠেছে, রান্না খাওয়ার সব ব্যবস্থাই ওখানে—এছাড়াও স্টেশনে কর্মচারীর দল নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী তুলে দেবে—এ তো জানা কথাই।

কিছুই বুঝতে পারে নি কেউ—এ উদ্ভট খেয়ালের অর্থ। তাও, ট্রেনই যদি এত পছন্দ, ট্যুরিস্ট গাড়িও তো অনেক রকম আছে। ফার্স্ট ক্লাস বগি, এয়ার কণ্ডিস্যনড—পয়সা যখন এত খরচ করছেন, আরাম তো আরও ঢের বেশী আদায় করতে পারতেন। ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। তবে এ কার্পণ্য কেন?

এই 'কেন'র জবাবটাই পায় না কেউ। অন্তরঙ্গরা প্রশ্ন করলে কুন্দবাবু মুচকি মুচকি হাসেন, কর্মচারীরা কেউ প্রশ্ন করতে সাহস করে না। বড় কর্তার রাশভারী মেজাজের কাছে অকারণেই কুণ্ঠিত হয়ে থাকে তারা সর্বক্ষণ। এ তো ওঁর একান্ত গোপন ইচ্ছার কথা—এখানে তাদের চির-অনধিকার।

কেউই জানতে পারত না কোনদিন, যদি না আপনাদের এই লেখক সে ইতিহাসের সাক্ষী থাকত।

সেদিন সে ট্রেনের সেই কামরাতে আমিও ছিলুম। এ ঘটনা নিয়ে একটা গল্পও লিখেছি, কিন্তু সেদিন সে গল্পের শেষ হয় নি, আজ হ'ল। এ বিচিত্র ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া উচিত বলেই লিখতে বসেছি। নাম দুটোই শুধু গোপন রইল—ঘটনার একটুও বদল করি নি। বিশ্বাস করুন চাই না করুন। এ ঘটনার সূত্রপাতের চাক্ষুষ সাক্ষী আমি, বাকীটা কুন্দবাবুর মুখে শোনা। আমার সঙ্গেও সেই যাত্রায়ই পরিচয়। কিন্তু সাধারণ ট্রেনভ্রমণের সখ্যের মতো তা যাত্রার পরিসমাপ্তির সঙ্গেই শেষ হয় নি—এই দীর্ঘকাল, পঁয়ত্রিশ বছর টিকে আছে।

কিন্তু সেকথা থাক। নাটকটার শুরু হ'ল কী ক'রে তাই শুনুন।

বোধহয় উনিশশো তিরিশ সাল সেটা। তখন কুন্দবাবুর মাত্র কুড়ি বছর বয়স। ইন্দুলেখার বয়স জোর ষোল। ওঁর বৌদি বলেছিলেন—আরও কম, পনেরো।

কাশী থেকে দেরাদুন এক্সপ্রেসে কলকাতা আসছিলেন কুন্দবাবু। তখন 'স্লীপার' হয় নি, সীটও রিজার্ভ করা যেত না। তেমনি অবশ্য ভীড়ও—এক পুজোর সময় ছাড়া—এখনকার মতো এত ভয়াবহ হত না। কোনমতে ঠেলে-ঠুলে ওঠা যেত, খানিক পরে বসবার জায়গাও মিলত। আর গাড়ি ছাড়বার স্টেশন থেকে উঠলে তো কথাই নেই—একবার ওপরের 'বাঙ্কে' একটা চাদর কি বিছানা বিছিয়ে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত, তোফা আরামে যাওয়া আসা যেত।

আমরা যে দিন আসছিলাম—কুন্দবাবু আর আমি—সেদিনও খুব ভীড় ছিল গাড়িতে। বেশ ঠেলেঠুলেই উঠতে হয়েছিল—আর ওঠার পরও সাসারাম পর্যন্ত ভাল ক'রে বসতে পাই নি। দরজার কাছে একজনের একটা ট্রাঙ্কের ওপর আমি আর কুন্দবাবু দুজনে বসেছিলুম ভাগাভাগি ক'রে। সেই দিনই প্ল্যাটফর্মে আলাপ দুজনের—কিন্তু প্রায়-একবয়সী বলে, অতি সহজেই আলাপটা পরিচয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আলাপের ক্ষেত্রটাও তাই কখনও সঙ্কীর্ণ বলে বোধ হয় নি। সারা রাতই আমরা গল্প ক'রে কাটিয়ে দিয়ে নামবার সময় পরস্পরের ঠিকানা নিয়ে নেমেছিলুম, সে ঠিকানাও অন্য অন্য ক্ষেত্রের মতো অনবধানে হারিয়ে যায় নি, ঠিকানাতে পৌঁছেও ছিলুম একদিন।

সে কামরায় যত দূর মনে পড়ছে, বাঙ্গালী যাত্রী ছিলেন আর একদল. ইন্দুলেখারা। ওর দাদা, বৌদি, মা—ও নিজে এবং বৌদির একটি বাচ্চা ছেলে এই নিয়ে ওদের দল। ওরা আসছিল লক্ষ্ণৌ থেকে, আগে জায়গা পেয়ে সামনা-সামনি দুটি বেঞ্চি জোড়া ক'রে বিছানা বিছিয়ে বসেছিল। তখন এমনিই হঠাৎ কেউ পাতা বিছানা সরিয়ে বসবার দাবী জানাত না, তার ওপর স্ত্রীলোক থাকলে তো কথাই নেই, ওরা বেশ নির্বিঘ্নে ও আরামেই ছিল, হাত পা মেলে।

বোধহয় ইন্দুর মা-ই লক্ষ্য করেছিলেন ব্যাপারটা। সাসারামে পৌঁছতে ওর দাদা সুকুমারবাবু আমাদের ডেকে নিলেন এবং দুই বেঞ্চির দুটি প্রান্তে একটু ক'রে বসবার জায়গা ক'রে দিলেন। সুকুমারবাবুরও অল্প বয়স, সাতাশ-আটাশের বেশী হবে না। বৌটি বড়জোর বাইশ-তেইশ, বাচ্চাটা বছর দুইয়ের। বেশ সুখী পরিবার। সকলেই সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছিলেন—এমন কি মা সুদ্ধ। কোন প্রসঙ্গই ওঁদের কাছে 'ট্যাবু' নয় দেখলুম, সেই জন্যেই আরও ভাল লাগল। আমরাও অচিরে সেই দলভুক্ত হয়ে গেলুম—ফলে ঘণ্টাখানেক পরেই মনে হল আমরা ওঁদের বহু পরিচিত। ওঁরা আমাদের আত্মীয়। না, রূপে মুগ্ধ হবার মতো চেহারা কিছু নয় ইন্দুলেখার। কুশ্রী না—তবে সুন্দরীও নয়। নিতান্তই চলনসই। মাজা মাজা রঙ, মাঝারি গঠন। মুখখানি সুডৌল, চোখের চাহনি কিছু গভীর, আর সেইটেই সে মুখের প্রধান আকর্ষণ। দাঁত বেশ সাজানো। সে জন্যে হাসিটিও মিষ্টি লাগছিল। তবু আমি মোহিত হবার মতো কোন কারণ খুঁজে পাই নি—কিন্তু কুন্দবাবু পেয়েছিলেন। মুগ্ধই হয়েছিলেন তিনি। তবে সে মুগ্ধতা এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে যে বহন করছিলেন, সেটা জানতুম না। নিতান্তই দু-চার ঘণ্টার ভাল লাগা, পরবর্তীকালে 'কোনদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে' হয়ত একটু মিষ্টি স্মৃতির রঙ লাগিয়ে দেবে মনে। হয়ত ঈপ্সাতুর একটা ইচ্ছা জাগাবে—আর একবার দেখবার ; একটু কৌতূহল হবে কি করছে সে, এখন কোথায় আছে—জানতে ; কিন্তু সেও দুদণ্ডের মতো, এর বেশী নয়। এইটেই স্বাভাবিক, এইটেই ভেবেছিলুম আমি। কুন্দবাবু কিন্তু সেভাবে নেন নি। তার কারণ পরে জেনেছিলুম, অনেক পরে। কুন্দবাবু আবাল্য নারী-স্নেহ বঞ্চিত। মা বোন বৌদি এই ধরনের কেউ ছিল না তাঁর, কারও স্নেহ বা সাহচর্য কিছুই পান নি। এখানে এই ট্রেনে ইন্দুলেখার যে চেহারাটা তাঁর

চোখে পড়েছিল, মোয়দের এ চেহারাটা ছিল তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত।

তাই চমকে উঠেছিলেন একেবারে, মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সেদিনটা ছিল মঙ্গলবার। বিহারীদের পক্ষে পূর্বদিকে যাত্রার প্রশস্ত দিন। সেটা আমরা জানতুম না, জানলে হয়ত একদিন পরেই বেরোতুম কাশী থেকে। ফলে ট্রেন যত এগোতে লাগল, ভীড় তত বাড়তে লাগল। গয়াতে যখন গাড়ি এসে থামল তখন আত্মরক্ষার প্রশ্নটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। উঠে গেলে এ জায়গাটুকুও থাকবে কিনা সন্দেহ। প্লাটফর্মটাও পড়েছে উল্টো দিকে, সুতরাং জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খাবার কিনব, সে উপায়ও নেই। অগত্যা সে রাত্রে আহারের চেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়ে দার্শনিকের মনোভাব গ্রহণ করলুম। কুন্দবাবু বললেন, 'নিন, একটা রাত না খেলে মানুষ মরে যায় না।' আমিও সায় দিলুম, 'তা তো নিশ্চয়ই। এমনি তো কত উপোস করে মানুষে. এক রাত না খেলে কি হয়।'

সুকুমারবাবুরা লক্ষ্য করলেন সব, শুনলেনও। ওঁদের চোখে চোখে কী ইশারা হলো জানি না, গয়া স্টেশন ছাড়তে যখন খাবারের হাঁড়ি খুলে খাবার সাজাতে শুরু করলেন ইন্দুর বৌদি, আড়ে চেয়ে দেখলাম—পুরো পাঁচটা ভাগই সাজাচ্ছেন তাঁরা। বিধবা মা গাড়িতে খাবেন না, অতএব ও দুভাগ যে আমাদেরই সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র রইল না। তবু, উদাসীনভাবেই অন্যদিকে চেয়ে বসেছিলুম, একটু পরেই অতি মিষ্ট কণ্ঠে সুকুমারবাবুর স্ত্রী বলে উঠলেন, 'নিন ধরুন, হাতে ক'রেই খেতে হবে, রাখবার তো জায়গা নেই।'

চেয়ে দেখলুম পরিষ্কার কলাপাতার চিলতেয় ডালপুরী, আলু চচ্চড়ি, বেগুন ভাজা ও চমচম সাজানো, ডালপুরীর সুঘ্রাণ আগেই পেয়েছি, এখন আহার্যের পারিপাট্য দেখে জিভে জল এসে গেল প্রায়। তবুও সৌজন্যের খাতিরে বললুম, 'না না, এ আবার কেন, ছি ছি, দেখুন দিকি, আমরা পরের স্টেশনে যা হয় কিনে নেব এখন, আপনারা খান। আমাদের কিছু দরকার হবে না,' ইত্যাদি।

সুকুমারবাবুও পাল্টা সৌজন্য প্রকাশ করলেন, 'আরে, এত কে খাবে মশাই, আপনারা খেয়েও ঢের পড়ে থাকবে। আমাদের কম পড়বে না—সে

বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

কিন্তু বৌদি এ সব কথার দিক দিয়েও গেলেন না, মুচ্‌কি হেসে বললেন, 'আপনারা বেটা ছেলে—পেটে খিদে মুখে লাজ কেন! খিদেয় তো মুখ শুকিয়ে উঠেছে দেখছি। নিন—দুর্গা বলে ধরে খেতে শুরু করুন দিকি। আপনারা না শুরু করলে আমরা খেতে পারছি না।...আপনারা না খেলে সব খাবারটাই নষ্ট হবে, তাছাড়া সত্যিই তো আর আপনাদের অভুক্ত সামনে রেখে আমরা খেতে পারি না। একেবারে না-খাওয়ার চেয়ে না হয় কিছু কমই খেলাম।'

অকাট্য যুক্তির কাছে হার মানতে হ'ল। অকাট্যতর যুক্তিও কিছু ছিল, সে আমাদের পেটে। আর বাক্যব্যয় না করে বৌদির হাত থেকে পাতাটা নিয়ে নিলাম। কিন্তু ওদিকে চেয়ে দেখি ইন্দু কথাবার্তা বিশেষ না বলেও কাজ অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে, শুধু তার সলজ্জ ভঙ্গী এবং নীরব চাউনিতেই কুন্দবাবু বিব্রত ও বিভ্রান্ত হয়ে, খাবারটা তার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন, এখন কিংকর্তব্য স্থির করতে না পেরে আড়ষ্ট ভাবে খাবারটা ধরে করুণ ও অপ্রতিভ চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

আর ইতস্তত করার কিছু ছিল না। প্রয়োজনও না, সাধ্যও না।

সুতরাং খেতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। বৌদি এক গ্লাস জল গড়িয়ে আমার পাশে অতি সামান্য একটুখানি জায়গাতেই গ্লাসটি বসিয়ে রেখে ছেলেকে খাওয়াতে শুরু করলেন। কুন্দবাবুর পাশে কিন্তু সেটুকু স্থানও ছিল না, তাঁর সামনে প্রকাণ্ড কার বিছানা এসে পড়েছে, ওদিকে লোক ঠেসে দাঁড়িয়ে আছে, তিলার্ধ ফাঁক নেই এদিকে, অগত্যা বাধ্য হয়েই ইন্দুলেখা জলের গ্লাসটি ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে আছে।

কুন্দবাবু আগে বোধহয় অতটা বুঝতে পারেন নি, বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই খাচ্ছিলেন। এখন আমার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে—মেয়েটি ওঁর জলটাই হাতে ক'রে বসে আছে বুঝতে পেরে বিষম লজ্জিত ও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আরে এ কী কাণ্ড! জলটা কোথায় রাখবেন এখানে! জল দরকার হবে না আমার। ও আপনি রেখেই দিন। আমি খাওয়ার সঙ্গে জল খাই না, বিশ্বাস করুন। আপনি খেতে শুরু ক'রে দিন, খাবারে ধুলো পড়ছে ওদিকে। জল যদি দরকার হয় চেয়ে নেব তখন—'

পাগলের মতো যেন এলোমেলো বকতে লাগলেন কুন্দবাবু। আর তাইতেই হাসি চাপতে পারল না ইন্দুলেখা, খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সে। অতি মিষ্টি হাসি সন্দেহ নেই, মনে হ'ল যেন খুব মিষ্টি কি বাজনা বেজে উঠল। কিন্তু তার চেয়েও মিষ্টি গলায় বলল, 'খাওয়ার সঙ্গে জল না খেলেও খাওয়ার পরে তো খাবেন। আর আপনি এত কুণ্ঠিতই বা হচ্ছেন কেন, একটুখানি জলের গ্লাসটা ধরে থাকলে কি আমার হাত ব্যথা করবে? এ তো আমাদের কাজই।...আর খোকনের খাওয়া না হলে তো বৌদির ছুটি হচ্ছে না, ওর খেতে খেতে অপনাদেরও খাওয়া হয়ে যাবে, তখন একসঙ্গে দুজনে বসে খাব, নিশ্চিন্তি হয়ে।'

'না না, তাই বলে আমি বসে বসে খাব আর আপনি ঠায় গেলাস ধরে বসে থাকবেন? না না, সে ভারী বিশ্রী, আপনি না হয় এই পায়ের কাছটায়—'

'হ্যাঁ, তাই আর নয়। এই আবর্জনার মধ্যে জলের গ্লাস নামিয়ে রাখি আর কি। কত লোক থুতু ফেলছে, ছিষ্টির লোকের জুতোর ধুলো। আমরা গো আর পাগল হই নি। তার চেয়ে আপনি সময় নষ্ট না ক'রে মুখ বুজে খেয়ে নিন, যত দেরি করবেন তত বেশীক্ষণ জলের গ্লাস ধরে থাকতে হবে।' অগত্যা কুন্দবাবু চুপ করলেন, কিন্তু তিনি যে কী পর্যন্ত কুণ্ঠিতবোধ করছেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। দেখতে দেখতে কপালে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম দেখা দিল, আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল দুটো কান আর কপাল, তার মধ্যেই কোন মতে গোগ্রাসে গিলে যেতে লাগলেন খাবারগুলো। বেশ বোঝা যেতে লাগল যে আহার্যের স্বাদ কিছুই পাচ্ছেন না তিনি, কোন মতে গলাধঃকরণই করছেন শুধু।

খাওয়া শেষ হলে পাতাটা জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েই কুন্দবাবু হাত বাড়ালেন জলের গ্লাসটার জন্য, কিন্তু ইন্দুলেখা তাও ছাড়ল না, আস্তে বলল, 'আপনার দুটো হাতই তো নোংরা হয়েছে, আপনি হাতটা বাইরে ধরুন, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি, হাতটা আগে ধুয়ে নিন বরং।'

হাত ধোয়ার পর পাশেই কোথা থেকে একটা তোয়ালে বার ক'রে দিল হাত মোছবার জন্য, তারপর কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে গ্লাসটা আবার ভর্তি ক'রে হাতে দিল কুন্দবাবুর। এবং জল খাওয়া হলে একরকম জোর ক'রেই তাঁর হাত

থেকে—গ্লাসটা ধুয়ে দেবার জন্যে বৃথা ব্যস্ত হচ্ছিলেন তিনি—গ্লাসটা নিয়ে ধুয়ে সেই গ্লাসেই নিজের জন্যে জল গড়িয়ে নিল।

এইটুকু, এর বেশী একটুও নয়।

তখন কুন্দবাবুও অতটা বোঝেন নি। কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন, অভিভূত হয়েছিলেন, কিন্তু খুব একটা বিপর্যয় ঘটে গেল জীবনে তা ভাবেন নি।

তাই, হাওড়ায় এসে নামবার সময় যথারীতি, এই রকমের সহযাত্রার ক্ষেত্রে যা রীতি সেই অনুযায়ী, ঠিকানা-বিনিময় হলেও, সে ঠিকানা খুব একটা যত্ন ক'রে রাখবার কথা মনে হয় নি কুন্দবাবুর।

কিন্তু ক্রমশ বুঝেছেন নিজের ভুল। ক্রমে ক্রমে সেই সেবাপরায়ণা মিষ্ট-স্বভাবের মেয়েটি তাঁর মনোরাজ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অসাধারণ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার অতি সাধারণ মূর্তি, ওঁর নিজের অনুরাগের রঙে। একটু একটু ক'রে নিজের পিপাসা ও ব্যর্থতা দিয়ে গড়েছেন তাকে, ইন্দুলেখাকে। শেষে আর একবার তাকে দেখবার ইচ্ছা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন খোঁজ পড়েছে সে ঠিকানাটার। কিন্তু সে কাগজটুকু আর খুঁজে পান নি তিনি, অবহেলায় অসাবধানতায় কোথায় হারিয়ে গেছে সেই খবরের কাগজের টুকরোয় লেখা ঠিকানাটা।

তখন খুঁজে খুঁজে এসে বার করেছেন আমাকে। অপিসের নামটা সর্বজন-বিদিত বলেই মনে ছিল কুন্দবাবুর। কিন্তু আমিও সে ঠিকানা রাখি নি। রাখার প্রয়োজন আছে ভাবি নি। এরকম পথের আলাপে সে উচ্ছ্বাস জাগে পরস্পরের সম্বন্ধে, তা মিলিয়ে যেতেও দেরি হয় না, এও তাই, সুতরাং কেনই বা রাখব তাদের ঠিকানা?

বাড়ির নম্বর মনে ছিল না, কিন্তু রাস্তাটার নাম মনে ছিল। বললাম কুন্দবাবুকে। হতাশ হয়ে চলে গেলেন তিনি, বিরাট রাস্তা, নম্বর জানা না থাকলে খুঁজে বার করা অসম্ভব।

আরও কিছুদিন যেতে অতটা অসম্ভব বোধ হয় নি আর। মনের আবেগ দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে, সেই অসাধ্য সাধনেই রত হয়েছিলেন। এক দুই ক'রে প্রত্যেকটি বাড়ি বাড়ি গিয়েই খোঁজ করেছেন, কোন সুকুমার ঘোষ সেখানে

থাকেন কিনা। সাতদিন সময় লেগেছে খুঁজে বার করতে সে বাড়ি। তারপর শুনেছেন যে তাঁরা সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, কোথায় তা কেউ জানে না।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। পঁয়ত্রিশটি সুদীর্ঘ বছর। চেহারাটা ম্লান হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু আবেগটা নষ্ট হয় নি, স্মৃতিও মুছে যায় নি মন থেকে। বরং তা যেন আরও মূল বিস্তার করেছে ধীরে ধীরে, অক্ষয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। পৃথিবীর সমস্ত নারীহৃদয়ের সুষমা তিনি আরোপ করেছেন সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটির উপর, তিল তিল ক'রে তিলোত্তমা গড়ে তুলেছেন কল্পনায়। বভুক্ষু আত্মা তাঁর তৃষ্ণার শান্তি খুঁজে বেড়িয়েছে সেই স্মৃতিতে। মনের মধ্যে প্রিয়া বা মানসীর যে মানদণ্ড রচিত হয়েছে ঐ মেয়েটির মাপে, তার বিচারে মনের মতো কাউকে খুঁজে পান নি আর।

কিন্তু তাই বলে হাহুতাশ ক'রে স্বপ্নের পিছনে দৌড়ে জীবন মাটি করেন নি। একটির পর একটি ব্যবসা ধরেছেন আর অমানুষিক অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে সার্থক সফল ক'রে তুলেছেন তাকে। আজ ভারতের সমস্ত ব্যবসায়ী-সমাজ তাঁকে শ্রদ্ধা করে, মান্য করে, ভয় করে।

শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও তিনি সর্বজনবিদিত।

এই কার্যোপলক্ষে তাঁকে সারা ভারতে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়, কখনও কখনও বাইরেও। কর্মোপলক্ষেই এলাহাবাদে এসেছিলেন এবার। আর সাত-আট দিন থাকতে হবে শুনে যখন স্থানীয় একটি মেয়ে-স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এসে ধরলেন যে তাঁদের পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে, তখনও আপত্তির কিছু ভেবে পান নি। হয়তো কিছু টাকা চাইবে, কোন বাড়ি ঘর তৈরীর কাজে—তা হোক, এখন তো দিয়েই থাকেন, না হয় প্রবাসী বাঙালীদের জন্য কিছু দিলেনই।

চমকে উঠেছিলেন, সভার নির্দিষ্ট তারিখের আগের দিন যখন ছাপা চিঠিখানা দিয়ে গেলেন সেক্রেটারী এসে। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর নামটা দেখে। ইন্দুলেখা ঘোষ।

অসম্ভব। অসম্ভব। মনে মনে বললেন তিনি। সাধারণ নাম—আরও বহু মেয়েরই থাকতে পারে। এখনও সেই ইন্দুলেখা তার পৈতৃক পদবীতেই রয়ে গেছে, তা বিশ্বাস হয় না। এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তবুও ছুটে

গেলেন কুন্দবাবু। চেনার কোন উপায় নেই, পঞ্চাশ বছরের একটি বিগত-যৌবন মহিলার মধ্যে সেদিনের কিশোরী মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, বিশেষ যার আকৃতির কিছুই মনে নেই আজ। লজ্জিত হয়েই ফিরছিলেন, কী ভেবে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—কিছু মনে করবেন না?'

হাসলেন ভদ্রমহিলা, ভারী মিষ্টি হাসি আর গলার আওয়াজ তাঁর। হেসে বললেন, 'না, না, মনে করবার কি আছে? বলুন না কি বলবেন। আপনি এসেছেন এই তো বহু সৌভাগ্য, আপনি নিজে থেকে আমাদের স্কুলে পায়ের ধুলো দেবেন, এ তো ভাবতেই পারি না আমরা।'

কিন্তু এবার সৌজন্যের দিকে কান ছিল না কুন্দবাবুর। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, সুকুমার ঘোষ বলে কি কাউকে চিনতেন আপনি? আপনার কোন আত্মীয় আছেন ঐ নামে?'

'আছেন বৈকি। তিনি আমার দাদা হন, এখানেই এখন আছেন, আমার বাসায়। এইবার রিটায়ার করলেন যে।'

সহজ ভাবেই বলেছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু বলতে বলতেই অকস্মাৎ যেন লাল হয়ে ঘেমে উঠলেন। লজ্জায় কুণ্ঠায় চোখ নেমে আসে, প্রাণপণে চেয়ে দেখেন, বাঁ কানটার দিকে। কুন্দবাবুর বাঁ কানের পাশে একটি ছোট্ট মাংসপিণ্ড আছে—ওঁর মুখেই শুনেছি, আবাল্য। খুবই ছোট, তবে আঁচিলের মতো নয়, চামড়ার রঙেরই ছোট্ট একটি আব।

ইন্দুলেখা বললেন, 'আশ্চর্য! আপনিই সেই কুন্দবাবু তাহলে! সেই এক-রাত্রির ট্রেনের আলাপ! মনে আছে আপনার?...সেদিন যখন গিয়েছিলুম অত ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখি নি তাই—নইলে আপনার চেহারার আর কিছু মনে না থাক, ঐ চিহ্নটার কথা মনে আছে।' ছেলেমানুষের মতো, তরুণ যুবকের মতোই ঘেমে উঠলেন কুন্দবাবুও, তেমনি ভাবেই বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। কোনমতে প্রশ্ন করলেন শুধু, এইটুকুই বলতে পারলেন কোন রকমে, 'আপনি—আপনি বিয়ে করেন নি কেন?'

আবার হাসলেন ইন্দুলেখা। বললেন, 'এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা কি ঠিক? ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে।'

তারপরই বলে ফেললেন, 'ওঃ, কত যে খুঁজেছি আপনাকে। মনে মনে অবশ্য। যখন মুখ ফুটে বলবার মতো সাহস হ'ল তখন দাদা খুঁজে পেলেন না আপনার ঠিকানাটা।' তারপর আরও অসংলগ্ন ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি—আপনার ছেলেপুলে কি?'

রুদ্ধশ্বাসে, অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমি বিয়ে করি নি।'

'কেন?...এখনও পর্যন্ত—! অবশ্য এটা আমার হয় তো ইম্পার্টিনেন্স হয়ে যাচ্ছে—তবে কৌতূহল হয় বৈকি। এত টাকা আপনার, এত সাক্‌সেস, ভাগ ক'রে নেবার কোন লোক আনেন নি ঘরে? কেন বলুন তো?'

খুব চুপি-চুপি উত্তর দিলেন কুন্দবাবু, 'যদি বলি আপনার জন্যে?'

তাঁকে বিস্মিতও চমকিত ক'রে দিয়ে উত্তর দিলেন ইন্দুলেখা, 'তাহলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব। অসম্ভব যে নয়, একরাত্রির স্মৃতি মনে ক'রে রাখা, সে তো আমি নিজেকে দিয়েই জানি।'

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। জানেনও সকলে।

সেইদিনই বিবাহ ঠিক ক'রে ফেললেন কুন্দবাবু। আইনের প্রয়োজনে যে কটা দিন দেরি করতে হয়—তার বেশী একদিনও করতে রাজী নন তিনি।

তবে ঐ সঙ্গেই এই খেয়ালটির কথাও জানালেন ইন্দুলেখাকে। তাঁদের ফুলশয্যা ও মধুচন্দ্রমা হবে ট্রেনে—কোন থার্ড ক্লাস কামরায়। সে দিনের সে থার্ড ক্লাস অবশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ আর তাঁর জীবন থেকে বিলাস সমারোহ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, তবু যতটা কাছাকাছি যায়, দোষ কি?

ইন্দুলেখা এ প্রস্তাবে কোন দোষ দেখতে পান নি—বরং আগ্রহেই সম্মতি দিয়েছেন। একটি থার্ড ক্লাস কামরাই তো তাঁর মনে আনন্দ-বেদনার উৎস হয়ে বিপুল এক স্মৃতি বহন করছে—তাই জীবনসায়াহ্নে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রিটি যদি একটি থার্ড ক্লাস ট্রেনের কামরাতেই অতিবাহিত হয় তো ক্ষতি কি? সে তো বরং ভালই।

পাষাণের ক্ষুধা

গরমের ছুটিতে পুরী যাওয়া আমার নতুন নয়, তবে ইদানীং বেশ কয়েক বছর যাওয়া হয় নি—এটাও ঠিক। সুতরাং ওখানকার সাম্প্রতিক চেহারাটা আমার দেখা ছিল না। বরাবরই হঠাৎ গিয়ে পড়ি, একটা কি ছুটো দিন যে-কোন হোটেলে উঠে বাড়ি খুঁজে নিয়ে সেখানে চলে যাই। নিজের চোখে না দেখে চিঠিতে বা পরের নির্বাচনের ওপর নির্ভর ক'রে বাড়ি ভাড়া করলে ঠকতে হয়—এ আমি অনেকবার দেখেছি, তা সে পুরীই বলুন কাশীই বলুন—অথবা মধুপুর-শিমুলতলা-দেওঘর যেখানেই বলুন না কেন। 'আপনার চক্ষে স্বুবর্ণ বর্ষে' হয়ত ঐ কথাটাই ঠিক। মোদ্দা যেখানে এক মাস দেড় মাস থাকতে হবে—সে জায়গাটা পছন্দসই না হলে যাত্রাটাই যেন মাটি হয়ে যায়। কিছুই ভাল লাগে না।

কিন্তু এবার পুরী গিয়ে হকচকিয়ে গেলুম। স্টেশানেই হোটেলের লোক এসে ধরে, বরাবর দেখে আসছি, এবার জনপ্রাণী দেখলুম না। পাণ্ডার ছড়িদার চকিতে একবার চোখোচোখি হতে কাষ্ঠ হাসি হেসে কোথায় সরে পড়ল আর তার টিকিটিও দেখা গেল না। তবু তখনও অতটা বুঝি নি 'থোড়াই কেয়ার' ভঙ্গীতে গিয়ে রিক্সা নিয়ে রওনা দিলুম বিজয়দার হোটেলের দিকে, স্বামী আর স্ত্রী—যে কোন একটা ছোট ঘর পেলেই চলে যাবে, অত কিসের ভাবনা?

বিজয়দার হোটেলের সামনে রিক্সা পৌছতে—নামবার আগেই দেখা গেল, বাক্স বিছানা নিয়ে শুষ্ক মুখে আরও ছুটি দল বাইরে বসে আছে, ভাবগতিক দেখে বুঝলুম তাঁরাও সম্প্রতি এসেছেন, কিন্তু বাইরে কেন? তবে কি—

তবে যে কি তা বিজয়দার মুখের দিকে চেয়েই বোঝা গেল। সেই চির-প্রসন্ন ও চিরপ্রশান্ত মুখখানিতে সাদর অভ্যর্থনার আলো তো কই ফুটল না, বরং বিব্রত ভ্রূকুটিই ঘনিয়ে এল, দ্রুত কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'এ কি কাণ্ড, একটু খবর দিয়ে আসতে নেই। বৌমাকে সুদ্ধ নিয়ে—ছি ছি! ছাখো দিকি, কী ছেলেমানুষি কাণ্ড! পুরী কি সেই পুরী আছে এখনও?···না না, নেমে আর কাজ নেই, সোজা চলে যাও লক্ষ্মীদির ওখানে—যদি কোনমতে য্যাকো-

২১

মোডেট করতে পারেন। আমার এখানে এঁরা সেই ভোরের প্যাসেঞ্জারে এসে বসে আছেন। বিকেলে যদি কেউ যায় তো সেই জায়গায় এঁরা ঢুকবেন। তবে তাও বলি, সে ভরসা বিশেষ নেই, যায় তো দুটি কলেজের ছেলে আছে—তারাই যেতে পারে। আর যাওয়ার মতো কেউ নেই।'

তখনও, এর পরেও পরিস্থিতির গুরুত্বটা পুরোপুরি বুঝি নি। বুঝলুম লক্ষ্মীদি থেকে হেমন্তদা—নীলমোহন থেকে অপ্রতিপাণ্ডা সকলকার হোটেল থেকে যখন ফিরতে হল—তখনই। চক্রতীর্থ থেকে স্বর্গদ্বার, কোথাও কোন হোটেল দেখতে বাকী রাখলুম না, খড়ের ঘর থেকে চারতলা বাড়ি পর্যন্ত—সর্বত্রই সেই এক কথা'—ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই'। ইস্, একটু আগে থাকতে খবর দিয়ে আসতে হয়, পুরী কি আর সে পুরী আছে···

হোটেলের পালা শেষ হতে ধর্মশালা নিয়ে পড়া গেল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে তো ঢোকাই গেল না। গোটা উঠোন জুড়ে আশ্রয়-প্রার্থীর দল বসে বাক্স বিছানা নিয়ে, তার মধ্যেই খাবারওলারা বাঁক নামিয়ে যেভাবে সিঙাড়া রসগোল্লা বিক্রী করছে—মনে হ'ল অবস্থাটা এঁরা বেশ মানিয়ে নিয়েছেন অর্থাৎ এখানেই দশশালা বন্দোবস্ত এঁদের। ইতিমধ্যে মাথার ওপরে সূর্য এবং সামনে রিক্সাওলার মেজাজ মধ্যগগনে পৌঁচেছে—দুজনেরই উত্তাপ অসহ্য। শেষোক্তটি তো প্রতিমুহূর্তে ভয় দেখাচ্ছে যে সে এবার রাস্তার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে—এবং তার এই হয়রানির জন্যে দশটি টাকা অন্তত আদায় ক'রে তবে ছাড়বে। তবু তাকেই বাপু-বাছা ক'রে শহরে গেলাম, মস্ত মস্ত ধর্মশালা হয়েছে আজকাল, কোথাও কি আর একটু মাথা গোঁজার স্থান মিলবে না? কিন্তু হায়, প্রভু জগন্নাথই দেখা গেল সেদিন বিরূপ আমাদের ওপর—ঘর ছেড়ে কোন ধর্মশালার দালানে সুদ্ধ ঠাঁই পাওয়া গেল না।

অগত্যা সে রিক্সাওলাকে পাঁচটি টাকা আক্কেল-সেলামী দিয়ে নতুন এক রিক্সা নিয়ে বিজয়দার কাছেই ফিরে এলাম আবার। আর কিছু না হোক তাঁর অফিসে মালগুলো রেখে মুখে হাতে একটু জল দিয়ে তো নিতে পারব, দুটো ভাতও কোন্ না মিলবে।

মিললও তা। আমাদের অবস্থা দেখে বিজয়দা প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করলেন, তাঁর 'ওঁয়ারা' এখানে থাকলে বৌমাকে অন্তত সেখানে থাকার ব্যবস্থা ক'রে

দিতে পারতেন—সে কথাটা বারবার জানালেন। ওঁয়ারা এখানেই থাকেন চিরদিন, নেই কেন প্রশ্ন করতে বিজয়দা দেখলুম একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। সন্দেহ হল ভীড় দেখে বিজয়দাই বৌদিদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সে জায়গায় তুটো ঘরে আটটা সীট পড়েছে। বিজয়দা নিজে শুচ্ছেন আপিস ঘরে।

যাই হোক—বিজয়দা অবশ্য করলেনও ঢের, মোটামুটি হোটেলের 'রাশ' সময়টা কাটতেই নিজে তুটো ভাত মুখে গুঁজে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন —বাড়ি বা ঘর কোথাও ভাড়া পাওয়া যায় কিনা সেই খোঁজে। একটা যা হয় ব্যবস্থা তিনি ক'রে দিতে পারবেনই—এ আশ্বাসটা বেশ জোর গলাতেই দিলেন বারবার।

কিন্তু বিধি যেদিন বাম হন সেদিন পোড়া শোলমাছও জলে পালিয়ে যায় —এ তো সামান্য একটা ঘর ভাড়া। অতবড় পুরী শহরে ওধারে চটক পাহাড় থেকে এধারে চক্রতীর্থ কোথাও একখানা বাসোপযোগী ঘর পর্যন্ত পাওয়া গেল না, বাড়ি তো দূরের কথা। স্বর্গদ্বারের পুরনো বস্তিতে অন্ধকার ঘিঞ্জি গলির মধ্যে তু-একখানা ঘর যা খালি দেখা গেল, তাতে আর যাই হোক শহরের মানুষ থাকতে পারে না। নোনা ধরা, দেওয়ালের ইট বেরিয়ে পড়েছে, জানলা দরজার পাল্লা নেই পুরো—যাও বা আছে, বন্ধ হয় না এই রকম অবস্থা।

পা অবসন্ন, মন ক্লান্ত ও বিরক্ত, বিজয়দা বিব্রত—এই অবস্থায় যখন শেষ পর্যন্ত আবার বিজয়দার আস্তানায় ফিরে এলুম তখন ফেরার এক্সপ্রেসের আর মাত্র কুড়ি পঁচিশ মিনিট সময় বাকী। ফিরতে তো হবেই—এই এক্সপ্রেসেই ফিরব। রিজার্ভেশ্যান নেই, তা না থাক ; রেলের ইস্কুলে পড়াই—ছাত্র এদিকে ওদিকে জুটে যাবেই, না হোক, পাস যখন দেখবে কোথাও একটা জায়গা ক'রে দেবেই ওরা—রেলের লোকেরা।

কুড়ি পঁচিশ মিনিট মাত্র আর বাকী আছে, সে তথ্যের ওপরও তত জোর দিই নি, রিক্সায় তো চেপেই আছি, বাক্স বিছানাও যখন কিছু খোলা হয় নি তখন আর অত ভাবনা কি, পৌছে যাবই এক রকম করে—এই কথাই ভাবতে ভাবতে আসছি, বিজয়দাকেও বলেছি সে কথা। তিনিও তুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বলতে পারেন নি, ভরসা ক'রে 'থাকো' একথা বলার উপায় নেই তাঁর।

কিন্তু হোটেলে ফিরে গিন্নির কাছে প্রস্তাবটা করতেই তিনি এতখানি জিভ কাটলেন একেবারে।

'বাপরে! তাই কখনও হয়! এখানে এসে জগন্নাথ দর্শন না ক'রে চলে যাব! সে আমার গলা কেটে ফেললেও পারব না। মণিকোঠায় না পৌঁছতে পারি, বাইরে থেকে একবার দর্শন করলেও শান্তি, এমনি ফিরে যাওয়া—না, না, সে আমি পারব না। বাপ রে!'

'—কিন্তু এদিকে যে আর মোটে সময় নেই, এই হয় তো আর গাড়ি পাব না। এখনও যদি ওঠো তো—।'

—'সে না পাই না পাবো। না হয় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই পড়ে থাকব সারারাত। না হয় সকালের প্যাসেঞ্জারে চাপব। এই তো পথে বসেই চৌপর-দিন কেটে গেল—রাতটা কি আর কাটবে না!'

আর বকাবকি করেও লাভ নেই। কারণ এইটুকুর মধ্যেই পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। এরপর হেলিকোপ্টার ছাড়া ও গাড়ি ধরা সম্ভব নয়। হতাশ হয়ে বিজয়দার মুখের দিকে চাইলাম, বিজয়দার মুখের প্রসন্নতা আর নেই, তবু ক্লান্ত মুখে একটা হাসির ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'বসো তা হলে—কি আর করবে। চা-টা খাও, তারপর বৌমাকে নিয়ে মন্দিরটা ঘুরেই এসো বরং। শেষ অবধি আর কিছু না হয়—আমরা দু'ভাই বাইরে একটা বিছানা ক'রে শোব, বৌমা না হয় আপিস-ঘরেই রাত কাটাবেন, একটা রাত কেটেই যাবে। উপায়ও তো নেই।'

কিন্তু, সম্ভবত এই সর্বশেষ পরীক্ষায়—তাঁর প্রতি নিষ্ঠাটা সত্য প্রমাণিত হতে—জগন্নাথ কিছুটা সদয় হলেন। বিজয়দার হোটেলে যে গয়লা দুধ যোগায়—ভীম তার নাম, কুচকুচে কালো পাথরের সচল পাহাড় একটি। নামেও ভীম, আকৃতিতেও ভীম। টাকার তাগাদায় এসে বিজয়দার জন্যে অপেক্ষা করছিল, সে আমাদের কথাবার্তায় ব্যাপারটা আঁচ ক'রে নিয়ে বলল, 'বাবু কি কোথাও ঘর পেলেন না এদিকে?'

বিরক্তি বোধ হল—অলস কৌতূহল ভেবে। কিন্তু গৃহিণী যাকে বলে মজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরার মতোই তাকে অবলম্বন করলেন। সাগ্রহে সোৎসাহে একেবারে তার সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা,

গ্যাখো না, জগন্নাথ এবার কী আতান্তরে ফেললেন! না হোটেলে আর না কোন বাড়িতে—কোথাও এতটুকু ঠাঁই হল না। তা আছে নাকি বাবা তোমার সন্ধানে কোথাও ঘরটর?'

ভীম, এদের ভাষায় ভীম্‌ম একটু সবিনয় হাসির ভঙ্গী ক'রে যা নিবেদন করল—তার অস্যার্থ এই দাঁড়ায় যে, আছে তার সন্ধানে—কিন্তু ঘর নয়, একটা গোটা বাড়িই। মস্ত বড় বাড়ি। ভাড়া তারা দেয় না—ভাড়া দেবার কোন প্রশ্নই নেই। ওর স্ত্রীর দাদামশাই ওখানকার দারোয়ান-কাম-কেয়ারটেকার, আমরা যদি যাই—সে বলে-কয়ে ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে। যতদিন খুশি থাকতে পারি আমরা। কারণ, যাদের বাড়ি তারা কস্মিনকালে কেউ আসে না। কোন আত্মীয়স্বজনও যে কেউ আসে বলে কোনদিন শোনা যায় নি। আর যদিও কেউ আসে—চিঠিপত্র তো দিয়ে আসবে, তখন কি আর আমরা কোন একটা ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারব না?

এই বলে ভীম আর একবার তার গুণ্ডিখাওয়া কালো দাঁতগুলি বিকশিত ক'রে একটা হাসির ভঙ্গী করল।

ভাড়া নয়, এমন কি বাড়িওলাকে বলে অনুমতি নিয়েও থাকা নয়—নিতান্তই ভৃত্যশ্রেণীর লোকের অনুগ্রহে বাস করা। ব্যবস্থাটায় আমার মন আদৌ সায় দিল না। কিন্তু গৃহিণী ততক্ষণে রীতিমত উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন। বোধকরি আমার মনের ভাবটা অনুমান ক'রে নিয়েই তিনি আমাকে একেবারে পাশ কাটিয়ে বিজয়দার শরণাপন্ন হলেন।

—'আপনি কি বলেন? একটু ওকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে দেখবেন নাকি? বাড়িটা কোথায়—কত বড়? সত্যি সত্যিই গিয়ে ওঠা যাবে তো? না কি প'ড়ো বাড়ি?'

বিজয়দা ভীমকে জেরা ক'রে যেটুকু তথ্য আদায় করতে পারলেন, তা অবশ্য খুব বেশী নয়। বাড়িটা মোদ্দা, দেখা গেল বিজয়দা জানেন। চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে বহুদূরে বাড়ি। বাড়িও নয়, তাকে প্রাসাদ বলাই নাকি উচিত। সে বাড়িতে কেউ আসে না এটাও যেমন ঠিক, বাড়ির মধ্যে মধ্যে সারিয়ে বসবাসযোগ্য ক'রে রাখা হয় এটাও ঠিক। অর্থাৎ প'ড়ো বা পুরনো হানাবাড়ি নয়। সুতরাং, এক-বার গিয়ে দেখতে দোষ কি?

দোষ অনেক দেখানো চলত কিন্তু গৃহিণী তার কোনটাই দেখতে রাজী নন। কাজে কাজেই আমিও সে বৃথা চেষ্টা ছেড়ে দিলাম। স্থির হল যে এই সন্ধ্যা রাতে আর ঐ অতদূরে অভিযান ক'রে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে না, আজকে আমরা এই বাইরে এবং শ্রীমতী বিজয়দার আপিস-ঘরে শুয়েই কাটাবো —কাল ভোরবেলা ভীম যখন দুধ দিতে আসবে তখন তার সঙ্গে মালপত্র নিয়ে রওনা দেব, সে ঐ বাড়িতে আমাদের থিতু ক'রে দিয়ে তবে আসবে।

গৃহিণী জোর ক'রে অগ্রিম বকশিশ হিসেবে ভীমের অনিচ্ছুক হাতে একটা টাকা গুঁজে দিলেন।

পরের দিন বাড়িটায় উপস্থিত হয়ে কিন্তু গৃহিণীর উৎসাহও যেন কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হ'ল। সত্যিই বাড়ি নয় সেটা, প্রাসাদ। বরং কিল্লা বলাই উচিত। এখানে যেমন কালচে ধরনের বেলে পাথর হয়, আগাগোড়া বড় বড় সেই পাথরে গাঁথা—বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে—কম্পাউণ্ড অর্থে বাগান নয়, বালির পাহাড় বা মরুভূমি—অত বড় জনহীন শব্দহীন প্রাণলক্ষণহীন বাড়িটা যেন একা নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে, অথবা বলা যায় থম থম করছে। বহুকাল পরে এই মাত্র গত বছরেই নাকি একবার মেরামত হয়েছে—সুতরাং দোরজানলাগুলো ভাঙা বা লোনাধরা দেওয়াল, প'ড়ো বাড়ির যা চিহ্ন বিশেষ নেই—তবুও, অতবড় বাড়িতে আমরা দুটি প্রাণী থাকব কেমন ক'রে ?

গৃহিণী পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলেন শুধু, ভেতরে যাওয়া বা জিনিসপত্র গুছিয়ে তোলা—কোনটাতেই তেমন কোন উৎসাহ দেখা গেল না তাঁর। গতিক দেখে চুপি চুপি এক সময় বললুম, 'দরকার নেই, চলো ফিরে যাই। দর্শন তো কাল হয়েছে—আজ ফিরে যেতে দোষ নেই। এখন গেলে প্যাসেঞ্জারটা ধরতে পারব।'

শ্রীমতী বোধ হয় খুব একটা প্রতিবাদ করতেন না, কিন্তু ভীম প্রবল প্রতিবাদ ক'রে উঠল। ওঁর শুষ্ক মুখ এবং আমার মৃদু কণ্ঠস্বরে আমাদের মনের ভাব অনুমান করতে অসুবিধা হয় নি তার, সে একেবারে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। কী বলছি আমরা। এ বাড়ি ভাড়া দিলে যে কেউ লুফে নিত। কি দৃশ্য সামনে, কত ফাঁকা। তাছাড়া দেখাশুনো করার যখন লোক একজন রয়েছে—আশ-

পাশের ঐ বড় বাড়িগুলোতেও এক-একজন করে মালী বা দারোয়ান থাকে, এ সময় লোকজনও আছে বেশির ভাগ বাড়িতে, একটা হাঁক দিলে কত লোক এসে পড়বে। তবে এত ভয় আমাদের কিসের ?

সবশেষে মোক্ষম মার দিলে, জগন্নাথ আমাদের ওপর সদয় হয়ে এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন, এখন যদি এ সুযোগ আমরা ছেড়ে দিই—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা হবে !

দৃশ্য যে চমৎকার তা মানতেই হল। সামনেই বিস্তৃত এবং অবারিত সমুদ্র, কোন কুশ্রী বাড়ি কিংবা কুৎসিত রকমের ভীড় দৃষ্টিকে বাধা দেয় না স্বর্গদ্বারের মতো। এ তো তবু আমরা নিচে দাঁড়িয়ে আছি—ওপরের বারান্দা থেকে নিশ্চয়ই বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাবে। আশপাশের বাড়ির কথাও ভীম যা বলেছে তাও খুব মিথ্যা নয়। একেবারে কাছে না হোক—কাছাকাছির মধ্যে দু-একটা বাড়িতে দামী শাড়ি শুকোচ্ছে, তা এখান থেকেই নজরে পড়ছে।

আমাদের এই দ্বিধা ও দোলাচলচিত্ততার মধ্যেই ভীম একসময় মালপত্র নিয়ে বারান্দায় নামিয়ে রেখে এল, তার পর হাঁকডাক ক'রে তার দাদাশ্বশুরকেও খুঁজে বার করল। খুঁজে বার করল—বললুম এই জন্যে যে, সত্যিই যাকে খোঁজা বলে তা না করলে তাকে দেখা যেত না—যদিচ সে আমাদের শব্দ পাওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রায় সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

এ লোকটিকে দেখে—এতক্ষণে চার দিকে চেয়ে যেটুকু উৎসাহ বোধ করেছিলুম, সেটুকু আবার মিলিয়ে যেতে দেরি হ'ল না। অতিবৃদ্ধ ন্যুব্জ দেহ একটি লোক, দৃষ্টি ঘোলাটে কিন্তু তার মধ্যেই কেমন যেন একটা বিদ্বিষ্ট ভাব আমাদের প্রতি। পরে অবশ্য বুঝেছিলুম এ বিদ্বেষ তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেই। ...এত বড় বাড়ি পড়ে আছে কিন্তু সে দেখলুম সেখানে থাকে না, বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে দুটো তালগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে বলতে গেলে পাতা-লতা দিয়ে একটা পর্ণকুটির তৈরি করা হয়েছে, নিতান্তই সামান্য—তার কোলে দু-একটা আকন্দ ও নারায়ণী সেনার গাছ—তাইতেই বাস করে লোকটি, কীর্তন্-অ ওর নাম, এবং সেই কুটির বা ঝোপড়ার দ্বারপ্রান্তেই (দ্বার অবশ্য নেই, অমনিই পাতালতার তৈরী আগড় একটা) এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে, ভীম হাঁকডাক ক'রে এগিয়ে যেতে নজরে পড়ল।

গৃহিণী এবার আর তাঁর নিরুৎসাহ গোপন করলেন না। বললেন, 'ও বাবা ভীম, তোমার ও দাদাশ্বশুর তো দেখছি তিনকালগত থুথ্‌ড়ে বুড়ো, ওর ভরসায় এখানে থাকব কেমন ক'রে? বাড়িতে তো জলও নেই, কে বা জল তুলবে, কে বা কাজকর্ম করবে—আমি তো আর সব পেরে উঠব না।'

'সে সব হবে মা,' প্রবল আশ্বাসে ওঁয়ার দ্বিধা-সংশয় যেন উড়িয়ে দেয় ভীম। জানায়, এখানে এই পাশেই এক ঝি আছে মাতী (মাতঙ্গী), সে এসে সব কাজ-কর্ম করে দিয়ে যাবে, আর এই যে কীর্তনচন্দ্রকে আমরা দেখছি এ দেখতেই এরকম, এখনও এক গাছা লাঠি নিয়ে দাঁড়ালে তিনটে লেঠেলের মহড়া নিতে পারে। হাজার হোক জাতগোয়ালা, কব্জির জোর কত! বাজারহাট কেনা-কাটা সব পারবে ও।

তবু আশঙ্কাটা পুরোপুরি যায় না ওঁর। কীর্তনের মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'কী বলছ, ঝি-টি পাওয়া যাবে তো?'

কীর্তন তার নিষ্প্রভ চক্ষু আমার গৃহিণীর মুখের ওপর স্থির রেখে কেমন এক রকম নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, পাওয়া যাবে। জলতোলা কাপড়-কাচা মশলা-পেশা বাসন মাজা—সব করবে, দৈনিক বারো আনা দিতে হবে, সারা দিন রাখতে হ'লে দুপুর বেলা খেতে দিতে হবে।'

—'আর যদি রাত্রেও থাকতে হয়?'

—'না, রাত্রে থাকবে না। ভোরে আসবে, সন্ধ্যার আগে চলে যাবে।'

—'অ আবারও যেন কেমন মিইয়ে পড়েন গৃহিণী—তা তুমি থাকবে তো?'

—না। আমি এই ঘরে থাকি। ওবাড়িতে আমার ঘুম হয় না। বাজার-হাট সব আমি করতে পারব, সারাদিন থাকব—সন্ধ্যার পর আর আমাকে পাবে না। আমি আফিং খাই, তখন আর সাড় থাকে না!'

—'কী হবে গো? এতবড় বাড়িতে তুমি আর আমি থাকতে পারব? হ্যাঁ বাবা ভীম, তা রাত্রে তুমি এসে থাকতে পারো না? না হয় তোমাকে কিছুই দিতুমই—'

বিনয়-হাস্যে ভীম উত্তর দেয়, আমার আটটা-দশটা গরু মা। রাত দুটোয় উঠে গোয়ালে ধোঁয়া দিতে হয়। রাত চারটেয় গাই দোওয়া শুরু হয়। নইলে আমার আর থাকতে কি—!'

—'তবে ?' উদ্বিগ্ন মুখে আমার দিকে চাইলেন উনি।

আমি চাইলাম সমুদ্রের দিকে। চারিদিকে চেয়ে দেখে নিলাম।

নবীন রৌদ্রে ঝলমল করছে চারিদিক, নীল সমুদ্র সুনীলতর হয়ে উঠেছে, নির্মেঘ আকাশের প্রতিফলনে! বড়ই লোভনীয় দৃশ্য আর মধুর বাতাস। সমস্ত দেহ জুড়িয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এই চেহারার দিকে চাইলে কোন বিপদের কথা মনেই থাকে না। সন্ধ্যা এবং অন্ধকার এখনও বহুদূর।

বললাম, 'দেখাই যাক না, 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন'। একটা রাত কেটেই যাবে। তেমন অসুবিধা হয়, কাল সন্ধ্যার আগেই চলে যাব।'

নীল সমুদ্রের নেশা বোধ হয় স্ত্রীকেও পেয়েছিল। তিনিও সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভেঙে-পড়া ঢেউগুলো দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। সে অবসরে কীর্তন দোতলায় একটা ঘর খুলে ঝাঁট দিতে লেগে গেছে—ভীম মালপত্র ওপরে তুলে নিজেই দু বালতি জল দিয়েছে ওপরের বাথরুমে, এর পর আর ধুলো পায়ে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না, আমরাও তুলতে পারলুম না।

দিনের উৎসাহ রাত্রে মিইয়ে গেল। দিনের আলোর রেশ মেলাবার আগেই মিলিয়ে গেল মনের আলো। এ বাড়িতে যে ইলেক্ট্রিক নেই তা আগে কেউ বলে দেয় নি। বিশেষ লাইন আছে, সুইচ আছে হোল্ডার আছে—অথচ তার মধ্যে প্রাণ-শক্তিটুকু নেই—এটা আমাদের বোঝবার কথাও নয়। হুঁশ হল বিকেলে বেড়াতে বেরোবার আগে, কীর্তনকে যখন জিজ্ঞাসা করলুম বাল্‌ব্‌ পাওয়া যাবে—না কিনে আনতে হবে একটা দুটো ? কীর্তন তেমনিই নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠে উত্তর দিলো, 'বাল্‌ব্‌-অ কঁড় হবো, বিজলী কৌঠি ?'

—'তার মানে ?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন আমার স্ত্রী।

তার মানে যা জেরা ক'রে জানা গেল—অতি পরিষ্কার। প্রায় বছর দুই এ বাড়িতে কেউ আসে নি। বর্তমান মালিক বাড়ি বিক্রি ক'রে দেবেন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, বাড়ির চেহারা দেখে কেউ আর দাম পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নি। সেই জন্যেই এই কিছুদিন আগে বাড়ি মেরামত করা হয়েছে, এখন যে বসবাসযোগ্য মনে হচ্ছে এ তারই ফল। আবারও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন

কর্তারা—কিন্তু এত দীর্ঘকাল এ বাড়ি ভাঙা আর পতিত অবস্থায় দেখা গেছে যে এখন আর কেউ দেখতেও আসতে চায় না।

তা তো হ'ল কিন্তু আমাদের উপায় কি? হোটেলে থাকব বলেই এসে-ছিলুম—লণ্ঠন আনার কথা তাই মনেও পড়ে নি। এ যা জোর হাওয়া মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালাও সম্ভব নয়।

অগত্যা আবারও ওদেরই শরণাপন্ন হই—কী হবে বাবা কীর্তন-অ? কীর্তন চন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঝেড়ে জবাব দিল, তার ওসব বালাই নেই। সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়ে সে—কখনও যখনও ওঠবার দরকার হলে অন্ধকারেই ওঠে। একটা প্রদীপ ও দেশলাই আছে, কদাচিৎ কখনও জ্বালে। হ্যারিকেন সে কোথায় পাবে।

'মাতী? মাতী কি বলে?' উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি, 'ওকে একবার বলে ছাখো না।'

মাতী বা মাতঙ্গীই শেষ পর্যন্ত ত্রাণ করল। দৈনিক এক আনা ভাড়ায় নিজের অদ্বিতীয় হ্যারিকেন লণ্ঠনটি এনে তেল পুরে জ্বেলে দিয়ে গেল। সে নাকি এমনই আলো যে আমরা জ্বালতে পারব না। আলোটির আরও যা গুণ দেখলাম—সামান্য বাড়াতে গেলেই এমন ধোঁয়া বেরোতে থাকে যে দেখতে দেখতে চিমনি অন্ধকার হয়ে যায়! অগত্যা আবার সে চিমনি মুছে যেমন মিট্‌মিটে ক'রে জ্বালিয়ে ছিল সেই অবস্থাতেই রেখে দিতে হল। ওতেই যা আলো হয়।

এরপর আর বেড়াতে যাওয়ার রুচি বা সাহস রইল না। প্রতি মুহূর্তেই আশা করছিলাম যে বিজয়দা আসবেন একবার খবর নিতে—স্বার্থপরের মতোই আশা করছিলাম হয়ত—কারণ তাঁর হোটেলের যা অবস্থা বাইরে বেরনোই মুশকিল, বিশেষ এতদূরে।

একটা সুবিধা এই ছিল যে পাণ্ডাকে খবর পাঠানো হয়েছিল—রাত্রে প্রসাদ পাঠানোর জন্যে। অর্থাৎ রান্নার হাঙ্গামা ছিল না। গৃহিণী বললেন, 'কালও যদি এখানে থাকতে হয়—দুপুরেই রাত্রের রান্না সেরে রাখতে হবে। আর, তুমি বাপু পয়সা খরচ ক'রে একটা নতুন লণ্ঠন কিনে এনো, এ আলোতে থাকতে পারব না। এর চেয়ে অন্ধকারে থাকাও ঢের ভাল।'

কাজও নেই কামাইও নেই—মানে মুক্তির অবসর নেই—এই অবস্থায় আমরা দুটি প্রাণী অন্ধকারে বারান্দায় বসে রইলাম পাশাপাশি। বাড়িওলার একটা অব্যবহার্য নড়বড়ে তক্তপোশ পড়ে ছিল ঘরে, সেইটেকে আগেই বার করিয়ে নিয়েছিলাম বারান্দায়—বসবার প্রয়োজন হবে বুঝেই—এখন তাতেই পুরনো খবরের কাগজ পেতে বসলুম।

দেখতে দেখতে চারিদিক আচ্ছন্ন ক'রে অন্ধকার নেমে এল। সে অন্ধকারে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে এল; শুধু মধ্যে মধ্যে ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ ও ফস্‌ফোরাসের আলো ছাড়া সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেছে। সব অন্ধকার, দূরে দূরে দু-একটা বাড়িতে যা আলো দেখা যাচ্ছে—আকাশের তারা বলেই বোধ হচ্ছে। এক সময় প্রায় আধ ঘণ্টার মতো সে আলোগুলোও নিভে গেল, এদিককার কারেন্ট্ বন্ধ হয়ে গেল বুঝলুম। পুরীতে এটা নিত্য ঘটনা।

এই অন্ধকারের মধ্যেই এক সময় মুটে এসে প্রসাদ দিয়ে গেল। সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। উনিশ-কুড়ি বছরের জোয়ান ছোক্‌রা কিন্তু সে কিছুতেই ওপরে উঠতে রাজী হ'ল না। বেশ দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিল যে, নিতে হয় নাও—না হয় আমি প্রসাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি, মোদ্দা ও-বাড়িতে আমি এই অন্ধকারে ঢুকব না কিছুতেই! এখন না হয় সঙ্গে অভড়া আছে—ফেরার সময়? না, সে হবে না।

এমন কি রকে পর্যন্ত উঠল না। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দু'ই বাঁধানো চত্বরের মতো, তারই একটাতে 'গুণ্ডি' বা হাঁড়িগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাগ হ'ল খুবই, একবার মনে হল ফিরিয়েই দিই—কিন্তু তার পরই মনে পড়ল সেই চিরকালীন প্রবাদ বাক্য—চোরের ওপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া—শেষ পর্যন্ত সামলে নিলুম রাগটা। একে যাচা অন্ন, তায় মহাপ্রসাদ, ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া ঘরে কিছু নেইও, এ নিবান্ধাপুরীতে কোন খাবারওলাও ঢুঁ মারে না যে রসগোল্লা জাতীয় কিছু কিনে রাখব। এ প্রসাদ ফিরিয়ে দিলে একেবারেই পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকতে হবে। অগত্যা নিজেরাই গুণ্ডিগুলো বুকে ক'রে ক'রে তুলে ওপরে নিয়ে গেলুম।...

নির্জন গৃহ, কর্মহীন উৎসাহহীন জীবন, সমুদ্রের উদ্দাম ঠাণ্ডা বাতাস। সঙ্গে

তেমন বই-পত্রও নেই, থাকলেও সুবিধে হ'ত না—পড়বার মতো আলো নেই। খবরের কাগজটাও পাওয়া যায় নি, এখানে কে কাগজ দিতে আসবে,—শুধু দুই প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া মুখোমুখি বসে থাকা। আমাদের জীবনে গল্প করার বিষয়-বস্তু ফুরিয়ে এসেছে বহুদিন। সুতরাং; রাত আটটা বাজার আগেই ঘুমে ঢলতে শুরু করলুম দুজনেই। খানিকটা এমনি ঢোলবার পর দুজনেরই প্রায় এক সময়ে মনে হ'ল, এমন কুঁড়ের মতো বসে থেকে লাভ কি? মিছিমিছি প্রসাদটাকে কড়কড়ে করা! এখানে এসেছি তো বিশ্রামের জন্যেই—একটু আগে শুয়ে পড়লে দোষ কি? এখানেও যে কলকাতার মতো ঘড়ি ধরে দশটায় খাওয়া আর এগারোটায় শোওয়া বজায় দিতে হবে এমন কোন আইন আছে?

'চিন্তা-মাত্রেণ' কাজটা সেরে ফেলা গেল। আহারাদি চুকিয়ে যখন শুয়ে পড়লুম—তখন'ও রাত নটা বাজে নি। আলোটা আর নেভাবার চেষ্টা করলুম না—কমাতেও সাহস হ'ল না—এমনিই তো টিমটিম করছে—যেটুকু আছে সেটুকুও যদি যায়—যা মাথা-পাগলা লণ্ঠন, আমাদের দ্বারা আর জ্বালা হয়ে উঠবে না। তার চেয়ে ও যেমন জ্বলছে জ্বলুক। এ আলোতে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না—শুধু এই কেরোসিনের গন্ধটাই যা একটু দুঃসহ।

প্রথমটা অত বুঝতে পারি নি। ঢেউ ভাঙ্গায় এমন প্রবল শব্দ হল এই সময়টায়, যে অন্য কোন শব্দ কানে যায় না। অথবা অন্য কোন শব্দ সেই তরঙ্গাভিঘাতের শব্দ থেকে পৃথক ক'রে নেওয়া যায় না। সে শব্দে তো আমরা অভ্যস্তই, সে শব্দের মধ্যেই তো ঘুমিয়েছি—তবে কিন্তু এখন ঘুমটা ভাঙ্গল কেন?…

দুজনের প্রায় একসঙ্গেই ঘুমটা ভেঙ্গেছে। আর একসঙ্গেই লক্ষ্য করেছি—ঘর অন্ধকার, লণ্ঠনটা ইতিমধ্যে কখন নিভে গেছে? আশ্চর্য, নিজে দাঁড়িয়ে তেল ভরিয়েছি, এর মধ্যে তো নেভবার কথা নয়। কেরোসিনের এমন তীব্র গন্ধই বা কেন ঘরে?

ওগো শুনছ? পাশ থেকে ফিসফিস করে ওঠেন গৃহিনী, আলোটা নিভল কেন?

'কী জানি ঃ পলতেটা বোধ হয় ছোট ছিল, অত লক্ষ্য করা হয়নি তখন।' জোর ক'রেই একরকম আশ্বস্ত করি তাঁকে। নিজে অতটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না—কারণ যা মৃদুভাবে জ্বলেছে তাতে তেল কিছুই এমন পোড়বার কথা নয়। পলতে যত ছোটই থাক—গোড়াতে যদি জ্বলে থাকে এখনও জ্বলা উচিত।

তবু তখনও ঘুম ভাঙ্গার কারণটা বুঝতে পারি নি, অথবা কোন বিশেষ কারণে যে ঘুম ভেঙ্গেছে তাও বুঝি নি।

বুঝলাম একটু পরে।

এবার আর শব্দটা 'ব্রেকার'এর শব্দ থেকে আলাদা ক'রে নিতে অসুবিধা হ'ল না।

এ ধরণের কোন শব্দ এর আগে শুনি নি। এমন ভয়াবহ, এমন গম্ভীর। বহুদিন আগে বিহারের সেই প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় বিহারের একটা শহরে ছিলাম। তারও দশ বছর আগে ১৯২৪ সালে যমুনার বন্যার সময় বৃন্দাবনে ছিলাম। দু'দিনই, অল্পের জন্যে প্রাণ বেঁচেছে। কিন্তু যে কথা বলছিলাম—বড় পাকা বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার শব্দ ঢের শুনেছি এ তাও ঠিক নয়। মনে হ'ল এই গোটা বাড়িটার 'হাড়মড়মড়ি' ব্যারাম হয়েছে, অথবা এই প্রকাণ্ড পাথরের বাড়িটাকে কে যেন বজ্রমুষ্টিতে নিষ্পেষিত করছে, তারই হাড়গোড় ভাঙ্গার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু তাতেই যেন বুকের স্পন্দন থেমে এল—দেহের রক্ত হিম বরফ হয়ে গেল কিছুকালের জন্য।

এমন ভয়ঙ্কর এমন পৈশাচিক, অথচ এত গম্ভীর একটা শব্দ—ঠিক যে কী শুনলাম, তা কাউকে বোঝানো যাবে না কোন দিন।

সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ নয়, এমন কি বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার শব্দও নয়, তা হলপ ক'রে বলতে পারি।

তবে এ কী ?

সত্যিই কিছু শুনেছি তো—না কি এও স্বপ্ন ?

কিছু বুঝতে পারছি না যেন, মাথার মধ্যে কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কোন—একটা সুস্পষ্ট চিন্তার খেই ধরতে পারছি না।...

অনড় অসাড় হয়ে পড়ে রইলুম দুজনেই।

ভয় যে এর আগে পাই নি তা নয়—কিন্তু আজ বুঝলুম যথার্থ ভয় পাওয়া কাকে বলে।

আর, ভয়ে যে এমন পাথর হয়ে যায় মানুষ, ভয়ে যে এমন একটা শারীরিক কষ্ট হয়—তাও আজ প্রথম অনুভব করলুম।

ঘরের মধ্যে হু হু ক'রে উদ্দাম সমুদ্রের হাওয়া বইছে ঝড়ের মতো। ঘরে শুয়েও শীত করছিল সে হাওয়ায়, কিন্তু এখন ঘামে বালিশ-বিছানা ভিজে উঠল। মনে হল হাওয়া কোথাও নেই।···

প্রাথমিক বিহ্বলতা কেটে যেতেই কিন্তু মানুষের সহজাত আত্মরক্ষার চিন্তাটা প্রবল হয়ে উঠল। অত ভেবে চিন্তে কিছু নয়, হয়ত বা এটাও ভয়েরই আর একটা চেহারা—জোর ক'রেই যেন হাত পা সক্রিয় ক'রে তুলে এক ঝটকায় বালিশের তলা থেকে টর্চটা টেনে বার ক'রে একেবারে উঠে দাঁড়ালুম।

টর্চটা জ্বলে উঠতে আরও খানিকটা সম্বিত ফিরে এল। ভাল ক'রে ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখলুম—না দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনিই আছে, ঘরেও অন্য কোন লোক ঢোকে নি। সেই সঙ্গে হ্যারিকেনটা নিভে যাওয়ার কারণটাও বুঝতে পারলুম। লণ্ঠনটা বোধ হয় ফুটোই ছিল, মাতী ময়দা বা সাবান কিছু টিপে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়েছিল—এখন, হয়ত বা লণ্ঠনটা তেতে ওঠবার ফলেই সে তাপ্পিটা খসে পড়ে গেছে। এছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে না—এভাবে ঘরময় তেল ছড়াবার। সব তেলটুকু বেরিয়ে যাওয়ার জন্যই আলোটা নিভেছে।

আমার এই ভাবে উঠে পড়ায় এবং আলো জ্বালায় গৃহিনীও কিছুটা—প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন, তিনিও তাড়াতাড়ি উঠে কুলুঙ্গী থেকে দেশলাইটা সংগ্রহ করে মোমবাতি জ্বালতে গেলেন কিন্তু তাতে দুরকম বাধা, প্রথমত দেশলাই এভাবে নোনা হাওয়ায় বাইরে ফেলে রাখা উচিত হয় নি। তাও, গোটা পাঁচ-ছয় কাঠি নষ্ট করে যদি বা একটা জ্বালাতে পারলেন শেষ পর্যন্ত—সেটা আর মোমবাতির পলতে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না, দমকা বাতাসে নিভে গেল তৎক্ষণাৎ।

মিথ্যে বলব না, কথাটা আমার মাথাতেও যায় নি—জানলা বন্ধ না ক'রে এখানে আলো জ্বালাবার চেষ্টা করাই মূর্খতা। সেই কথাটাই এবার বললুম ওঁকে। আগে জানলা দুটো বন্ধ করো—মিছিমিছি দেশলাইয়ের কাঠি খরচ ক'রে লাভ কি ? ও কটা তো এখনই শেষ হয়ে যাবে।···আমি আলো ফেলছি তুমি জানলাগুলো বন্ধ করে এসো আগে—'

গৃহিনীও তা বুঝলেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে দেশলাইটা বিছানায় ফেলে এগিয়ে গেলেন জানলাটা বন্ধ করতে—

এগিয়ে গেলেন বলাটা বোধহয় ভুল হল। সেদিকে ফিরলেন বলাই উচিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত এবং অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এবার তাঁর মুখের ওপর আলো ফেলে দেখি সমস্ত মুখখানা তাঁর ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে—

জানলার দিকে ভয় পাবার মতো এমন কি কারণ থাকতে পারে ?

তবে কি বাইরের বারান্দায় কিছু দেখেছেন তিনি ?

তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটে যেতে গিয়ে আমিও বুঝলুম ব্যাপারটা। আর বলা বাহুল্য আমিও কিছুক্ষণের জন্য আবার অনড় পাথর হয়ে গেলুম।

যখন আমরা শুতে যাই তখন—তখন কেন সারাদিন ধরেই লক্ষ্য করেছি—আমাদের চৌকী থেকে জানালাটার অন্তত হাত ছয়েক দূরত্ব ছিল, এখন দেখছি এক হাতও নেই !!

স্তম্ভিত বিহ্বল ভাবেই আড়ষ্ট হাতটা ঘুরিয়ে দেখে নিই আর একবার, শুধু ওদিকের জানালাই নয়—চারিদিকের দেওয়াল ও জানলা যেন বড় কাছে এসে গিয়েছে। সমস্ত দিন যে ঘরে ছিলুম, সেই বিরাট হলঘরের আর কোন অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে তার সিকিতে মাত্র দাঁড়িয়েছে—

কিন্তু তাও রইল না বেশীক্ষণ।

হঠাৎ আবার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ উঠল। বাড়িটার পাষাণ দেহ যেন কোন অদৃশ্য অশরীরী শক্তি তার বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে। পাথরের হাড়ও মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ছে। তারই মধ্যে চোখে পড়ল—চোখে না পড়ে উপায়ও ছিল না, কারণ বড় কাছে এসে পড়েছে দেওয়ালগুলো—স্পষ্ট দেখলাম আমাদের সামনের দেওয়ালটা একটু একটু ক'রে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আরও

কাছে, আরও কাছে—

অর্থাৎ বাড়িটাকে কেউ চেপে ধরে নি। এই পাষাণ-পুরীই তার প্রস্তরকঠিন মুষ্টিতে আমাদের চেপে ধরবার চেষ্টা করছে।

ঘরটা আরও ছোট হয়ে আসছে।

আরও—আরও।

প্রথম সচেতন হয়ে উঠলেন আমার গৃহিণীই। প্রচণ্ড একটা আর্তনাদ ক'রে উঠে—তিনি পাগলের মতো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দরজাটার ওপর। পাগলের মতোই হাৎড়ে হাৎড়ে খিল খুলে এক হাতে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে ; বাইরের বারান্দাও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে ততক্ষণে, আমরা টর্চের ক্ষীণ আলোতেও স্পষ্ট দেখলুম—একটু একটু ক'রে সঙ্কীর্ণতর হচ্ছে। কোনমতে সামনে তিনি এবং পিছনে আমি, এইভাবে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সিঁড়ি ধরলুম ; ঘোরানো সিঁড়ি—উঁচু বাড়ির প্রশস্ত সিঁড়ি যেমন হয়—কিন্তু সে সিঁড়িও সরু হয়ে এসেছে, একজনের যাওয়া তা-ই কষ্টকর। প্রতি-মুহূর্তেই মনে হচ্ছে রেলিং আর দেওয়ালের জাঁতিকলে আটকে যাব—যদি ঠিকমতো নামতে না পারতুম, যদি কোথাও তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পা পেছলাত, তাহলে আটকেই যেতুম নির্ঘাৎ—নিহাত গুরুবল বা জগন্নাথের কৃপা (আজ স্বীকার করছি, সে সময় জগন্নাথ রাম কোন ঠাকুর-দেবতার কথাই মনে আসে নি, সেই ভয়ঙ্কর আপৎকালে যেটি সবচেয়ে মনে রাখা দরকার, গুরুদত্ত বীজমন্ত্র উচ্চারণ করার কথাও মনে পড়ে নি তখন)—কোনমতে ধাপ কটা পেরিয়ে এসে নিচের বারান্দা এবং সেখান থেকে এক লাফে বাইরে বালির প্রাঙ্গণে এসে পড়লুম। এতক্ষণ গৃহিণী চৈতন্য হারান নি বা আমার হাতের মুষ্টিও শিথিল করেন নি, কিন্তু এখন—নিরাপদ মুক্তির মধ্যে এসে একটা চিৎকার ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আমার সেটুকু সামর্থ্যও ছিল না—একটা শব্দ করারও শক্তি ছিল না আর। আমিও সেইখানে বালির ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়লুম।···

তারপর ?

তারপর আর কিছু জানি না। ওপরের তারাভরা আকাশও চোখের সামনে অন্ধকারে লেপেমুছে একাকার হয়ে গেল—আর কোন সংজ্ঞা কি চৈতন্য রইল না আমারও।

আবার যখন নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলুম—তখনও ঠিক প্রভাত হয় নি। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার বিবর্ণ হয়ে এসেছে—প্রত্যুষের খুব বেশী দেরিও নেই আর।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসতেই নজরে পড়ল গৃহিণী তখনও সেইভাবে পড়ে আর আমাদের থেকে অদূরে প্রশান্ত মুখে একটা ঘটি হাতে বসে আছেন কীর্তনচন্দ্র। ঘটি করে বোধহয় জলই এনে থাকবেন—কারণ উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়েছি আমার মাথা থেকে কপাল ও ঘাড় বেয়ে জল গড়াচ্ছে। তার মানে কীর্তনই মুখে চোখে জল ছিটিয়ে দিয়েছে। হয়ত সেই জন্যেই সম্বিৎ ফেরা সম্ভব হয়েছে এত তাড়াতাড়ি।

এতক্ষণের দুঃসহ আতঙ্ক, ঐ লোকটাকে দেখে কিছুটা ভরসা পাবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বিষহ উষ্মায় পরিণত হলো। যা মুখে এল তাই বলেই লোকটাকে গালাগালি দিয়ে উঠলাম। যে গালিগালাজে আর আমার উষ্ণ কণ্ঠস্বরে গৃহিণীও চৈতন্য ফিরে পেয়ে উঠে বসলেন কিন্তু কীর্তনচন্দ্রকে কিছুমাত্র বিচলিত হতে দেখলাম না। অনেকক্ষণ পরে, আমার কটুকাটব্যে নয়—গৃহিণীর বিনয়-বচনেই যদি বা মুখ খুলল, তবে একেবারে সাফ জবাব, 'মু কঁড় জানিবে!' আমরা কি তাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন খোঁজ-খবর ক'রে এসেছিলুম? তার মতামত জানতে চেয়েছিলুম? এ বাড়িতে যে ভূত আছে সে কথা তো এ তল্লাটের সবাই জানে। নইলে বাড়ি বিক্রি হয় না কেন, ভাড়াটে আসে না কেন? নইলে এতবড় বাড়ি খালি পড়ে থাকতে সে ঐ ঝোপড়ায় বাস করে কেন?...

রাত্রের ভয়াবহতা রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্য অবাস্তবতা বলে মনে হয়। সূর্য-কিরণে তেমনই ঝলমল করে বাড়ি, তেমনই প্রশান্তি তার চারিদিকে, তার মধ্যেও। বারান্দা তেমনই প্রশস্ত, যেমন কাল সকালে দেখেছিলুম; সিঁড়িও তেমনি আছে। গতরাত্রির সে পরিবর্তনের চিহ্নমাত্রও নেই। আমি হয়ত মালপত্রের তদ্বিরেও আর ভেতরে ঢুকতুম না কিন্তু গৃহিণী দেখলুম আমার থেকে বেশী ভরসা ধরেন, তিনি কীর্তনকে সঙ্গে নিয়ে তাকে পুরোভাগে রেখে দুর্গা দুর্গা করতে করতে ঢুকলেন আবার—অগত্যা আমাকেও

ওঁদের পিছু পিছু যেতে হলো।···

না, ভেতরেও কোন পরিবর্তন নেই। আমাদের শোবার ঘরও তেমনি মাঠ-ময়দানের মতো ফাঁকা পড়ে আছে। সেদিকে চেয়ে সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল, সেই দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য ভয়টা নিতান্তই ছেলেমানুষী বোধ হ'ল। হাস্যকর ছেলেমানুষী।

শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া।

আলোটা।

হ্যারিকেনের তেল যে সবটুকু নিঃশেষে বেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত মেঝেতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেটা স্বপ্নও নয়, কল্পনাও নয়। আর হ্যারিকেনটা তুলে দেখলুম, কোথাও কোন তাপ্পা খসে যাওয়ারও চিহ্ন নেই। এমন কি কোন ফুটোও চোখে পড়ল না। পলতেও অনেকখানি বড়। এক ফোঁটা তেল থাকলেও জ্বলত!

তবে?

এসব 'তথ্যে'র উত্তর খোঁজার মতো মানসিক স্থৈর্য ছিল না তখন আর।

রিক্সা ডেকে তাদের সাহায্যেই মাল-পত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে এক রিক্সার মাল দুই রিক্সায় চাপিয়ে দিয়ে গেলাম সোজা বিজয়দার হোটেলেই। স্থান না পাই তো সেইদিনের ট্রেনেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব। হাওয়া খেয়ে আর কাজ নেই।

সৌভাগ্যক্রমে বিজয়দার হোটেলে আগের দিন সন্ধ্যাতেই অকস্মাৎ একটা ঘর খালি হয়েছে, সকালে তখনও এক্সপ্রেসের যাত্রীরা আসে নি, তাই নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। বিজয়দা প্রথমটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সবটাই আমাদের স্বকপোল-কল্পনা বলে; অতবড় বাড়িতে দুটি প্রাণী থাকা বলেই অকারণে ভয় পেয়েছি আমরা—কিন্তু কীর্তনচন্দ্রের দুটি মোক্ষম যুক্তি প্রয়োগ করতে তিনিও মানতে বাধ্য হলেন যে কথাটা আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। এই ভীড়েও অতবড় বাড়ি ভাড়া হয় না কেন? অন্তত কোন হোটেলও নিতে পারত তো! তাছাড়া বাড়িটা মেরামত করতে খুব কম ক'রেও আট দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে মালিকদের—সে জায়গায় ওরা দর

দিয়েছে নামি মাত্র ত্রিশ হাজার—তবুও বিক্রি হয় না কেন?

বিজয়দার অবশ্য এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না। তিনি তাঁর বাজার-হাট, বোর্ডার এবং হোটেল রক্ষার সহস্রবিধ কচকচির মধ্যে প্রায় তখনই ভুলে গেলেন ব্যাপারটা। আমরা তখন তাঁর কাছে মাত্র ছ'নম্বর —অর্থাৎ ছ'নম্বর ঘরের দুটি বোর্ডার মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু আমরা অত সহজে ভুলতে পারলুম না। বিশেষ সে রাত্রের সেই বিভীষিকা আমার স্ত্রীকে রীতিমতো কাবু ক'রে ফেলেছে, পরের দিন সকালে যত না হোক এখানে নিরাপদ আশ্রয়ে এসে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন যেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর কৌতূহল প্রবল—তিনিই আরও অবিরত আমাকে খোঁচাতে লাগলেন কীর্তন-চন্দ্রকে ধরে রহস্যটার ইতিবৃত্ত আবিষ্কার করতে।

অবশেষে একদিন সকালে সত্যি সত্যিই রওনা হয়ে গেলাম। ধরলামও কীর্তনকে চেপেচুপে। প্রথমটা কিছুই বলতে চায় নি—'মু কিছি জানে না। মু কঁড় জানিবে' বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত পকেট থেকে একটি পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে দেখাতে কাজ হ'ল—কীর্তনচন্দ্র দ্রবীভূত হলেন একটু।

ইতিহাস যা শোনা গেল—বর্তমান মালিকদের আগের মালিকের সময়কার ঘটনা।—সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। এ বাড়ি বা প্রাসাদ করিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের এক জমিদার। বিপত্নীক ভদ্রলোক পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে ভিন্ন গ্রামের এক দরিদ্র ভদ্রলোকের কন্যাকে একেবারে বিবাহ ক'রে ফিরে ছিলেন। মেয়েটি অসামান্য সুন্দরী নাকি, বয়সও মাত্র আঠারো-উনিশ। মেয়ের বাবা নগদ কুড়ি হাজার টাকার লোভ সামলাতে না পেরে এই কাজ করেছিলেন, মেয়ে ললিতাও ঋণগ্রস্ত বাবা আর তাঁর আরও তিনটি অনূঢ়া কন্যার মুখ চেয়ে স্বেচ্ছাতেই এই আত্মদানে রাজী হয়েছিল।

তার নাকি তত দোষও ছিল না। সে সত্যিই আত্মদান হিসেবে নিয়েছিল, বৃদ্ধ স্বামীকে সেবাযত্ন করতেও কোন ত্রুটি করে নি সে।

গোলমাল বাধল অন্যত্র। প্রথমটা 'নতুন মা' নিয়ে ঘরে আসতে বঙ্গচন্দ্র-বাবুর পুত্রকন্যারা একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ ক'রে তাঁর ছোট ছেলে—যার জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে এই কাজ করেছিল বঙ্গচন্দ্র, সে নাকি দা নিয়ে কাটতে এসেছিল বৃদ্ধ বাবাকে। শেষ পর্যন্ত ললিতারই চোখের জলে সবাই

শান্ত হয়। ললিতা নাকি সকলের হাতে পায়ে ধরে বঙ্গচন্দ্রকে বাঁচায়—পুত্র পুত্রবধূদেরও মন জয় ক'রে নেয়। কিন্তু সেই ছোট ছেলে আনন্দই ক্রমে ক্রমে নতুন মার একটু বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়ল। ললিতা প্রথমটা এ ঘনিষ্ঠতা এড়িয়েই চলত কিন্তু শেষে সেও একটু নরম হয়ে পড়েছিল। আনন্দ বোঝাল যে ললিতার ওপর তার ন্যায়ত ধর্মত দাবী আছে, তারা কিছু অন্যায় করছে না, বাপের অন্যায়ের প্রতিকার করছে মাত্র।

ব্যাপারটা বেশীদিন চাপা রইল না। বঙ্গচন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে দেশত্যাগ করলেন। কলকাতায় এলেন, সেখান থেকে কাশী। সেখান থেকে বোম্বাই। কিন্তু কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। সন্দেহ জিনিসটা এমনই যে একবার মাথায় ঢুকলে ব্যাধিবিশেষের বীজাণুর মতো ক্রমশ ছড়িয়েই পড়ে, কিছুতেই নিঃসংশয় হতে দেয় না মানুষকে।

শেষে বঙ্গচন্দ্রর এমন হ'ল যে কোন শহরে গিয়ে তিনি শান্তি পান না, যে কোন তরুণ ভদ্রসন্তান দেখেন মনে হয়—সে ললিতার সম্বন্ধে লুব্ধ আর ললিতাও তার প্রতি অনুরক্ত।

ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর মনে পড়ল পুরীর এই বাড়িটার কথা। তৈরী করার পর একবার মাত্র এসেছিলেন। নির্জন জায়গা, কাছাকাছি বিশেষ লোক-জনের বসতি নেই—এইখানটাই নিরাপদ বলে মনে হ'ল।

কিন্তু ললিতাও তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, লালসা নয়—স্বামীর প্রতি প্রতি-হিংসার আক্রোশে তখন অগ্র-পশ্চাৎ-ভবিষ্যৎ—কোন জ্ঞানই তার নেই। বঙ্গচন্দ্র সঙ্গে চাকর রাখতেন না। এখানে এসেও স্থানীয় দাসী সংগ্রহ করেছিলেন একটি, কাজকর্মের জন্য। কিন্তু তাঁর নিজের কতকগুলো ব্যক্তিগত সেবার অভ্যাস ছিল যা দাসীর দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়। ঝিকে দিয়েই একটি নুলিয়াকে ডাকিয়ে এনে ব্যবস্থা করেছিলেন—প্রত্যহ এসে তেল মালিশ ক'রে সমুদ্রে স্নান করিয়ে আনবে বলে। সে-ই আবার বিকেলে এসে পা টিপে দিয়ে যেত।

অন্য কোন পুরুষের অভাবে ললিতা সেই নুলিয়াটিকেই অবলম্বন করল। তার পক্ষে তো এ আশাতীত সৌভাগ্য। প্রথমটা বঙ্গচন্দ্র অত বোঝেন নি। ললিতা যে এতটা নিচে নামবে এটা কল্পনাও করতে পারেন নি। যখন টের

পেলেন তখন শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে মেরে স্ত্রীকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলেন। সিগারেট পুড়িয়ে মুখের তিন-চার জায়গায় ছ্যাঁকা দিয়ে মুখটাকে বিকৃত ক'রে তুললেন। ঝুলিয়াকেও লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে।

ঝুলিয়া তার নিজের অপমানে যত না হোক, ললিতার প্রতি অত্যাচারে ক্ষেপে গেল। ললিতাকে একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন বঙ্গচন্দ্র, নিজে একা এই ঘরটাতে শুয়েছিলেন—যেটাতে আমরা ছিলাম। পাণ্ডাকে বলেছিলেন একটা দারোয়ানের কথা. কিন্তু সে কিছু আর এক রাত্রেই পাওয়া যায় না, তবে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁর বালিশের নিচে রিভলবার থাকে। মজবুত দরজা বন্ধ ক'রে শোবেন—কে কি করবে তাঁর? ঝুলিয়াও তা জানত। সেও এক অদ্ভুত পথ ধরল। পাঁচিল দেওয়ার জন্য ইট আনানো ছিল, চুনও কিছু ছিল নিচের ঘরে। ললিতাকে মুক্ত করে দিয়ে দুজনে রাতারাতি চুন বালি দিয়ে ঐ ঘরের দরজা ও ওদিকের জানলা গেঁথে নিশ্ছিদ্র করে দিল। আগে জানলা পরে দরজা। জানলা বন্ধ করতেই ঘুম ভেঙেছিল বৃদ্ধের। আগেই ভাঙত কিন্তু ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতেন বলে ঘুমটা অস্বাভাবিক গাঢ়, হাওয়া বন্ধ হতে তবে ঘুম ভেঙেছিল। তখন দরজা গাঁথা চলছে। বাইরে থেকে আগেই শেকল তুলে দিয়েছিল এরা। বুড়ো মানুষের চিৎকার কান্নাকাটি বিশেষ বাইরে পৌঁছয় নি। আর পৌঁছলেই বা কি, শুনবে কে? সেটা বর্ষাকাল, পুরীতে লোক এমনিতেই কম। তাছাড়া তখন এদিকে এত বাড়ি হয় নি, খুব দূরে দূরে দু-একটা বাড়ি—তাতেও লোকজন নেই।...

পরের দিন পাণ্ডা এসেছিলেন, ললিতা নিচেই ছিল। দু-একটা কথা বলে বিদায় করেছে, স্টোভে পুড়ে গেছে বলে নিজের অবস্থা সামলে নিয়েছে। ঝিকে আগের দিনই বিদায় ক'রে দিয়েছিলেন বঙ্গচন্দ্র—এদের কথা জানত তবু তাঁকে জানায় নি বলে,—নতুন ঝি পাণ্ডারই এনে দেবার কথা, ললিতা সেটাও রদ করেছে ঝি পাওয়া গিয়েছে বলে।

এরপর দু-তিনটে দিন ওরা এইখানেই বাস করেছে। ওদের মনে শান্তি ছিল না—কারণ বঙ্গচন্দ্র নাকি ঐ অবস্থাতেও পুরো দুটো দিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ও দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ বাইরের কেউ না শুনুক—এরা শুনেছে।

অবশেষে একসময় সে সব শব্দই নীরব হয়ে গেছে—কিন্তু ওদের কানে নীরব হয় নি সম্ভবত। ক্রমাগত সেই আর্তনাদ ও বিলাপ ওদের কানে বেজেছে। আর তাছাড়া নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তাটাও তার বাস্তব চেহারা নিয়ে এবার ওদের সামনে দাঁড়িয়েছে। শেষে দুজনেই নাকি এই বাড়ির অন্য ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ডাক্তারদের অনুমান—ললিতা আগে, মুলিয়াটা পরে।...

বেশ কয়েকদিন পরে পাণ্ডাই খবর নিতে এসে আবিষ্কার করেছেন এক ব্যাপার। তিনি পুলিসে খবর দিয়েছেন, পুলিস এসে দেওয়াল ভেঙে বঙ্গচন্দ্রের গলিত শব উদ্ধার করেছে। এসেছে ওঁর ছেলেমেয়েরা। সৎকার ইত্যাদি ক'রেই চলে গেছে। তারা এ-বাড়ির জন্যে আর কিছু করে নি—যুদ্ধ বাধতে প্রথম সুযোগেই বেচে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

কিন্তু তার পরের মালিকরা অত সহজে অব্যাহতি পান নি। অনেক চেষ্টা করেছেন ভাড়া দেবার কি বিক্রি করবার—কোনটাই হয় নি। কোন ভাড়াটেই এক রাত্রির বেশী টিকতে পারে নি। আর সেই জন্যই—দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ায়—বিক্রি হয় নি।

কীর্তনের অনুমান—যদিই আমরা টিকে যাই তো, সেই কথাটা প্রচার হ'লে হয়ত বিক্রীর সুবিধা হবে—এই লোভেই ভীম আমাদের এনে তুলেছিল। ভীমের নাকি এটা একটা বড় 'সাইড বিজনেস', বাড়ির দালালি করা। তবে সেটা অনুমানই—কারণ এর পর আমরা যে কদিন ছিলাম, ভীমের টিকি খুঁজে পাই নি। তাকে নাকি জরুরী কাজে আবাদে যেতে হয়েছিল—তার ভাইপো দুধের যোগান দিতে এসে এই অজুহাতই দিয়েছে।

স্বপ্নাতীত

হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। ঘটনাটা এত তুচ্ছ, এতই অল্প সময়ের যে মনে পড়ার কথাও নয়। এমন ধরনের ঘটনা নিত্য কত ঘটছে, প্রত্যেকের জীবনেই এ ধরনের আশীর্বাদ কখনও না কখনও মেলে—কে আর এতে গুরুত্ব দেয়? পাগল বা মাতাল ছাড়া এ সব কথা আক্ষরিক অর্থে কেউ ধরে না। অনাদিও

—মদ না খেলে ধরত না, পরিহাস ছলে যেটুকু গুরুত্ব দিয়েছিল, সেটুকুও দিত না।

অবশ্য আশীর্বাদ ঠিক এটা নয়। বর।

অনাদি সেই বরই দাবি ক'রে ছিল। কিন্তু প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কেউ—সেদিনের সে বর মনে ক'রে রেখে দাবি করত না।

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কেউ এত ভয়ও পেত না অবশ্য।

স্ত্রীকে ভয় করে প্রায় সবাই—শোনাযায় স্বয়ং আলমগীরও করতেন তবে তারও একটা সীমা আছে বৈকি।

কিন্তু ঘটনাটা বোধ হয় গোড়া থেকে শুরু করা দরকার।

পূজোয় বাইরে যাবার ভিড়। বেশির ভাগ লোকই কলকাতা থেকে যায়—সেখানেই পেশাপেশি ভিড় হয়, পঞ্চমীর দিন শুনেছি বহির্মুখী যাত্রীদের যাওয়ার প্রবল ইচ্ছার ফলে যাওয়াই হয়ে ওঠে না, অর্থাৎ রাস্তায় গাড়িঘোড়া জ্যাম হয়ে যথাসময়ে হাওড়ায় পৌঁছানো যায় না।

হাওড়ার দিকেই সকলের নজর থাকে। বাইরের কোন স্টেশনে কী হয় এ সময়—তা, যারা থিতিয়ে বসে যায়—তারা কোন দিন লক্ষ্য ক'রে দেখেও না।

অনাদিকে দেখতে হয়েছিল কারণ বর্ধমান স্টেশন থেকেই গাড়িতে ওঠার কথা তার। ফাস্ট ক্লাসের যে কটা বার্থ বর্ধমানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তারই একটা পেয়ে গিছল সে।

নিজের জন্যে কোন চিন্তা ছিল না বলেই সহযাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখতে পেরেছিল। বর্ধমানেও থৈ থৈ করছে লোক, এদের প্রায় কারুরই রিজার্ভেসন নেই, ইচ্ছা তুন এক্সপ্রেসে উঠবে। এর চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ বোধ হয় আর কিছু নেই। বেশির ভাগই খানিকটা ঠেলাঠেলি করবে, গোঁত্তা খাবে—শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকবে। অলসভাবে ভিড়ের দিকে চাইতে চাইতে সেই কথাই ভাবছিল অনাদি।

কিন্তু গাড়ি আসতে যে কাণ্ডটা হ'ল সেটার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। মানুষের এই দুর্দশা—পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে এই লাঞ্ছনা—সে স্বপ্নেও ভাবে নি। ফাস্ট ক্লাসের যাত্রী তার নিজেরই অবস্থা সঙীন হয়ে উঠেছিল—যদি চেনা একটি চেকারের সঙ্গে দেখা হয়ে না যেত—তা হ'লে ওর নিজের বগি

পর্যন্ত বোধ হয় পৌঁছনোই হত না।

নিজের বার্থ খুঁজে পেয়ে বিছানা বিছিয়ে, মালপত্র গুছিয়ে রেখে আর একবার বাইরে এসেছিল অনাদি। তখনও সেই অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা চলছে, অমানুষিক কাণ্ড। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মানুষগুলো গাড়ির দরজায় যেন আছড়ে আছড়ে পড়ছে, কিন্তু একজনও উঠতে পারছে না।

অবশ্য প্রায় তখনই গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দিল, অন্তিম চেষ্টায় আরও খানিকটা ধাক্কাধাক্কি অনিবার্য বুঝেই অনাদি ওর দরজায় উঠে দাঁড়াল। গাড়ি ছাড়বে, এমনি সময়েই সেই কাণ্ডটা ঘটল। এক অতি বৃদ্ধা, তালগোল পাকানো— আশি কি নব্বুই বছর বয়স হবে—একটি ছোট পুঁটুলি হাতে—ওপাশের একটা স্লীপারে উঠতে যাচ্ছিলেন—কে একজন না দেখেই নিজের নিষ্ফল প্রয়াসে ওঁকে সজোরে ধাক্কা দিল, বুড়ি ঠিকরে এসে পড়ে গেলেন ঠিক ওর বগির শেষে —দুই বগির খাঁজে। দেহের অর্ধেকটা রইল প্লাটফর্মে অর্ধেকটা নিচে ঝুলে পড়ল। প্লাটফর্ম আঁকড়ে ধরার ব্যাকুলতায় বুড়ি ছটফট করছেন কিন্তু একে আঙুলে জোর নেই, তায় হাতে পুঁটুলি—নিচের দিকেই চলে যেতে লাগলেন ক্রমশ।

এ সবই কয়েক লহমার ব্যাপার। অনেকেই হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল, চিৎকার উঠল চারদিক থেকে—কিন্তু তখন ট্রেনেও টান পড়েছে ইঞ্জিনের। আর ভাবার সময় ছিল না, অনাদিও ভাবল না—গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে— এক হ্যাঁচকায় বুড়িকে টেনে প্লাটফর্মে তুলে নিল। আর এক লহমা দেরি হ'লে বুড়ির দেহটা নির্ঘাত চাকার তলায় চলে যেত, এমনিতেই খানিকটা ঘ্যাঁষটানি লেগে গেল।

ততক্ষণে কে একজন বুদ্ধি ক'রে চেন টেনে দিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠবার তাড়া ছিল না। অনাদি ঝুঁকে পড়ে বুড়ির অবস্থাটা দেখছে— বুড়ি ঠিক সেই সময়েই একবার চোখ খুললেন, ওর চোখের দিকে চেয়ে চুপি চুপি কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'যদি কখনও কোন বিপদে পড়িস বাবা, আমার কথাটা ভাবিস, মনে মনে আমাকে জানাস—বিপদ কেটে যাবে।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজলেন আবার।

অভিজ্ঞ মহলে আবার একটা কোলাহল উঠল, 'মরে গেছে, মরে গেছে!'

চারিদিক থেকে আরও লোক ছুটে এল। পুলিস, রেলের লোক। পড়ে যাওয়ার শকেই সম্ভবত বুড়ির হার্ট ফেল করেছে—সম্ভাব্য মৃত্যুর আকস্মিক আশঙ্কায়। অনাদি আর অত মাথা ঘামাল না, এতখানি দুঃসাহসিক কার্যের বাহবাটাও পুরো পেল না—বুড়ি মরে গিয়ে কৃতিত্ব ম্লান ক'রে দিল। সে নিজের কামরায় এসে বসল। মিনিট পনেরো গাড়িটা ঐখানেই ডিটেন্‌ড হয়ে গেল—সেই চিন্তাটাই তখন সকলের প্রবল হয়েছে—অনাদিরও। এমনিই অনেক দেরিতে কাশী পৌঁছয় গাড়িটা, আরও কত দেরি করবে কে জানে।

কে এ বুড়ি, এখানে এমনভাবে একা এসেছে কেন, গাড়ি চড়ে কোথায় যাচ্ছিল, সঙ্গে মালপত্র নেই—হয়ত ভিখিরী, কোন আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও আছে কিনা, তারা হয়ত খবরও পেল না—এই ধরনের চিন্তা আসা স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক সত্বর ভুলে যাওয়াও। অনাদিও ভুলে গেল। শুধু শুয়ে পড়ার পর একবার মনে হয়েছিল কথাটা—বুড়ির কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের ধরনটা। সাধারণত এক্ষেত্রে যে রকম আশীর্বাদ করে বুড়িরা এ সে রকম তো নয়। যেন কোন দেবী বর দিচ্ছেন এই ভাবেই কথা কটা বলে গেল। মাথাই খারাপ বোধ হয়। নিজেকে কোন দেবীটেবী ভাবত।

এ কথাটা নিয়েও বেশি ভাবার অবসর হল না। তার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই কথাটা আজ এতদিন পরে কী ভাবে মনে পড়ল কে জানে। বোধ হয় মদ খাবারই ফল, মাতাল হবার। মাতাল না হ'লে পাগলের কথা কার মনে পড়ে—আর তা কেই বা যাচাই ক'রে দেখতে চায়।

ওদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার বাহেলের পার্টিতে গেলেই এই ব্যাপার ঘটে। হরেক রকমের মদ আসে—অনেক কাণ্ড ক'রে এ সব মদ আনান ভদ্রলোক, নিজে যেমন বোতল বোতল খান—তেমনি সবাইকে জবরদস্তি ক'রে খাওয়ান। অনাদি নিজে মাতাল নয়, রোজ-দিন খায়ও না—কিন্তু বাহেলের ওখানে গেলে মাত্রা ঠিক রাখা যায় না। একে মনিব, তায় খুব ভালোবাসে লোকটা—সে যদি কাকুতি মিনতি ক'রে গেলাস নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে—এড়ানো যায়?

স্ত্রী মনোরমা এইটেই বোঝে না, রাগারাগি করে। বলে, ঐ ক'রে তোমাকে

পাঁড় মাতাল ক'রে দেবে—তখন আমার আর জলে ডুবে মরা ছাড়া গতি থাকবে না।

অবশ্য শেষ যেদিন পার্টি ছিল সেদিন বাড়াবাড়িটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। এসে যা-তা কাণ্ড করেছে—শেষমেষ বিছানায় বমি ক'রে ভাসিয়েছে। সকালে তা নিয়ে মনোরমা খুব চেঁচামেচি করেছে, বঁটি নিয়ে নিজের গলায় বসাতে যাচ্ছিল, আর কোন পথ না পেয়ে তখন ওকে ছুঁয়ে দিব্যি করতে হয়েছে যে পার্টিতে গেলেও মোটে এক গেলাসের বেশি মদ খাবে না, প্রতি বার এক চুমুক ক'রে খেয়ে মনিবের মর্যাদা রাখবে।

কিন্তু সে দিব্যি আজ রাখা যায় নি। বাহেলের পীড়াপীড়িতে বেশ খানিকটা খেতে হয়েছে। মোট হিসেব করলে হয়ত দু বোতলের কাছাকাছি হয়ে যাবে। মাতালই হয়ে পড়েছে রীতিমতো।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে সেটা হুঁশ হয়েছে। ভয়ও হয়েছে খুব। আর সেই সময়ই ভয়ে দিশাহারা হয়ে যখন ফিরে পথে কোথাও বসে থাকবে কিনা ভাবছে—বুড়ির কথাটা মনে পড়ে গেল—আর নেশার ঘোরে বলেই হয়ত খুব একটা ভরসাও পেল মনে মনে।

'জয়মা বুড়ি, মদের গন্ধটা বেমালুম কাটিয়ে দাও মা, যদি মনে ক'রে থাকো সেদিন তোমাকে বাঁচিয়েছি—মানে আমার পার্ট-অব-বিজনেস আমি ঠিকই করেছি—তুমি বাঁচলে না সে তোমার বরাত—আজ আমাকে বাঁচিয়ে দাও মা।'

তার পর বাড়িতে এসে ডেকেছে, মনোরমাই দরজা খুলে দিয়েছে। তখন গভীর রাত, ঘুমের ঘোরে দোর খুলেই শুয়ে পড়েছে। মুখ হাত ধুয়ে কখন অনাদি এসে গিয়েছে তা সে টেরও পায় নি।

পরের দিন সকালেই অগ্নিপরীক্ষা। নেশা ছুটে যাওয়ায় বুড়ির ওপর আর অতটা আস্থা ছিল না, বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। কিন্তু চমকে উঠল সত্যি সত্যিই—যখন মনোরমা হাসি হাসি মুখে বললে, 'কী ভাগ্যি! কাল যে তোমার সাহেব একেবারে অমনি মুখে ছেড়ে দিলে। এত গুড্ বয় হয়ে গেছ! রাত্রে ঐ ভেবেই আমার ঘুম ভেঙে গেল, একটু গন্ধ পর্যন্ত নেই মদের—এমন তো হয় না!'

সস্তার বাড়ি

বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রান—শুধু হয়রানই নয়, উদ্‌ভ্রান্ত, এমন সময় কল্যাণ এসে খবর দিলে, উত্তর কলকাতায় একটা বাড়ি আছে, দোতালা বাড়ি, উপরে নিচে চারখানা শোবার ঘর, রান্না ভাঁড়ার—এছাড়া তেতলায় একটা চিলে কোঠা—মাত্র পঞ্চান্ন টাকা ভাড়া!

'কত?'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে বিজয়।

নিশ্চয় একশ পঞ্চান্ন বলতে গিয়ে কল্যাণ ভুল করেছে। শুধু পঞ্চান্ন বলে ফেলেছে।

কল্যাণ কিন্তু আবারও বলে—'পঞ্চান্ন, শুধ্ পঞ্চান্ন! রাজী আছ উত্তরে যেতে?'

উত্তরে কেন—যমের দক্ষিণ দোরেও যেতে বিজয়ের আপত্তি নেই—এমনই ওর অবস্থা তখন। কোথাও একটা আশ্রয় পেলেই বাঁচে। নীচের তুটি ঘর নিয়ে সে থাকে, ভাড়া পঞ্চাশ—সেটাকে বাড়াতে না পেরে বাড়িওলা তাকে তাড়াবার জন্যে এমন সব কৌশল অবলম্বন করেছে যে এক মুহূর্ত সেখানে থাকাও সমস্যা। ওরা উঠে গেলে নাকি সে পঁচাত্তর টাকা ভাড়া পাবে ঐ তুখানা ঘরের। তা পাক—কিন্তু তার জন্য মানুষ এত অভদ্র হ'তে পারে? বিজয় বাড়ি খুঁজছে প্রাণপণে, বাড়ি পেলেই উঠে যাবে—এ কথাটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন। তারা ওপরে থাকে—ওরা নিচে সুতরাং ছোটখাটো অসংখ্য এমন অত্যাচারের সুযোগ তাদের আছে যা নিয়ে নালিশ মকদ্দমা তো করা যায়ই না—পাঁচজনের কাছে বলতে গেলেও উপহাসাস্পদ হবার সম্ভাবনা। যারা ভুক্তভোগী নয় তারা সে তুঃখ বুঝবে না। আর তাছাড়া ছাঁ-পোষা কেরানী লোক, বারো মাস মামলামকদ্দমা করারই বা সময় কই? ঝগড়াঝাঁটি করতেই বিরক্তি বোধ হয়—ক্লান্তি আসে।

কিন্তু সে যাক্—কল্যাণ বলে কি?

পঞ্চান্ন টাকায় গোটা বাড়ি? এই বাজারে? পাগল নাকি ও?

গত দেড় মাস দু মাস বিজয় কম ক'রে অন্ততঃ দেড়শ' বাড়ি দেখেছে। চোর-কুঠরীর মতো দুখানা ঘর যার আছে সে যদি বা দয়া ক'রে একশো টাকা না চায় তো আশি চাইবেই। তাও তার না আছে জল না আছে পাইখানা—ছত্রিশ ঘর ভাড়াটের জন্যে হয়ত একটি কল এবং একটিমাত্র পাইখানা। এমনও আছে যারা ব'লে দেয়, 'বিপদ আপদ হয় সে আলাদা কথা—তা নইলে মোটামুটি জল আপনাদের রাস্তার কল থেকেই আনতে হবে।'

আবার ভাড়া যদি একটু কম হয়—পঁয়ষট্টি-সত্তরের ধাক্কা যা—সে মনুষ্য বাসের অযোগ্য। দিনের বেলা আলো জ্বালতে হয়, ভিজে স্যাৎস্যাৎ করছে, কলতলা পাইখানার পাশের ঘর হয় তো—এমনি সব জোটে। দক্ষিণ কলকাতার বাড়িগুলো এত পুরনো নয় ব'লেই ওর এই দিকে ঝোঁক। নইলে উত্তরে আর আপত্তি কি ?

সে সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলে, 'পঞ্চান্ন টাকায় একখানা গোটা বাড়ি ? কি রকম বাড়ি রে ?'

কল্যাণ একটু বিরক্তই হয়, 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার বাবা—একবার দেখে এলেই পারো। তোমার তো দুখানা ঘরের দরকার, যদি ড্যাম্প্ হয়—নীচের ঘরগুলো না-ই ব্যবহার করলে !'

'তা বটে। চলো এখনই দেখে আসি। কিন্তু এ খবর কে দিলে ?'

কল্যাণ বললে, 'এই আত্মীয়দের মধ্যেই—আমার পিসেমশাইয়ের এক ভাগ্নী-জামাইয়ের কাকার বাড়ি।'

কল্যাণের আত্মীয়তাবোধের সঙ্গে বিজয়ের বহুদিনের পরিচয়—সে আর বৃথা বাক্যব্যয় করলে না, শুধু গম্ভীর ভাবে বললে, 'তাহ'লে তো আপনা-আপনির মধ্যেই, জানা শোনা। চলো বেরিয়ে পড়ি—'

কিন্তু বাড়ি দেখে আরও অবাক হ'লো বিজয়। শ্যামবাজারের মধ্যেই, বাড়ি খুব পুরনো নয়—নিচের ঘরগুলোতেও বাস করা যায় স্বচ্ছন্দে। জল কল সব সুবিধে। দিব্যি বাড়ি।

বিজয় দেখে শুনে অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'তুই নিশ্চয় ভুল শুনেছিস কল্যাণ। এবাড়ি শুধু পঞ্চান্ন হ'তে পারে না। হয় ভুল শুনেছিস নয় তো ঠাট্টা করেছে তোর কাকা।'

'অত কথায় দরকার কি তোর!' কল্যাণ বলে, 'আজই চল্ না দুপুর বেলা অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাড়িওলাকে ভাড়া জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে আসবি। তাহ'লেই বিশ্বাস হবে তো? ওদের অফিস আমাদের অফিসের দুখানা বাড়ি পরেই—'

বিজয় তবু প্রশ্ন করে, 'ক বছরের য়্যাডভান্স দিতে হবে? হয়ত তাইতেই মেরে দেবে রে! কিংবা সেলামী। ফার্নিচার তো নেই, নইলে হয়ত কতকগুলো ভাঙা কাঠ দিয়ে দু হাজার টাকা নিয়ে নিত। কোন্ দিকে পুষিয়ে নেবে তাই ভাবছি।'

কল্যাণ বললে, 'না তা নয়। পিসেমশাইয়ের কাছে যা শুনেছি—লোকটা খুব নির্বিবাদী। এখন সব রেণ্ট কণ্ট্রোল থেকে যা ভাড়া কমিয়ে দিচ্ছে, ও বলেছে কি দরকার ওসব হ্যাঙ্গামে যাবার। যা রয় সয়—তাই ভালো! তবে জানাশুনো লোক নইলে ভাড়া দেবে না, নালিশ মকদ্দমা দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে না হয়—এই ওর একমাত্র চিন্তা।'

কথাটা বিজয়ের মনে লাগল।

তখন আর অঞ্জলির সঙ্গে কথা কইবার সময় নেই। কোনমতে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে অফিস দৌড়ানো—তাও পনের মিনিট লেট হয়ে গেল। নিহাৎ সরকারী অফিস বলেই রক্ষে। এখানে ঠিক সময় হাজির দেওয়াটা কেউই আশা করে না আজকাল।

ঘণ্টাখানেক কাজ ক'রেই দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল। বাড়িওলা মানুষটি খুব ভদ্র, বছর পঞ্চাশ বয়স, গোলগাল মোটাসোটা—গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সমাদর ক'রে বসিয়ে চা আনতে পাঠালেন। তারপর কল্যাণের মুখে বিজয়ের পরিচয় পেয়ে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'বাড়ি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

বিজয় সোৎসাহে বললে, 'খুব। বলেন তো এগ্রিমেণ্ট করতে রাজি আছি।'

'না না—থাক্। মানে আমি কি চাই জানেন, কোন পক্ষেই কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। আপনিই বা বাঁধা পড়বেন কেন?

'কিন্তু সে যে আবার বিপদ, দু মাস বাদেই যদি আপনি বলেন দেড়শ টাকা ভাড়া দাও, নইলে পথ দ্যাখো—আমি বেশি ভাড়া পাচ্ছি। তখন? এই

বিপদেই তো দিশাহারা, আবার ভাজনা খোলা থেকে আগুনে ঝাঁপ দেব?'

'না না—সে সব কোন ভয় নেই। আমি জেন্টল্‌ম্যান্‌স্‌ ওয়ার্ড দিচ্ছি। বলেন তো আমার তরফ থেকে আমি একটা লিখে দিচ্ছি যে এক বছরের মধ্যে ভাড়া বাড়াবো না। তারপরও বাড়লে কত বাড়াবো বলুন, পঞ্চান্ন টাকাটা তো একশ' হতে পারে না।'

'সে ভালো কথা। এখন তাহ'লে আমাদের কি করতে হবে?'

বাড়িওলা নীরবে কিছুক্ষণ পেপার ওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে বললেন, 'ভাল হয় যদি তু মাসের ভাড়া জমা রাখেন। এছাড়া প্রতিমাসের ভাড়া আগাম দিতে হবে। এই জমাটা তু মাস থাকার পর মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে কাটা যাবে। আর যদি তার আগেই উঠে যান বা ভাড়া ঠিক মতো না দেন তো ও টাকাটা বাজেয়াপ্ত হবে। আমি দেখুন স্পষ্ট কথার মানুষ—আমার অপরাধ নেবেন না।'

'না না, ঠিক আছে। এত ভদ্রতা আমি আশাই করি নি।' বিজয় পকেট থেকে চেক্‌ বই বার ক'রে তখনই একশ' পঁয়ষট্টি টাকার চেক দিয়ে রসিদ নেয়। তারপর চা খেতে খেতে বলে, 'তাহ'লে বাড়ি কবে পাচ্ছি আমি?'

'আজই পেতে পারেন। শেষ ভাড়াটে চলে যাওয়ার পর চুনকাম করিয়ে দিয়েছি। আবার যদি দরকার হয় তো করিয়ে নিতে পারেন—আমি খরচ দিতে পারি। আমার পক্ষে ক'রে দেওয়া শক্ত।'

'কতদিন আগে গেছেন তাঁরা?' বিজয় কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই প্রশ্ন করে।

'তা, মাস ছয়েক হবে বোধ হয়।'

'এতদিন বাড়ি খালি আছে? সে কি!' বিজয় বিস্মিত হয়।

কল্যাণ বলে, 'তোমার কপালে আছে। আর কি!

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বাড়িওলা বলেন, 'না, মানে আমি ঠিক যাকে-তাকে ভাড়া দিতে প্রস্তুত নই—বুঝলেন না? হাঙ্গামা করা আমার পোষায় না।'

বিজয় বিজয়গর্বে রসিদখানা অঞ্জলির চোখের সামনে মেলে ধরে বললে,

'বাড়ি তৈরী, এখন কবে উঠবে বলো।'

'সে কি! একেবারে পাকা?' অঞ্জলির বিশ্বাসই হয় না।

তারপর সব কথা শুনে সে বলে, 'হ্যাঁগো এখনও এমন সত্যযুগের মানুষ আছে?'

'আছে তো দেখছি।

দুজনে মিলে পরামর্শ ক'রে স্থির হ'ল যে আগামী রবিবারেই উঠে যাওয়া সুবিধা। ওদের ঝিকে যদি শনিবার অফিস যাবার আগেই বিজয় ও বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় তো সে কতক ধোওয়া মোছা ক'রে রাখতে পারবে। তারপর অফিস থেকে ফিরলে ওরা ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাই গিয়ে ঠিকঠাক ক'রে রেখে আসবে। কতক কতক বাজে জিনিসপত্রও চাইকি রেখে আসতে পারে।

সেই মতো ব্যবস্থাই হয়ে গেল। ওরা উঠে যাচ্ছে শুনে পুরনো বাড়িওলা নিজে প্রস্তাব করলেন, 'বলেন তো আমরাও গিয়ে ধুয়ে মুছে দিয়ে আসতে পারি।'

'না, দরকার হবে না—ধন্যবাদ।' ব্যঙ্গের সুরে বিজয় উত্তর দিলে।

শনিবার দিন অফিস থেকে ফিরে বই কাগজ ইত্যাদি কিছু কিছু জিনিস একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে বিজয় স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা হ'ল। গিয়ে কড়া নাড়তেই ওদের ঝি এসে দোর খুলে দিয়ে একটু বিস্মিত ভাবেই বললে, 'ওমা দোর দেওয়া আছে? ছেলেটা তাহ'লে গেল কোথা দিয়ে?'

'কে ছেলে? কাদের ছেলে?' অঞ্জলিও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

'তা জানি নি বাপু'। কে একটা ছেলে—এই বছর সাত-আটের—এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি যখন বারণ ক'রে দিলুম যে দেখো খোকা ধোওয়া ঘরে কাদা পায়ে ঢুকো না, তখন নিচে নেমে এলো। তাও যতবার নিচে জল নিতে এসেছি দেখেছি খালি ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তা সে এলো কি ক'রে? দোর দাও নি তুমি?'

'একটু দেরি হয়েছিল। দাদাবাবু চলে যাওয়ার পর তো আর দোর দেওয়া হয় নি। পরে মনে হ'ল বটে, একা রয়েছি,—কেউ যদি বদমাইশ এসে ঢুকে পড়ে? তাই তখন এসে দোর দিয়ে গেলুম। সদরে খিল লাগিয়ে যখন উঠেছি তখনই দেখি ছেলেটা ছাদ দিয়ে নামছে। যখন দোর খোলা ছিল তখনই ঢুকে

পড়েছে। আমি জিজ্ঞেসা করলুম, অ খোকা তোমার নাম কি, কোথায় থাকো —তা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসলে, জবাব দিলে না। ভারি ফুটফুটে ছেলে—'

অঞ্জলি বললে, 'নিশ্চয়ই এই পাশের কোন বাড়ির ছেলে হবে। তার মা হয়ত খুঁজছে। তা সে গেল কোথায়?'

'কি জানি, আমি তো ভাবলুম চলে গেছে। এখন তো দেখছি দোর দেওয়া—'

বিজয় বললে, 'ছাখো কোন ফাঁকে আবার হয়ত ওপরে উঠে গেছে।'

অঞ্জলি বললে, 'ছাখো তো তরুর মা—থাকে তো ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। কার ছেলে—সে হয়ত কেঁদে কেটে খুন হচ্ছে—'

ঝি দোতালা তেতলা সব খুঁজে এসে বললে, 'কৈ বৌদি, কোথাও তো নেই। গেল কোথা দিয়ে?'

বিজয় বললে, 'হয়ত ছাদ দিয়ে রাস্তা টাস্তা আছে। তাহ'লে তো বিপদ, এতটুকু ছেলেই যদি যেতে আসতে পারে তাহলে তো অন্য লোক সহজেই পারবে।'

কিন্তু ছাদে উঠে দেখা গেল যে ছোট ছেলে কেন—খুব জোয়ান ছেলেও কেউ আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। একদিকে গলি অপর তিন দিকেই উঁচু উঁচু বাড়ি, আসা যাওয়ার পথ নেই।

তখন সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

অঞ্জলি বললে, 'নিশ্চয়ই কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে ছিল, এখন আবার আমরা যখন ওপরে খুঁজছি তখন পালিয়েছে।'

তা অবশ্য হ'তে পারে। সদরদোরের কপাট ভেজানোই ছিল।

পরের দিন সকাল ক'রে খাওয়াদাওয়া সেরে দুপুরের মধ্যেই এ বাড়িতে সবাই চলে এল মালপত্র লরীতে বোঝাই ক'রে। ওরা ট্যাক্সিতে ক'রে আসবার সময় হাতিবাগান থেকে অঞ্জলির মা আর ছোট বোন মিনুকে তুলে এনেছিল। মা সব গোছগাছ ক'রে দিয়ে বিকেলের চা খাবার ক'রে খাইয়ে—সন্ধ্যাবেলা চলে গেলেন। মিনু রইল—নতুন বাড়িতে অনেক কাজ, দিনকতক থাকলে সুবিধাই হবে, এই ভেবে অঞ্জলিই তাকে রেখে দিলে।

সন্ধ্যার পর অঞ্জলি মিনুকে ডেকে বললে, 'আমি ততক্ষণ রুটিগুলো সেঁকে নিই—তরুর মা বেলে দেবে'খন—তুই খুকীকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে—'

'খোকা ?'

খোকা তখন তরুর মার গা ঘেঁষে বসে গল্প শুনছে। সে বললে, 'আমি এরই মধ্যে শুতে যাবো বুঝি ? বা রে! আটটায় খাবো—তার পরে তো ঘুম। মাসী কিচ্ছু জানে না।'

'তোমার বুঝি আজ নতুন বাড়ির অনারে পড়াশুনো সব ডকে উঠল খোকন ?' অঞ্জলি হেসে বলে।

'বাবা তো পড়াবে—বাবা কোথায় ?'

কি সব খুচরো জিনিস কিনতে বিজয় বাজারে গিয়েছিল। মিনু খুকীর দুধ গরম ক'রে নিয়ে তাকে কোলে ক'রেই ওপরে চলে গেল। দুধ খাইয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে সে বিছানায় বসে খুকীকে ঘুম পাড়াতে শুরু করেছে এমন সময় দেখল ঘরে গুট্‌গুট্‌ করে ঢুকছে একটি ছোট ছেলে। খোকনেরই বয়িসী হবে, তবে খোকন নয়।

এঘরে আলো নেই, কিন্তু বাইরের বারান্দায় আলো জ্বলছে তারই আভাতে বেশ দৃষ্টি চলে। ছেলেটি একেবারে ওর কাছে এসে দাঁড়াল—দুটো হাত বেশ ক'রে ছড়িয়ে খাটের কানাটা ধরে হাসিহাসি মুখে চেয়ে রইল মিনুর মুখের দিকে—

মিনু তখন খুকীকে কোলে শুইয়ে প্রাণপণে চাপ্‌ড়াচ্ছে আর গুনগুন ক'রে গান গাইছে, কাজেই ছেলেটিকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারলে না। তবে অনুমানে বুঝলে এ কালকের সেই ছেলেটি—বাড়ি ধোবার সময় যে ঢুকে পড়েছিল। ওর বেশ কৌতুক বোধ হ'ল। ছেলেটা তো অদ্ভুত, বলা-কওয়া নেই—অচেনা লোকের বাড়ি সপ্রতিভ ভাবে ঢুকে আসে। পাগলা আছে বোধহয় একটু।

ভাবতে ভাবতেই মনে হ'ল জামাইবাবু বেরিয়ে গেছেন, নিশ্চয়ই তারপর তরুর মা দোর দেয় নি। দ্যাখো দিকি কি অন্যায়—এমনি ভাবে অন্য লোকও তো ঢুকে পড়তে পারে!

খানিকটা চাপড়াবার পর খুকীর চোখ দুটো যেমন একটু বুজে এসেছে, মিনু সামনের দিকে ঝুঁকে চুপি চুপি ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বললে, 'ও খোকা, তোমার নাম কি ? কোন্‌ বাড়িতে থাকো ?'

ছেলেটা উত্তর দিল না। মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু।

মিনুরও আর বেশি কথা কইতে ভরসা হ'ল না পাছে খুকি উঠে পড়ে। খানিক পরে খুকীর ঘুমটা আর একটু গাঢ় হ'তে তাকে সন্তর্পণ তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলে, সে সময় ওকে ছেলেটার দিকে পেছন ফিরতে হয়েছিল, কিন্তু সে একমিনিটের বেশি নয়—তারপর ফিরে আর ছেলেটাকে দেখতে পেলে না।

মিনু তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দায় এল। সেখানেও সে নেই। ছাদের দিকে উঁকি মেরে দেখলে সিঁড়ির দরজা বন্ধ। পাশের ঘরেও কেউ নেই। নিশ্চয় নিচে গেছে। সে নিচে নামছে এমন সময় কট কট ক'রে সদরের কড়া নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ের ডাক, 'খোকন!'

মিনুই গিয়ে তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিল।

তারপর আবার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভেতরে এসে তরুর মাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তরুর মা তখন জামাইবাবু যাবার কত পরে দোর দিয়েছিলে?'

'ও মা, কি বলছ গো! আমি তো ওনার সঙ্গে গিয়ে দোর দিয়ে এলুম।'

বিজয়ও সায় দিলে, 'হ্যাঁ, আমি ডেকে নিয়ে গেলুম যে। নতুন পাড়া—কিছু কি বলা যায়! কেমন লোক সব—চোর ছ্যাঁচড় আছে কিনা জানি না তো!'

'কিন্তু—কিন্তু তা হ'লে সে ছেলেটা গেল কোথায়?'

'কে ছেলে রে?' অঞ্জলিও বেরিয়ে আসে।

'ঐ একটা খোকা। খোকনেরই মতো হবে, কি আর একটু বয়স বেশী। খুকীকে যতক্ষণ ঘুম পাড়ালুম সমস্তক্ষণ আমার কাছে সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেমন পেছন ফিরে খুকীকে শোয়াতে গেছি—কোথায় যে পালিয়ে গেল! ওকেই বোধ হয় তরুর মা দেখেছিল সেদিন!'

অঞ্জলি একটু চিন্তিত মুখে বললে, 'গেলই বা কোথায়? সে না হয় দুপুর বেলা—রাস্তা দিয়ে এসেছিল। আজ এই রাত্তিরে ওর বাপ মা ছেড়ে দিয়েছে? কোথা দিয়ে ঢুকেছে বাড়িতে—সত্যি এটা দেখা দরকার!'

ওরা এদিক ওদিক দেখলে। খাটের নিচে, সিঁড়ির কোণ, বাথরুম,—ওপরের ছাদ পর্যন্ত। কোথাও তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

এবার বিজয়ও একটু চিন্তিত হ'ল, 'তাই তো সদর দোর বন্ধ, বাড়ি থেকে

বেরোবার আর কোন রাস্তা নেই—গেল কোথায় ?'

খানিকক্ষণ সবাই চুপ ক'রে থাকার পর তরুর মা সভয়ে বললে, 'হ্যাঁ বাবু, ভূত টুত নয় তো ? রাম রাম !'

'দূর দূর—চুপ কর্ !' তাকে ধমক দিয়ে ওঠে অঞ্জলি, 'এটুকু ছেলে ভূত —শুনেছিস কোথাও ?'

'তা বটে বাপু !' স্বীকার করে তরুর মা—'শুনি নি তো কখনও। খোকা-ভূতের কথা !'

সেদিনের মতো সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেলেও অঞ্জলির গা-টা ছম্ ছম্ করতে লাগল। আগে কথা ছিল যে বড় ঘরে অঞ্জলি ছেলেমেয়ে এবং বোনকে নিয়ে শোবে—বিজয় থাকবে পাশের ঘরে, ঝি শোবে নিচে। কিন্তু তরুর মার মুখের চেহারা দেখে তাকেই পাশের ঘরের ব্যবস্থা করা হ'ল—বিজয় বড় ঘরের মেঝেতে শুল আলাদা বিছানা ক'রে।

কিন্তু এর পর দুটো দিন কাটল নিরুপদ্রবে। বিজয় ক্ষ্যাপাতে শুরু করলে মিনুকে, 'ওটা তোমার অলস মস্তিষ্কের কল্পনা মীনাবতী—তরুর মা যেমন দিন-দুপুরে ভূত দেখে, তুমি আবার সেই কথা শুনে ভাবলে বুঝি তুমিও দেখছ। ওইটে ইনফ্লুয়েন্স করলে আর কি তোমাকে—'

'আপনার যেমন কথা !' মিনু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'সন্ধ্যাবেলা বুঝি স্বপ্ন দেখে কেউ ?'

'স্বপ্ন নয় কল্পনা !'

তুমুল কৃত্রিম কলহ জমে ওঠে শালী-ভগ্নিপতির মধ্যে।

বুধবার দিন কিন্তু আবার দেখা গেল তাকে। এবার দেখলেন খোদ কর্তাই।

কী একটা উপলক্ষে অফিস সেদিন বন্ধ ছিল। টানা একটা দিবানিদ্রা দিয়ে বেলা চারটে নাগাদ বিজয় ছাদে উঠে পায়চারি করছিল। খোকন তার মামার বাড়ি গেছে সকালে—খুকী তখনও ঘুমুচ্ছে। মিনু অঞ্জলি তরুর মা নিচে। রান্নাঘরে চায়ের জল চাপিয়ে দুই বোনে বসে গল্প করছে, তরুর মা কলতলায় বাসন মাজছে। সমস্ত দোতলাটা নির্জন ও নিস্তব্ধ।

ছাদের একটা কোণ থেকে নিচের ঘরের বড় বিছানাটা দেখা যায়। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেই কোণে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায় বিজয়। ঠিক সেদিকে

চায় নি সে, চোখের পাশে দৃষ্টির যে আব্‌ছায়া থাকে একটা, তাতেই মনে হ'ল যেন ঘরে নড়ছে কী একটা—নিয়মিত ভাবে। তখন ভাল করে তাকিয়ে দেখল সে—একটি বছর-সাতেকের ছেলে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত খুকীকে হাওয়া করছে। দিব্যি ফুটফুটে ছেলে, পরনে হাফ প্যান্ট, খালি গা। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে খুকীর দিকে, চোখের দৃষ্টিতে অগ্রজের সস্নেহ অথচ সকৌতুক ভাবটি ফুটে উঠেছে।

ভাল ক'রে তখনও এর পরিপূর্ণ অর্থ টা মাথায় যায় নি—বিজয় কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপরই সব ইতিহাসটা মনে পড়ায়, ছেলেটিকে অতর্কিতে গিয়ে ধরবে বলে পা টিপে টিপে যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে নেমে এল।

নিচে নামতে বড় জোর ওর দু মিনিট গেছে সবসুদ্ধ। কিন্তু কই? সে তো নেই। খুকী যেমন ঘুমোচ্ছিল তেমনি ঘুমোচ্ছে। তবে কি সেও স্বপ্ন দেখছিল, কিংবা কল্পনা? মিনুকে যা বলেছে তারও তাই?

কিন্তু না, ঐ তো পাখাখানা পড়ে আছে—ওটা সাধারণতঃ দেওয়ালের গায়ে পেরেকে আটকানো থাকে।

তাহ'লে ছেলেটা গেল কোথায়?

খাটের নিচে উঁকি মেরে দেখলে বিজয়, পাশের ঘর, ওপরের ছোট বাথ-রুমটা—কোথাও তো নেই। আবার ছাদে উঠল—যদি অন্য দিক দিয়ে উঠে গিয়ে থাকে তার অলক্ষ্যে—না তাও তো নেই। দোর বন্ধ করে নেমে এসে দোতালাটা আবার ভাল ক'রে দেখল তারপর একতলায় নেমে সিঁড়িতে এল। রান্নাঘরে ওরা বসে কাপে চা ঢালছে, তরুর মা বাসন ধুয়ে জমা ক'রে রাখছে চৌবাচ্চার পাড়ে। পাশের ঘর দুটোরই কপাটে শেকল তোলা। সদর দরজা বন্ধ।

'হ্যাঁগো—তাকে দেখেছ কেউ?'

'কাকে গো?' ওর গলার আওয়াজে বিবর্ণ হয়ে অঞ্জলি বেরিয়ে আসে। মিনুর হাত কেঁপে খানিকটা চা মাটিতে পড়ে যায়।

সংক্ষেপে বিজয় সব কথা খুলে বলে। অঞ্জলি সবটা ভাল ক'রে শোনবার আগেই ছুটে গিয়ে খুকীকে বুকে তুলে নিল। তারপর সবাই মিলে বাড়িটা

তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজল। কিন্তু কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই।

তরুর মা তখন ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপছে। ওর গলায় কান্নার সুর।

'কি হবে বাবু, আমি আর ওপরে যেতে পারব নি।'

অঞ্জলি তাকে ধমক দিয়ে ওঠে—'কেন কী হয়েছে কি? এই তো তিন দিন এসেছিস? সে তোদের ভয় দেখিয়েছে. না কোন অনিষ্ট করেছে?'

তরুর মা তখন যেন একটু প্রকৃতিস্থ হ'ল, 'তা বটে বাপু। তা ঠিক কথা। কৈ ভয়ডর তো কারুক্কে দেখায়নি—'

অঞ্জলি বিজয়কে বললে, 'এইজন্যে বোধ হয় বাড়িওলার এত সাধুতা, তাই ভাড়া এত কম। তুমি এক কাজ করো—পাড়ায় দু'একজনের সঙ্গে দেখা করো। জানো ভাল ক'রে ব্যাপারটা কি।'

বিজয়ের কথাটা মনে লাগল।

চটিটা পায়ে গলিয়ে সে তখনই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

পাশেই থাকেন এক রিটায়ার্ড সাবজজ, তিনি তখন বাইরের রকে বসে সকালের খবরের কাগজটা পড়ছেন। বিজয় নমস্কার ক'রে পাশে গিয়ে বসতে তিনি মুখ না তুলেই বললেন, 'দেখা দিয়েছে বুঝি?'

ভালরকম বুঝতে না পেরে বিজয় বললে, 'আজ্ঞে?'

কাগজখানা নামিয়ে রেখে এবার ওর দিকে চাইলেন ভাল ক'রে সাবজজ বাবু, 'বলছি সেই ছেলেটাকে দেখেছেন তো? তাই তো এসেছেন? সাধারণতঃ এত দেরি হয় না, বাড়িতে আসার পরের দিনই ছুটে আসে সবাই!'

একটু হাসলেন তিনি। বিদ্রূপ ও করুণা মাখানো হাসি।

বিজয় বললে, 'দেখেছি আমরা আসবার আগেই। তবে আপনাদের কাছে খবরটা নিতে আসবার ঠিক অবসর পাই নি।' ইচ্ছে ক'রেই একটু খোঁচা দেয় বিজয়।

'ও। দেখেছেন আগেই! আপনাদের সাহস আছে তো!' একটু ক্ষুণ্ণই হন ভদ্রলোক, 'মজা এই, আপনারা একবারও ভেবে দেখেন না যে চারিদিকে যখন বাড়ির আকাল তখন এত সস্তায় বাড়ি দেয় সে কী ক'রে। আগে কেউ আসেন না আমাদের কাছে—তখন মনেই পড়ে না পাড়ায় এতগুলো লোক আছে। আসেন ঠকে, ঘা খেয়ে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে ছুটতে ছুটতে।...কত

তো দেখলুম। তিন দিনও কেউ থাকতে পারে না। আবার সেই পুরনো আস্তানাতেই ভাড়া বেশী দিয়ে ছুটে যেতে হয়। হুঁ!'

ক্লান্ত হয়েই যেন থামেন তিনি। বিজয় মনে মনে ততক্ষণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, সে সেটা গোপন না ক'রেই বললে, 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?'

'ভূত! আবার কি!'

'ভূত?'

'হ্যাঁ মশাই—ভূত। তবে বলি শুনুন—'

এই বলে তিনি কাহিনীটা খুলে বললেন।

'বছর পাঁচেক আগে একটি ভদ্রলোক এই ঘরটি ভাড়া নেন। আগে খুব বড় জমিদার ছিলেন তিনি—নানা বদ খেয়ালীতে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। এখানে আসার পরই ওঁর স্ত্রীর কি ভারী ব্যারাম হয়—ডাক্তার ফাক্তার ডাকেন নি, ভুগে ভুগে তিনি মরে গেলেন। নিয়ে দিয়ে রইল ঐ ছেলে—দিন কতক ঝি রেখেছিলেন সে-ই রেঁধে দিত, অন্য কাজও করত। কিন্তু সে মাইনে পায় না, কত দিন থাকবে? তা ছাড়া রান্না খাওয়ারও জিনিস থাকত না অর্ধেক দিন। তখন কর্তা নিজেই একবেলা রান্না ধরলেন, বিকেলের জন্যে কোনদিন সেই ভাতই থাকত, কোনদিন বা—মানে যেদিন পয়সা-কড়ি জুটত—সেদিন হোটেল থেকে রুটি মাংস কিনে আনতেন। প্রায়ই মদে বুঁদ হয়ে ফিরতেন—ছেলেটাকে ঠেঙাতেন বেদম। আবার নেশা ছুটে গেলে খুব আদরও করতেন। ছ'টা হয়ে মরে গিয়েছিল, ঐ এক ছেলে—শিবরাত্রির সলতে। উপার্জনের মধ্যে ছিল শুনেছিঁ জুয়া খেলা—যেদিন কিছু মিলত সেদিনই মদের মাত্রা বেশী। যেদিন হেরে যেতেন সেদিন চুপচাপ। ছোট ছেলে, একাই থাকত বাড়িতে—উনি দোরে চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে যেতেন। আমাদের সঙ্গে কোনদিন আলাপ পর্যন্ত করেন নি। তবু আমি একদিন মশাই উপযাচক হয়ে বললুম, আমাদের কাছে রেখে যান না কেন ছেলেটাকে—সারাদিন তবু খেলাধুলা করতে পারে, আমার একপাল নাতি-নাতনী রয়েছে। ও হরি, মুখের উপর বললে কিনা, ধন্যবাদ। দরকার নেই কিছু—যত সব বদ্ ছেলে আপনার বাড়ির—অত মিশ্‌লে ছেলে বিগড়ে যাবে।...সেই থেকে আর কথা কই নি ওর সঙ্গে, ঘেন্না হ'ত। অত অভদ্র

ছোটলোককে কি বলব—ওর ছাগল ও যেদিকে পারে কাটুক।...তারপর এক দিন দেখি দিনেও তালা ঝুলছে। পর পর তিন দিন এমনি গেল। মনে করলুম বাড়িওলা খুব তাগাদা করছে, তাই সরে পড়েছে কোথাও বাপ বেটায়। দিন রাতই তো পাওনাদাররা আসত। একদিন বাড়িওলাও এলেন—বললেন, জানেন কিছু খবর—বললুম, না মশাই কিছুই জানি না। তবে হ্যাঁ—আমার স্ত্রী একদিন বলেছিল ছেলেটাকে ওর মধ্যে পুরে রেখে যায় নি তো, মাতালের কাণ্ড। আমি উড়িয়ে দিলুম—দূর, তাই কখনও পারে। হাজার হোক বাপ। তবু কান পেতে শুনতুম, কোন শব্দই হ'ত না। চার দিন পরে লোকটা ফিরল একটা রিক্সা ক'রে—খুব রোগা হয়ে গিয়েছে, চক্ষু কোটরগত —হাত পা কাঁপছে। আমি তখন এই রকেই বসে। গাড়ি থেকে নেমে কোন-মতে দরজার তালা খুলল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আজ তারিখ কত বলতে পারেন? আমি তারিখ বললুম। তখন বললে, আমি কতদিন আসি নি বলুন তো?...তা চার পাঁচ দিন হবে। তখনই চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, আমার খোকা!'

বলতে বলতেই সাবজজ বাবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। চশমা খুলে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন। বিজয় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে, 'তারপর?'

'আমি তো অবাক। খোকা ওর মধ্যে ছিল নাকি? চলুন চলুন, কী সর্বনাশ! ভেতরে গিয়ে দেখি ঠিই তাই—বিছানায় শুয়ে পড়ে আছে—তখনও প্রাণটা ধুক্ ধুক্ করছে। তবে সে যে বেশিক্ষণ নয় তা দেখেই বুঝলুম। ঘরে খাবার মতো একটা জিনিসও ছিল না, তার ওপর ছেলেটা নাকি কিছুদিন ধরেই ভুগছে—এই পাঁচ দিনের উপবাসে একেবারে শেষ হয়ে এসেছে। কী লক্ষ্মী ছেলে মশাই, একটু আওয়াজ ক'রে নি, কাঁদে নি কাটে নি কিছু নয়—বরং ওর বাবা যখন এসে চিৎকার করে ডাকলে, খোকন রে ব'লে, একবার একটু চোখ চেয়ে হাসল।...আমিই গেলুম ছুটে ডাক্তার ডাকতে। কিন্তু ডাক্তার কি করবে আর? সন্ধ্যাবেলাই ছেলেটা মরে গেল।'

'তার পর?'

'বাপটা তিন দিন ছিল পড়ে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যা জানলুম, ওর জুয়ার আড্ডায় সেদিন বুঝি অনেক টাকা জিতেছিল। যে বেশি হেরেছিল সে ওর

টাকাটা কেড়ে নেবার মতলবে মদের সঙ্গে ধুতরোর রস মিশিয়ে খাইয়ে দেয়—তাতেই তিন চার দিন ওর কোন হুঁশ ছিল না—তারাও টাকাকড়ি নিয়ে সরে পড়েছে···এদিকে এই কাণ্ড। তিন দিন লোকটাও মুখে জল দিলে না—আবার একটা নরহত্যা হয় দেখে আমরা একদিন জোর ক'রে তাকে ভাত খাওয়ালুম। খেয়ে এখানেই পড়ে ঘুমোল, তারপর সন্ধ্যেবেলা উধাও—আর ফেরে নি। বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা জানি না। বাড়িওলা পুলিস কেস ক'রে তালা ভাঙিয়ে মালপত্র ফেলে দিয়ে বাড়ি চুনকাম করিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত—কিন্তু তারপর আর ভাড়া হয় না। যে আসে সেই ছেলেটিকে দেখে, কারুর কোন অনিষ্ট করে নি কখনও—তবু ভূত দেখে কে আর থাকে বলুন।'

বিজয় ফিরে এসে আনুপূর্বিক সব কাহিনীটা খুলে বলল অঞ্জলির কাছে। মিনু তো কেঁদেই ফেললে, অঞ্জলিরও চক্ষু সজল হয়ে উঠল।

'আহা, বাছা রে।'

বিজয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তাহলে এখন কি করা? আবার সেই পুরনো বাড়ি?' অঞ্জলি উপস্থিত সকলকে বিস্মিত ক'রে বললে, 'কী আর করব। আমি এখানেই থাকবো। সে তো আমাদের কোন অনিষ্ট করছে না। আত্মা একা থেকে হাঁপিয়ে ওঠে তাই আসে। আমার কোন ভয় নেই।'

তরুর মা বললে, 'তাই বলে ভূতের সঙ্গে থাকবে?'

'এই তো তিন দিন রইলি, কী করেছে সে তোর? অত ভয় হয় রামকবচ নিগে যা।'

'না না, সে কথা কি বলছি। আমি কি আমার লেগে বলছি, ছেলেমেয়েগুলো রয়েছে।' অপ্রতিভ ভাবে বলে সে।

'তা থাক। ওদের সে ভালবাসে, নইলে খুকীর গরম হচ্ছে দেখে সে বাতাস করবে কেন?'

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে—সেইদিন থেকেই সে এ বাড়ি ছেড়ে দিলে একেবারে। আর কোনদিন কখনও কেউ তাকে দেখতে পায় নি।

অঞ্জলি বরং দুঃখই করে, 'আহা রে, আমি দেখতে পেলুম না একবারও। তোমরা সবাই দেখে নিলে।'

বিজয় বলে, 'সে বেচারীকে সবাই ভয় করেছে, তোমার মতো ভালবাসে নি কেউ। ঐ ভালবাসাটুকুর জন্যেই তার তৃষিত আত্মা মুক্তি পাচ্ছিল না বোধ হয়। এবার সে স্বর্গে চলে গেছে।'

অঞ্জলি ছল ছল চোখে বলে, 'তা হোক, এবার মহালয়ায় আমি তার নামে তিনটি বামুন খাইয়ে দেব।'

মিনু বলে, 'মাঝখান থেকে আপনি কিন্তু সস্তায় একটা বাড়ি পেয়ে গেলেন জামাইবাবু!'

'তা বটে।' বিজয়ও হাসে।

তিন-তিন বার

ঘটনাটা আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়. খবরের কাগজে ফলাও ক'রে বেরিয়েছিল, সবচেয়ে বিখ্যাত যে কাগজ সে তো বর্ডার দিয়ে যাকে বলে 'বক্স' করে ছাপা, তাই ছেপেছিল।

সেই যে, মনে পড়ছে না? চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল—বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে তখন, হঠাৎ একটা লোক একেবারে সামনে পড়ে গিয়েছিল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাক্সিটা ফুটপাথে উঠে পড়ে, সেখানে ছিল এক মুটে তার ঝাঁকার ওপর বসে—সে বেচারা তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এরপর নিজের 'জান'-এর কথা ভেবে দিশাহারা হয়ে যাবে ড্রাইভার সেটা স্বাভাবিক। কোনমতে ছুটে পালাতে গিয়ে প্রথম একটা রিক্সাওলার ঘাড়ে পড়ল—রিক্সাচালক ও তার দুজন আরোহী, একটি তরুণ ছেলে ও তার প্রৌঢ়া মা চাপা পড়লেন, একজন সেখানেই—বাকী দুজন হাসপাতালে মারা গেলেন। তারপর স্বভাবতই হিসেব-জ্ঞান-দৃষ্টি সব গোলমাল হয়ে গেল ড্রাইভারের—জানে যে জনতার হাতে পড়লে 'লীঞ্চ' করা যাকে বলে তাই করবে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। সে কোন দিকে পালাচ্ছে তা জানে না তখন, উল্টো দিক থেকে কাটাতে গিয়ে এক বিপরীতমুখী বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগাল। গাড়ি তো গেলই, ড্রাইভার নিজেও খুন হ'ল—দুটি লোক বাস-এর সামনের দরজায় ঝুলে আসছিল তারাও গেল।

মনে পড়ছে এবার ?

মোট সাতটি লোকের মৃত্যুর কথা ?

কাগজে অনেক চিঠি-লেখালেখি হয়েছিল তখন, মর্মার্থ, আজকাল কাউকে চাপা দিলে কি য়্যাক্সিডেন্ট ঘটালে এই যে ড্রাইভারদের ওপর নির্যাতন করার রেওয়াজ হয়েছে, এতেই আরও বেশী এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

মনে পড়ছে ? পড়তেই হবে, এ খবর না পড়ে উপায় নেই। শুধু কারুরই খেয়াল নেই সেই হতভাগ্যের কথা, যে হঠাৎ অমনভাবে সামনে এসে না পড়লে এত কাণ্ড কিছুই হত না!

খেয়াল নেই, মানে তার কথা কেউ জানে না। কাগজওলারাও তার নাম-ধাম-বিবরণ কিছু পান নি। দু-একজন প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছিলেন বলেই জানা গেছে, কিন্তু সে লোকটি সেই অভাবনীয় হট্টগোল ও পর পর অতগুলি মর্মান্তিক ঘটনায় বিপুল জনসমাগমের ফাঁকে কোথায় গেল সে খবর কেউ রাখে নি।

সে যেন মূর্তিমান নিয়তির মতো এই সাতটি প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে এসেছিল, শূন্য থেকে মূর্তি পরিগ্রহ করে, কাজ শেষ হতে আবার শূন্যেই মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু তা নয়, সেই লোকটিই সেদিন তার নিয়তিকে খুঁজতে চেষ্টা করেছিল, ধরতে চেয়েছিল।

লোকটি আমাদের পরিচিত, নাম অভিলাষ। বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে, শ্যামবর্ণের ওপর সুশ্রী বলিষ্ঠ চেহারা। মেদিনীপুর জেলায় বাড়ি, দেশে খাবার সংস্থান নেই। জমার ঘরে মাত্র এক বিঘা ধানী জমি, খরচের খাতায় পঙ্গু বাবা, স্ত্রী ও দুটি বাচ্চা। বাপ যখন সক্ষম ছিলেন, আরও অনেকের জমি ভাগে চাষ করতেন, সংসার চলার জন্যে কোন চিন্তা ছিল না। সেই জোরেই কুড়ি-একুশ বছর বয়সে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন, সে কি খাবে বা স্ত্রী-পুত্রকে কি খাওয়াবে সে কথা চিন্তা করেন নি, অভিলাষকেও করতে দেন নি। অভিলাষের মা নেই, সংসার দেখার লোকাভাব, তখন সেই প্রয়োজনটাই বড় হয়ে উঠেছিল।

অভিলাষ কিন্তু চাষবাসের দিকে যায় নি। তার অভিলাষ ছিল উচ্চ। সে চাকরির খোঁজে কলকাতায় এসেছিল। দেশের ব্যাপারটা বাপ দেখছেন সুতরাং কিছুদিন বেকার ঘুরে বেড়ানোর অসুবিধা ছিল না। বেশি ঘোরাঘুরি

করতেও হয় নি অবশ্য। কিছুদিনের মধ্যেই এক বইয়ের দোকানে কাজ পেয়ে গিয়েছিল একটা, দেশেরই এক মাস্টারমশাইকে ধরে। স্কুল ফাইনাল পাস নয়, তবে তার জন্যে আটকায় নি। হাতের লেখা ভাল, সুশ্রী চেহারা, ভদ্র কথাবার্তা এই দেখেই ওর মনিব ওকে নিয়েছিলেন। মাইনে অবশ্য খুব একটা কিছু বলবার মতো নয়, ঢুকেছিল বোধহয় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায়—দৈনিক চার আনা জলপানি—সেটাই ক্রমে বেড়ে একশোতে পৌঁছেছিল।

বিশেষ অসুবিধাও হয় নি। এখানে দেশের বিস্তর চেনা লোক ছাপাখানায় কাজ করে, তারা অনেক লোক এক জায়গায় মেস করে থাকে, যাতে খরচ কম পড়ে। তেমনিই একটা সস্তার মেস পেয়ে গিছল। বইয়ের দোকানে ছুটি বেশী, কাছে দেশ বলে সহজেই যাতায়াত চলত, খরচের জন্যেও খুব আটকাত না। দেশে সংসার চালাবার কথা ভাবতে হত না বলে স্ত্রী-ছেলেমেয়ের কথা নিয়েও মাথা ঘামাতে হয় নি। দেশে যাবার সময় এটা-ওটা নিয়ে গেলেই চলত, পুজোর সময় কাপড়-জামা, স্ত্রীকে দু-চার টাকা হাত-খরচ। ইদানীং ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলের মাইনে এবং বইখাতার খরচটাও দিতে হত অবশ্য। তেমনি কিছু বোনাসও পেত পূজোর সময়।

তারপর হঠাৎই শুরু হ'ল ভগবানের মার।

বাবা অকস্মাৎ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেলেন। স্ট্রোক না কি বলে তাই হয়ে। এদিকে নতুন সরকার কায়েম হতে সেই সময়টায় বইয়ের বাজার গেল ঝপ ক'রে পড়ে। লাইব্রেরীর সরকারী গ্র্যান্ট কমে গেল—যাও বা পাবার কথা হাতে এল না। সে টাকা নাকি অন্য দরকারী খাতে চলে গেল। ওদের দোকান তেমন বড় কিছু নয়, খরচা কম বলে তবু তখনকার মতো টিকে গেল। কিন্তু লাভ নয়, বিক্রীর টাকাতেই চালাতে হচ্ছিল—সেটা অত কেউ খেয়াল করে নি। আগে ভদ্রলোক ছাপতেন নাটক-নভেল—বই ছাপা যা তা শেষ হয়ে যায়' নতুন করে ছাপা যায় না, নতুন বইও ছাপা হয় না। এই যখন অবস্থা সরকার বদল হল বটে, কিন্তু হাতে তখন পুঁজি বলতে কিছু নেই। দিশাহারা মালিক চড়া সুদে দেনা করে ইস্কুল বই ছাপলেন—এবং ডুবলেন। 'অব্যাপারেষু ব্যাপার' হলে যা হয়। সর্বনাশের যেটুকু বাকী ছিল—হঠাৎ কাগজ গেল বাজার থেকে লোপাট হয়ে। চোরাবাজারে ডবলেরও বেশি দামে কিছু কিছু পাওয়া যায়—

তাতে চুনোপুঁটিদের চলে না। ভদ্রলোক 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে' পণ্ডিতরা যা করেন তাই করলেন, সামান্য টাকায় ব্যবসাটি বেচে দিলেন।

অর্থাৎ অভিলাষের চাকরিটি গেল।

কারণ যিনি এঁর স্টক কিনে নিলেন, তাঁর আগে থেকেই পুরনো লোক ছিল—তিনি এসব দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না।

তারপর থেকে বিস্তর চেষ্টা করেছে চাকরির। নন-ম্যাট্রিক ছেলে সেকালের ভাষায়—বিশেষ কোন হাতের কাজও শেখে নি, কে তাকে এই বাজারে চাকরি দেবে? সব জিনিসেরই দাম চারগুণ-পাঁচগুণ বেড়ে যাচ্ছে এক এক লাফে—যার যার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ব্যবসাতেও সে ঘা পরোক্ষভাবে এসে লাগছে। ওর যা জগৎ, বই পাড়ায়—সেখানে তো আরও। পাঁচ টাকায় বই ফের ছাপা হলে চোদ্দ-পনেরো টাকা দাম হচ্ছে—কে কিনবে, কার কত বাড়তি টাকা আছে? প্রকাশকদের, বেঁচে থাকাই সমস্যা, নতুন লোক রাখার তো প্রশ্ন ওঠে না।

দেশেও গিছল অভিলাষ। এমনি তার স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু চাষবাসের পরিশ্রম সহ্য করতে গেলে বেশ কিছু অভ্যাসও দরকার। তা তার নেই। অভিজ্ঞতাও নেই। তাছাড়া এখন ভাগ-চাষের বিস্তর অসুবিধা, সরকার নতুন নতুন আইন করছেন, যাদের জমি আছে তারা এখন মজুর রেখে নিজেরাই চাষ করছে। কিছুদিন বাড়িতে বৃথা বসে থেকে তাই আবার কলকাতায় ফিরতে হয়েছে। স্ত্রীর সর্বশেষ গহনাটি বেচে ওদের জন্যে কিছু রেখে ত্রিশটি টাকা নিয়ে এসেছিল সে, আর কিছু আনা সম্ভব ছিল না।

সেও হল অনেক দিনের কথা। পুরনো মেসে বিস্তর টাকা বাকি পড়েছিল। সেখানে না গিয়ে একটা নতুন মেসে উঠল। মেসের খরচ আজকাল যে অঙ্কে পৌঁচেছে তাতে ত্রিশ টাকায় পনেরো দিনও চলে না। চলে না যে, তা অভিলাষও জানে—কিন্তু আর কোথাও থেকে কিছু যোগাড় করতে পারে নি। পুরনো মনিবের কাছে গিছল, তিনি টাকা দিতে পারেন নি, আগেকার বই খান দুই বাড়িতে ছিল, তাই দিয়েছিল। সেগুলো সিকিদামে বেচে টাকা চারেকের মতো হয়েছিল, তাও কাপড়-কাচা সাবান কিনতে ও দাড়ি-কামানোর খরচা যোগাতে চলে গেছে। বন্ধুদের কাছে কম্পোজের কাজ শিখতে চেয়েছিল—

তারা কতগুলো বড় বড় প্রেস উঠে যাচ্ছে ও গেছে তার ফিরিস্তি শুনিয়ে সহজ একটি প্রশ্ন করেছিল, 'কাজ শিখতে যে ক'মাস সময় লাগবে সে ক'মাস খাবে কি ?' তার উত্তর দেওয়া যায় নি।

তারই ফলে—যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধুরা মীল বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে—শুধু থাকার জায়গাটা এখনও দিয়েছে একজন, নিজের বিছানার ভাগ দিয়ে—তখন এই চরম সঙ্কল্প নিতে বাধ্য হয়েছে সে।

আত্মহত্যাই করবে সে।

স্ত্রী-পুত্র ? অক্ষম বাপ ?

সে ঈশ্বর দেখবেন। এখনই বা কি হচ্ছে তাদের কে জানে ! বেঁচে থেকেই বা কি করতে পারছে সে ? কী করতে পারবে ?

পুরো দু'দিন অনাহারে থাকার পর সেদিন সে তাই মরীয়া হয়ে চলন্তি ট্যাক্সির সামনে এসে পড়েছিল। অপেক্ষাকৃত জনবিরল পথে পুরো স্পীডে গাড়ি আসছে, অব্যর্থ মৃত্যু। বৃদ্ধ লোকটা যে অমন পাগলের মতো ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে প্রাণ দেবে তা কে ভেবেছিল ?

তখন আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তিতেই 'সটকে' পড়েছিল অভিলাষ, কে জানে এ নিয়ে কী হাঙ্গামা থানা-পুলিস হয় !

তারপর অবশ্য অনুতাপ হয়েছিল খুব। পুলিস ধরলে তবু খেতে দিত। হাজতে একটু শোবার জায়গাও মিলত নিশ্চয়।

দিন দুই সে চেষ্টাও করল, বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে, প্রকাশ্য রাস্তায় প্রাকৃতিক কাজ সেরে—কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, ওকে কেউ ধরল না। ভিক্ষার চেষ্টাও করেছিল বৈকি, অনেকেই 'মাপ কর' বলে বিদায় দিয়েছে, ওর সত্য-ভাষণকে 'নাটক' বলে, নতুন শিক্ষিত জুচ্চুরি বলে বিদ্রূপ করেছে—দু'একজন কিছু কিছু দিয়েছে অবশ্য, তাতে একখানা ছোট রুটি আর এক কাপ চা ছাড়া কিছু হয় নি।

শেষে আবার ও মরীয়া হয়ে ঐ চৌদ্দতলা বাড়িটায় ঢুকে পড়েছিল। সে খবরও আপনারা কাগজে দেখে থাকবেন। যদি একেবারে ওপরের ছাদ পর্যন্ত উঠে যেতে পারত তো কি হত বলা যায় না। কিন্তু উপবাসক্লিষ্ট দেহে

চারতলার বেশি উঠতে পারে নি, আরও যে ওঠা দরকার তাও ভাবে নি। সামনেই একটা দরজা খোলা পেয়ে গিয়েছিল, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দরজাটা—সোজাসুজি ওদিকের বারান্দা পর্যন্ত অবারিত পথ খোলা দেখেছিল, সেইটেকেই সে নিয়তির নির্দেশ ভেবে কোনদিকে না তাকিয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল রাস্তায়।

কিন্তু আবারও তার ভাগ্য তাকে নিয়ে বড় একটা তামাশা করলেন।

ঝাঁপ দিয়ে পড়ার আগে নিচের দিকে তাকায় নি অভিলাষ, তাকাতে সাহস হয় নি। কারণ যার ফ্ল্যাট দিয়ে যাচ্ছে সে যদি চোর-ডাকাত বলে চেঁচামেচি ক'রে ধরে ফেলে! জাতও যাবে পেটও ভরবে না। মরা হবে না, হয়তো গুচ্ছের মার খেতে হবে। একবার নিচের দিকে তাকালে, দু'চার সেকেণ্ড অপেক্ষা করলে, এমন হত না সম্ভবত। ঠিক সেই সময়েই নিচে দিয়ে যাচ্ছিলেন এক ক্রীশ্চান পাদরী, অভিলাষ গিয়ে পড়ল তাঁর ওপরে। তিনি নিচে পড়ে গেলেন, ও তাঁর ওপরে। অভিলাষ কিছু চোট পেল কিন্তু তিনি কনকাশন অফ দ্য ব্রেনে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে মারা গেলেন। দিন কয়েক পরে অভিলাষকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবার সময় সহৃদয় ছোকরা সার্জনটি বলে দিল, 'পা পিছলে পড়ে গেছেন বলে রিপোর্ট লিখিয়েছি পুলিসে, তাই রেহাই পেয়ে গেলেন। বুঝতেই তো পারছি সুইসাইড করতে গিছলেন। সে থানা-পুলিস অনেক হাঙ্গামা—হয়তো জেল খাটতে হত। যান, এমন চেষ্টা আর করবেন না। আপনার যে ভাগ্য অমন মিরাকুলাসলি বাঁচিয়ে দিলে—তাকে বেশি ঘাঁটাবেন না আর।'

বাঁচিয়ে তো দিলেন ভদ্রলোক পুলিসের হাত থেকে—কিন্তু সে এখন যায় কোথায়?

থানা-পুলিস তো ভাল, জেল হলেও বলার কিছু নেই। চুরি ডাকাতি দুর্নামে জেল-খাটায় তার আপত্তি—নইলে জেল তো ভাল, নিরাপদ আশ্রয় ও নিশ্চিত আহার।

তবু, এ ক'দিন হাসপাতালে দুবেলা খেয়ে একটু যেন যোঝার শক্তি পেয়েছে আবার। আশা হচ্ছে সত্যিই হয়তো তার ভাগ্য তাকে মরতে দেবে

না। সেই জোরেই আবারও দু-তিন দিন পথে পথে ঘুরল। পরিচিত মহল-গুলো আর একবার বাজিয়ে দেখল কোথাও একটা ত্রিশ টাকার চাকরিও জোটে কিনা। দু-এক জায়গায় বাড়ির কাজ চেয়েও দেখল—অবশ্যই অচেনা জায়গায়, চেনা লোক দেশের লোক কাউকে বলতে পারবে না সে 'চাকরের কাজ করে দাও, বাসন মাজা চাকর'—কিন্তু সেদিকেও কোন সুবিধে হল না। অপরিচিত লোককে কেউ আজকাল সহজে বাড়ি ঢোকাতে চায় না। কেউ কেউ সেটা পরিষ্কারই বলে দিলেন, কেউ বা শুধু 'লোক দরকার নেই' বলে সহজে সারলেন। এক জায়গায় তো অন্তঃপুরের কণ্ঠস্বর বাইরে এসে পৌঁছল, 'যা খাটাগুমশো চেহারা, দেখলেই তো মনে হচ্ছে গুণ্ডা খুনে। ঐ লোককে বাড়ি ঢোকানো! বাব্বা! তার চেয়ে নিমতলায় গিয়ে বসে থাকলেই হয়।' তার জবাবে কে একজন বললেন: 'আরে না না, ভিক্ষে করারই রকমফের একটা। ভিক্ষে চাইলে বলবে খেটে খাও—সেই পথটা মেরে দিলে, বুঝলে না?'

অর্থাৎ অন্ধকার আগেও যেমন ছিল পরেও তাই রইল।

এমনি আরও ক'দিন উপবাসে কাটাবার পর আবারও সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেলল অভিলাষ। রবার্ট ব্রুসের গল্প পড়েছিল ছেলেবেলায়। পাঠশালায় পড়া পদ্যও মনে পড়ল, 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে, বারেক নিরাশ হলে কে কোথায় ছাড়ে।' দুবার ব্যর্থ হয়েছে বলে তৃতীয়বার হবে তার মানে নেই। তাছাড়া এমনিই তো পথে পড়ে মরতে হবে না খেয়ে। তার চেয়ে ভালভাবে ভাল জায়গায় মরাই ভাল।

সে অনেক ভেবে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল দক্ষিণেশ্বরে। সন্ধ্যার মুখ। নিচে থেকেই মা ভবতারিণীকে একটা সেলাম-ঠোকার-মতো নমস্কার করে নেমে এল ঘাটে। তারপর গায়ের ময়লা শার্টটা আর গেঞ্জিটা এক কোণে ছেড়ে রেখে আস্তে আস্তে নেমে গেল জলে।

কিন্তু একটা রহস্য তার জানা ছিল না। ডুবব বললেই ডোবা যায় না। যে সাঁতার জানে তার পক্ষে ডোবা কঠিন। গ্রামের মেয়েরা এসব জানে, যারা ডুবে মরতে চায় তারা নিজেদের আঁচল দিয়ে আগে পা-দুটো বাঁধে, তারপর কলসী জলে ভরে তার সঙ্গে হাত বা গলা বেঁধে ডুব দেয়। যাতে

ইচ্ছে করলেও আর ভেসে উঠতে না পারে।

এসব অভিলাষ শোনে নি কখনও। সে যতই ডোবার চেষ্টা করে—আত্মরক্ষার সহজ নিয়মে ভেসে ওঠে আবার।

এমনি করতে করতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার। তার থেকে অল্প দূরে আর একটি লোক, সম্ভবত একটি কিশোর ছেলে তার মতোই ডুবছে উঠছে। একটু তফাত, সে ডুবতে চাইছে, এর ওঠবার চেষ্টা। প্রথমটা ভাবল ইচ্ছে ক'রেই করছে এমন, মজা করার জন্যে, খেলা—কারণ মনে হচ্ছে ওরই সঙ্গী ক'টি ছেলে পাড়ে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি চেঁচামেচি করছে। কিন্তু তার পরই বুঝল, খেলাতেই শুরু হয়েছিল হয়তো, এখন মর্মান্তিক পরিণতিতে শেষ হতে চলেছে। ছেলেটা সত্যিই ডুবছে। শেষে যখন আর মাথাটা উঠল না, শুধু হাতের মুঠোটা যেন শূন্যে কী একটা অবলম্বন খোঁজার চেষ্টা করছে, তখন সে ত্বরিৎগতিতে গিয়ে যথেষ্ট তলিয়ে বা ভেসে চলে যাবার আগেই ছেলেটাকে ধরে ফেলল।

তখন ভাঁটার শুরু, জলে প্রবল টান। কিন্তু অভিলাষ যতই দুর্বল হয়ে পড়ুক, সবল স্বাস্থ্যের লোক। জলে নেমে একটু সুস্থও হয়েছে, সে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে এক সময় ঘাটে পৌঁছল। ছেলেটাও জল খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তাই, নইলে হাঁকড়-পাঁকড় করত, হয়তো ওর গলা জড়িয়ে ধরতে যেত—তাহলে দুজনকেই ডুবতে হ'ত।

ততক্ষণে ঘাটে লোক জড়ো হয়েছে, হৈ-চৈ উত্তেজনা। ধনীর ছেলে, বাপ পুলিসের বড়কর্তাদের একজন। ছেলেটার নাম শেখর, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি বলে বেরিয়েছে গাড়ি নিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে ইয়াকি করতে করতে কে একজন দিয়েছে ওকে এক ধাক্কা। শেখর যে সাঁতার জানে না—অত কেউ খেয়াল করে নি। জলে ফাঁড়া বলে ওর মা সাঁতার শিখতে দেন নি। তাছাড়া ও যে অত জলে গিয়ে পড়বে, ভেসে যাবে—সেটা যে ভাঁটার সময়—এত তাদের জানার কথা নয়। যখন বুঝল সত্যিই ডুবছে, ডুবেই গেছে, তখন নিদারুণ ভয় পেয়ে তারা পালিয়ে গেল—যে যেদিকে পারল।

চেঁচামেচি করেছিলেন অন্য লোক। তাঁদের মধ্যেই কে গিয়ে বাইরে স্ট্যাণ্ডে গাড়িতে গাড়িতে জিজ্ঞাসা করেছেন। এদের ড্রাইভার বিবরণ শুনে ছুটে

এসেছ। তাছাড়াও দু-একজন চেনা লোকও বেরিয়েছে। এদিকে কেউ কেউ ফার্স্ট এড্ দিতে শুরু করেছেন। জলও বেরিয়ে গেছে খানিকটা। টেলিফোন পেয়ে বাবা-মা আসতে আসতে ছেলেটার জ্ঞান এসে গেছে।

পিছু হটে আস্তে আস্তে সরে পড়লেই হত। কিন্তু জলে ডোবার পর মানুষটাকে ধরে ঘুরিয়ে জল বার করতে হয় তা অভিলাষ জানত। অত বড় পনেরো-ষোল বছরের ছেলেকে তুলে ঘোরানো অত সহজ নয়। সকলেই উপদেশ দিচ্ছে, করছে না কেউ। অভিলাষ ওকে সেই অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে চলে যেতে পারে নি। ফুটফুটে ভাল ঘরের ছেলে, আদরের ছেলে দেখলেই বোঝা যায় ; না জানি তার বাবা-মা-র কি মনের অবস্থা হবে এ খবর পেলে। এই টুকুর মধ্যেই ওর মায়া পড়েছে একটা অদ্ভুত। সে-ও প্রাথমিক শুশ্রূষার কাজে লেগে গিছল।

যখন সরে পড়বার কথা মনে হ'ল, তখন শেখরের বাবা শরৎবাবু এসে গেছেন। তিনি অমনি অমনি পুলিসের চাকরিতে এত উন্নতি করেন নি। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ওর কাপড়ের অবস্থা, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি ও ক্লান্ত চোখের দিকে চেয়েই ব্যাপারটা অনুমান করেছেন। তিনি বললেন, 'উঁহুঁ, উঁহুঁ সে হবে না। আমার সঙ্গে বাড়ি যেতে হবে।'

অভিলাষ জড়িয়ে জড়িয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠলেন, 'বেশী চালাকি করতে হবে না। তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে বুঝে নিয়েছি। এমনি না যাও, য়্যারেস্ট করিয়ে নিয়ে যাব। নাও, ভাল চাও তো ভাল ছেলের মতো চল। জামা কোথায়? শুকনো কাপড় যে আর নেই, বুঝতেই পারছি। চল, চল।'

অগত্যা ওদের সঙ্গেই যেতে হ'ল। সেখানে যেতে একটা শুকনো পাজামা দিলেন কে একজন। চা-খাবার এল। লুচি ডিম মিষ্টি। তারপর গিন্নী গলার হার খুলে ওর হাতে দিতে যাচ্ছিলেন, 'তুমি যা করেছ বাবা, তার তুলনায় এ কিছু নয় অবিশ্যি ; ঐ আমার এক ছেলে, শিবরাত্রির সলতে—' কর্তা তাঁকে ধমক দিলেন, 'র'সো র'সো, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কেন এমন জোয়ান ছেলেটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল শুনি আগে। বলো তো বাবা,

ব্যাপারখানা কি ?'

অভিলাষ আর বৃথা মিথ্যে বলার চেষ্টা করে নি। সব কথাই খুলে বলেছে। শরৎবাবু ধৈর্যের সঙ্গে বসে সব শুনেছেন। তিনি মানুষ চেনেন—লোকটা যে সত্য কথা বলছে তা বুঝেছেন। তবু ওর দেশের ঠিকানা, প্রাক্তন মনিবের নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে বললেন, 'এত দিন দেশ ছাড়া বলছ, তাদের একটা তো খবরও দাও নি। তারা ভাবছে নিশ্চয়। তুমি এই একশোটা টাকা রাখো, এক সেট জামাকাপড় কিনে নাও, আর দেশে গিয়েও তাদের হাতে বিশ-পঁচিশ টাকা দিয়ে এস। তুমি বলছ যে-কোন কাজ করতে রাজী আছ, তা—যদি এ-সব কথা সত্যি হয়, যা বলছ—একটা কিছু হয়ে যাবেই। তোমার ভাল চেহারা, সিপাইয়ের কাজ দেবার চেষ্টা করব। বয়স একটু বেশী হয়েছে অবশ্য—দেখি কি করতে পারি। নেহাৎ না হয়, মোটর ভিইকিল্‌স্‌-এ ক্লীনার হিসেবে ঢুকিয়ে দেব, তার পর গাড়ি চালানো শিখে ড্রাইভার হতে পারলে তো ভালই। যাই হোক, কাজ একটা পাবেই। যাও ঘুরে এস, দু-তিনটে দিন।'

শেখর অভিলাষকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বসে ছিল, সে ক্লান্ত সুরে বলল, 'অভিলাষদাকে আমাদের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা ক'রে দাও বাবা, আমি ওকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দোব। সিপাইয়ের থেকে ড্রাইভারের কাজ অনেক ভাল।'

দেখা গেল গৃহিণীরও ছেলেটিকে বাড়িতে রাখার ইচ্ছা।

'আচ্ছা, আচ্ছা। ঘুরে তো আসুক। তুমি এখানে এসেই উঠো। অন্য কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থেকো।'···

কিন্তু সিপাহী বা ড্রাইভার কোন চাকরিই আর করা হল না অভিলাষের।

বাড়ি থেকে ফেরবার সময়, বোধকরি অতিরিক্ত আগ্রহের জন্যেই, পাঁশকুড়া স্টেশনে ছেড়ে-দেওয়া ট্রেন ধরতে গিয়ে হাত ফসকে নিচে পড়ে গেল। ট্রেন যখন দাঁড়াল তখন অনেক কষ্টে যে মাংসপিণ্ডটাকে উদ্ধার করা হল চাকার খাঁজ থেকে—তাকে মানুষ বলে বোঝার উপায় ছিল না। কে মানুষ তাও সনাক্ত করা গেল না।

বহুদিন পরে খবর পেয়েছিলেন শরৎবাবু। রেল পুলিসের কাছে খবর নিয়ে জামার বর্ণনা থেকে বুঝেছিলেন। তিনি আর অভিলাষের স্ত্রীকে সে খবর

জানাবার চেষ্টা করেন নি। শুধু গৃহিণী যে সাড়ে তিনভরির হারটা ওকে দিতে চেয়েছিলেন তার আনুমানিক মূল্য হিসেব করে দু হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অভিলাষের স্ত্রী-পুত্রকে, প্রাক্তন মনিবের নাম করে।

অশরীরী

অনেকদিন আগেকার কথা, ঠিক কোন্ বছর তা আর মনে নেই। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে কোন একটা বছর হবে।

স্কুল-পাঠ্য বইয়ের ক্যানভাসিং উপলক্ষে সে সময়টা মুর্শিদাবাদ জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওদিকে তখন ট্রেন ছিল খুব কম, বর্তমানের মতো এত বাসও চালু হয় নি। ভোরে বেরিয়ে দুটো ইস্কুল সেরে ডেরায় ফিরতে রাত দশটা এগারোটা বেজে যেত। যেদিনের কথা বলছি সেদিন জিয়াগঞ্জ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ভোর ছটার গাড়ি ধরে নিমতিতা গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ফিরে জঙ্গীপুর রোড স্টেশনে এসে রঘুনাথগঞ্জ আর জঙ্গীপুর দুটো ইস্কুল সারতেই ট্রেনের টাইম কাবার হয়ে গেল, ফিরে যখন স্টেশনে এলাম, তখন শোনা গেল, সেই রাত সাড়ে আটটা নাগাদ একটি গাড়ি আছে—শেষ গাড়ি—আজিমগঞ্জ ফেরার অর্থাৎ আবার গঙ্গা পেরিয়ে জিয়াগঞ্জে আসতে রাত দশটারও বেশী হয়ে যাবে। জিয়াগঞ্জ ডাকবাংলোতে দু-তিন দিনের জন্যে ডেরা বেঁধে ছিলাম। না ফিরে উপায়ও ছিল না। আমি বরাবরই একটা জায়গায় মালপত্র রেখে আশপাশের কয়েকটা ইস্কুল সেরে নিতাম, বিছানাপত্র ঘটি গামছাসুদ্ধ ইস্কুলে গিয়ে ওঠা আমার পোষাত না।

স্টেশনে যখন এলাম তখন সাড়ে পাঁচটা হবে, অর্থাৎ পুরো তিনটি ঘণ্টা বসে থাকা হা-পিত্যেশ করে। তবে তখন ওটা গা-সওয়া ছিল, মনে আছে প্রতিবছর রামপুরহাট যেদিন যেতাম সেদিন অন্তত পাঁচটি ঘণ্টা বসে থাকতে হত, কোন কোন দিন আরও বেশী। তবে ওখানে আলোর সুবিধা ছিল, লোকের ভিড় ছিল না বললেই হয়, বসে বসে শান্তিতে লেখাপড়া করা যেত।

কিন্তু জঙ্গীপুর রোড স্টেশনে তখন ওসব কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ওয়েটিং রুম তো ছিলই না—যতদূর মনে পড়ছে নিচু প্ল্যাটফর্মের দু-দিকে দুখানি মাত্র

বেঞ্চি পাতা ছিল। ট্রেনের সময় ছাড়া আলোর বালাই ছিল না বিশেষ, একেবারে ট্রেন আসবার সময় হলে আলো জ্বালা হত—ট্রেন চলে গেলেই নিভিয়ে দেওয়া হত। সারারাতে আপ ডাউন দুতিনখানি ট্রেনের জন্যে আধ ঘণ্টা হিসেবে দেড় ঘণ্টা আলো জ্বলত তো ঢের। মন্দ লোকে বলে, সে তেলটুকু না বাঁচালে মাস্টার মশাইদের বাসায় আলো জ্বলে না, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

যাই হোক—আমি যখন প্ল্যাটফর্মে এসে বসলাম তখনও একটু আলোর আভাস আছে। বেঞ্চিতে স্যুটকেসটা পেতে আগের দিনের অসমাপ্ত লেখাটা শেষ করব বলে প্যাড ও কলম বার ক'রে গুছিয়ে বসলাম। কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষ সেটা, শীতের অপরাহ্ণ—যে আলোটুকু ছিল সেটুকু যেতে বেশী-ক্ষণ সময় লাগল না। দেখতে দেখতে চারিদিক নিশ্চিহ্ন ক'রে নিঃসীম নিরন্ধ্র অন্ধকার নেমে এল। প্ল্যাটফর্মে জনমানব নেই যে নিদেন একটা বিড়ি খেতেও দেশলাই জ্বালাবে। স্টেশন ঘরে এক বাবু বসে কাজ করছিলেন কিন্তু তিনিও দরজাটা আধ-ভেজানো ক'রে বসে ছিলেন, টিকেট ঘরের ঘুলঘুলিটাও বন্ধ, তা থেকে আলো আসবে, সে সম্ভাবনাও নেই। আর সে ঘরে যা জ্বলছে তাও তো সাধারণ বড়গোছের একটা কেরোসিনের বাতি। তার আলো যে আধখোলা দোরের মধ্যে দিয়ে বাইরে এসে পড়ে সেই জমাটবাঁধা অন্ধকার কিছুমাত্র হ্রাস করতে পারবে—সে আশা বৃথা।

এক্ষেত্রে কাগজকলম বাক্সে তুলে চুপ ক'রে বসে থাকতে হয়—কিন্তু এতক্ষণ অন্ধকারে ভূতের মতো বসে থাকতে মন সরল না। পকেটে একটা ছোট টর্চ ছিল। সেইটেই বার ক'রে এক হাতে জ্বেলে ধরে আর এক হাতে লিখে যেতে লাগলাম।

একমনে লিখে যাচ্ছিলাম ; ঘাড় তুলে কোন দিকে তাকাই নি, তাকাবার কোন প্রয়োজনও মনে হয় নি। জনপ্রাণী নেই স্টেশনে, কিছু দেখাও যাচ্ছে না—তাকিয়েই বা লাভ কি ? কিন্তু খানিকটা পরে কি রকম যেন মনে হ'ল—আমার সামনে থেকে একটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে এসে লাগছে। প্রথমটা অত গ্রাহ্য করি নি, কারণ এমনিতেই শীত বেশ পড়েছে, (তখন ঐ সময়েই বেশ শীত পড়ে যেত, এত কংক্রীটের বাড়ি বা অ্যাশফাল্টের রাস্তা হয় নি পল্লী

অঞ্চলে), অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, মুখে মাথায় একটা কনকনে ভাব অনুভব করছি। কিন্তু এ যেন সে হিমেল ভাব নয়, এ যেন আর কিছু, যেন বরফের ভাপ এসে লাগছে মুখে, যেন সামনে বরফ রেখে কেউ বাতাস করছে বলে মনে হ'ল। তবু তখনও কিছু ভাবিনি—বা কিছু দেখতে পাব বলে মুখ তুলি নি, বার পাঁচ ছয় এমনি ঠাণ্ডা ফুঁ দেবার মতো বাতাসটা মুখে এসে লাগতে অন্যমনস্কভাবেই মুখটা তুলে সামনে তাকিয়েছি। আর তাকাতেই দেখতে পেলাম, খুব কাছ ঘেঁষে, আমার স্যুটকেসটার ঠিক সামনে কখন একটি লোক মুড়িসুড়ি দিয়ে এসে বসেছে এবং জুলজুল ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত তার নিঃশ্বাসটাই এসে লাগছে মুখে।

ব্যাপারটা বেশ ভাল ক'রে বুঝে দেখুন। আমি বেঞ্চির ওপর আড়াআড়ি ভাবে বসে আছি—নইলে স্যুটকেসটাকে ডেস্ক করে লেখা যায় না। সুতরাং কেউ এসে সাধারণ ভাবে বেঞ্চে বসলেও আমার ঠিক সামনেই বসবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবু লোকটিকে দেখে মনে মনে যে একটা ধাক্কা খেলাম, তার কারণ লোকটি কখন এসে বসেছে তা বিন্দুমাত্রও টের পাই নি বলে। তন্ময় হয়ে লিখছিলাম ঠিকই—তাই বলে এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হই নি যে, কাঠের নড়বড়ে বেঞ্চিতে পাশেই একটা লোক এসে বসবে অথচ টের পাব না। কবিতা লিখলেও না হয় কথা ছিল—লিখছি তো নিরেট গদ্য।

তাছাড়াও চমকে ওঠবার দুটি কারণ ছিল : ঠিক আলোটা ঘুরিয়ে তো দেখি নি, টর্চের সামান্য আলো সাদা কাগজে পড়ে ওদিকে যে ঈষৎ আভাটুকু প্রতিফলিত করেছে তাইতেই যা দেখা। তাতে সহজ মানুষকেই ভয়াবহ মনে হয়,—আর এ যা নজরে পড়ল কালো-র‍্যাপার-মুড়ি-দেওয়া প্রচুর দাড়ি গোঁফ এবং মোটা ভুরুতে ঢাকা একটা মুখ, তার মধ্যে কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের স্থির একটা দৃষ্টি। কবির ভাষায়—ভাবলেশশূন্য, কিন্তু বোধকরি সেই জন্যই আরও অস্বস্তিকর। আর যা—তা হ'ল ওর ঐ নিঃশ্বাসটা। এতকাল তো উষ্ণ নিঃশ্বাসই পড়ে এলুম ও লিখে এলুম, ঠাণ্ডার মধ্যে মানুষের নিঃশ্বাস গরমই তো লাগার কথা—এমন হিমশীতল মনে হবে কেন, বিশেষ এত কাছে থেকে।

এসব কথা গুছিয়ে লিখতে যত সময় লাগল ততক্ষণের ব্যাপার নয়। এক-

বার এক পলক তাকিয়ে দেখা। তাও টর্চটা ফেলে ভাল ক'রে দেখতে সঙ্কোচে বাধল, চেয়েই বা কতক্ষণ থাকা যায়—সুতরাং আবার চোখ নামিয়ে লেখায় মন দিলাম। লোক এসে বসেছে তো বসেছে, তার আর কী করা যাবে, রেলের বেঞ্চি, আমার তো আর নিজস্ব নয়, যে কেউই এসে বসতে পারে। আর এসব দেশে এমন প্ল্যাটফর্মে বসে টর্চের আলো ফেলে কেউ কিছু লিখছে দেখলে অবাক লাগবারই কথা—সেই জন্যেই হয়ত লোকটি অমন ক'রে চেয়ে আছে।

কিন্তু মনকে যতই বোঝাই, কিছুতেই আর লেখায় মন দিতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, কাগজের ওপর কলম যেন সরতেই চাইল না। ওদিকে চেয়ে নেই তবু মনে হতে লাগল সেই দৃষ্টি তেমনি অকম্পিত স্থিরভাবে আমার ওপর নিবদ্ধ আছে, সে দৃষ্টির অর্থ শুধু সুগভীর নয়—হয়ত ভয়ঙ্করও। আর তার ওপর সেই নিঃশ্বাসটা এসে পড়ছেই মুখে, তেমনি অস্বাভাবিক হিমশীতল। মুখটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, একটু পিছিয়েও বসলাম—যথাসাধ্য, কিন্তু তাতেও কোন তারতম্য ঘটল না সে অনুভূতির। বরং খানিক পরে মনে হতে লাগল, আরও কাছে থেকে, আরও বেশী ক'রে লাগছে হাওয়াটা—

তবে কি লোকটা মুখখানা আরও কাছে নিয়ে আসছে আমার মুখের ?

চেয়ে দেখবার কথাও ভাবলাম—কিন্তু কিছুতেই যেন মুখটা তুলে বা টর্চটা ফেলে দেখতে পারলাম না। ভয় ? তা হয়ত হবে—আজ আর বলতে পারব না কেন সেদিন চাইতে পারি নি।

চিৎকার করব ? কিন্তু শুধুই চেঁচিয়ে উঠব পাগলের মতো ? সে যে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। ওর নাম জিজ্ঞাসা করব ? কেন এখানে এসে বসল ও —জিজ্ঞাসা করব ? কিন্তু সে আমার কী অধিকার ! এমনিও কিছু কথা কওয়া যেতে পারত—এখন মনে হয়—যেমন 'ট্রেনের আর কত দেরি' কিংবা 'কখন টিকিট দেবে' বা ঐ ধরনের কিছু, কিন্তু সেদিন কিছুই মাথায় আসে নি। এলেও হয়ত গলা দিয়ে স্বর বেরোত না। কারণ বার দুই গলা খাঁকারি দেওয়ার চেষ্টা করলাম—তাও হ'ল না।

কিছুই করা হ'ল না, শুধু মনে হতে লাগল যে, কেমন যেন পাথর হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। তেমনি জড়, তেমনি ঠাণ্ডা। মনে হ'তে লাগল যে, ঐ ঠাণ্ডা হাওয়াটা, ঐ অমানুষিক হিম নিঃশ্বাসটা ক্রমে ক্রমে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে

ফেলছে, আমার দেহটাকেই শুধু নয়, বোধকরি আমার মন—আমার চিন্তাশক্তিকেও—

এই অনুভূতিটা সম্বন্ধে সচেতন হতেই যেন প্রাণপণ একটা চেষ্টায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। আর সেই সামান্য নড়াটুকুতেই সাহসও ফিরে পেলুম কতকটা—টর্চটা ফেলে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম।

কেউ কোথাও নেই। বেঞ্চিতে স্যুটকেসের পাশের জায়গাটি বেবাক খালি। একেবারে শূন্য যাকে বলে।

আবারও ধাক্কা খেলুম যেন একটা।

কিছুক্ষণ আগেও দেখেছি, তার নিঃশ্বাস অনুভব করেছি মুখের ওপর গায়ের ওপর, এই কয়েক মুহূর্ত আগেও—এই, বোধহয় চোখের পাতা ফেলতে যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যেই গেল কোথায়! বসল তাও টের পেলাম না, উঠে চলে গেল তাও জানলাম না। অথচ, আমি এক লাফে উঠেছি, তাও সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্যাঁচ কোঁচ ক'রে উঠেছে বেঞ্চিটা।

তবে কি সেই একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল লোকটা? তাই সাড়া পাই নি। কিন্তু উঠলেও—এরই মধ্যে যাবে কোথায়?

ভাল ক'রে টর্চ ফেলে দেখলুম চারিদিকে কোন জীবিত বা ছায়ামূর্তিরও চিহ্ন নেই। ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছি রীতিমতো, ভয়টা থাকলেও ভয়ের জড়তাটা নেই। দ্রুতপদে টর্চ ফেলে প্ল্যাটফর্মটা ঘুরে এলুম এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। জনমানব একটিও নেই কোথাও। শুধু টিকিট ঘরের সামনে করোগেট শেডটার মধ্যে ওজনকলের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে একটি স্ত্রীলোক আর একটি ছোট ছেলে। এইটেই স্বাভাবিক। ঠাণ্ডাতে খোলা প্ল্যাটফর্মে নেহাৎ আমাদের মতো বাতিকগ্রস্ত লোক ছাড়া সাধ করে কেউ বসতে যায় না।

সে লোকটি তা হলে গেল কোথায়!

দারুণ একটা অস্বস্তি নিয়ে ফিরে এসে বেঞ্চে বসলুম। কাগজ কলম তুলে ফেলেছি স্যুটকেসে—এখন টর্চটাও নিভিয়ে বেশ শক্ত হয়ে বসে রইলুম। কিন্তু স্থির হয়ে বসতেই মনে হ'ল আবারও যেন বাঁ পাশের গালের ওপর সেই হিম নিঃশ্বাস—। চেয়ে দেখলুম,—প্রথম অন্ধকারে, পরে আলো জ্বেলেও—

কেউ কোথাও নেই। আর মাথা ঘামাবার চেষ্টা করলুম না, উঠে পায়চারি করতে শুরু করলুম। আরামে দরকার নেই আর—সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

অবশ্য বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হ'লও না, টিকিটের ঘণ্টা পড়ল, ঘুলঘুলির মুখ খুলে দিলেন মাস্টারমশাই—এক চিলতে আলো দেখা গেল বাইরে। একটু পরে দুটি তিনটি তেলের আলোও জ্বলল। লোকও আসতে শুরু করল দু'একজন ক'রে। কিন্তু সেই দাড়ি গোঁফ ও জোড়া ভুরুওলা লোকটিকে আর কোথাও দেখলুম না। সে যেন উবেই গেল—অন্ধকারের প্রাণী অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।*

ভাড়াটে বাড়ি

উপরে নীচে মোট বারোখানি ঘর কিন্তু তেরো ঘর ভাড়াটে থাকে বাড়িটিতে। বাড়ির ভিতর দিকে পশ্চিমের যে বারান্দা তাহারই একটা খাটান চটের পর্দা দিয়া ঢাকিয়া শীতাতপ হইতে আড়াল করা হইয়াছে এবং সেই অতি সঙ্কীর্ণ-পরিসর স্থানের মধ্যেই আরও সরু তক্তপোশ পাতিয়া কালাপদ নিজের বাসস্থান ঠিক করিয়া লইয়াছে। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে পেরেক ও দড়ির সাহায্যে আলনা টাঙ্গাইয়া তাহাতে সে কাপড়-জামা রাখে এবং তাহার বাকী 'এস্টেটপত্র' অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা তোরঙ্গ আর জোড়া-দুই জুতা, থাকে তক্তপোশের নিচে।

এ বুদ্ধি নাকি কালীপদর নিজেরই ; সে ঘর খুঁজিতে আসিলে বাড়িওয়ালা প্রতাপবাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'ঘর না তৈরী করলে আর দিতে পারব না, সব বোঝাই।'

সে জবাব দিয়াছিল, 'ঠিক এই রকমই খুঁজছি আমি। চলুন দেখি, আমি ঘর বার করতে পারি কি না—'

হতভম্ভ প্রতাপবাবু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'তার মানে?'

সে কহিয়াছিল, 'মানেতে দরকার কি, চলেই আসুন না!'

* এই উপস্থিতিটি অবলম্বন ক'রে পরে একটি গল্পও লিখেছি। কিন্তু সে গল্পই কল্পনা। আসল ঘটনা যা তা এই।

এবং তাঁহার হাত ধরিয়া প্রায় টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া গিয়া প্রস্তাবটা বুঝাইয়া দিয়াছিল। প্রতাপবাবু আরও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কিন্তু এর দরকার কি? কলকাতাতে কি আর ঘর নেই?'

কালীপদ উত্তর করিয়াছিল, 'ঢের, অভাব কি? অভাব যেটা হচ্ছে সেটা আমার টাকার—একটা ঘর নিলে তো আর ছ'সাত টাকার কমে পাব না, মেসে সীট নিলেও চার টাকা অন্তত দিতে হবে। অথচ আমার দু'টি টাকার বেশী সঙ্গতি নেই। আপনারও ধরুন এটা স্রেফ উপরি তো? যা পেলেন তাই লাভ।

বলা বাহুল্য, আর একটু বিবেচনার পর প্রতাপবাবু রাজী হইয়াছিলেন। সেই হইতে কালীপদ তাহার এই অদ্বিতীয় ঘরকন্না পাতিয়া সেইখানেই আছে। তাহার এই আবিষ্কারের জন্য তাহার গর্বেরও সীমা ছিল না, প্রায়ই লোককে ডাকিয়া কহিত, 'বাবা, প্রতাপ দত্তের চেয়েও আমার বিষয়বুদ্ধি বেশী! দিলুম ওর দুটো টাকা আয় বাড়িয়ে।'

কালীপদর বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হইবে কিন্তু এই বয়সে কেহ যে এমন অলস হইতে পারে, তাহা এ বাড়ির কাহারও জানা ছিল না। এ বিষয়ে সে ছিল অদ্বিতীয়! কী একটা ছাপাখানায় চৌদ্দ টাকা মাহিনার চাকরি করিত, সকাল দশটা হইতে অপরাহ্ণ ছয়টা পর্যন্ত সেখানে কাজ করিবার কথা। সে প্রত্যহ সাড়ে নয়টা পর্যন্ত সকালে ঘুমাইত, বাকী সময়টার মধ্যে তাহাকে স্নান প্রভৃতি সারিয়া খুচরা দরের হোটেল হইতে ভাত খাইয়া দশটার মধ্যে হাজিরা দিতে হইত। তাড়াতাড়িতে কোন দিনই ভাল করিয়া খাওয়া হইত না, তবু সে একটি দিনও সাড়ে নয়টার আগে শয্যাত্যাগ করিত না, কেহ অনুযোগ করিলে বলিত, 'উঠে কি করব? ভোর হ'তে না হ'তে কল পাইখানা নিয়ে যা কাড়াকাড়ি আর ঝগড়াঝাঁটি, তার চেয়ে সকলের সারা হ'লে নিই, এই আমার ভাল।'

কিন্তু সন্ধ্যাবেলাও অফিস হইতে বাহির হইয়া কোনমতে একটা উড়ের দোকান হইতে দুই পয়সার রুটি কিনিয়া আহারটা সেইখানেই সারিয়া লইত, তাহার পর বাসায় ফিরিয়াই সটান্ শয্যাগ্রহণ। অর্থাৎ অফিসের আট ঘণ্টা আর এদিকে ওদিকে আরও ঘণ্টাখানেক, এই মোট ন' ঘণ্টা সময় ছাড়া সে একটি মুহূর্তও বৃথা অপব্যয় করিত না; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পনেরো ঘণ্টাই তাহার

কাটিত বিছানায়। বাড়তি অন্য কোন রকম আয়ের চেষ্টা তো করিতই না, প্রেসেই কোনদিন 'ওভার টাইম' খাটিতে বলিলে সে সোজাসুজি অস্বীকার করিত। বলিত, 'দেখুন পয়সাটাই তো বড় কথা নয়, শরীরটার দিকেও দেখতে হবে তো ? এই যা খাটুনি, কোন্ দিন পড়ব আর মরব !'

বাসার কেহ অনুযোগ করিলে বলিত, 'কী হবে আমার বেশী পয়সায় ? চারটে টাকা গুদোম ভাড়া দিতে হয়, আর বাকী দশ টাকাতেই আমার বেশ চলে যায়। মায়ের পেটে দশ মাস ছিলুম, ওটার ভাড়া দেওয়া দরকার, বুঝলেন না ? আর কাউকে দেখবার আমার দরকার কি ? দেশে যা আছে তার ওপর আর চারটে টাকা হ'লেই মায়ের বেশ চলে যাবে, চাই কি যদি একটু টেনে চালাতে পারে তো হাতে দু'পয়সা জমবেও—'

এমন কি উপরের মহিমবাবু তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাঁহার ছেলেটাকে সামান্য অ-আ শিখাইতে, তাহার জন্য মাসিক এক টাকা হারে পারিশ্রমিক দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কালীপদ তাহাতেও রাজি হয় নাই।

মহিমবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ত তুমি শুয়ে শুয়ে গল্পই করো, ও যদি তোমার কাছে এসে পড়ে যায় তো তোমার ক্ষতি কি ? অথচ একটা টাকা আয় তো বাড়ত !'

উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কালীপদ জবাব দিয়াছিল, 'একটা টাকা আয় বাড়লে তো আর আমার দুঃখ ঘুচবে না মহিমবাবু ! ওটা কিছু নয়—কিন্তু এই সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আবার এসে বকতে শুরু করলে কি আর শরীরে কিছু থাকবে মনে করেন ? না, মহিমবাবু, ওটা মাপ করতে হ'ল।'

অথচ এই একটি বিষয়ে আলস্য তাহার কোনও দিনই দেখা যায় নাই। বকিতে পারিত সে অসাধারণ ; যতক্ষণ সে বাসায় থাকিত এবং জাগিয়া থাকিত, ততক্ষণ আর কাহারও শান্তি থাকিত না ; অবিরাম গতিতে সে কাহারও না কাহারও সহিত বকিয়া চলিত। বক্তৃতার বিষয়বস্তুরও কোন দিন তাহার অভাব হইত না। সে বাসায় কাহারও খবরের কাগজ লইবার বদ্ অভ্যাস ছিল না, সুতরাং কালীপদ যতটা সংবাদ প্রেসের অন্যান্য কর্মচারীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিত, তাহার চতুর্গুণ ভেজাল মিশাইয়া সে অম্লানবদনে ইহাদের কাছে চালাইত। এবিষয়ে তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল খুব বেশী। নমুনাস্বরূপ

তেতালার বামুন পিসীর কথাই ধরা যাক্—

বামুন পিসী বিধবা মানুষ, বিধবা কন্যা লইয়া থাকেন, সামান্য কিছু টাকা তেজারতীতে খাটাইয়া তাঁহার দিন চলে। সহসা একদিন নিজের বিছানা হইতে চীৎকার করিয়া কালীপদ তাঁহাকে সংবাদ দিল, 'আর খবর শুনেছ মাসী, কোম্পানী কি নতুন আইন করছে ?'

বামুন পিসী প্রথমটায় অতটা গ্রাহ্য করেন নাই, একটু তাচ্ছিল্য সহকারেই প্রশ্ন করিলেন, 'কি রে কালীপদ ?'

কালীপদ জবাব দিল, 'সোনার দাম হু হু ক'রে বেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় ক্ষতি হচ্ছিল ব'লে কোম্পানী আইন ক'রে দিচ্ছে, সোনা আর কেউ পনেরো টাকা ভরির বেশী দামে বেচতে পারবে না।'

বামুন পিসীর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার মূলধন সুদ্ধ চলিয়া যায় যে। তিনি ছুটিয়া আসিয়া, কহিলেন 'ওমা, সে কি সব্বনেশে কথা রে, আমি যে তাহ'লে দাঁড়িয়ে মারা যাব !'

কালীপদ সমবেদনা জানাইয়া কহিল, কিন্তু কি করা যায় মাসী, এধারে তে অনেক লোকের সর্বনাশ হয়ে যায়।

নিচের ঘরে তখন সুরেশবাবু অফিস্ হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িতেছিলেন তিনি হাঁকিয়া কহিলেন, 'এ খবর কবেকার কাগজে দিয়েছে কালীপদ ?'

কালীপদ জবাব দিল, 'কেন আজকের !'

সুরেশবাবু কহিলেন, 'কিন্তু আমি তো অফিসে আজকের কাগজ আদ্যোপান্ত পড়লুম, তাতে তো কৈ এ খবর পেলুম না।'

কালীপদ কহিল, 'কি কাগজ পড়েছেন আপনি ?'

সুরেশবাবু কহিলেন, 'আমি দুখানা বাংলা কাগজ পড়েছি—'

কালীপদ অম্লানবদনে জবাব দিল, 'এসব খবর তো বাংলা কাগজে থাকে না, ইংরিজী সব কাগজেই বেরিয়েছে—'

সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িটায় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বামুন পিসী তো মড়াকান্না জুড়িয়ে দিলেন, তিনি ভরি-করা কুড়ি-পঁচিশ টাকা ধার দিয়াই বসিয়া আছেন, সুদসুদ্ধ আরও বাড়িয়াছে। অবশেষে সুরেশবাবু বাহিরে গিয়া চার পয়সা দিয়া একটা ইংরাজী কাগজ কিনিয়া আনিলেন এবং সকলে মিলিয়া উপুড়

হইয়া পড়িয়া সংবাদটা খুঁজিতে লাগিলেন।

তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন এ খবর মিলিল না, তখন কালীপদ বেশ সহজ কণ্ঠেই কহিল, তাই ‘তো! বাবু বললেন কি না, আমি তো আর কাগজ পড়ি না, সময় কোথা বলুন!’

কিন্তু তবু তাহার পর তিন রাত্রি বামুন পিসীর ভাল ঘুম হইল না।

আর একদিন হয়ত মহিমবাবু সারাদিনের পর বিশ্রাম করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল, ‘এবারে ভাইসরয় কাপের খবর জেনেছেন কিছু?’

মহিমবাবুর রেস সম্বন্ধে দুর্বলতা সর্বজনবিদিত, তিনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, ‘কি খবর ভাই কালীপদ?’

কালীপদ জবাব দিল, ‘এবারে এত বেশী লোক ফাইনালিস্টের ওপর বাজী ধরেছে যে, ওরা ঠিক করেছে এবার কিছুতেই ওকে জিততে দেবে না—’

মহিমবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, তিনিও মনে মনে ঐ ঘোড়াটা আঁচিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করিলেন, ‘তুমি কার কাছে এ খবর শুনলে?’

কালীপদ হাসিয়া কহিল, বিলক্ষণ! ‘আমাদের ম্যানেজারবাবুর কাকার সহিস হ’ল লাট সাহেবের বাবুর্চির আপনার মেসোমশাই! তার মুখ থেকেই বাবু শুনেছেন, আমি আবার বাবুর মুখে শুনলুম, নইলে আমি আর ওসব ঘোড়া-ফোড়ার খবব কোথা থেকে পাব বলুন?’

এ যুক্তি অকাট্য বলিয়াই মহিমবাবুর বোধ হইল। ফলে তাঁহার চোখের সামনে দিয়া তাঁহার অনেকগুলি টাকা ডুবাইয়া ঐ ঘোড়াটাই ফাস্ট হইল। তিনি ফিরিয়া আসিতে কালীপদ সংবাদ শুনিয়া কহিল, ‘কি করবেন বলুন, ওরা তো তিন ভরি আফিং খাইয়েছিল, শালা ঘোড়া যে আফিংসুদ্ধ হজম করবে তা কে জানে!’

এইভাবেই তাহার দিন চলে। কোনদিন আসিয়া বলে, ‘সেই যে হনলুলুতে একটা ঘোড়ার পেটে তিনটে মানুষের ছানা হয়েছিল, তারই একটা আজ মরে গেল।’

কোন দিন বা শুষ্কমুখে সংবাদ দেয়, ‘দেরাদুন এক্সপ্রেস পড়ে যেতে সেদিন

যা লোক মরেছিল, তার নাকি সব এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। কাল একটা মড়া মাটি খুঁড়ে বার করেছে—এইসা ধাক্কার চোট যে, একেবারে মাটির মধ্যে পুঁতে গিয়েছিল!'

ইদানীং তাহার কথা সবটা প্রায় কেহই বিশ্বাস করিত না। ভাল করিয়া সেদিকে কেহ কানও দিত না। কিন্তু দৈবাৎ তাহার একটি ভাল শ্রোত্রী মিলিয়া গেল। মহিমবাবুর অফিস আলিপুরে উঠিয়া যাওয়ায় তিনি ঐ অঞ্চলে বাসা দেখিয়া চলিয়া গেলেন, আর তাঁহারই ঘরে ভাড়া আসিলেন চন্দ্রনাথবাবু। ভদ্রলোক একটা মনোহারী দোকানে কাজ করেন, টাকা ত্রিশেক মাহিনা, অথচ ছেলেপুলে সর্বশুদ্ধ সাত-আটটি হইবে। এই চন্দ্রনাথবাবুরই বড় মেয়ে টেঁপি বাড়ির মধ্যে কালীপদর সবচেয়ে বড় ভক্ত হইয়া উঠিল।

টেঁপির বয়স বছর চৌদ্দ কিংবা পনেরো হইবে কিন্তু দেখিলে মনে হয় আরও ছোট, এমনিই তাহার দৈহিক গঠন। শ্রীছাঁদ কোথাও কিছু নাই, বেঢপ চেহারা তাহার উপর বাপের নাই পয়সা, এমতাবস্থায় তাহাকে পার করা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার সেই কথাটা কল্পনা করিয়াই বোধ করি টেঁপির মায়ের মাথা খারাপ হইয়া যাইত, তিনি কন্যাকে দেখিলেই কারণে-অকারণে তিরস্কার করিতেন। তাঁহার বাক্যযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে ফাঁক পাইলেই ছোট ভাইটাকে কোলে করিয়া কালীপদর বিছানার সামনে বারান্দায় আসিয়া বসিত এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাহার চমকপ্রদ সংবাদাদি শুনিত।

বলা বাহুল্য, এমন শ্রোত্রী পাইয়া কালীপদরও উদ্ভাবনী শক্তির দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল, এখন সংবাদ খোঁজ-খবর করিয়া সংগ্রহ করেও বেশী এবং ভেজাল চালায় তাহার আটগুণ। ঝোঁকের মাথায় এমন কথাও বলিয়া বসে, 'উড়ো-জাহাজ হয়ে কি সুবিধেই হয়েছে বল্ দেখি টেঁপি, আমাদের রাজা রোজ কামস্কাটকায় মাছ ধরে বাড়ি ফেরবার পথে বসোরা থেকে গোলাপ কিনে নিয়ে যায়। আগে কি আর এত সুখ চলত?'

টেঁপি সব কথাই নির্বিচারে বিশ্বাস করিত। এমনকি কোন দিন কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ কোন সংবাদ তাহার বাবার কাছে দিতে গেলে তিনি যখন উপহাস করিতেন, তখন সে তাঁহাকেই মূর্খ ভাবিয়া মনে মনে দুঃখিত হইত। চন্দ্রনাথবাবু

দোকান হইতে গোপনে ছেলেমেয়েদের জন্য মধ্যে মধ্যে বিস্কুট লজেঞ্জস্ প্রভৃতি লইয়া আসিতেন, টেঁপি আবার তাহারই মধ্য হইতে দুই-একখানা কালীপদর জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া হয়ত কহিত, 'বাবাটা কিচ্ছু খবর রাখে না, জানো কালীদা, বোম্বেতে ভূমিকম্প হয়ে সেই সমুদ্দুরের মাছ ছিট্‌কে লাট সাহেবের খাবার টেবিলে গিয়ে পড়েছিল—সেই কথাটা বলতে গেলুম বাবাকে, বাবা হেসে উড়িয়ে দিলে।'

কালীপদ অনুকম্পাভরে কহিত, 'খবরের কাগজ তো পড়তে পায় না বেচারা, খবর রাখবে কী ক'রে বল্?'

কোন দিন বা টেঁপি কহিত, 'এমন ক'রে শুয়ে কতদিন কাটাবে? বলি এর পর বিয়ে-থা করতে হবে না, ঘর সংসার পাততে হবে না? এমনি ক'রেই কি বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভেসে ভেসে বেড়াবে?'

বিস্মিত হইয়া কালীপদ জবাব দিত, 'বিয়ে-থা? আমি বিয়ে করব?··· তুই কি ক্ষেপেছিস টেঁপি?'

টেঁপি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিত, 'সে কি, বিয়ে করবে না তো চলবে কি ক'রে! অসুখ-বিসুখ হ'লেই বা দেখবে কে, ভাত-জলই বা দেবে কে? হোটেলে খেয়ে ক'দিন শরীর থাকবে? সংসারী হ'তে হবে না?'

কালীপদ হাতজোড় করিয়া বলিত, 'মাপ করো রাজা, আমার আর সংসার পেতে দরকার নেই। এই বেশ আছি! সে বড় ঝঞ্ঝাট!'

টেঁপি রাগ করিয়া চলিয়া যাইত।

কিন্তু সহসা একদিন দেখা গেল যে, কালীপদর এই অপরিসীম ঔদাসীন্য কিছু কমিয়াছে। টেঁপি নিজের ঘর হইতে ছুঁচ-সুতা লইয়া আসিয়া কালী-পদরই একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া কহিল, 'আমার যে বিয়ে হচ্ছে কালীদা!'

কালীপদ সহসা যেন একটা ধাক্কা খাইল। চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, সে কি? কার সঙ্গে? কবে?

টেঁপি দাঁতে করিয়া সুতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল, 'কবে এখনও কিছু ঠিক হয় নি।···ঐ যে নিচে বাইরের ঘরে বুনো মোষের মতো দেখতে দুটো ভাই

থাকে, তাদেরই বড়টার সঙ্গে। ওর নাকি আমাকে বড় পছন্দ, মুখে আগুন!'

লোকটিকে কালীপদর মনে পড়িল। রাস্তার উপরের ঘরটা ভাড়া করিয়া দুটি ভাই থাকে, কোন্ এক বড় দপ্তরীখানায় দুজনে কাজ করে, যেমন কালো, তেমনি মোটা, তেমনি বেঁটে—দুটি ভাই-ই একরকম দেখিতে।

কালীপদ যেন একটু অসহিষ্ণু ভাবেই কহিল, কিন্তু তার যে প্রায় চল্লিশের ওপর বয়স হ'ল।

টেঁপি গম্ভীরভাবে কহিল, 'তা কি করবে, বাবা পয়সা-কড়ি তো দিতে পারবে না, ওর চেয়ে ভাল পাত্তর কোথা পাবে? দয়া ক'রে যে নিতে চাচ্ছে এই ঢের।

কালীপদ আরও খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'কিন্তু থাকে তো ঐ একটা ঘরে, বিয়ে ক'রে থাকবে কোথা?'

টেঁপি কহিল, 'সবাই কি আর তোমার মতো চিরকাল একরকম কাটায়? ওরা আলাদা বাসা নিচ্ছে ঐ ছুতোরপাড়ার গলিতে—একটা মাটির বাড়ি ভাড়া করেছে, এই মাসেই উঠে যাবে।'

কালীপদ আর কথা কহিল না। ইহার দিন-দুই পরে সত্য সত্যই সেই দুটি ভাই অন্যত্র উঠিয়া গেল। কালীপদ নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কি করিয়া যে কি করা যায় কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে তিন-চারদিন পরে একটা মতলব তাহার মাথায় খেলিয়া গেল, সে মনিবের নিকট হইতে দুটি টাকা ধার করিয়া একটা লটারীর টিকিট কিনিয়া ফেলিল।'

টেঁপি সন্ধ্যার সময় হ্যারিকেন জ্বালিয়া তাহার বিছানার সামনে নখ কাটিতে বসিয়া ছিল, এক সময় সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কালীপদ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাহার দিকেই চাহিয়া আছে, সে একটু বিস্মিত হইয়া কিহল, 'অমন ক'রে চেয়ে আছ যে?'

কালীপদ জবাব দিল, 'ভাবছি।'

তাহার পর গলাটা নামাইয়া সহসা কহিল, 'টেঁপি, আমি যদি তোকে বিয়ে করি?'

ফ্যাঁস করিয়া নরুনটা মাংসের মধ্যে বসিয়া গেল। জোর করিয়া কাটা স্থানটা চাপিয়া ধরিয়া বিবর্ণ মুখে টেঁপি কহিল, 'ও আবার কি ঠাট্টা?'

কালীপদ কহিল, 'ঠাট্টা নয়, সত্যি ভাবছি ক'দিন। ঐ বুনো মোষটার সঙ্গে

বিয়ে হ'লে বড় কষ্ট পাবি তুই —'

টেঁপি ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, 'রাখবে কোথায় আমাকে বিয়ে ক'রে? এইখানে?'

কালীপদ মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞভাবে বলিল, 'সে ব্যবস্থাও করছি। আজ একটা লটারীর টিকিট কিনেছি দু'টাকা দিয়ে। দেখবি?…'

তাহার পর কহিল, 'ফার্স্ট প্রাইজ না হয় নাই পেলুম, অন্য প্রাইজও তো আছে? তাইতেই কলকাতায় একটা ছোটখাট বাড়ি কিনে এমনি ক'রে সব ভাড়াটে বসিয়ে দেব, বুঝলি না! দিব্যি বসে খেয়ে চলে যাবে'খন।…ইস্ তোর পা-টা অমন ক'রে কেটে গেল কি ক'রে রে? রক্তে ভেসে যাচ্ছে যে!'

ইহার পর সাতটা আটটা দিন টেঁপির যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। কালীপদ রোজ তাহাকে বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, লটারীর টাকা তাহার না পাইবার কোনই কারণ নাই, টেঁপিও ক্রমে তাহা বিশ্বাস করিয়াছে।

কিন্তু আটদিনের দিন কালীপদ বাসায় ফিরিতে সে উদ্‌গ্রীব হইয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তাহার সারা মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। সে আর কোন প্রশ্ন করিল না, শুধু পাশের রেলিংটা ধরিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে কহিল, 'এখনও তো পনের-কুড়ি দিন সময় আছে, একটা ভাল কাজটাজ খুঁজে দেখ না!'

শুষ্ক কণ্ঠে কালীপদ কহিল, 'কে আর আমাকে বেশী মাইনের কাজ দেবে? পনেরো না হয় আঠারো এই তো।'

টেঁপি জবাব দিল, 'বেশী টাকাতে দরকারই বা কি। এইতো আমার বাবা তেত্রিশ টাকা মাইনেতে সংসার চালাচ্ছে,—'

সে আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদে গিয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া পড়িল। মাকে কহিল, 'মাথা ধরেছে মা বড্ড, আজ আর আমি কিছু খাব না—'

এই প্রথম তাহার কালীপদর দক্ষতা সম্বন্ধে মনে সংশয় দেখা দিয়াছে এবং সে আঘাত বড় কঠিন।

পরের দিন কালীপদ ফিরিল রাত ন'টারও অনেক পরে। বোঝা গেল সে ওভার-টাইম কাজ করিয়াছে। টেঁপি আসিয়া অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া

রহিল, তাহার পর যেন কতকটা অপরাধীর মতোই চলিয়া আসিল, যদিও তাহার অপরাধটা যে কোথায়, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

পরের দিন মা প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যাঁরে, আজকাল কালীপদকে যে বড় চুপ-চাপ দেখছি।'

টেঁপির মুখ অকারণে আরক্ত হইয়া উঠিল, সে মাটির দিকে মুখ করিয়া কহিল, 'এইবার একটু কাজে-কর্মে মন দিয়েছে, বোধ হয় সংসারী হবার ইচ্ছে!'

মা মুখে একটা শব্দ করিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, ও হবে সংসারী, পোড়া কপাল! বিশ্বকুঁড়ে আর মুখ-সর্বস্ব। শেষ অবধি দেখিস, ওকে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে।'

টেঁপি একটু উষ্ণ কণ্ঠেই কহিল, 'মায়ের যেমন কথা, ভিক্ষে করবে কি দুঃখে? কাজ করছে না ও? এইত কাল ওভার-টাইম খেটে এল—'

মা আর কথা কহিলেন না। কিন্তু টেঁপির তখন মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; সে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল কালীপদ সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত খাটিতেছে অর্থের জন্য এবং—হাঁ, এবং তাহাকে সুখে রাখিবার জন্য। টেঁপি তাহাদের ছোট্ট গৃহস্থালীতে তাহারই জন্য রাঁধিয়া বাড়িয়া বসিয়া আছে, কালীপদ অফিস হইতে ফিরিবার পথে কত কি কিনিয়া আনিয়াছে। টেঁপি অনুযোগ করিতেছে, কি দরকার এত খাটবার, অত বেশী টাকায় আমাদের কি হবে, এই তো দুটি প্রাণী আমরা, কুড়িটা টাকা মাসে হ'লেই ঢের।

কিন্তু কালীপদ ঘাড় নাড়িয়া কহিতেছে, 'না না তুমি বোঝ না, তোমার সাধ-আহ্লাদ কিছুই মেটাতে পারছি না, কি আর দিতে পারছি তোমায় বলো?...তা ছাড়া আজই দুটি প্রাণী আছি, চিরকাল কি থাকব—ছেলেপুলে হবে না! হাতে দু'পয়সা হওয়া দরকার—'

লজ্জায় রাঙা হইয়া টেঁপি হয়ত পাখাখানা ঠকাস্ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে—

সহসা তাহার জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল কালীপদর পায়ের শব্দে। সে সেদিনও কাহারও সহিত বাক্য-ব্যয় না করিয়া একেবারে সটান্ নিজের শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। টেঁপি পাশের ঘরের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল তখন

মোটে আটটা, কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে তাহার বুকটা যেন ঢিপ্ করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, 'এরি মধ্যে ওপরটাইম শেষ হয়ে গেল?'

কালীপদ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া ছিল, খানিকক্ষণ তেমনিই শুইয়া থাকিয়া বিরস-কণ্ঠে জবাব দিল, 'ও আমি পারব না। বড্ড খাটুনি। অত ক'রে খাট্‌লে মরে যাবো—'

টেঁপি শক্ত করিয়া রেলিংটা চাপিয়া ধরিয়া যেন নিজেকে সামলাইয়া লইল। কি যেন বলিতেও গেল, কিন্তু ঠোঁট দুটিই শুধু থর-থর করিয়া কাঁপিল, কণ্ঠ ভেদিয়া কোন শব্দ বাহির হইল না। মিনিট-খানেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

তাহার বাবা ও মা তখন লণ্ঠনের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া একছড়া সোনার হার আলোকে মেলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, টেঁপিকে দেখিয়া মা মুখ তুলিয়া কহিলেন, 'জামাই গায়ে হলুদ দেবে ব'লে এরি মধ্যে হার গড়িয়েছে। দেখ্ দেখি পছন্দ হয় কিনা, তোকে দেখাবার জন্যেই পাঠিয়েছে—। আমার তো বাপু বেশ পছন্দ।'

টেঁপি যন্ত্রচালিতের মতো হারটা তুলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সেটা ধীরে ধীরে আবার মায়ের হাতেই ফিরাইয়া দিয়া কহিল, 'বেশ হয়েছে মা!'

সতীন-কাঁটা

সুদীপ্তাদের ব্যাপারটা বন্ধুবান্ধব তো বটেই, আত্মীয় স্বজন এমন কি পাড়া-প্রতিবেশী চেনাশুনো সকলকারই আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। স্বাভাবিকও। সতীনে সতীনে ভাব এতকাল নিরুপমা দেবীর উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাস্তবে কেউ দেখে নি। বিভূতিবাবু তিন বোনকে তিন সতীন ক'রে বাস্তবের সঙ্গে একটা রফা করেছেন, পরসতীনে সখ্য, তিনিও দেখাতে সাহস করেন নি। বঙ্কিমবাবু ঋষি মানুষ, যা বলেন তা আর্যপ্রয়োগ, আর দেবী রাণীও কিছু সাধারণ মানুষ নন, সে কথা তো এখানে ওঠেই না।

না, সতীনে সতীনে এত সৌহার্দ্য কেউ কখনও দেখে নি। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর রক্ষিতার সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ-পরিচয়, যাওয়া-আসা প্রভৃতি মৌখিক প্রীতির কথাও শোনা যায়। কিন্তু সতীনে সতীনে, নৈব নৈব চ। সুদীপ্তা কিনা সেই অসম্ভবই সম্ভব করল।

অবশ্য আপনারা একটু টেক্‌নিক্যাল ভুল ধরতে পারেন, সুদীপ্তা এখন আর হর্ষর স্ত্রী নয়, আইনত সে সম্পর্ক চুকে গেছে। সুতরাং নীপমালা ওর সতীন পদবাচ্য হয় কিনা সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের একটা মতামত নেওয়া দরকার হয়তো। তবে, আমারও একটু দেবার মতো সাফাই আছে, সুদীপ্তা তো আর বিয়ে করে নি, চাকরির জায়গায় আগের সে পদবীটাও বহাল আছে। সতীন বলা যাবে না কেন?

এসব ভণিতা থাক, যে 'ব্যাপারটা' শব্দ দিয়ে শুরু করেছি সেটাই খুলে বলি।

হর্ষদেব ভাল ছাত্র, অল্পবয়সেই অধ্যাপক হিসাবে নাম করেছে। এ ছাড়াও, তার সম্বন্ধে যেটা বিশেষ উল্লেখ্য—অসাধারণ রূপবান। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, টানা চোখে মদির দৃষ্টি, ঈষৎ লোমশ বলিষ্ঠ হাতে দীর্ঘ অগ্নি-শিখার মতো আঙুল, সব মিলিয়ে নারীজগতে সে চিরদিনই ঈপ্সিত। তাকে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না।

বহু নারী তাকে পাবার জন্যে উন্মত্ত, আকুল ভাবে তাকে কামনা করে, তার সামান্য প্রশ্রয় ও প্রসাদ পেলে কৃতার্থ হয়ে যায়, এ বোধটা যে কোন পুরুষের কাছেই উপভোগ্য। হর্ষও এই আকুলতাটা উপভোগ করত এবং এক-বার পেয়ে গেলে, সম্ভোগের তৃষ্ণা মিটে গেলে ধরা দিত না কাউকে। নাড়াচাড়া বা খেলাতেই তার আমোদ ছিল বেশী।

সুদীপ্তা তার এম.এ. ক্লাসের নতুন সহপাঠিনী। ওকে সুশ্রী বলা গেলেও সুন্দরী বলে আখ্যাত করা যায় না কোন মতেই। বিশেষ ঐ ক্লাসেই ওর থেকে ভাল দেখতে মেয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু সুদীপ্তার সম্পদ ছিল অন্যত্র। সেটা তার বুদ্ধি, রূপসী মেয়েদের যেটা প্রায়ই থাকে না।

সুদীপ্তা এসেই পণ করে বসল, এই ছেলেটিকে সে বাঁধবে তার জীবনের সঙ্গে, ওর এই লুকোচুরি খেলা, ল্যাঠামাছের মতো কেবলই পিছলে বেরিয়ে

যাওয়া, বন্ধ করবে। তার জন্যে সে সাধনাই শুরু করল বলতে গেলে। আর যে একাগ্রতায় তার কামনাকে তপস্যা করে তুলল, তাতে ভগবান লাভ হয়, প্রেমিক তো তুচ্ছ। সুতরাং হর্ষকে ধরা দিতেই হ'ল। পরাজয় স্বীকার ক'রে, কর্তিত-পক্ষ বিহঙ্গের মতো বিবাহিত জীবনের খাঁচায় প্রবেশ করল সে।

এর পর কেটেছে দীর্ঘকাল, আট-ন বছর। একটি সন্তানও হয়েছে ওদের, ছেলে। সুদীপ্তাও ভাল ছাত্রী, সেও ডক্টরেট পেয়েছিল। দুজনেই অধ্যাপনা করে এমন ভাবেই ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে, সুদীপ্তার ক্লাসগুলো পড়ে সকালের দিকে, দুটোর পরই ছুটি হয়ে যায়, হর্ষর প্রথম দিকে কোন ক্লাস থাকে না। সে ছেলেকে ইস্কুলে দিয়ে যায়, সুদীপ্তা বাড়ি ফেরার সময় নিয়ে আসে।

সুখেই ছিল। সুখী দম্পতির উদাহরণ দিত সবাই ওদের দেখিয়ে। সুদর্শন স্বামীকে নিয়ে প্রথম দিকে একটু অস্বস্তি ছিল সুদীপ্তার, ক্রমশ সেটাও, সে আশঙ্কাও কেটে গিছল, নিশ্চিন্তও হয়েছিল সে।

এই সময় এল নীপমালা, হর্ষর ছাত্রী।

সেও সুদীপ্তার মতোই পণ ক'রে বসল, এই সুন্দর কান্তি সুপণ্ডিত সুখ্যাত অধ্যাপকটিকে করায়ত্ত করবে। সেটা খুব কঠিনও হল না, কারণ নীপমালা সুদীপ্তার থেকে ভাল দেখতে না হলেও, তার থেকে বয়সে ছোট। তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছরের পুরুষের কাছে কুড়ি-একুশ বছরের অনূঢ়া কন্যার আকর্ষণ একটা থাকেই। সুতরাং নীপমালা মাত্র বছর খানেকের চেষ্টাতেই অধ্যাপকটিকে জয় ক'রে নিল। আরও বছর দুই সময় লাগল একটা বিবাহের সম্পর্ক চুকিয়ে আর একটা বিবাহে গ্রন্থি দিতে।

এ পর্যন্ত গেল সাধারণ কাহিনী, সচরাচর যা ঘটে থাকে। মানে বর্তমানে ঘটছে। এইবার বলছি এ ইতিবৃত্তের বিস্ময়কর অংশটা।

প্রথম অবশ্য বছর খানেক কোন সম্পর্ক রইল না। হর্ষ নীপমালাকে নিয়ে অন্য ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠল। অনেক দূরে। দুজনের উপার্জনে যে ফ্ল্যাটের ভাড়া টানা যায় একজনের সাধ্যে তা কুলোয় না। সুতরাং সুদীপ্তাকেও পুরনো ফ্ল্যাট, তাদের এতদিনের সুখ ও স্বপ্নের স্মৃতি মাখানো বাসা ছাড়তে হ'ল। তবে এই-খানে সে একটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিল। সন্তান মায়ের কাছে থাকবে এ-ই সাব্যস্ত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করে নি হর্ষ, সে বরং

বেঁচেই গেল। তবে ছেলের ভরণ-পোষণ-শিক্ষা বাবদ মাসে মাসে যে টাকাটা দেবার কথা তার বদলে ওর যা কিছু সঞ্চয় সব তুলে, কিছু পৈতৃক অর্থও পেয়েছিল, একেবারে বিশ হাজার টাকা দিয়ে সুদীপ্তার কাছ থেকে লিখিয়ে নিলে যে ভবিষ্যতে এ বাবদ সে আর কিছু দাবী করবে না। এই টাকাটা এবং ওর নিজের যা কিছু ছিল আর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে কিছু ধার ক'রে একটা ছোট্ট বাড়ি কিনে নিল সুদীপ্তা।

দু' পক্ষই নিশ্চিন্ত, শান্ত ; মধ্যের এই পীড়াদায়ক দুটো বছরের কথা ভুলে যাবে ক্রমশ—এই আশাই করতে শুরু করেছে সবাই। এর মধ্যে সুদীপ্তা একদিন হর্ষদের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির।

দরজাটা আধখোলা হতেই সুদীপ্তাকে দেখতে পেয়েছিল, তার পর পুরো এক মিনিট সময় লেগেছিল নীপমালার—আগন্তুককে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া উচিত হবে কিনা সেটা ভাবতে। কে জানে কি মতলবে এসেছে, ঝগড়া করবে কিম্বা সকলের সামনে কোন অবাঞ্ছিত দৃশ্যের অবতারণা করবে ; অথবা আর কিছু টাকাই চাইতে এসেছে হয়তো—এক মিনিট সময়ের মধ্যেই সহস্র চিন্তা মাথায় খেলে গেলেও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল না বলেই পথ ছেড়ে দিতে হ'ল।

'কী রে, ভূত দেখলি নাকি ? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—ভূত নই, তবে তোর ঘরের ভূতপূর্ব বটে।···তোর ঘরকন্না দেখতে এলুম একটু, তুই বিরক্ত হবি না তো ? তা যদি হোস তো বল্, এখনই মানে মানে বিদায় নিই।'

এর উত্তরে কি বলা উচিত তাও ভেবে পেল না নীপমালা। আসলে এ অবস্থার কথাটা সুদূর কল্পনাতেও কখনও ভাবে নি সে। তাই কতকটা বিমূঢ় বিহ্বল ভাবেই বলল, 'না, না, তাতে কি ! তা কেন, বাঃ ! বসো না।'

বিহ্বলতার আরও কারণ ছিল। ছাত্রী হিসেবে অবশ্যই নীপমালার ও বাড়িতে যাতায়াত ছিল। কিন্তু 'তুই' বলার মতো অন্তরঙ্গতা কখনও ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। স্বামীর ছাত্রী হিসেবে 'তুমি'ই বলেছে সুদীপ্তা বরাবর, যা স্বাভাবিক। এখন অকস্মাৎ এ আত্মীয়তার হেতুটাও তাকে ভাবিয়ে দিল।

তবু বলতে হ'ল—বসো না। এটাও অবশ্য এক ডিগ্রি এগিয়ে যাওয়া, কেন না এতকাল আপনিই বলে এসেছে।

'বা রে, বসব বলে এসেছি বুঝি। চ, তোর ঘরদোর দেখি, কেমন সংসার

সাজিয়েছিস।' তারপর নীপমালার মুখের ওপর এক লহমা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তুই ভয় পেয়ে গেছিস বুঝি? না ভাই। কোন বদ মতলব নেই। মনে রাগ কি হিংসে থাকলে আসতুম না। যতদিন তা ছিল বিন্দুমাত্র অভিমান কি ঘেন্না ছিল, ততদিন একথা একবারও ভাবি নি। আসলে আমার আর কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। মনে হচ্ছে ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সম্পর্কটা বজায় থাকলেই পরে অনেক দুঃখ পেতে হত হয়তো। মানুষটা যদি এমন লোভাত্তে না হত তোর সাধ্যি কি যে তুই ওকে কেড়ে নিতে পারিস। না, তার ওপরও রাগ নেই আর।'

বলতে বলতেই সে প্রসঙ্গ থেকে একেবারে অন্য প্রসঙ্গ চলে আসে। বলে, 'বাঃ! বেশ সাজিয়েছিস তো! এ খাটটা তো বেশ সুন্দর ডিজাইন! বেড কভারটা কি কেনা, না কেউ প্রেজেণ্ট করেছে? ওখানে ঐ বিশ্রী ঘটিটা রাখিস নি কিন্তু, বড্ড বেমানান লাগছে।

শোবার ঘর, বসার ঘর, মায় রান্নাঘর পর্যন্ত দেখে এসে বলে, 'কি রে, চা খাওয়াবি না? গলা শুকিয়ে গেল যে একা একা বকে। নে যা, জল চাপা।'

'তুমি তো শুনেছি, প্রায় নিত্যই শুনি, খুব ভাল চা করো, আমার চা নাকি মুখে তোলা যায় না'—এবার মুখ টিপে হেসে বলে নীপমালা, এতক্ষণে সহজ হয়েছে সে, 'তা তুমিই না হয় চা করো, আমরা খাই।'

'বয়ে গেছে, বারো মাস তো নিজেকেই ক'রে খেতে হয়। ওতে অরুচি ধরে গেছে। আর সে তোরা যখন আমার বাড়ি যাবি তখন আমি ক'রে খাওয়াব। তোর বাড়ি এসে আমি খাটতে যাব কেন?'

নতুন কেনা সোফাটায় এলিয়ে বসে পুনশ্চ প্রশ্ন করে, 'হর্ষ কখন আসেরে? তেমনি রাত হয়, না নতুনের টানে সকাল ক'রে ফেরে? আমি অবিশ্যি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না, খোকাকে ঝিয়ের কাছে রেখে এসেছি, যা দিনকাল, কাউকে বিশ্বাস নেই। চা খেতে খেতেও যদি এসে না পৌঁছয়, ওকে বলে দিস, আমার মনে আর কোন ময়লা নেই। যদি ওরও কোন কাঁটা কোথাও বিঁধে না থাকে, লজ্জার কাঁটা ছাড়া আর কিছু তো থাকার কথা নয়, বন্ধুর মতো মেশাই তো ভাল। মিছিমিছি একই সমাজে যখন চলাফেরা মেশা, একই পেশা, মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলে মধ্যে মধ্যে বড় অক্ওআর্ড পোজিশ্যনে পড়তে হয়।'

সে-ই সূত্রপাত।

হর্ষরও বোধ করি কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন টান ছিল তখনও, সুদীপ্তার প্রশ্রয় পেয়ে খুশী তো হ'লই সুখীও হ'ল। প্রথম প্রথম যে একটু বিব্রতভাব, অপ্রতিভ-তার কাঠিন্য থাকে, সেটা কেটে যেতে এক মাসও লাগল না।

এরপর দু'পক্ষই সহজ হ'ল, সহজ সস্নেহ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। ছেলেকে দেখতে পাবে, সেটা উপরি পাওনা হর্ষর, এতকালের অভ্যস্ত, এক কালের অতিপ্রিয় সাহচর্য, পছন্দমতো সেবা, রুচিমতো রান্না থেকে একেবারে বঞ্চিত থাকতে হ'ল না, সেইটেই প্রধান লাভ।

এরপর আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া আপন নিয়মে চলতে লাগল। নীপমালা বলে, 'তুমি আমাকে একটু-আধটু রান্না শিখিয়ে দাও সুদীপ্তাদি, না না, তামাশা কি ছদ্ম বিনয় নয়—আমি জানি এখনও তোমার রান্নাই ওর মুখে লেগে আছে। সেই স্বাদটাই খোঁজে।'

শিখিয়ে দেয়ও সুদীপ্তা। অকুণ্ঠ ভাবেই শিখিয়ে দেয়, যত্ন ক'রে, হাতে ধরে যাকে বলে। নিজেও তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দেয় এক-একদিন, বালিগঞ্জ থেকে দমদম,—কচুরি, সিঙ্গাড়া ধোঁকার ডালনা ইত্যাদি।

পুজোর সময় অনেক ইতস্তত ক'রে হর্ষ একখানা শাড়ি নিয়ে আসে, সুদীপ্তা যে ধরনের শাড়ি পছন্দ করে। তারপর হাতজোড় ক'রে বলে, 'নেবে তো ?'

সুদীপ্তা হেসে বলে', বা রে ? নেব না কেন ? তবে তুমি না দিয়ে নীপি হাতে করে দিলেই ভাল হত।'·;·

এই ভাবেই চলছিল। সব রবিবার যাওয়া আসা সম্ভব নয়, তবে প্রায় রবিবারেই দেখা হয় তিনজনের। হয় হর্ষরা এ বাড়ি আসে, সেইটেই বেশির ভাগ, নয়তো সুদীপ্তা ওদের বাড়ি যায়। সে গেলে এটা ওটা তরকারী বা খাবার ক'রে নিয়ে যায়, ওখানে গিয়েও নীপমালাকে সরিয়ে রাঁধতে লেগে যায়।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন আমেরিকা থেকে ডাক এল সুদীপ্তার কাছে। আধুনিক ভাষায় স্টেট্‌স-এর আমন্ত্রণ। একটা লেকচারার বা ঐ ধরনের কিছু একটা ব্যবস্থা। পড়াবে তার সঙ্গে কিছু রিসার্চও করবে।

বেশ লোভনীয় প্রস্তাবই এসেছে, কিন্তু বিপদ হ'ল ছেলেকে নিয়ে। ছেলে

ওর সঙ্গে গেলে তাঁদের আপত্তি নেই, তাঁরা যে টাকা দেবেন তাতে সে খরচও চালানো যাবে, আপত্তি ওরই। এখানে স্কুলে ভর্তি হয়েছে, সে পড়াও হবে না, ওখানে গেলে নতুন ক'রে সব শুরু করতে হবে। আবার এখানে যখন ফিরবে ওখানের পড়াও কাজে লাগবে না। দেড় বছর দু'বছর যতদিনই থাকুক সে সময়টাই বরবাদ।

সুদীপ্তা এসে বলল, 'এক উপায় হর্ষ, তুমি যদি একটু স্যাক্রিফাইস করো।'

'স্যাক্রিফাইস আর কি ? খোকাকে রাখা, এই তো ? তাতে তো আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। সে আমারও ছেলে, এখনও পর্যন্ত—একমাত্র।'

'না না, খোকাকে রাখার জন্য এত ভনিতা করি নি। তোমাদের ওখানে গিয়ে থাকতে হবে, আমার বাড়ি।'

'তার মানে ? কেন ? চুরিটুরির ভয় করছে ? কিন্তু আমাদেরও তো সে প্রশ্ন আছে। আমাদের ফ্ল্যাট আগলাবে কে ?'

'শোন শোন, কথাটা শেষ করতে দাও। আমার এক ভাইঝি এর মধ্যে এসে ঘাড়ে চেপেছে। পিসতুতো ভাইয়ের মেয়ে, বাবা মারা গেছেন ওর তিন বছর বয়েস, মা বর্ধমানে এক ইস্কুলে নিচের ক্লাসে মাস্টারী করেন, তাতেই কোনমতে বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়েছেন। কিন্তু এখন ওর কলকাতায় এম. এ. পড়ার শখ। ভাল মেয়ে, একটা স্কলারশিপও পেয়েছে, এসে কেঁদে পড়ল, আমি সাহায্য না করলে ওর পড়া হবে না। আমি আর না বলতে পারি নি। তাকে এখন কি বলি, কোন্ মুখে ফিরিয়ে দিই ?'

বলতে বলতে, ঝোঁকের মাথায় হর্ষর হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলে, 'লক্ষ্মীটি হর্ষ, তুমি রাজী হয়ে যাও নইলে আমার যাওয়াই হবে না।'

একটু বিচলিত হবে বৈকি, হবার তো কথা। এককালের অতি প্রিয় হাতের স্পর্শ, তার আকর্ষণ একেবারে বিলুপ্ত হবে কেন। বলে, 'না, না, সে কথা হচ্ছে না। তুমি যাও। তবে এ ফ্ল্যাট ছাড়া যাবে না। এত জিনিসপত্র তোমার ঐটুকু বাড়িতে ধরবে না, এখানে কাকে রাখা যায় তাই ভাবছি।'

'সেটাও আমি ভেবে রেখেছি মশাই, তার জন্যে তোমাকে অনাবশ্যক ব্রেন সেল্স্ ক্ষয় করতে হবে না।...ভগবানই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন একটা। নীপির কাকা অজয়বাবু ব্যাচেলার মানুষ, ভাগ্নের ফ্ল্যাটে শেয়ার ক'রে থাকতেন, সেই

ভাগ্নে হঠাৎ আগ্রার কাছে খেরাগড়ে বদলি হয়েছে। বেশ একটু আতান্তরেই পড়েছেন ভদ্রলোক। তাঁকে এই ফ্ল্যাট অফার করলে বেঁচে যাবেন তিনি।'

'তারপর? তুমি ফিরে এলে? তখন তাঁকে কোথায় ফেলব?'

'অত দূরের ভাবনা না-ই বা ভাবলে! এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। আর আমি এসে পড়লে সেইদিনই যে ঘর ছাড়তে হবে, এমনই বা কি কথা? অজয়বাবু অন্য বাসা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা অনায়াসে আমার ওখানে থাকতে পারবে।'

হর্ষ রাজী হয়ে গেল। নীপমালা একটু খুঁতখুঁত করেছিল, তবে কোন প্রবল আপত্তি তোলে নি। তাও, যেটুকু দ্বিধা ছিল, সুদীপ্তার অনুনয় বিনয়ে সেটুকুও থাকল না। হেসে বললে, 'কিন্তু সৎমার কাছে ছেলে রেখে যাচ্ছ, যদি অযত্ন হয়?'

প্রথমত সৎমা নয়, আইনত এটাকে সৎমা বলা যায় কি? দ্বিতীয়ত যাকে সৎমা বলছিস তার নিজের ছেলে থাকলেও সে দুশ্চিন্তার কথা উঠত। এ আমি নিশ্চিন্ত হয়েই যাচ্ছি, আমার চেয়ে বেশী যত্ন করবি তুই।'

সুদীপ্তা যে বলেছিল, এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে সে কথাটা ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই ফলে গেল।

অথবা কথাটা উচ্চারিত হবার সময় বিধাতা 'স্বস্তি' বলে উঠেছিলেন। কিম্বা জেনে বুঝেই বলেছিল সুদীপ্তা। 'কথার-কথার' মতো বলে নি। ফলাফল প্রত্যক্ষ করারও প্রয়োজন হয় নি, সে-ই এর আয়োজন করেছিল, ঘটনা-সূত্র সাজিয়ে-ছিল। বিশেষ ফল আশা করেই বিষবৃক্ষ রোপণ ক'রে গিয়েছিল।...

সুদীপ্তা যখন ফিরে এল, তখন নীপমালা তার বাপের বাড়িতে উঠে গিয়ে হর্ষর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনেছে; সুদীপ্তার ভাইঝি অন্তঃসত্ত্বা। সেইটেই মামলার প্রধান 'কজ'।...

'যে সর্বশেষ হাসি হাসে, সে-ই যথার্থ হাসে' ইংরেজী এ প্রবচনের অর্থ কি নীপমালা বুঝল এতদিনে? সুদীপ্তার বিশ্বাস বুঝেছে।

ভুলের ফসল

সজল লাহিড়ী নামকরা লেখক। খুবই নামকরা। পূজো সংখ্যার জন্যে সম্পাদকরা তাঁর দোরে ছুটোছুটি শুরু করেন বৈশাখ মাস থেকে—তিনি তাঁদের অনেক ভুগিয়ে কাঁদিয়ে সেই লেখা দেন ভাদ্রের শেষে কিম্বা আশ্বিনের গোড়ায়—যেবার যেমন পূজো পড়ে। তাঁর জন্যে কাগজ বেরনো বন্ধ থাকবে, প্রেস আটকে থাকবে—এটা ভাবতে ভাল লাগে তাঁর। এইটেই তাঁর বিলাস। অথবা প্রথম বয়সে এই সম্পাদকের দল তাঁর সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখিয়েছিলেন (ব্যক্তিগতভাবে এঁরা হয়ত নন—তবে সম্পাদকদের তিনি শ্রেণীগত ভাবেই দায়ী ক'রে রেখেছেন মনে মনে), তারই প্রতিশোধ এটা। টাকাও নেন তিনি সেই পরিমাণে, সেটাও সেই প্রতিশোধের অঙ্গ হিসেবে ধরেন। সকলের থেকে বেশি নেবেন তিনি—এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। অপর লেখকের কি বাজারদর উঠেছে খোঁজ নিয়ে, সেই অঙ্কের বেশ খানিকটা ওপরে নিজের লেখার দর ধার্য করেন।

লিখছেনও সজলবাবু অনেকদিন ধরে। বড় বড় কাগজ সবগুলোতেই লেখেন তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বরং বলা উচিত বড় বড় কাগজ ছাড়া লেখেন না। অনেক লিখেছেন। তাঁর বইয়ের কাটতিও খুব। বস্তুত সেই বিক্রী দেখেই সম্পাদকরা বুঝতে পারেন তাঁর লেখার সমাদর কী পরিমাণ। তবু, এতদিন পরে এবারের পূজোয় যে কাণ্ডটা হ'ল তা তাঁর কেন সম্পাদকদেরও কল্পনার বাইরে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, যে দুটি কাগজে এবার তিনি উপন্যাস লিখেছেন—দুটিই বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত কাগজ—'ভারত' আর 'অমর'—তবু এ কাগজেও তো এই তিনি প্রথম লিখছেন না। দুটি না হোক, দুইয়ের যে-কোন একটিতে তাঁর উপন্যাস তো থাকেই—প্রত্যেক বছর। তবু এমন সাড়া কখনও পড়ে নি এর আগে, এত প্রশংসা এত অভিনন্দন তিনি আর কখনও পান নি।

সজলবাবু অভিজ্ঞ লেখক। বহুদিনের পুরনো লেখক। তিনি জানেন—যতই 'সাড়া-জাগানো' লেখা বলে বিজ্ঞাপন করা হোক, এই বাংলা দেশে—সাহিত্য জগতে অন্ততঃ—সত্যি সত্যিই সাড়া জাগে কদাচিৎ। স্বভাব-অলস

বাঙ্গালী ভাল লাগলেও সে ভালো-লাগাটা . যে আবার উদ্যোগ ক'রে কাগজে কলমে লিখে জানাতে হবে—এটা ভাবতেই পারেন না। অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। লিখে কেন, টেলিফোন ক'রে বা মুখে জানানোও হয়ে ওঠে না। এর যে কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে, তাই জানেন না। সুতরাং সাড়া-জাগা বা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেশির ভাগই থাকে লেখকের কল্পনা বা ইচ্ছাতুর চিন্তায়। একখানা দুখানা চিঠি এলেই তাঁরা সেটাকে অসংখ্য বলে ধরে নেন, প্রকাশকরাও সেই মর্মে বিজ্ঞাপন করেন।

কিন্তু এবার স্বীকার করতেই হ'ল সজলবাবুকে—বাঙ্গালী তার সেই স্বভাব-আলস্যও পরিহার করেছে। চিঠি এসেছে—অসংখ্য না হ'লেও অভাবিত। প্রায় দুশোর কাছাকাছি। আর টেলিফোন, মৌখিক অভিনন্দন বা উচ্ছ্বাস যে কত তার তো ইয়ত্তাই নেই। সকলের মুখেই এক কথা, এমন আর কখনও হয় নি—এমনটি এর আগে আর পড়েন নি তাঁরা। একই পূজোয় এক লেখকের এমন উৎকৃষ্ট দুটি লেখা—এ সাফল্য অবিশ্বাস্য।

অবিশ্বাস্য তো বটেই—আর আশ্চর্যের কথা, লেখকের কাছে আরও বেশি। তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, কিন্তু সেটা প্রশংসার আতিশয্য-জনিত সুখে বা আত্মতৃপ্তিতে নয়—বিস্ময়ে। কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি। কেমন ক'রে—কী ভাবে যে এটা হল, এই আশাতীত, কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করলেন তিনি—তা তাঁর ধারণার বাইরে—সম্পূর্ণভাবেই। তাঁরই মাথা খারাপ হ'ল, না পাঠকদের ? এমন কি, এটা সত্যকার প্রশংসা না প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ—এ সংশয়ও মধ্যে মধ্যে মনে দেখা দিতে লাগল। পাঠকদের মতিগতি চিরদিনই দুর্জ্ঞেয় লেখকদের কাছে, তবু এতটা জটিল এবং আপাত-অর্থশূন্য বলে মনে হয় নি এবারের আগে—বহুদর্শী লেখক সজল লাহিড়ীরও। তিনি যেন বেশ একটা অস্বস্তিতও বোধ করছেন। পরিচয় ভুল ক'রে কাউকে সম্মান দেখালে সে ব্যক্তি যেমন অস্বস্তি বোধ করে—কতকটা তেমনিই। কেবলই ভয় হচ্ছে তাঁর—এখনই বুঝি এই স্তুতির প্রাসাদ খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে, প্রতিমার রং কাদা ধুয়ে আসল বাঁশখড়ের কাঠামো বেরিয়ে পড়বে। প্রকাশকরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে বেশী রয়্যাল্টি দিয়ে একেবারে প্রথমেই

পাঁচ হাজার কপি ছাপার কনট্রাক্ট করাতে—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যে নয় এই প্রশংসাটা, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল বটে, তবু অস্বস্তিটা পুরোপুরি কাটল না কিছুতেই।

তার কারণ তিনি এই গত কদিন উল্‌টোটাই আশঙ্কা ক'রে আসছিলেন, আর সেই আশঙ্কার জন্য প্রধানত দায়ী যে, ছেলে অভিজিৎকে গালিগালাজ করছিলেন। তখনও অস্বস্তির সীমা ছিল না—কিন্তু সে অন্য কারণে। তাঁর উত্তুঙ্গ অহঙ্কারের প্রাসাদ ভেঙে পড়বে—এই কল্পনাতেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। লোকে যা-তা বলবে, অন্য সাহিত্যিক বন্ধুরা মুখ বাঁকিয়ে হাসবেন আর এই অপমানটা উপভোগ করবেন—বিদ্রূপ করবেন সজলবাবুকে নিয়ে—এইটেই আশা বা আশঙ্কা করছিলেন। এখন মনে হচ্ছে বন্ধুদের ব্যঙ্গ বা ধিক্কার এর চেয়ে ঢের কাম্য ছিল। সূর্যের তাপ সহ্য হয়—এ বালির তাপ যে অসহ্য।

অবশ্য এ সমস্ত ব্যাপারটার মূলেও তাঁর সেই অভ্রভেদী অহমিকা। কোন কাগজকেই কখনও পুরো লেখা এককালে ধরে দেন না তিনি। পুজোয় সাধারণত দু-তিনটে উপন্যাস এবং গোটা দশ-বারো গল্প লেখেন কিন্তু কোনটাই সময়ে বা পুরো-লেখা অবস্থায় দেন না। গল্প অবশ্য বেশির ভাগ দু কিস্তিতেই দিয়ে ফেলেন কিন্তু উপন্যাসের জন্যে অন্তত দশ-বারো দিন লোক পাঠাতে হয় সম্পাদকদের। তবে, সজলবাবু খাটতে পারেন অসাধারণ, যেদিন তারিখ দেন সেদিন একেবারে রিক্ত হস্তে ফেরান না কাউকে। তাঁর সমকক্ষ (তিনি অবশ্য কাউকেই তাঁর সমান দরের লেখক ভাবেন না) বা সমমর্যাদায় অন্য প্রবীণ লেখকরা যেমন হয়রান করেন—বৃথা হাঁটাহাঁটি করান, সজলবাবু তেমন কাউকে করেছেন, এ অপবাদ কোন সম্পাদক দিতে পারবেন না।

এবারেও তাই চলছিল। মোট তিনটি উপন্যাসের 'ওয়াদা' দেওয়া ছিল। 'ভারত', 'অমর' ও আর একটি প্রমোদ-মাসিকে। প্রমোদ মাসিকেরটা অনেক আগে লিখে দিতে হয়েছিল, সেই রকমই কথা ছিল তাদের সঙ্গে—সে জন্যে জরিমানা হিসেবে পাঁচশ টাকা অতিরিক্তও দিয়েছিল তারা। একসঙ্গে লেখা চলছিল—এই দুটি উপন্যাস। একই সঙ্গে কথাটা বাচ্যার্থেও ঠিক। সকালে হয়ত এটা দু পৃষ্ঠা লিখলেন, দুপুরে অপরটা—আবার সন্ধ্যাতে হয়ত সকালের কাহিনী নিয়ে বসলেন, এই ভাবে লিখছিলেন। দেওয়াও চলছিল সেই ভাবেই

—ওকে দশ পৃষ্ঠা, একে আট পৃষ্ঠা—এই হিসেবে। তিনি যে বড় লেখক, সম্পাদকদের যে প্রাণের দায়ে ছুটোছুটি করতে হয় এই ভাবে, দশ-বারো টাকা যে বাসভাড়া লাগে একটা উপন্যাসের পুরো পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে তাঁর কাছ থেকে—একটা লোকের প্রত্যহ তিন-চার ঘণ্টা ব্যয় হয়, মাইনে করা লোকের, সে ক্ষেত্রে সে খরচও চাপে ঐ দশ-বারো টাকার ওপর (সম্পাদকরা নিজে এলে ট্যাক্সিভাড়া আছে)—এই তথ্যটা তিনি উপলব্ধি করতে চান, করাতে চান তাঁর পরিবারের বাকী সকলকে, বন্ধুবান্ধব, পাড়ার লোকদেরও। তিনি যে একটা কেওকেটা লেখক নন, যারা পূজো সংখ্যায় লেখা ছাপা হলেই চরিতার্থ হয়ে যায় তাদের দলের নন—এই পরোক্ষ স্তুতিটা উপভোগ করতে চান—তারিয়ে তারিয়ে চেখে-দেখার মতো ক'রে। এটা তিনি তাঁর পাওনা বলেই মনে করেন—কাগজওলাদের এই প্রায়শ্চিত্তটা। অনেকদিন ধরে তাঁদের অনেক—অবজ্ঞা না হোক—অবহেলা ঔদাসীন্য সহ্য করেছেন, আজ যদি তার দাম উশুল করতে চান তো খুব দোষ দেওয়াও যায় না। আর এর জন্য কষ্টও বড় কম করতে হয় নি তাঁকে। লোকে ভাবে লেখাটা খুব সোজা—হয়ত খুব সহজে লেখেও কেউ কেউ, যা পড়ে পাঠকরাও অচিরে ভুলে যায় সে সব লেখা ও লেখককে—সজলবাবু কিন্তু অত সহজে আজ যশ-গৌরবের এই শিখর-চূড়ায় ওঠেন নি। কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি, সাধনার মতো ক'রে তপস্যার মতো ক'রেই সাহিত্যচর্চা করেছেন। তার জন্যে বেশ কিছুদিন অর্থকৃচ্ছ্রতাও সহ্য করতে হয়েছে, গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে স্ত্রী ও মার কাছ থেকে। আজ সেই তপস্যার ফল ফলেছে, সিদ্ধিলাভ হয়েছে—সে ফল তিনি যদি আজ একটু সাড়ম্বরেই ভোগ করতে চান, খুব দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে।···

তাছাড়া—এভাবে লেখার মধ্যেও কিছুটা বাহাদুরী আছে। একটা লেখা থেকে আর একটা লেখায় স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেন তিনি—এক কাহিনী থেকে অন্য কাহিনীতে, যখন যেটা লেখেন সেটা ছাড়া অন্য কোন কথা, কোন আখ্যানভাগ, কোন চরিত্রই তাঁর মনে বা মাথায় থাকে না, বাকী সব কথা সম্পূর্ণভাবে চিন্তা-ভাবনা থেকে বার করে দিতে পারেন। এ যে কী দুর্লভ ক্ষমতা—এই অনায়াস গতি—তা আর কেউ না হোক, লেখকরা বোঝেন, তাঁরা ঈর্ষাও করেন সে জন্যে। বাড়তি পাওনা হিসেবে ভোজের সঙ্গে পানের

মতো—সে ঈর্ষাটুকুও উপভোগ করেন সজলবাবু।

অবশ্য লেখা সম্বন্ধেও যেমন সজাগ তিনি, লেখার কিস্তি বিলি সম্বন্ধেও তেমনি সতর্ক। ছুটো ফাইলে ছুটো লেখা থাকে, ফাইলের ওপর উপন্যাস এবং যে কাগজে যাবে তার নামও লেখা থাকে, তবু যখন যাকে দেন—সাবধানে বার বার মিলিয়ে দেন। এর কখনও অন্যথা হয় না। এবারেও হয় নি—ঐ একদিন ছাড়া। নিতান্ত হঠাৎ জামাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে চলে যেতে হয়েছিল বলেই অভিজিৎকে বলে গিয়েছিলেন ফাইল থেকে এক পৃষ্ঠার কপি রেখে বাকীগুলো দিয়ে দিতে, ভারতের কপিটা ভারতের লোককে, অমরেরটা অমরের লোককে। সতর্কও ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন বার বার—যেন গোলমাল হয়ে না যায়। সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোন গোলমাল আশঙ্কা করেননি এটা ঠিক। কারণ অন্য দিনও, যখন ঐসব কাগজের লোক আসে—অভিজিৎই বার ক'রে দেয়, অবশ্য তাঁর সামনে, তাঁকে দেখিয়ে নেয়,—তবু সে নিজে হাতেই দেয়। সে ভাল ক'রেই জানে কোন্ ফাইলে কার লেখা, আর কোন্ কাগজের তরফ থেকে কে নিতে আসে।

হয়ত অত বার বার সাবধান ক'রে গিয়েছিলেন বলে অভিজিতের মাথাটা একটু গুলিয়ে গিয়েছিল। পাছে ভুল করে এই ভয়েই ভুলটা ক'রে ফেলল সে। ভারতের কপির দশ স্লিপ অমরের লোককে, আর অমরের আট স্লিপ ভারতের লোককে দিয়ে বসে রইল।

দেবার পরেও সে ভুল ধরা পড়ল না। ভুল বলে বুঝতে পারলে তো ভুল হ'তই না। সজলবাবুরও কোন সন্দেহ হয় নি, ফিরে এসে কতকটা অভ্যাসের বশেই প্রশ্নটা করেছিলেন, 'ঠিক দিয়েছিলি তো? এরটা ওকে দিয়ে বসিস নি?' কিন্তু সে নেহাৎই মামুলি প্রশ্ন—করার জন্যই করা। ভুল হয় নি, তিনি নিশ্চিত জানতেন। ভুল হবার কোন কারণ নেই। অভিজিৎ মূর্খ নয়। নির্বোধ তো নয়ই। সে কলেজে পড়ছে, এই আবহাওয়াতেই মানুষ। তার বাবার লেখা মানেই যে টাকা, তা সে জানে। আর আজকালকার ছেলেদের কাছে টাকার বড় কোন বিবেচ্য বস্তু নেই, অর্থই পরমার্থ—সুতরাং সতর্ক যে সে হবেই—সে সম্বন্ধে সজলবাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ভুল ধরা পড়ল একেবারে 'অমর' কাগজে পূজা সংখ্যা বেরোবার পর। এমনিতে নিজের লেখা এত তাড়াতাড়ি পড়েন না সজলবাবু, একেবারে যখন বই ছাপা হয় তখনই একবার পড়ে নেন। প্রুফ দেখার সময়ই সেটা ঘটে বেশির ভাগ। কিন্তু এবারে—নিতান্তই দৈব বলতে হবে, হাতে কোন কাজ না থাকায় অলসভাবে পাতা ওল্টাচ্ছিলেন—নিজের লেখা ছাড়া আর কীই বা পড়বার আছে—নিজের লেখাতেই চোখ বুলোচ্ছিলেন। সেই সময়ই প্রথম ধরা পড়ল ব্যাপারটা। নিজের বিছানায় হঠাৎ সাপ দেখার মতো চমকে উঠলেন তিনি। প্রথমটা বিশ্বাস হ'ল না, মনে হ'ল নিতান্তই এটা মনের ভুল। ভাল ক'রে দেখলেন তিনি, লাইন মিলিয়ে মিলিয়ে—আগাগোড়া পড়লেন দুবার—আর কোন সন্দেহ রইল না। মধ্যে একটি পুরো পরিচ্ছেদই অন্য বইয়ের এসে গেছে—তার ঘটনা, তার পাত্রপাত্রী সুদ্ধ।

পাগলের মতো হয়ে উঠে তখনই 'ভারত'-এর জন্য লোক পাঠালেন, কাগজ নাকি বেরিয়েছে কিন্তু এ পাড়ায় তখনও আসে নি—ধর্মতলায় হয়ত পাওয়া যেতে পারে—শুনে সেখানেই পাঠালেন, কাগজ আসতে দুরু-দুরু বকে কম্পিত হাতে খুলে দেখলেন—ঠিক, সেখানেও সেই সর্বনাশ হয়ে বসে আছে। ছাপার প্রায় চার পৃষ্ঠার মতো—বড় কম নয় সেটা, আজকাল লাইনোয় ছাপা চার পাতা—অন্য বইয়ের অংশ এসে বসেছে, সেখানেও সেই একই অবস্থা। ও কাহিনীর মাধবী হঠাৎ এখানে সুলেখার জায়গায় বসেছে, এখানকার সুলেখা ও বিজলী গিয়ে ঢুকেছে মাধবীর পরিবর্তে।

তারপর যা কাণ্ড হ'ল তা বর্ণনার অসাধ্য, অনুমান করতে হবে আপনাদের।

চেঁচিয়ে, ছেলেকে অকথ্য কুকথ্য গালাগাল দিয়ে, স্ত্রীর ওপর তম্বী করে, ঝি চাকরকে খিঁচিয়ে কাগজ দুটো কুঁচিয়ে ছিঁড়ে কার্পেটে কালিসুদ্ধ দোয়াতটা আছড়ে ভেঙে—একেবারে পাগলের মতো কাণ্ডকারখানা করে তুললেন। ছোটখাটো দক্ষযজ্ঞ একটা। রাগ করে খেলেন না সে সারাটা দিন। দুপুরে ভাতসুদ্ধ থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারেন নি। বাইরে বেরিয়েই মনে হ'ল আশপাশের সমস্ত লোক বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে—সকলের মুখে চোখেই একটা অনুকম্পার ভাব—ফলে কোনমতে মোড়ের পানওয়ালার দোকানটা পর্যন্ত

গিয়েই ফিরে চলে এলেন, বলতে গেলে পালিয়ে এলেন। কিন্তু তখনও কিছু খেলেন না, ছোট মেয়ে—যে সবচেয়ে আদরের তাঁর কাছে, সে একবার কিছু খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে এসেছিল, তাকে একরকম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইলেন খালি পেটেই।

তারপর—বেলা চারটে থেকে এই কাণ্ড শুরু হ'ল। এই ভানুমতীর খেল।

প্রথম টেলিফোন করলেন সজলবাবুর বড় ভগ্নিপতি, নিমু গোস্বামী। ভগ্নিপতি বলে নয়—ভাল সাহিত্যপাঠক বলে সজলবাবু বরাবরই এঁর মতামতকে শ্রদ্ধা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এখনকার মতো শূন্য ডিগ্রিধারী নন, লেখাপড়া জানা লোক। সবচেয়ে বড় কথা, সত্যিকার সাহিত্য রসিক—পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোন উল্লেখযোগ্য বই নেই যা উনি পড়েন নি।

টেলিফোনে ওঁর গলার আওয়াজ পেয়েই সজলবাবুর মনে হয়েছিল উনি তিরস্কার করার জন্যেই ফোন করেছেন, অথবা লেখাটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেন নি বলে—জানতে চাইছেন ব্যাপারটা কি। মনে হয়েছিল একবার যে, ওঁর বক্তব্য শোনার আগেই টেলিফোন রেখে দেন—নিতান্তই তাতেও অব্যাহতি পাওয়া যাবে না বলেই তা করেন নি। কিন্তু গোস্বামী যা বললেন তা একেবারে প্রত্যাশঙ্কার বিপরীত। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তিনি অমরের উপন্যাসটার। বললেন, 'তুমি ভালো লেখো ঠিকই, অনেক ভাল বই লিখেছ, কিন্তু এর তুলনা নেই—এই বই-ই তোমার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হয়ে রইল।'

বুঝতে দেরি হ'ল কথাগুলো। ভুল শুনছেন না তো? না কি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এটা?

কিন্তু গোস্বামী বলেই চলেছেন। অজস্র প্রশংসা ও স্তুতি। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন তিনি—যথেষ্ট প্রশংসার যেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না।

তা ছাড়াও—এই ভগ্নিপতিটিকে ভাল ক'রে চেনেন তিনি। এ ধরনের বিদ্রূপ করার মানুষ নন। যারা মানুষের সামান্য একটু ত্রুটি ধরে তাকে আঘাত করার জন্য ব্যগ্র হয়, নির্মল গোস্বামী সে দলের নন। এমনিতেও—সাহিত্য তাঁর কাছে ঈশ্বর, এ নিয়ে তিনি ঠাট্টা করবেন না। শ্যালকের যে

লেখাগুলো পছন্দ হয় না তেমন—সে সম্বন্ধে তিনি নীরব হয়ে থাকেন, কখনও নিন্দা করেন না।

তবে কি এতকাল পরে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল তাঁর ?

ভয়ে ভয়ে ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন সজল লাহিড়ী, 'আপনি পড়েছেন সবটা ?'

'পড়েছি বৈকি। না পড়েই কি বলছি। কাগজ হাতে পেয়ে তোমারটাই আগে ধরেছিলুম, একটানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেছি—।'

'বেশ বুঝতে পেরেছিলেন সব ?…পড়তে পড়তে কোন অসুবিধা হয় নি ? …কোন ভুল ত্রুটি চোখে পড়ে নি ?'

'না—কিছু না। ভুল বলতে দু-একটা নামের এদিক-ওদিক হয়ে গেছে, তা সে তো স্বাভাবিক। একসঙ্গে অতগুলো লেখা লিখলে তো এ ধরনের ভুল হতে বাধ্য।'

সেই শুরু !

গোস্বামী না রাখতে রাখতেই জটিলেশ্বর ফিল্‌মের রাখহরি সুর। বলে, 'কী মশাই, কার সঙ্গে কথা কইছিলেন এত ? সেই থেকে ডায়াল ক'রে ক'রে হয়রান !…শুনুন, আপনার এই অমরের বইটা—কী যেন নাম—বংশীবট — ওটা আমার চাই-ই। আর কাউকে যেন কথা দেবেন না। আমার সঙ্গে দরে না পটে সে আলাদা কথা, মোদ্দা যা বাজারদর উঠবে তার চেয়ে বেশি দিয়েও ওটা কিনব, আমাকে না বলে বেচতে পাবেন না। এই বলে রাখছি— ।'

তখনও গলায় যেন জোর পাননা সজলবাবু। ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, 'পড়েছেন নাকি ? পড়ে দেখে পছন্দ হয়েছে, না এমনিই—?'

'বলেন কি, এতগুলো টাকা ইনভেস্ট্‌ করব না পড়ে ? ভোরবেলা কাগজ হাতে পেয়ে—এমনি ওল্‌টাতে শুরু করেছিলুম, তারপর কোথা দিয়ে যে টেনে নিয়ে গেলেন মশাই, এই শেষ করলুম। কাজকম্ম সব পড়ে—এখনও খাওয়াই হয় নি। এক্‌সেলেন্ট মশাই, ইউনিক ! অবিশ্যি বোকার মতো বলে ফেললুম পছন্দ হয়েছে, তাই বলে যেন একেবারে গলায় ছুরি চালাবেন না—আকাশ-ছোঁয়া না কি বলে যেন খবরের কাগজের ভাষায়—সেই রকম একটা দাম হেঁকে বসবেন না। আমি প্রথম আপনাকে কন্‌গ্র্যাচুলেট করলুম সেই কৃতজ্ঞতায়'

অন্তত রয়ে-বসে দামটা নেবেন'—ইত্যাদি।

এরপর আরও সাত-আটটি টেলিফোন।

সেদিন শুধুই অমরের লেখাটার কথা। পরের দিন থেকে শুরু হয়ে গেল ভারতের উপন্যাসখানারও অজস্র উচ্ছ্বসিত স্তুতি। এমন নাকি হয় না, একই সিজন্‌এ একই লেখকের দুখানা উপন্যাস—এমন উৎরে যায় না কখনও।

প্রশংসা আসতে শুরু হ'ল সর্বত্র, সর্বস্তর থেকে। পাড়ার ধনুষ্কোডি ক্লাবের সভাপতি দলবল নিয়ে এসে মালা দিয়ে গেলেন। য়্যান্‌ড্রু ম্যাকনীল-এর আপিস রিক্রিয়েশান ক্লাব একটা সম্বর্ধনা জানাতে চায়। এমন কি অমরের মালিক বিমলকান্তি মিত্রও টেলিফোন ক'রে অভিনন্দন জানালেন—নিজে থেকেই বললেন যা কথা হয়েছিল তার থেকে একশ টাকা বেশি দেবেন। এইটেই সবচেয়ে বড় বিজয় সজলবাবুর—হাড়কৃপণ বিমলকান্তির কাছ থেকে বেশি টাকার প্রস্তাব আসা। ভারতের মালিক টেলিফোন করেছিলেন—তিনি নাকি এসব বিশেষ পড়েন না, স্ত্রীর পীড়াপীড়িতেই পড়েছেন, সত্যি খুব ভাল লেগেছে। সম্পাদক এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে বাড়িতে এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন। চিঠির তো বৃষ্টি। দুই কাগজের আপিসে তো বটেই—তাঁর বাড়িতেও কম নয়।

কিছুই বুঝতে পারেন না সজলবাবু। পাঠকদের প্রশংসায় যে এত কষ্ট হয়, এত অস্বস্তি বোধ হতে থাকে তা আগে কখনও অনুভব করেন নি। এতগুলো লোক মিছে বলছে না, এতগুলো লোক ঠাট্টা করছে না এটা ঠিক, কিন্তু তবু—!

প্রথমটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, শেষে একটু উষ্ণও হয়ে উঠলেন। একজন দুজনের ওপর তো তেড়েই উঠলেন, 'তোমরা কিচ্ছু জানো না, তোমাদের মতামত প্রশংসার কোন মূল্যও নেই। তোমরা যা পাও আদেখ্‌লের মতো তাই তোমাদেব ভাল লাগে।' যারা প্রশংসা করতে এসেছিল তারা হতভম্ব হয়ে যায়। ভাবে অতিরিক্ত বিনয়। বাড়িতেও অশান্তির শেষ রাখলেন না। স্ত্রী কিছু বোঝাতে এলে তাকে খিঁচিয়ে উঠতে লাগলেন। ছেলের ওপর কোপটাই বেশি, তাঁর কেবলই মনে হয়, সে এবার তাঁকে অনুকম্পার চোখে দেখছে। তার

চোখে প্রতিহিংসার কল্পিত আলো দেখতে পান তিনি।...রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, মুঠো মুঠো ট্র্যাঙ্কুইলাইজার খেয়েও স্নায়ু শীতল হয় না।

শেষে, দশ-বারোদিন যেতে—নিতান্ত কালক্রমেই যখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এল কিছুটা—নিজে একবার লেখা দুটো নিয়ে বসলেন। আদ্যোপান্ত পড়লেন দুটো লেখাই। একবার নয়—একাধিক বারই পড়লেন। তখন মাথাতে গেল ব্যাপারটা, দেখলেন ভোজবাজীই ঘটে গিয়েছে একটা। ভোজবাজী বললে হয়ত একটু ছোট করা হয়—মিরাক্‌ল্ যাকে বলে তাই হয়ে গেছে। পাত্রপাত্রীর নামের এদিক ওদিক যাই হোক, ভুলের ফলে গল্পে যে প্যাঁচ লেগেছে, তাইতেই কাহিনী দুটো অসাধারণ হয়ে উঠেছে। এ পরিণতি তিনি নিজে কখনও ভাবেন নি, ভাবলে এ জিনিস হতও না হয়ত—এ নিতান্তই দৈবাৎ ঘটে গিয়েছে—কিন্তু ফল ভালই হয়েছে, অপ্রত্যাশিত রকম ভাল। দু-একটা জায়গায় যা ধোঁকা লাগতে পারত পাঠকদের মনে—সেটা লেখক যত বুঝতে পারলেন, পাঠকরা অত বোঝে নি, তারা নিজেদের মতো কল্পনা দিয়ে সে শূন্যতা পুষিয়ে নিয়েছে। যার যা ভাবতে ভাল লেগেছে সে সেই মতো ভেবেছে।

কিন্তু সে যাক, সত্যিই ভাল হয়েছে, অসামান্য রকমের উৎরে গেছে দুটো বই-ই। তিনি যা ভেবে রেখেছিলেন, যে ভাবে লিখেছিলেন, তাতে এত ভাল দাঁড়াত না—সেটা তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।

খুশি হবারই কথা—কিন্তু হলেন না সজলবাবু।

ছেলেকে অবশ্য কিছু বললেন না, বরং তার অনেক দিনের শখ ছিল একটা দামী হাতঘড়ির, স্ত্রীকে টাকা দিয়ে কিনিয়েও দিলেন—কিন্তু নিজে মনমরা অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন।

আসলে তাঁর অহমিকায় ঘা লেগেছে—প্রচণ্ডরকম। সেই জন্যেই সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারছেন না। তিনি এটা ভাবতে পারেন নি—এতটা ভাল হত না তাঁর লেখা অবিকৃত অবস্থায় বেরোলে—এই চিন্তাটাই তাঁকে অস্থির ও বিমূঢ় ক'রে তুলেছে। অভিজিতের আকস্মিক একটা ভুলের ফলে আজ তাঁর এই খ্যাতি ও প্রশংসা, এই অভাবিত সাফল্য, এটাকে তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অপমান বলেই মনে করছেন। পরাজয় একটা।

পূজোতে কোথাও যাবেন না স্থির ক'রে রেখেছিলেন—পূজোর পরই অমরে

একটা ধারাবাহিক উপন্যাস ধরবার কথা, সেইটেই লেখা শুরু করবেন ধীরে সুস্থে, এই ঠিক ছিল—অকস্মাৎ সব পরিকল্পনা বানচাল ক'রে মাদ্রাজ রওনা হয়ে গেলেন ষষ্ঠীর আগের দিন। কোন পরিচিত বাঙালীর সঙ্গে দেখা হবে না —এই লেখার প্রশংসা শুনতে হবে না—এই আশাতেই এত জায়গা থাকতে মাদ্রাজ বেছে নিলেন। যাওয়ার আগে অমরের সম্পাদককে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে গেলেন—

'অনিবার্য কারণে উপন্যাসটি এখন শুরু করা গেল না, সেজন্যে আন্তরিক দুঃখিত। শারীরিক অবস্থা এমনই যে—এখন ধারাবাহিক লেখা শুরু করা সম্ভব নয়, করলে হয়ত আপনাদের বিপন্নই করা হত শেষ পর্যন্ত। সামান্য একটু অসুবিধায় ফেললুম—কিন্তু নিরুপায় বুঝে ক্ষমা করবেন। ইতি—'

অমরের সম্পাদক তাঁর সহকারীকে চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, 'সাকসেসের এই তো বিপদ, এখন কেবলই ভয় হচ্ছে বোধহয় সজলবাবুর যে, যদি ঐ স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে না পারি।...নাও, এখন খোঁজ আবার অন্য লেখক, কে তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারে—! ভ্যালা-এক বিপদ হ'ল দেখছি। লেখা ভাল হয়েছে বললেও দোষ!'

ভাগ্যরূপিনী

না না, আমি কোন আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করছি না। কিংবা কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণাও না। শুধু যা ঘটেছিল সেইটুকুই বলছি. আর আপনাদেরই জিজ্ঞাসা করছি—পুরুষ পাঠকদের—আর কীই বা করতে পারতুম—এ ছাড়া? আপনারা হলে কী করতেন এ অবস্থায়?

হয়ত কেউ কেউ কঠিন-হৃদয় বা ঘা-খাওয়া মানুষ আছেন—যাঁরা কঠিন হয়েই থাকতেন কিন্তু সে খুবই কম, শতকরা একজন বড় জোর।

হৈ-চৈটা কিছু আগেই কানে এসেছিল, তবে উঠে গিয়ে ব্যাপারটা কি খোঁজ করতে হবে—এমন কিছু নয়। বাড়িতে আমি একা তখন। ওঁয়ারা ভোরবেলাই 'নীলের ঘরে বাতি' দিতে নকুলেশ্বরতলায় গিয়েছেন, নইলে রোদ উঠে যাবে এই যুক্তি (যাবেন তো গাড়িতে, রোদে কী করবে? তা নয়, জল

খেতে, চা পান খেতে দেরি হয়ে যাবে। এইই আসল কারণ)।—বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছি। সাংবাদিকরা আজকাল ভাল খবর লেখার চেয়ে সাহিত্য লেখেন বেশী। সুতরাং রসিয়েই পড়ছি। খবর বোঝার দরকার নেই। সাহিত্য-রস তো পাচ্ছি, এই ঢের। সেই জন্যেই আরও উঠে গিয়ে দেখব বাইরের চেঁচা-মেচিটা কিসের,—সে ইচ্ছে আর হয় নি।

উঠতে হলও না অবশ্য। পৃথিবীতে সৌভাগ্যের পিছনে ছুটলে সৌভাগ্য দূরে সরে যায়—তুমি দূরে থাকতে চাইলে সে পিছনে ছোটে—এটা সৌভাগ্যের বেলাতেও যেমন, দুর্ভাগ্যের বেলাতেও তেমনি। আমারও ভাগ্য—দরজাটা ওঁয়ারা বেরিয়ে যাওয়া ইস্তক ভেজনোই ছিল, আলিস্যি ক'রেই উঠে আর বন্ধ করি নি—দমকা হাওয়ার মতো কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকে কপাটটা বন্ধ করে দিলে।

ভাগ্য মানে ভাগ্যরূপিণী—একটি মেয়ে, যা এতক্ষণ আপনারা প্রত্যাশা করছিলেন।

ঘরে ঢুকে এক লহমায় আমাকে দেখে নিয়ে ছুটে এসে যেন আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল, এবং বসে হাঁপাতে লাগল।

বুঝুন ব্যাপার। গল্প উপন্যাসে এমন ঘটনা পড়লে বোধহয় রোম্যান্স কি রোমাঞ্চ জাগে—বাস্তবে, যাদের অগ্রপশ্চাৎ কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাদের আতঙ্ক হবারই কথা।

আমারও এই শেষের অনুভূতিটাই প্রবল হয়ে থাকবে। তখন তাও যেন বুঝতে পারছি না, পাথর হয়ে গেছি।···এ আবার কী ফ্যাঁসাদ রে বাবা। মেয়েটি অল্পবয়সী, দেখতেও ভাল, দামী শাড়ি-জামা-পরা—তবে সেগুলো খুব বিপর্যস্ত, জামাটা ছিঁড়ে গেছে খানিকটা, ফলে সুডৌল সুদৃশ্য বুকের অনেকটা পর্যন্ত তখন অনাবৃত, সে সম্বন্ধে সচেতনও হবার অবসর পায় নি সম্ভবত ; শাড়িও আলুথালু। আর—এতক্ষণ ছিল না হয়ত—কিন্তু এখন, দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনেই সমস্ত কপাল গলা ঘাড়—এমন কি আরও যতদূর চোখে পড়ছে—ঘামে ভেসে গেল। সে লজ্জায় কি পরিশ্রমে, অথবা ভয়ে—তা জানি না। কিংবা সব মিলিয়েই।

অবশ্য এ সব দেখার কি এত ভাবার সময় নেই। মনের মধ্যে ফাঁড়ার চিন্তাটাই প্রবল। যে অবস্থা, বহু কঠিন বিপদ ঘটতে পারে। এর কী মতলব,

কোন্ দিক দিয়ে ফাঁসাবে—এখনও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ; নিমেষের মধ্যে অনেকগুলো সম্ভাবনা খেলে গেল মাথায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ফলাফল। আমার এক দাদা গাড়ি ক'রে আসতে আসতে একটি মেয়ে রাস্তায় ভিজছে দেখে তুলে নিয়েছিলেন। তার ফলে থানা পুলিস, বাড়িতেও নানা সন্দেহ—সেটা বোধহয় সম্পূর্ণ কাটে নি—শেষে দু হাজার টাকা খেসারত দিয়ে রেহাই পান। আমি বিব্রত তো বটেই, কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলুম, 'এ—এসব কি ! কপাট দিলেন কেন ? কী চান আপনি ? এভাবে—'

মেয়েটি এবার সোজাসুজি আমার পা চেপে ধরল—তাকে চেপে না ধরে জড়িয়ে ধরা বলাই উচিত, যেভাবে একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়েছে—'একটু, একটুখানি চুপ ক'রে থাকুন, প্লীজ—আপনার পায়ে পড়ছি। জানতে পারলে মেয়েছেলে বলে মানবে না—টেনে নিয়ে যাবে—আমাকে বাঁচান।'

তারপর হঠাৎই বলে ফেলল, আমি—পকেটমার, হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে !'

মেয়ে পকেটমার। কি সর্বনাশ।

তবে—সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল, আশ্চর্য হবারই বা কী আছে। আজকাল তো এদের খুবই আমদানি হয়েছে। কাগজে পড়ছি, লোকেও বলছে। ট্রামে বাসে বিশেষ চড়তে হয় না ভগবানের ইচ্ছেয়—আপিসের গাড়িটা যতদিন আছে—তাই, নইলে আমাকেও হয়ত গচ্ছা দিতে হত এঁদের পাল্লায় পড়ে এতদিন।

মনটা কঠিন হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বরও ব্যঙ্গ-তিক্ত স্বভাবতঃই।

'বটে, পকেটমার জেনেও তোমাকে বাঁচাব—এইটেই আশা করো নাকি ? আস্পর্ধাও তো কম নয়। বরং বাঁচতে চাও তো এখনই বেরিয়ে যাও, নইলে আমাকেই টেলিফোন ক'রে পুলিসে খবর দিতে হবে।'

ততক্ষণে সে পুরোপুরিই আমার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরেছে, বেশ মজবুত ভাবেই—অর্থাৎ ওঠার চেষ্টা মাত্র না করতে পারি ; অন্তরকম একটু 'অ্যাপীলে'র চেষ্টাও ছিল বোধহয়—কিন্তু মুখে বলল, 'তাহলে তো বেঁচে যাই। মার খেতে তো হবে না, মুখ-নাকও ছিঁড়ে কেটে যাবে না। তাতে বাইরে বেরোনোই বন্ধ করতে হবে কত দিন। সেই তো আসল ভাবনা। পুলিসে দিলে বড়জোর কঘণ্টা হাজতে থাকতে হবে। তারপর তো ছাড়া পাবই। ওখানে তো ঘুষ

দিয়েই খালাস—ইন ক্যাশ্ অর ইন কাইণ্ড।'

আমি মশাই—সত্যিই বলছি—এতখানি বয়সে, এমন 'ব্রেজেন ফেসেড' না কি বলে ইংরেজীতে, মানে রাম-বেহায়া মেয়ে দেখি নি।

রাগে চট ক'রে যেন কথা যোগায় না মুখে। অনেক কষ্টে বলি, 'তা তাই যদি জান তো অমনভাবে পা চেপে ধরছ কেন, টেলিফোনের কাছে যাতে না যেতে পারি!'

সে অম্লানবদনে উত্তর দিলে, 'অতটুকু ঝামেলার মধ্যেই বা যাই কেন, যদি না গিয়ে পারি—সেই তো ভাল।'

অগত্যা—এক রকম বাধ্য হয়েই বসে পড়তে হ'ল।

ব্যাপারটা খুবই রোমাঞ্চকর ও রোম্যান্টিক হতে পারত সন্দেহ নেই। পায়ে যে উষ্ণ কোমল স্পর্শ পাচ্ছি, তা মনে মোহ সৃষ্টি করারই কথা; একটুও করছে না বললে সত্যের অপলাপ করাও হয়। স্থান কাল পাত্র অন্য রকম হ'লে সতিই উপভোগ্য হত। কিন্তু অবস্থা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, সেটা ভুলি কি ক'রে! গৃহিণী ও কন্যা যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন। পাড়ার ঐ যারা এর পিছে ধাওয়া করেছিল—তারাও হঠাৎ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকা অস্বাভাবিক নয়। কাউকেই আসল কথা বোঝাতে পারব না। মাঝখান থেকে ঘরে বাইরে মাথা তোলাই মুশকিল হয়ে পড়বে।

এ সাংঘাতিক মেয়ে, সর্বনাশী। কিছুতেই এর আটকায় না। কোনমতে একে বার ক'রে দিতে না পারলে শাস্তি স্বস্তি নেই। কিন্তু এ বাহুবন্ধন এখন ছাড়াই কী ক'রে। তাহলে তো রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হয়। তখন যদি চেঁচিয়ে লোক জড় ক'রে উলটো চাপ দেয়?···আসলে দরজাটা খুলে রাখাই আমার ঝকমারি হয়েছে।

না, গায়ের জোরে হবে না, অন্য পথ ধরতে হবে। গলার স্বর বদলে নরম ভাবেই প্রশ্ন করলুম, 'তুমি তো দেখছি লেখাপড়া জানো, ভদ্রঘরের মেয়ে—এ কাজ করোই বা কেন?'

বাহুবন্ধন তবু শিথিল হল না। শুধু মুখটা কিছু করুণ হয়ে উঠল। উত্তর দিল, 'কী করব। বাড়িতে পঙ্গু বাবা, প্যারালিসিসে একটা অঙ্গ পড়ে গেছে, প্রায় অন্ধ মা, তিনটে ছোট ছোট ভাই বোন। কি খাওয়াব তাদের? আপনি

আমাকে চাকরি দেবেন? কত লোকের কাছে গেছি, কেউই তো ভদ্রভাবে বাঁচবার কি বাঁচাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন নি।'

কী যেন মাথায় এসে গেল, দুষ্ট সরস্বতী ভর করার মতো—বরাতের ওপর বরাত দিয়ে বলে ফেললুম, 'মিথ্যে কথা। এসব মামুলি বাঁধা গৎ বরং থানায় গিয়ে বলো, ছেড়ে দেবার তবু একটা অজুহাত পাবে তারা। এত অবস্থা খারাপ নয় তোমার। এত দায়িত্বও নেই। এ কাজ তুমি করো, অভাবে নয়—স্বভাবে।'

এই ওপর-চাপেই আশ্চর্য কাজ হ'ল। একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর মুখখানা—চোখের চাউনিটাও হয়ে উঠল ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো। আর্ত, অসহায়।

ওদিকে রাস্তার হৈ-হৈটা কাছে আসছে। অন্বেষণকারীদের একটা দল বোধহয় সামনে দিয়ে চলে গেল।

'এই দিকেই তো এল। আমি পষ্ট দেখেছি। উবে গেল নাকি বাওয়া!'

'না না. আমি সেই গোড়া থেকে তোকে বলছি। এক্কেবারে উল্‌টো দিকে এইচি আমরা—'

'আশ্চর্য! এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিলে মাগী!'

স্তিমিত হয়ে গেল কোলাহল আর পদশব্দ।

মেয়েটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, সেটা বুঝতে পারলুম।

প্রথম আঘাতের সে বিহ্বলতাও কেটে গেছে।···জাঁহাবাজ মেয়ে। এই-টুকুর মধ্যেই—যাকে বলে লাইন অফ য়্যাক্‌শানও ঠিক করে নিয়েছে।

বাইরের চেঁচামিচি কাছে আসতেই পা দুটো ছেড়ে দিয়েছিল—দরকার হ'লে অন্তঃপুরে গিয়ে আশ্রয় নিত বোধহয়, তারই প্রস্তুতি হিসেবে। এতক্ষণ পায়ের ওপর প্রায় সব দেহটাই চেপে ধরে ছিল। অস্বস্তি ও আতঙ্কের সীমা ছিল না। এখন অপরাধীর মতো হেঁট মাথায় আস্তে আস্তে বলল, 'না, মিছে কথা বলে পাপ আর বাড়াবো না। সত্যিই—একেবারে যে খাবার সংস্থান নেই তা নয়। বাবা এখনও চাকরি করছেন। তবে আমি চাকরি পাই নি এটাও ঠিক। আর···অনেক টাকা খরচ ক'রে বিয়ে দেবেন সে সঙ্গতিও তাঁর নেই। আরও দুটো বোন ইস্কুল কলেজে পড়ছে। একটি টিউশানী করতে

পারতুম, করেওছি—সে বড় ডাক্তারী। ভাল লাগল না।···তাতেই, কী যে দুর্বুদ্ধি হল, এই পথ ধরলুম। বাড়িতে এখনও জানে আমি টিউশানী করি—'

এবার দ্বিধা ছিল না। বললুম, 'তুমি কিন্তু বেশ বানিয়ে বলতে পারো! গল্প লিখতে শুরু করলে নাম হত। এ লাইনে হঠাৎ একদিনে আসা যায় না। অনেক তালিম দরকার, পিছনেও লোক থাকা চাই। একা একা হয় না। তুমি যখন পকেট কাটছিলে তোমার সঙ্গে আরও লোক ছিল নিশ্চয়ই। চোরাই মাল হয়ত পাচারও হয়ে গেছে। এসব দলের কাজ।'

হঠাৎ যেন ইলেকট্রিক শ্যক খেয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। চাপা গলায় সাপের মতো হিস হিস ক'রে উঠল, 'কেন আমাকে সেই থেকে এত অপমান করছেন বলুন তো! খুব জো পেয়ে গেছেন, না।···এখুনি চেঁচিয়ে লোক জড়ো ক'রে যদি ফাঁসাই আপনাকে?'

সে ভয় তো রয়েছেই, তার চেয়েও বেশী ভয় গৃহিণী এসে পড়ার; তবু উপায় তো নেই, নরম হলেই পেয়ে বসবে—তাই মুখ-সাপোর্ট বজায় রেখে বলি, 'ছ্যাখ না চেষ্টা ক'রে। যারা তোমাকে ঐ খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা এখনও বেশী দূর যায় নি। আর কেউ কি আর তোমার মুখটা মনে ক'রে রাখে নি!'

আবারও যেন দমে গেল সে। মনে হল ফুটো বেলুনের মতো চুপ্‌সে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগটারই সদ্ব্যবহার ক'রে বললুম, 'যাক গে, এখন সরে পড়ো দিকি ভালয় ভালয়, নইলে সত্যিই পুলিস ডাকতে হবে এবার। নয় তো চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করতে হবে—তুমি যা চাইছিলে!'

সর্বনাশী এবার বোধ হয় নিজের সর্বনাশের চেহারাটা দেখতে পেল। বিপন্ন, আবারও সেই ফাঁদে পড়ার মতো মুখের ভাব। এদিক ওদিক চেয়ে যেন মরীয়া হয়েই বলে ফেলল, 'আমাকে—আমাকে গোটা ছয়েক টাকা ধার দেবেন? সত্যি বলছি, চোরই হই আর পকেট-মারই হই—আমাদেরও একটা কোড অফ অনার আছে। বিপদের ঋণ ফাঁকি দেব না, ঠিক শোধ দেব।'

'কি হবে টাকা? তোমার কাছে কিছু নেই?'

'ব্যাগটা ভিড়ের মধ্যে কে যে কেড়ে নিল। তখন সেদিকে নজর দিতে গেলে মার খেতে হয়। আর কোথায় পাব?···এই অবস্থায় বেরিয়ে হেঁটে যেতে সাহস হয় না। যে দেখে নি সেও কাপড়-চোপড়ের এই অবস্থা দেখলে চিনবে।

একটা ট্যাক্সি করতে হবে।'

একটু ইতস্ততঃ করলুম। চট ক'রে বেরিয়ে গিয়ে লোক ডাকতে পারতুম তখনও। মাত্র দু'তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও—হয়ত বাধা দিতে পারত না। মতলব বোঝার আগেই কপাটটা খুলে দিতে পারতুম।

কিন্তু পারলুম না ওর চোখের দিকে চেয়ে। অভিনয় নয়—সত্যিই বিপন্ন করুণ হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। উদ্বেগের সীমা নেই।

দিলুম পকেট থেকে টাকাটা বার ক'রে। খবরের কাগজওয়ালাকে দেব বলে একটা দশ টাকার নোট রেখেছিলুম পকেটে, সেটাই দিয়ে দিলুম। বললুম, 'নিয়ে যাও, তবে যদি উপকার করেছি বলে মনে করো—দয়া ক'রে আর ফেরৎ দেবার চেষ্টা ক'রো না।'

মেয়েটা যেন একটু অভিভূতের মতোই নোটখানা নিল। তারপর, শাড়ি জামা যতদূর সম্ভব গুছিয়ে ভদ্রস্থ করে নিয়ে—আর এক কাণ্ড ক'রে বসল, হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে একেবারে আমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল একটা। ওর কপালের ঘাম লাগল পায়ে, দু'চার গাছা চুলও এসে পড়ল। এ অভিজ্ঞতা এ-ই প্রথম, অন্য কোন অনুভূতি কী বোধ করলুম জানি না, গা-টা সিরসির ক'রে উঠল এটা টের পেলুম।

সে প্রণাম ক'রে উঠে নিঃশব্দেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে আমিই একটু কোমল হয়ে উঠেছি, পায়ের সেই অননুভূতপূর্ব স্পর্শটাই বিচলিত ক'রে তুলেছে বোধ হয়—বললুম, 'কিন্তু—এ লাইন কি ছাড়তে পারো না আর? মিছিমিছি এত রিস্‌ক্, ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়ে তুমি—!…এখনও সময় আছে, এমন কিছু পুরনো অভ্যেস হয়ে যায় নি নিশ্চয়!'

মেয়েটা দরজার কাছে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'বোধ হয় আর পারব না। চেষ্টা যে না করেছি তা নয়। এ কাজের উত্তেজনা—বাহবার নেশাই একদিন টেনেছিল, এখন বাঁধনটা চেপে বসেছে। দলের ভয়ও আছে একটা, তবে দোষ সবটাই ওদের ওপর চাপাব কেন, নেশাও কম নেই। খোঁয়াড়ি ভাঙ্গা জানেন? মদের? মদের অবসাদ মদ দিয়েই কাটাতে হয়।'

'বিয়ে করো না কেন? এমন চেহারা, লেখাপড়া জানো—'

'বিয়ের পরও যদি এ অব্যেস ছাড়তে না পারি? তা ছাড়া, এই দেহ নিয়ে —এই ইতিহাস নিয়ে স্বামীর ঘর করতে যাওয়া?—না, সেও পারবে না।'

সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

— চতুর্থ স্তবক সমাপ্ত —